গীত-বাদ্যম্

(১ম খণ্ড)

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ

বাংলা একাডেমীর **মুদ্রণ শাখা**

বিষয়-সূচী

তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘণ এই জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে প্রতিটি জাতিকে এক একটি পৃথক অধ্যায়ে লেখা হয়েছে। **শব্দ-সূচী** দেখুন।

শুদ্ধিপত্র

৮'এর পাতার ফুটনোটে পঃ অহোবল ও শ্রীনিবাসের কথা ভুল বলা হয়েছে। সর্বপ্রথম পঃ সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধ গ্রন্থেই তারের লম্বের কথা বলেন।

৩১-এর পাতায় গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনায় আলাপী আলাপিনী হবে।

৩৪ „ „ উত্তর মেলার্দ্ধটি উভয় মেলার্দ্ধ পড়তে হবে।

৪০ „ „ শ্লোকের মলংন্ধারং=মলংকারং হবে।

৫৬ „ „ কুর্ষাৎ—কুর্য্যাদ ও বহ্নিজালে—বহ্নিজ্বালে হবে।
লোলাম্বালী- লোলম্বালী হবে।

৫৭ „ „ সমনিকা নয়, প্রমাণিকা পড়তে হবে।

৫৮ „ „ মৌক্তিকমালা চন্দ শৌক্তিক নয়।
স্রাগিনী—স্রাগ্বিনী পড়তে হবে।

৬১ „ „ সৌরীন্দ্রমোহন—শৌরীন্দ্রমোহন হবে সর্বক্ষেত্রেই শৌরীন্দ্র শ' হবে।

৭৮ „ „ বাদীস্বর বা অংশস্বরের জায়গায়—'বাদীস্বর বলা হয়' হবে।

১১৫ „ „ দ্রুপদের—ধ্রুপদের হবে।

১২১ „ „ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম লেখা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ ভুল শিষ্য মণ্ডলীর মাঝে ওঁর নাম থাকতেই পারে না, কারণ উনি বয়সে অনেক প্রবীন ছিলেন। প্রুফ দেখার প্রমাদে এটি ঘটেছে। নামটি ঘরাণায় কথার পরেই আসবে।

১২২ „ „ প্রকাশনায়—প্রকাশনার হবে।

১৭৬ „ „ **বাসরস্বতী—বালাসরস্বতী** হবে।

১৯৩ „ „ শরীরজ কথার পর পূর্ণচ্ছেদ হবে।

২০৮ „ „ ডান হাতে তার টেনে—বাঁহাতে হবে এবং বাঁহাতে লেখাটি ডান হাতে পড়তে হবে।

২২২ „ „ প্রচীন—প্রাচীন হবে।

২৬৪ ও ২৬৬ „ মেলম বা স্বরম বা বাদ্যম শব্দগুলি মেলম্ বা স্বরম্ ও বাদ্যম্ হবে। এবং গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠাতেই এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে এই প্রমাদ ঘটেছে।

২৯৬ „ „ বোহন—বোহণ হবে এবং সর্বত্রই এই শব্দটি বোহণ হবে জানবেন।

৩০৬ „ „ তুরীর—তূরীর হবে, এবং শেষ লাইনে রহ্ শব্দটি হয় হবে।

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে

সঙ্গীত—গান, বাজনা ও নাচ এই তিনকে একসঙ্গে সঙ্গীত বলা হয়। এই তিনের মধ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রধান বলে অনেকে সঙ্গীত মানে কণ্ঠ-সঙ্গীত (অর্থাৎ কেবলমাত্র গানকেই) মনে করেন ; কিন্তু আসলে শব্দটি সমুদয়বাচক।

সঙ্গীত শাস্ত্র—যে বই পড়লে গান, বাজনা ও নাচের সকল বিষয় জানা যায়, সাঙ্গীতিক পরিভাষার (বিশেষ অর্থবোধক ভাষার) পরিচয় পাওয়া যায় এবং সঙ্গীতের ব্যাকরণ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, তাকেই **সঙ্গীত শাস্ত্র** বলে। এই শাস্ত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত : (১) গীতকাণ্ড, (২) বাদ্যকাণ্ড ও (৩) নৃত্যকাণ্ড। এই তিন কাণ্ডকে একত্রে **তৌর্যত্রিক** বলা হয়।

এই তৌর্যত্রিকও আবার দুই ভাগে বিভক্ত : প্রথম—ঔপপত্তিক তৌর্যত্রিক ; দ্বিতীয়—ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌর্যত্রিক। সোজা কথায় যাতে গান, বাজনা ও নাচের উপপত্তি (theory) বা ঔপপত্তিক (theoretical) সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, তাকে বলা হয় **"ঔপপত্তিক তৌর্যত্রিক"**। আর যাতে ক্রিয়া সিদ্ধাংশের (practical) অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা থাকে, তাকে বলা হয় **ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌর্যত্রিক**।

সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ

এখানে সঙ্গীতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কানে শুনে আমাদের মনে রসের সঞ্চার করে যে গান-বাজনা, তাকে **শ্রাব্য সঙ্গীত** বলে। চোখে দেখে আমাদের অন্তরে রসভাব জাগায় যে নাচ ও হাবভাব, তাকে **দৃশ্য সঙ্গীত** বলে।

সঙ্গীত-পদ্ধতি—বর্তমানে ভারতে দুই প্রকার সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত : (১) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি ও (২) কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি। প্রথমে সমগ্র ভারতবর্ষে একই সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টীয় অষ্টম ও একাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পদ্ধতি দ্বিধাবিভক্ত হয় বলে জানা যায়। সঙ্গীতের গবেষক অনেক পণ্ডিত এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে রাজী নন। তাই ইতিহাস ছেড়ে বর্তমানে প্রচলিত দুই পদ্ধতির কথা বলছি।

(১) **হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি**—বর্তমানে উত্তর ভারতে সর্বত্র ও দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্রে এই নিয়ম প্রচলিত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে সম্রাটগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ও ফার্সী সঙ্গীত মিশ্রণে তৎকালীন হিন্দুদের ব্যবহৃত ও প্রচলিত অতীত প্রকাশভঙ্গী ও কলাকৌশলের সামান্য সামান্য রদবদলে যে নূতন পদ্ধতির (style) কথা বর্তমানে শোনা যায়, সেটিই "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" নামে পরিচিত।

(২) **কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি**—দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে, যে পদ্ধতি সীমাবদ্ধ, সেটি "কর্ণাটকীয় সঙ্গীত পদ্ধতি" নামে পরিচিত। (উড়িষ্যায় কর্ণাটকী পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত, আসামের কিছু অংশেও দক্ষিণী পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তবে বর্তমানে এইসব প্রদেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির প্রভাব চলছে।)

প্রকাশভঙ্গী পৃথক্ হলেও এবং মেল ও ঠাটে নামগত প্রভেদ থাকলেও, এই দুই পদ্ধতিতেই শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে বারোটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। রাগ ও ঠাটের প্রভেদ থাকলেও উভয় পদ্ধতিতেই এই বারোটি স্বর থেকেই ঠাট ও মেলের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি।

মার্গ সঙ্গীত—অনেকের ধারণা এই যে, বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের (classical) রাগ সঙ্গীতকেই মার্গ সঙ্গীত বলা হয়। সেটি ঠিক নয়। মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে বহুকাল লোপ পেয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীত রত্নাকরে মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে ; কিন্তু মার্গ সঙ্গীত বলতে বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি চালের রাগ সঙ্গীতকেই বোঝায়, এ কথা তা' দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি না। মার্গ সঙ্গীত মার্গ তালের মতই আজ লুপ্ত।* সুরলোকের দেবসঙ্গীতই প্রকৃতপক্ষে মার্গ সঙ্গীত।

দেশী সঙ্গীত—বর্তমানে প্রচলিত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শৈলীর উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতই হল দেশী সঙ্গীত।

লোক সঙ্গীত—বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ সেই সেই

* সঙ্গীত-পারিজাতের ভাষ্যকার সঙ্গীতপ্রেমী শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখছেন : "মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ থেকে অন্ততঃ হাজার বছর আগে।" আমরাও একথা স্বীকার করি।

প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত যে গীত চলতি গ্রাম্য সুরে গীত হয়ে থাকে, তাকেই আমরা "লোক সঙ্গীত" বলি।

শব্দ—যে প্রকার অনুভূতি "কানের ভিতর দিয়া" আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে ধরা পড়ে, তাকেই "শব্দ" বলা হয়। এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর আঘাত-জনিত অনুরণন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। শব্দের কোন অন্ত নেই; কত রকম শব্দের উৎপত্তি হতে পারে, তা' আমাদের ধারণাতীত। প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় (নাতিশীতোষ্ণ ও নীহারাদিতে আনাচ্ছাদিত অবস্থায়) শব্দ প্রতি সেকেণ্ড সময়ে ১১২০ ফুট প্রসারিত হয়। অনন্ত এই শব্দতরঙ্গ থেকেই সাঙ্গীতিক ধ্বনির জন্ম।

ধ্বনি—প্রতিটি শব্দকেই আমরা ধ্বনি বলতে পারি। শব্দ, ধ্বনি ও নাদ এই তিন-ই একার্থবোধক। মানুষের কৃষ্টির প্রথম ও প্রধান বাহন এই ধ্বনি। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত—সবার মূলেই এই ধ্বনির প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত আন্দোলনজাত মনোহর ধ্বনি থেকেই সাঙ্গীতিক (ধ্বনির) নাদের জন্ম। সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিটি স্বরধ্বনিকে এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের অর্থে রং-এর অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শব্দের কোনও রং-ও নেই আর গন্ধও নেই; একমাত্র কান দিয়ে শুনেই তা' উপলব্ধি করা যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক শব্দের রং-এর কথা স্বীকার করেছেন; তা'ছাড়া আমাদের দেশের অনেক যোগীও শব্দের রং-এর কথায় আস্থাবান। আমরা সাধারণ মানুষ শব্দের অর্থে সাঙ্গীতিক নাদের কোন বর্ণ (রং) দেখতে পাই না। এই ধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—'সাঙ্গীতিক ধ্বনি' ও 'কঠোর ধ্বনি'।

সাঙ্গীতিক ধ্বনি—অনুরণনজাত যে মধুর ধ্বনি পর্যায়ক্রমে নিয়মিত আন্দোলনের ফলে প্রকাশিত হয়, তাকেই 'সাঙ্গীতিক ধ্বনি' বলা হয়।

কঠোর ধ্বনি—সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি ছাড়া অন্য সমস্ত অনিয়মিত আন্দোলনজাত অপ্রীতিকর ধ্বনিকে 'কঠোর ধ্বনি' বলা হয়। শ্রুতিকটু কর্কশধ্বনি সঙ্গীতের উপযোগী নয় বলে এদের সাঙ্গীতিক ধ্বনির পর্যায়ে ধরা হয় না। (কণ্ঠ-সঙ্গীতে যদি কখনও কর্কশ ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তবে তাকে কঠোর ধ্বনির পর্যায়ে ফেলা সঙ্গত হবে না)

নাদ

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরাঃ
ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥"

—মতঙ্গ ঃ বৃহদ্দেশী।

'নদ্' ধাতু থেকে 'নাদ' কথার উৎপত্তি। নদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দ মাত্রকেই নাদ বলা হয়। প্রাচীনকালের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা শারীরজ নাদকেই নাদ বলেছেন এবং ব্যাখ্যাটি সেইভাবে হওয়ায় নাদের সাঙ্গীতিক অর্থে কিছু অসুবিধা হয়। অবশ্য সংগীত শাস্ত্রে "নদ্যতে ইতি নাদঃ" এরূপও বলা হয়েছে। এখানে আনন্দদায়ক ধ্বনি অর্থেই নাদ বলা হয়েছে। অপিচ 'নদাভ্যাং জাতত্বাৎ নাদ ঃ", অর্থাৎ 'ন' ও 'দ' এই দুই থেকে যার উৎপত্তি, সেই হল 'নাদ', এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে এবং সেই ব্যাখ্যায়।

"নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাৎ দকারো হব্যবাহনঃ।
তাভ্যাং সংজায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ নাদ ইতি স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ, 'ন'কার অর্থে প্রাণবায়ু ও 'দ'কার অর্থে দেহস্থ অগ্নি, এদের সংযোগেই নাদের উৎপত্তি। আরও বিশদ্‌ভাবে বলা হয়েছে যে আত্মার স্বপ্রকাশাকাঙ্ক্ষা ইচ্ছারূপ অগ্নিবায়ুতে আঘাত করে: সেই বায়ু নাভিতে মূর্চ্ছিত হয়ে যোগারূঢ়া (নিত্যতা কল্পিত যোগ+রূঢ়া অর্থে প্রকৃতি ও প্রত্যয়) শক্তিদ্বারা উপর দিকে উঠে স্বর হিসাবে কণ্ঠে প্রকাশিত হয়।

অনাহত নাদ ও আহত নাদ

"অনাহত আহতশ্চেতি দ্বিবিধো নাদস্তত্র ॥"

(১) আঘাত ব্যতিরেকেই শরীরে যে শব্দ উদ্ভূত হয়, তাকেই **অনাহত নাদ** বলা হয়। যোগীদের সাধনায় এই নাদ ধরা পড়ে; স্বাভাবিকভাবে এই শব্দ কানে শোনা যায় না। যাই হ'ক, সংগীতে আমরা এই নাদকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি।

(২) কানে শোনা যায় এমন যে কোনও আঘাতজাত ধ্বনিকেই **আহত নাদ** বলা হয়। এই আহত নাদ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি।

বর্ণাত্মক নাদ—আহত নাদকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হল। মুখ থেকে জিভ, দাঁত প্রভৃতির আঘাতে যা বের হয়, অর্থাৎ পুস্তকপাঠ, বাক্যকথন ইত্যাদিকে

বলা হয় **বর্ণাত্মক নাদ**; এবং গান গাওয়া, বাজনা বাজানো প্রভৃতি স্বরধ্বনি প্রধান শব্দকে বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক নাদ**।

"সোপ্যাহত পঞ্চবিধো নাদস্তু পরিকীর্তিতঃ।
নখ বায়ুজ চর্মাণি লৌহ শারীরজাস্তথা॥"

সঙ্গীত মকরন্দ—নারদ

—উপরের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে এই ধ্বন্যাত্মক বা আহত নাদ আরও পাঁচ রকমের আছে। (বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য)

(১) বীণা, সেতার, এসরাজ আদি "তত" যন্ত্রদের বলা হয়েছে **নখজ**;
(২) বাঁশী, সাহনাই প্রভৃতি "শুষির" " " **বায়ুজ**;
(৩) পাখোয়াজ, তবলা " "আনদ্ধ" " " **চর্মজ**;
(৪) কাঁসর, ঘণ্টা " "ঘন" " " **লৌহজ**;
ও সর্বশেষ (৫) কণ্ঠনিঃসৃত স্বরধ্বনিকে " " **শারীরজ**।

"অতি সূক্ষ্মং পুরা নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মম্ অতঃপরম্।
গলে পুষ্টমপুষ্টংতু শীর্ষে বক্ত্রে চ কৃত্রিমম্॥"

—রসকৌমুদী (শ্রীকণ্ঠ)

উপরের শ্লোকে দেখা যায় নাদের আরও ভাগ রয়েছে। নাদের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে: নাভি থেকে উত্থিত হয় অতি সূক্ষ্ম নাদ, হৃদয় থেকে সূক্ষ্ম নাদ, কণ্ঠ থেকে পুষ্ট নাদ, মস্তক থেকে অপুষ্ট নাদ এবং মুখ থেকে কৃত্রিম নাদ।

এ বিষয়ে অন্য মতও রয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাদের উৎপত্তিস্থল বুঝাবার জন্য তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হৃদয় থেকে **মন্দ্র**, কণ্ঠ-থেকে **মধ্য** ও মস্তক থেকে **তার**।

নাদের বৈশিষ্ট্য—এখন নাদের অর্থাৎ স্বরধ্বনির বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি। আন্দোলনের বিস্তারের ওপরেই নির্ভর করে স্বরের তীব্রতা বা মৃদুতা। ইংরাজিতে একেই বলে Intensity of sound.

তীব্রনাদ—যখন কোনও শব্দ, অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর, জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়, তখন সেই **তীব্র নাদকে** বলা হয় **বৃহন্নাদ**।

মৃদুনাদ—যখন কোনও শব্দ অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর মৃদুভাবে প্রকাশ করা হয়, তখন সেই **মৃদু নাদকে** বলা হয় **ক্ষুদ্রনাদ**।

আন্দোলনের প্রাবল্যের তারতম্যের উপর যেমন নির্ভর করে নাদের তীব্রতা ও

মৃদুতা তেমনি তার তীক্ষ্ণতাও নির্ভর করে এই আন্দোলনের সংখ্যার ওপরেই। একে ইংরাজীতে pitch বলে।

(১) কোনও একটি **স্বরকে** (base করে) ধরে তা থেকে যে কোন চড়া স্বরকেই (higher pitch) প্রকাশ করা হোক না কেন, সেই স্বরধ্বনিকে **"পরাতীক্ষ্ণ নাদ"** বা **উচ্চনাদ** বলা হয়।

(২) কোনও একটি স্বরকে (base করে) ধরে তা থেকে যে কোন নীচু স্বরকেই (lower pitch) প্রকাশ করা হোক না কেন, সেই স্বরধ্বনিকে **অনুতীক্ষ্ণ নাদ** বা **নিম্ননাদ** বলা হয়।

সহায়ক নাদ—কথাটি হিন্দী শব্দ। এটিকে অনেকে স্বয়ম্ভু নাদ বলেন, কিন্তু সেটি ঠিক মনে হয় না, কারণ 'স্বরমেল কলানিধি' ও 'রাগবিরোধ' দেখলে জানা যায় যে অর্থটি সঙ্গত নয়।

কোন বাদ্যযন্ত্রেই একটি শুদ্ধ শব্দ (অর্থাৎ একটি একক স্বরধ্বনি) প্রকাশ পায় না। তার আঘাতজাত শব্দের আশে পাশে অর্থাৎ মূল স্বরের সঙ্গে, আরও অনেকগুলি স্বর যুক্তভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সব সময়ে এই মৃদু ধ্বনিদের ভালভাবে শোনা যায় না কারণ তাদের তীব্রতা মূল স্বরধ্বনির চেয়ে অনেক দুর্বল। এই প্রচ্ছন্ন মৃদু স্বরধ্বনিগুলিই হিন্দীতে **সহায়ক নাদ** নামে পরিচিত। ইংরাজীতে একে বলা হয় "ওভারটোন" (overtone)। বাংলায় একে বলা হয় **সনাদ,** শুদ্ধভাষায় **উপস্বন**। এই নাদের বিভিন্ন ধরনের কম্পনের অভিনবত্ব থেকেই আমরা আধারজাত স্বরধ্বনিকে চিনতে পারি। এটিকে নাদের জাতির পর্যায়ে ফেলা যায়।

আন্দোলন

তারযন্ত্রে যখন কোন আঘাত দেওয়া হয়, তখন সেই আঘাতের ফলে তারটি নিজস্ব স্থান থেকে (from natural starting point, i. e., position of rest) থেকে চ্যুত হয়ে কিছুক্ষণ ধরে এপাশে-ওপাশে বা উপর-নীচে কাঁপতে থাকে। আঘাতের গতিভেদে বা অন্য নানা প্রভেদে এই দোলনের হেরফের হয়। এই ধরনের দোলনকেই **আন্দোলন** বলা হয়। তানপুরার কোন তার খাদে বাঁধার পর তাতে আঘাত দিলে খালি চোখেই এটি ধরা পড়ে। সকল প্রকার আহত নাদই এই আন্দোলন-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

ছড় দিয়ে যে সমস্ত যন্ত্র বাজান হয়, তাদের তারগুলি পাশে পাশে দুলতে

থাকে। যেহেতু ছড়ের টান ডাইনে-বাঁয়ে চলে, সেজন্য ছড়ের যন্ত্রে সোওয়ারী থেকে আড়ি পর্যন্ত তারটিও লম্বালম্বি ডাইনে-বাঁয়ে দোলে। এসরাজের তারে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সোওয়ারীর উপর রাখা তারের ক্ষুদ্র অংশটুকু (আধসুতো বা এমন অংশ) থেকে সোওয়ারীর মাধ্যমে তারের অনুরণনটি চর্মাচ্ছাদনীকে আশ্রয় করে ধ্বনিকোষে (অর্থাৎ, হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে) গুঞ্জন তোলে; ফলে তবলি, সোওয়ারী, আড়ি, তার ও সমস্ত ধ্বনিকোষকে আওয়াজটি গুঞ্জিত করে তোলে এবং আওয়াজটি বড় ও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।

আমাদের জানা আছে যে এক বস্তুর সঙ্গে অপর এক বস্তুর আঘাত বা ঘর্ষণ লাগলেই বায়ুতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনেই ধ্বনির উৎপত্তি। আমাদের সঙ্গীতের সমস্ত ধ্বনিই আন্দোলনের ফলে জন্ম নেয়। যেমন সকল আঘাত এক রকম হয় না, তেমনি সকল আন্দোলনের গতিও সকল সময়ে এক রকম হয় না, এবং তারই ফলে শব্দের বিভিন্নতা ঘটে। পণ্ডিতেরা এই আন্দোলনকে সাধারণতঃ দুইটি পর্যায়ভুক্ত করেছেন :

(১) **নিয়মিত আন্দোলন** বা **স্থির আন্দোলন**—যখন আমরা তানপুরার তারে আঘাত করি, তখন তারের দোলন কিছুক্ষণ যাবৎ একভাবে হতে থাকে। যদিও দোলনের গতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আসে, তবুও অনুরণনটি একই শোনায়। সেই কারণে একে **স্থির আন্দোলন** বলা হয়, যেহেতু এটি নিয়মিত ভাবদ্যোতক। তারের দোলনের গতি বেশ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে একই রকমে চলে বলে এটাকেই আমরা **নিয়মিত আন্দোলন**ও বলি। এই আন্দোলনজাত ধ্বনি শ্রবণসুখকর হওয়ায় এই ধ্বনি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

(২) **অনিয়মিত আন্দোলন** বা **অস্থির আন্দোলন**—যখন আন্দোলনের গতি নিয়মিতভাবে বা পর্যায়ক্রমে চলে না, তখন এই আন্দোলনজাত শব্দকে আমরা **অস্থির আন্দোলন** বা **অনিয়মিত আন্দোলন** বলি। অনিয়মিত আন্দোলনজাত ধ্বনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অল্পই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরও বহু প্রকারের আন্দোলনে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে আন্দোলনের বৈচিত্র্য [harmonics, overtones (সহায়কনাদ), sympathetic vibrations (সহানুভূতিক কম্পন) ও beats] সম্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

এখন বাদ্যযন্ত্রে তারের মাপ অনুযায়ী আন্দোলনের সংখ্যার তারতম্যের কথা বলছি।

তারের লম্ব ও আন্দোলন সংখ্যা

স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতার (pitch-এর) কথা বলতে গেলে যেমন স্বভাবতঃই আন্দোলনের বিষয় এসে পড়ে তেমনি তারের লম্ব (length), স্থূলতা বা ওজন (thickness or weight) ও তারের টানের—বিততির (tension) বিষয়ও ভাবা উচিত। কোনও বাজনার তারে আঘাত দিলেই আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমেই বলেছি তারের টান (বিততি=tension) ও স্থূলতা (thickness)-র ওপরই নির্ভর করে আন্দোলনের তারতম্য। তারটি কাঁপলে একটা স্বর শোনা যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আন্দোলন সংখ্যা এক সেকেণ্ডে ১৬-এর বেশী হলে তবেই শোনা যাবে একটা নির্দিষ্ট স্বর ; আর আন্দোলন সংখ্যা কম হলে কোন নির্দিষ্ট স্বর কানে শোনা যাবে না। তারটি পুরোপুরী কাঁপলে তবেই তৈরী হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্বর অর্থাৎ তারের লম্ব বা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে। এস্রাজ, সেতার প্রভৃতি বাজনার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তারের দৈর্ঘ্য যত কম, স্বর তত তীক্ষ্ণতর অর্থাৎ উঁচু। অতএব দেখা যাচ্ছে তারের লম্ব কম হলে আন্দোলন সংখ্যা বাড়ে, লম্ব বেশী হলে আন্দোলন সংখ্যা কমে ; অর্থাৎ তারের আন্দোলন সংখ্যা তার লম্বের সঙ্গে প্রত্যনুপাতিক (inversely proportional)।

তারের লম্ব যদি জানি এবং সেই লম্বের আনুপাতিক আন্দোলন সংখ্যা যদি ঠিক করতে পারি তবে ঐ লম্বের বিভিন্ন ভাগের আন্দোলন সংখ্যা আমরা প্রত্যনুপাতিক নিয়মে বার করতে পারবো, আবার আন্দোলনের সংখ্যা থেকে লম্বটিও স্থির করতে পারবো। বীণাদি যন্ত্রে প্রধান তারটি লম্বে সাধারণতঃ ২৪ থেকে ৪২ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। সুবিধার জন্য ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি চিন্তাশীলেরা খরজের তারের সাধারণ লম্বের প্রমাণ ৩৬" ইঞ্চি ধরেছেন এবং পাশ্চাত্য নিয়মে কম্পাঙ্ক (frequency) ধরেছেন ২৪০ (যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সি (c)-র কম্পাঙ্ক ২৬১)।*

এইবার হিসাবে আসছি, তবে তার আগে সরগম সম্পর্কে কিছু বলছি। পাশ্চাত্যে সপ্তকের নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতায় (just intonation) স ২৪০ কম্পাঙ্ক, র (৯।৮ স) ২৭০, গ (৫।৪ স) ৩০০, ম (৪।৩ স) ৩২০, প (৩।২ স) ৩৬০, ধ (৫।৩ স) ৪০০, ন (১৫।৮ স) ৪৫০, র্স (২।১ স) ৪৮০। আসলে

* প্রথমে পণ্ডিত অহোবল ও পরে শ্রীনিবাস পণ্ডিত তারের লম্বের হিসাব ৩৬" ধরেন।

হারমোনিয়মের প্রথম চাবিটিই ২৪০ অর্থাৎ C বা উদারার স। যে চাবিটিকে আমরা স বলে বাজাই সেটি c (ছোট হাতের c বা মুদারার স) যার কম্পাঙ্ক হল ৪৮০ তবে স বলেই আমরা ২৪০-কে ধরে নিই।

উপরের হিসাব থেকে প্রমাণ হয়, স ও র-এর মাঝে অনুপাত আছে ৯।৮ র ও গ-এর মাঝে ১০।৯, গ ও ম-এর মাঝে ১৬।১৫, ম ও প-এর মাঝে ৯।৮, প ও ধ-র মাঝে ১০।৯, ধ ও ন-র মাঝে ৯।৮, এবং ন র্স-র মাঝে ১৬।১৫।

পাশ্চাত্যে সপ্তকের নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতাই-এর সঙ্গে আমাদের আধুনিক সপ্তকের খুব বেশী মিল আছে বলেই ঐটিকে ধরা হচ্ছে। কিন্তু এক জায়গায় গোলমাল দেখা যাচ্ছে। খরজ পঞ্চম ভাব মানতে গেলে ধৈবত, রেখাবের পঞ্চম হবে, অর্থাৎ র যদি ২৭০ হয় তাহলে ধ-কে ২৭০×৩।২=৪০৫ কম্পাঙ্ক হতে হবে। তাহলে আমাদের বর্তমান সপ্তক দাঁড়াবে ২৪০, ২৭০, ৩০০, ৩২০, ৩৬০, ৪০৫, ৪৫০, ৪৮০।

খরজের তারের দৈর্ঘ্য অর্থে লম্ব যদি ৩৬″ ইঞ্চি হয় তাহলে আনুপাতিক ভাবে

কম্পাঙ্ক—	স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্স
	২৪০,	২৬০.	৩০০,	৩২০,	৩৬০,	৪০৫,	৪৫০,	৪৮০,
দৈর্ঘ্য বা লম্ব—	৩৬,	৩২,	$২৮\frac{৪}{৫}$,	২৭,	২৪,	$২১\frac{১}{৩}$,	$১৯\frac{১}{৫}$,	১৮
প্রত্যনুপাত—	৮।৯,	৪।৫,	৩।৪,	২।৩,	১৬।২৭,	৮।১৫,	১।২,	

সপ্তকে এই সাতটি স্বরই শুধু নেই আরও পাঁচটি বিকৃত স্বরও আছে, এমনকি স্বরগত শ্রুতি ছাড়া আরো ১৫টি শ্রুতিও আছে। মধ্যযুগে ১২টি স্বর সম্পর্কে কোন কোন গ্রন্থকার আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রুতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক কোন আলোচনা হয়নি। আধুনিককালে ১২টি স্বর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ২২ শ্রুতির বিচার বলতে গেলে অনুমানের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাই ১২ স্বরের কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা ও তারের লম্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই বিচার করব।

আমরা জানি স র̲ র গ̲ গ ম ম॑ প ধ̲ ধ ন̲ ন এই হল ১২টি স্বর। মধ্যযুগে এদের কম্পাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি, কিন্তু তারের লম্বের মধ্যে এদের অবস্থান সম্বন্ধে বিচার হয়েছিল। পণ্ডিত অহোবলই এর প্রথম প্রবক্তা ও শ্রীনিবাস তাঁকেই অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের মতে খরজের তারটিকে ১/২,

১/৩, ১/৪ ভাবে ভাগ করলে ঐ ১২টি স্বরের স্থান অনায়াসে পাওয়া যাবে। এই মতটিকে সাজিয়ে দেখালে এইরূপ হবে—(যদি স ৩৬" হয় তা'হলে)

স	=	পুরা তার							= ৩৬"
স̇	=	১/২ তার							= ১৮"
ম	=	৩/৪ তার	স	—	স̇	=	১৮+৯		= ২৭"
প	=	২/৩ তার	স	—	স̇	=	১৮+৬		= ২৪"
গ̲	=	৫/৬ তার	স	—	প	=	২৪+৬		= ৩০"
র	=	৮/৯ তার	স	—	প	=	২৪+৮		= ৩২"
ধ	=	৭/১২ তার	প	—	স̇	=	১৮+৩		= ২১"
ন̲	=	৫/৯ তার	প	—	স̇	=	১৮+২		= ২০"

৩৬"	৩৩১/৩"	৩২"	৩০"	২৮১/২"	২৭"	২৫"	২৪"	২২"	২১"
স	র̲	র	গ̲	গ	ম	ম॑	প	ধ̲	ধ

২০"	১৯"	১৮"
ন̲	ন	স̇

অঙ্কের হিসাবটা দেখুন :—

স = ৩৬"

স̇ = ১/২ ∴ ৩৬ × ১/২ = ১৮"

ম = ১/২ স — স̇ ; স — স̇ অংশটি হল ৩৬" ও ১৮"-র মধ্যবর্তী অংশ, সুতরাং ৩৬ – ১৮=১৮"।

এই ১৮"-র মধ্যস্থলে ম আছে : কাজেই সে আছে ৯"-তে। কোন বিন্দু থেকে ?

—স̇ বিন্দু থেকে। অতএব ম আছে ১৮"+৯"=২৭"-তে।

প = ১/৩ স — স̇, অর্থাৎ ১৮" থেকে তিন ভাগ করে তার প্রথম

ভাগের শেষ বিন্দুতে প অবস্থিত। ১৮"-র তিন ভাগ হল ১৮÷৩=৬" (৬"+৬"+৬") অতএব প আছে প্রথম ৬"এর শেষে, অর্থাৎ ১৮"+৬"=২৪"-তে। র = ২/৩ স — প। স থেকে প হল ৩৬—২৪=১২"। ১২"-কে ১/৩ করে ভাগ করা হচ্ছে ৪+৪+৪ ; কাজেই র আছে প থেকে ৪+৪=৮" দূরে, অর্থাৎ ২৪+৮=৩২"-তে। এই ভাবেই অন্য সব কয়টির বিচার করতে হবে।

সঙ্গীত পারিজাতের যে সপ্তক পাওয়া গেল তাতে পারস্পরিক অনুপাত বা স্বরান্তর বিচার করলে আমরা পাই—

স/র=৩৬/৩২=৯/৮ ; র/গ=৩২/৩০=১৬/১৫ ; র/গ=৩২/২৮½=(৩২×২)/৫৭=৬৪/৫৭ ; গ/ম=২৮½÷২৭=৫৭/(২×২৭)=১৯/১৮ ; ম/প=২৭/২৪=৯/৮ ; প/ধ=২৪/২১=৮/৭ ; ধ/ন=২১/২০ ; ন/সঁ=১৯/১৮।

আবার স/র=৩৬/৩৩⅓=(৩৬×৩)/১০০=২৭/২৫ ; র/র=১০০/৩÷৩২=১০০/(৩×৩২)=২৫/২৪ ; গ/গ=৩০÷৫৭/২=(৩০×২)/৫৭=২০/১৯ ;

ম/ম=২৭/২৫ ; ম/প=২৫/২৪ ; প/ধ=২৫/২২ ; ধ/ধ=২২/২১ ; ন/ন=২০/১৯ ; বিচার করলে দেখা যাবে স - র সঙ্গে ম- ও প-র সংবাদিত্ব ঠিক আছে, অর্থাৎ ৪/৩ স্বরান্তর ও ৩/২ স্বরান্তর বজায় আছে ; গ - র সঙ্গে ন - র সংবাদিত্বও ঠিক আছে, অর্থাৎ [৩০/২০=৩/২]; গ-র সঙ্গে ন-র সংবাদিত্বও শাস্ত্রানুযায়ী দেখা যায় [৫৭/২÷১৯=৫৭/(২×১৯)=৩/২]; শুধু র ও ধ এর সংবাদিত্বে গোলমাল দেখা যায় :—র-৩২, ধ-২১ ; অতএব র/ধ=৩২/২১, যেটি ৩/২ অনুপাতের চেয়ে বড়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য মতানুসরণকারী পণ্ডিতেরা তাই ধ-কে ২১⅓"-তে সরিয়ে দিয়ে ৩/২ অনুপাত ঠিক রাখার পক্ষপাতি [কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখাবার আগে আমাদের বিচার করা উচিত ছিল ; প্রাচীন শাস্ত্রমতে র-ধ সংবাদী কিন্তু র-প তো সংবাদী নয়। পারিজাতে র-পও সংবাদী হয়েছে [৩২/২৪=৪/৩] যা অনুচিত মনে হয়। সুতরাং পারিজাতের র আর একটু সরে স-এর দিকে আসা উচিত ছিল ; কাজেই কেবলমাত্র ধ-কে দোষী করে লাভ কি? পারিজাতের প্রাচীন একটি অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবকে অনুসরণ করতে গিয়ে ভুলে মধ্যযুগীয় ষড়্‌জ-পঞ্চমকে ব্যবহারে এনে আমরা গণনায় কিছু ওলট পালট করে ফেলেছি। অতএব র গ ধ ন র গ ধ ন সব

কয়টিতেই অশুদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কতটুকু অশুদ্ধতা সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

পারিজাতের ধ এর স্থান পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বর্তমানের দু' একজন পণ্ডিত ব্যক্তি পারিজাতের সঙ্গে আধুনিক সপ্তকের মিল করবার জন্যে গ-ন-কেও পরিবর্তিত করতে বলেছেন, যাতে স/গ=৫/৪ হয়, স/ন=১৫/৮ হয়। এঁদের মতে গ আছে স, ধ-এর মাঝে, কিন্তু ঠিক মধ্যস্থলে নয়। গ-এর স্থান $২৮\frac{১}{২}$"-তে নয় $২৮\frac{৪}{৫}$"-তে ইত্যাদি। কিন্তু পারিজাতকার কোথাও এইভাবে কল্পনা করতে বলেন নি।

এখানেই শেষ নয়; কয়েকজন সঙ্গীত গুণী ধ-কে $২১\frac{১}{৩}$" ধরে গ বার করেছেন $২১\frac{১}{৩}" + \left(\frac{৩৬ - ২১\frac{১}{৩}"}{২}\right) = ২১\frac{১}{৩} + ৭\frac{১}{৩} = ২৮\frac{২}{৩}$"-তে এবং ন বার করেছেন $১৮" + \left(\frac{২১\frac{১}{৩}" - ১৮"}{৩}\right) = ১৮" + ১\frac{১}{৯}" = ১৯\frac{১}{৯}$"-তে। যেহেতু গ পরিবর্তিত হল, সেহেতু ম (তীব্র) ও হবে $১৮" + \{(\underline{২৮\frac{২}{৩}" - ১৮"}) \div ৩ \times ২\} = ১৮" + ১০\frac{২}{৩} \times \frac{২}{৩}" = ১৮" + ৭\frac{১}{৯}" = ২৫\frac{১}{৯}"$ তে। তবুও ধ বার করতে অসুবিধা দেখে এটিকে র-এর পঞ্চম হিসাবে $৩৩\frac{১}{২}" \times \frac{২}{৩}" = ২২\frac{২}{৯}$"-তে রেখেছেন। এর ফলে সপ্তকটি হচ্ছে—

৩৬"	$৩৩\frac{১}{৩}$"	৩২"	৩০"	$২৮\frac{২}{৩}$"	২৭"	$২৫\frac{১}{৯}$"	২৪"	$২২\frac{২}{৯}$"	$২১\frac{১}{৩}$"
স	র (কোমল)	র	গ (কোমল)	গ	ম	ম (তীব্র)	প	ধ (কোমল)	ধ
২০"	$১৯\frac{১}{৯}$"	১৮"							
ন (কোমল)	ন	স (তার)							

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হন নি। তিনি তারকে একটু অন্যভাবে ভাগ করতে চেয়েছেন। স র (কোমল) র গ (কোমল) গ ম ম (তীব্র) প ধ (কোমল) ধ ন (কোমল) ন-কে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের স্থিরীকৃত স্থানেই রেখেছেন, কিন্তু র (কোমল)-কে রেখেছেন স ও র-এর মাঝখানে অর্থাৎ $৩২" + \frac{(৩৬" - ৩২")}{২} = ৩২" + ২ = ৩৪"$-তে; ম (তীব্র)-কে রেখেছেন ম ও প-এর মাঝখানে অর্থাৎ $২৪" + \frac{(২৭" - ২৪")}{২} = ২৪" + \frac{৩}{২} = ২৫\frac{১}{২}"$-তে; ধ-কে রেখেছেন র-এর পঞ্চম হিসাবে অর্থাৎ $৩৪" \times \frac{২}{৩} = ৩২\frac{২}{৩}"$-তে; এবং ন-কে রেখেছেন গ-এর পঞ্চম রূপে অর্থাৎ $২৮\frac{২}{৩}" \times \frac{২}{৩} = ১৯\frac{১}{৯}"$-তে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত করেও ভারতীয় স্বরসপ্তকের কোন রূপের সঙ্গেই ওপরের হিসাবের মিল হয় নি, মিল হয়নি ডায়াটোনিক পিথ্যাগোরীয়ান স্কেলের সঙ্গে, এমন কি সমশ্রুতিক বা অসমশ্রুতিযুক্ত সপ্তকের সঙ্গে।

এবার তারের ব্যাপারে যে দুটি প্রশ্ন জাগে সে দুটি বলছি।

১। একটি স্বরের তারের লম্ব দেওয়া থাকলে অন্যগুলির স্থান কিভাবে বার করা যাবে ?

২। একটি স্বরের কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে কম্পাঙ্ক উৎপাদনকারী তারটির আনুপাতিক লম্ব দেওয়া থাকলে অন্য যে কোন স্বরের কম্পাঙ্ক ও লম্ব কি উপায়ে নির্ণয় করা যায় ?

উত্তর: আমরা ধরে নিয়েছি স তারের লম্ব ৩৬″ ও কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে (২৪০)। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কোমল র-এর লম্ব ও কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে স-এর সঙ্গে কোমল র-এর স্বরান্তর অনুপাত কি আছে তা জানতে হবে, না হলে উত্তর দেওয়া যাবে না। ধরা যাক, এই অনুপাত অর্থাৎ স/র=২৭/২৫। নিয়ম হল, উঁচু স্বরের দৈর্ঘ্য বার করতে হলে জানা দৈর্ঘ্যটিকে অনুপাত দিয়ে ভাগ করতে হবে, নিচু স্বরের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে

এখানে র উঁচু স্বর কাজেই র-এর দৈর্ঘ্য হবে $৩৬ \div \frac{২৭}{২৫} = \frac{\cancel{৩৬}^{৪} \times ২৫}{\cancel{২৭}_{৩}} = \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩} =$ অহোবলের র। কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়মটি ঠিক উলটো; সুতরাং স-এর

আন্দোলন সংখ্যা ২৪০ হলে র হবে $\cancel{২৪০}^{৪৮} \times \frac{২৭}{\cancel{২৫}_{৫}} = \frac{১২৯৬}{৫} = ২৫৯\frac{১}{৫}$ সঃ=অহোবলের কোমল র-র কম্পাঙ্ক। অহোবলের শুদ্ধ গ অর্থাৎ আমাদের সময়ের কোমল গ-এর অনুপাত আমরা পেয়েছি। ৬/৫ $\left[\frac{স}{র} \times \frac{র}{গ} = \frac{৯}{৮} \times \frac{১৬}{১৫} = \frac{৬}{৫}\right]$ সুতরাং গ-এর লম্ব

হল $৩৬ \div \frac{৬}{৫} = \frac{\cancel{৩৬}^{৬} \times ৫}{৫} = ৩০''$ এবং কম্পাঙ্ক হল $২৪০ = \frac{৬}{৫} = ২৮৮$ সঃ। কিন্তু অনুপাত জানা থাকলে হয় দৈর্ঘ্য নয় কম্পাঙ্ক জানা থাকা চাই। এ ক্ষেত্রেও একটি সরল

নিয়ম আছে ; নিয়মটি হল আদর্শের লম্বকে আলোচ্য স্বরটির লম্ব দিয়ে ভাগ করে আদর্শের কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য স্বরের কম্পাঙ্ক পাওয়া যাবে, এবং আদর্শের কম্পাঙ্ককে আলোচ্য স্বরটির কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করে আদর্শের লম্ব দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য স্বরটির লম্ব পাওয়া যাবে। ধরা যাক র-এর লম্ব ৩২", তাহলে তার কম্পাঙ্ক কত হবে ?

এক্ষেত্রে আদর্শের লম্ব হল ৩৬" এবং তার কম্পাঙ্ক ২৪০ ; তাহলে র-এর কম্পাঙ্ক হবে $\frac{\cancel{৩৬}^{৯}}{\cancel{৩২}} \times \cancel{২৪০}^{৩০} = ২৭০$ সঃ। ধরা যাক, গ-এর কম্পাঙ্ক ৩০৩¾, তাহলে তার লম্ব কত ? এক্ষেত্রেও আদর্শের কম্পাঙ্ক ২৪০ এবং লম্ব ৩৬" ; সুতরাং গ-এর লম্ব হবে

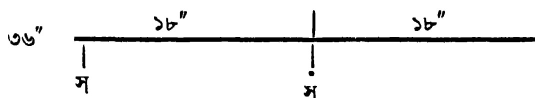
$$\frac{২৪০}{৩০৩\frac{৩}{৪}} \times ৩৬ = \frac{\cancel{২৪০}^{১৬} \times ৪ \times \cancel{৩৬}^{৪}}{\cancel{১২১৫}_{৯}} = \frac{২৫৬}{৯} = ২৮\frac{৪}{৯}''$$

এবার অহোবলের তারের লম্বের হিসাব বোঝা যাক—

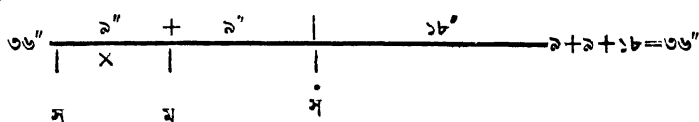
তারটি ৩৬" অর্থাৎ পুরো তারটা বাজালে স বলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বরস্থানের নিচের অংশটিই আন্দোলিত হয়ে স্বরটিকে প্রকাশ করে।

৩৬"————————————————

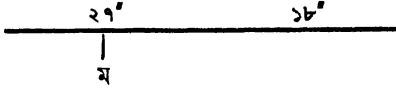
একে অর্ধেক করলে, উপর থেকে অর্ধেকের বিন্দুতে এলে ঐ বিন্দুতে তারার স অর্থাৎ ṡ বসবে। তাহলে ṡ বসল ১৮"র বিন্দুতে। অর্থাৎ এই বিন্দুতে তার চেপে ধরে আঘাত করলে নিচের ১৮" অংশটি ṡ বলবে।



উপরের দিকের এই ১৮" তারটুকুকে অর্ধেক ভাগ করলে উপরের অর্ধেকের শেষ বিন্দুতে বসবে ম। অর্থাৎ ম বসবে উপর থেকে ৯" ইঞ্চি নিচে (১৮"র অর্ধেক)।

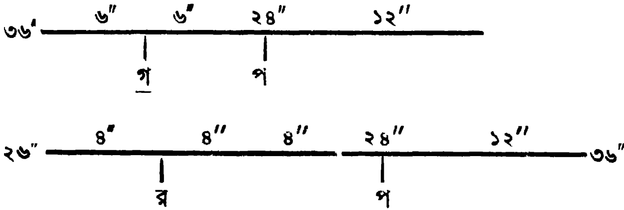


উপর থেকে ৯" নিচে এই বিন্দুতে চেপে ধরে তারে আঘাত করলে তারের নিচের অংশটি ম বলবে। এই নিচের অংশটির দৈর্ঘ্য কত? ৩৬" — ৯ = ২৭"। সুতরাং ম বসছে নিচে থেকে ২৭" উপরে।



এরপর পুরো তারটাকে তিন ভাগ করে ওপর থেকে এক তৃতীয়াংশের শেষ বিন্দুতে প-কে বসান হচ্ছে। ৩৬"-র ১/৩ = ৩৬/৩ = ১২"।

তাহলে প বসছে উপর থেকে ১২"-র শেষ বিন্দুতে এবং এর নিচের অংশটিই আঘাত পেলে প-কে প্রকাশ করছে। যেহেতু এই নিচের অংশটির মাপ ৩৬" — ১২ = ২৪", তাই বলা হচ্ছে প আছে ২৪"তে। এরপর ওপর থেকে প পর্যন্ত ১২" অংশটিকে অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশে ভাগ করা হচ্ছে। ১২"-র অর্ধেক ৬" এবং একতৃতীয়াংশ ৪", সুতরাং র বসছে ওপর থেকে ৪" নিচে আর গ বসছে উপর থেকে ৬" নিচে।



ঐ ৬"-তে চেপে ধরে বাজালে নিচের সম্পূর্ণ অংশটি গ বলবে। যেহেতু নিচের অংশটি ৩৬" — ৬" = ৩০, সেহেতু বলা হচ্ছে, যে গ ৩০"-তে বসছে। ঠিক একই কারণে র বসছে ৩৬" — ৪" = ৩২"-তে। অপর দিকে প ও র্স-এর মাঝের অংশটির মাপ হল ২৪" — ১৮" = ৬" এই ৬"-কে ১/২ করে নিলে ৩" পাওয়া যায়, যেখানে ধ বসে। এর নিচের অংশ হল ১৮" + ৩" = ২১", যাতে আঘাত করলে ধ বাজবে সুতরাং ধ বসছে ২১"-তে। অন্যান্য স্বরের ব্যাপারও ঠিক এই ভাবেই বিচার করতে হবে।

শ্রুতি

শ্রবণাৎ শ্রুতি—এই 'শ্রবণ' শব্দটি থেকেই 'শ্রুতি' কথাটি এসেছে। যে সঙ্গীত-ধ্বনি আমরা কানে শুনতে পাই, তাকেই শ্রুতি বলা যায়; অর্থাৎ নাদ

থেকেই শ্রুতির জন্ম। কোন তারে আঘাত করলে প্রথমে তারের কম্পন থেকে যে সর্বনিম্ন কর্ণগ্রাহ্য ধ্বনিটি পাওয়া যায়, তাকেই আমরা আদি শ্রুতি বলে ধরে থাকি।

এই শ্রুতিকে প্রাচীনকালে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি হল স্বরস্থিত অর্থাৎ **স্বরগত শ্রুতি**; দ্বিতীয়টি হল **অন্তর শ্রুতি** (অর্থাৎ, পর পর দু'স্বরের মাঝখানে যে শ্রুতি আছে।) এখন শ্রুতি বলতে স্বরান্তর বিভাগকেই বলা হয়। এই শ্রুতির অভিব্যক্তি থেকে প্রকাশিত রঞ্জনগুণ-বিশিষ্ট মধুর ধ্বনিই হল **স্বর**।

শ্রুতির স্বরসংখ্যা সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত ও মতান্তর রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ বেছে নিয়েছে মাত্র বাইশটি (২২) শ্রুতি। শ্রুতি-সংখ্যা-নির্ণয় প্রসঙ্গে 'শাস্ত্রকারেরা' বলেছেন—তারা অগণ্য, কারণ তারা "কেশাগ্রবৎ অন্তুরতঃ", অর্থাৎ এক চুল পরপর অবস্থিত। আবার বলেছেন, "শ্রুতিস্থানে স্বরাং বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি শক্যতে," আরও বলা হয়েছে :

"জলেষু চলতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে
গগনে পক্ষীণাং যদ্বৎ তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ ॥

—জলে মাছের চলার পথ বা আকাশে পাখীর উড়ার পথ যেমন বোঝা যায় না, বা তাদের সংখ্যা যেমন গণনা করা যায় না, স্বরের মাঝে শ্রুতির সঠিক অবস্থান ও সংখ্যাও তেমনি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা এই অসংখ্য শ্রুতি থেকে যে বাইশটি শ্রুতি বেছে নিলেন, তাদের নাম হল যথাক্রমে :

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিনী।

ভারতবর্ষে মাত্র এই বাইশটি শ্রুতিই কেন গৃহীত হয়েছিল, অথচ আরব, গ্রীস, প্রভৃতি নানা দেশে শ্রুতির সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে কেন ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে উঠেছিল, তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা, বা কেন এই মতান্তর বর্তমান, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমাদের দেশে অল্পই হয়েছে। শ্রুতি সম্বন্ধে রাজা স্যর শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীযুত ভবন রাও পিঙ্গলে, শ্রীযুত সহস্রবুদ্ধি, শ্রীযুত দেবল, মিঃ উইলিয়ম্ জোন্স, মিঃ ক্লেমেন্টস, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী, শ্রীযুত আচরেকর প্রভৃতি গুণী পণ্ডিতেরা অনেক কথা লিখেছেন। শ্রুতির অন্তর-বিভাগের এই অসম বণ্টন কোন্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তা তাঁরা খুঁজে বের করার চেষ্টা

করেছেন। এঁদের রচিত পুস্তক পাঠে সে সব কথা জানা যাবে ; সব বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমবণ্টনের পক্ষপাতী, আবার কেউ বা অসমবণ্টনের পক্ষপাতী। সমবণ্টন করলে সংবাদীরূপে 'ম' ও 'প' স্বরের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। 'ম' ও 'প'-কে স্থির রাখলে তবেই আমরা সমবণ্টনের কথা চিন্তা করতে পারি। অথচ 'ম' ও 'প'-কে স্থির রেখে সমবণ্টন করা বিজ্ঞানসম্মত বলে আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষ কেন এই বাইশটি শ্রুতি বেছে নিয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে যুক্তিসম্মত কোন বিচারের সন্ধান আমরা পাইনি।

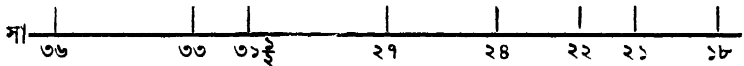
সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম্. বি. মহাশয় শ্রুতির উৎপত্তি ও সংখ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। ডাঃ রায় বলেছেন যে প্রাচীনকালের গান ছিল অবরোহক্রমিক। এই অবরোহণ-ক্রম অনুসারে পণ্ডিতেরা একটা 'স্কেল' (scale) তৈরীর চেষ্টা করেন। একটি স্বরজের তারের অর্দ্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি অবরোহক্রমিক ভাগ করতে গিয়ে তাঁরা অর্ধেক ভাগেই একটি উঁচুর 'ṡ' পেয়ে যান। কিন্তু তিন ভাগ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মাঝখানে পেয়ে যান পঞ্চম বা 'প' স্বরটিকে ; চার ভাগ করতে নতুন কোন 'স' পান না ; কেবলমাত্র খুঁজে পান মধ্যম, অর্থাৎ 'ম' স্বরটিকে। তখন নীচু 'স' ও উঁচুর 'ṡ'-এর মাঝের অংশটিকে একটি স্কেল ভেবে নিয়ে তাঁরা 'স'-এর সঙ্গে 'ম' এবং 'প'-এর সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে 'ম' দুই 'স'-এর মাঝখানে রয়েছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে 'প' আছে প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সংযোগস্থলে। ভাষান্তরে বলা যায় যে তারকে অর্ধেক হিসাবে ধরলেও 'ম' ও 'প'-র সঙ্গে সম্পর্কটি $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ রূপেই রয়ে যাচ্ছে।

আরও মজার কথা, 'ম' যেমন তারের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে 'স' ও 'ṡ'-র মাঝে থাকে ; 'প' স্বরটিও তেমনি ধ্বনির তীক্ষ্ণতা বিচারে 'স' ও 'ṡ'-র মাঝে রয়েছে, অর্থাৎ দুটি স্বরই বিশিষ্ট।

এ ধরণের মিল ছাড়া এদের অপর বৈশিষ্ট্য হল স্বরজের সঙ্গে এদের অদ্ভুত মিল বা সংবাদিত্ব। তারের মাপ দিয়ে 'স' ও 'ম' এবং 'প' ও 'ṡ'-র অনুপাত স্থির করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন, 'স' ও 'ম' এবং 'প' ও 'ṡ'-র অনুপাত উভয় ক্ষেত্রে একই (৪/৩) ;

অর্থাৎ 'স' ও 'ম'-র প্রতিটি অংশেরই একটি করে সংবাদযুক্ত অংশ 'প' ও 'স̇'-তে বর্তমান আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্য বিচার করে 'ম' - 'স̇'-কে এবং 'স̇' - 'প'-কে ১/২ ও ১/৩ ভাগ করে তাঁরা আরও চারটি স্বর লাভ করলেন 'র', 'গ', 'ধ' ও 'ন'। এইভাবে শ্রুতিবিভাগে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের উদ্ভব হল, যথা—



এই সপ্তকের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা গেল :—

(১) এর মধ্যে 'স ম' ও 'প স̇' এই দুটো সমান অনুপাতযুক্ত অংশ আছে,

(২) 'স' থেকে শুরু করে পরপর স্বরগুলির মাঝে ১২/১১, ২২/১১, ৭/৬, ৯/৮, ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬ অনুপাত আছে, যেখানে কোন স্বর বসানো নেই অথচ বসানো যায়।

এই লক্ষণগুলির সাহায্যে পণ্ডিতগণ অপর একভাবে সপ্তকরচনার বিষয় বিবেচনায় সচেষ্ট হলেন :—(ক) একদিকে তাঁরা 'ম' ও 'প'-র নির্দিষ্ট ৯/৮ অনুপাত দিয়ে সপ্তকটির মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করলেন। (খ) অপরদিকে ক্রমিক স্বরগুলির মাঝের অনুপাতসমূহের সাহায্যে সপ্তকটির বিশ্লেষণ করলেন। অতঃপর এই দুই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে (গ) সপ্তককে সাতের পরিবর্তে কত সূক্ষ্মতর ভাবে ভাগ করা যায়, তা আবিষ্কার করলেন এবং স্বরগুলির মাঝের ফাঁক বা অপূর্ণ স্থানগুলিকেও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম স্বর দিয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন।

নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল :—

(ক) 'ম' - 'প'-র ৯/৮ অনুপাত দিয়ে 'স' - 'ম' ও 'প' - 'স̇'-কে ভাগ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাগফল হয় ২+২৫৬/২৪৩। অতএব একটি সপ্তকে

[(স — ম) {২+২৫৬/২৪৩} + (প — স̇) {২+২৫৬/২৪৩}] এবং 'ম' — 'প' মিলে ৫টি ৯/৮+২টি ২৫৬/২৪৩ আছে। ঐ ২৫৬/২৪৩ আবার ৯/৮-এর মধ্যে প্রায় ২½ বার পাওয়া যায়; অর্থাৎ ৯/৮-কে ১ ধরলে ২৫৬/২৪৩ স্থূলভাবে ৪ হয়। অতএব 'ম' — 'প'-কে ২ ধরলে ২৫৬/২৪৩ স্থূলভাবে ১ হয়। 'মা' - 'পা'-কে ৩ ধরলেও ২৫৬/২৪৩ স্থূলভাবে ১-ই হয়; 'ম' -'প'-কে ৪ এবং ৫ ধরলে অপরটি ২ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ম' - 'প'

৪ হলে ২৫৬/২৪৩-এর মান ১-এর কিছু বেশী হয়। ভারতীয় গুণীগণ ২৫৬/২৪৩-এর মান ১-ই ধরেছিলেন। তাঁরা ২৫৬/২৪৩-কে ১ শ্রুতি বলে গণ্য করেছিলেন এবং ৯/৮-কে ৪ শ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; ফলশ্রুতি হল এই যে তাঁরা ৫ × ৪ + ২ × ১ = ২২ শ্রুতি পেলেন। এই দ্বাবিংশ শ্রুতির পশ্চাতে (খ)-এর তথ্যগত প্রভাব বিস্তারিত ছিল: আগেই দেখান হয়েছে, (খ) স্বরগুলির পারস্পরিক অনুপাত পাওয়া গিয়েছিল ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬, ৯/৮, ১২/১১, ২২/২১ ও ৭/৬। এই অনুপাতগুলিকে সমানানুপাতে পূর্ণসংখ্যায় রূপায়ন মানসে ল. সা. গু. করে ২৭৭২ সংখ্যাটি প্রাপ্ত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা দেখলেন, একটি সপ্তককে ২৭৭২টি সূক্ষ্মভাবে ভাগ করা যায় এবং এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এককগুলির প্রত্যেকটিকে শ্রুতি ধরলে শ্রুতির সংখ্যা হয় ২৭৭২, অর্থাৎ অনন্তমান।

এই সূক্ষ্ম বিভাগ সঙ্গীতের অনুপযোগী বলে প্রাচীন গুণীজন স্থূল সংখ্যার সন্ধানে (ক)-এর সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করলেন। ২৭৭২ এর ভাজক হল ৭, ১১, ১২, ২১, ২২, ২৮, ৩৩, ৪৪, ৬৬ ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'ম' - 'প'-কে ২ ধরলে পাওয়া গেল ৫ × ২ + ২ × ১ = ১২ শ্রুতি: এটা অতিস্থূল এবং আমাদের সপ্তকের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সমষ্টি। 'ম' - 'প'-কে ৩ ধরলে পাওয়া যায় ৫ × ৩ + ২ × ১ = ১৭ শ্রুতি; আরবীয়রা এর ব্যবহার করেন, কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ১৭ নয় বলে ভারতীয়রা এটি গ্রহণ করেননি। 'ম' - 'প'-কে ৪ এবং ২৫৬/২৪৩-কে ১ ধরলে আমরা পাই ৫ × ৪ + ২ × ১ বা ২২ শ্রুতি। এই ২২ সংখ্যাটি ২৭৭২-এর ভাজক, এই বিবেচনায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। যদি 'ম' - 'প'-কে ৪ ধরে ২৫৬/২৪৩-কে ২ ধরা হত, তাহলে গ্রীকদের ৫×৪ + ২×২ বা ২৪ শ্রুতি হত বটে; কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ২৪ নয়। তেমনি 'ম' - 'প'-কে ৯ এবং ২৫৬/২৪৩-কে ৪ মনে করলে আধুনিক ইউরোপে অনুসৃত ৫×৯ + ২ × ৪ বা ৫৩টি শ্রুতিও ২৭৭২-এর ভাজক নয়। এই কারণেই ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানীগণ ২৭৭২-এর অন্যতম ভাজক ২২-কেই গ্রহণ করে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি আছে।

এখন বিচার করলে দেখা যাবে, ভগ্নাংশ এড়িয়ে গেলে ৯/৮ এবং ৭/৬ হবে ৪ শ্রুতি, ১২/১১ হবে ৩ শ্রুতি এবং ২২/২১ হবে ২ শ্রুতি। অর্থাৎ সপ্তকটি লিপিবদ্ধ করলে দাঁড়াবে:—স ৩, র ২, গ ৪, ম ৪, প ৩, ধ ২, ন ৪, র্স। মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালে ব্যবহারিক সঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য

রাখার জন্য ভারতীয় গুণীগণ 'গ' - 'ম' ও 'ন' - 'র্স'-র মধ্যে অনুপাতের সমতা এনেছিলেন। ফলে আসল ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের রূপ হয়েছিল :

স্বর ... . স র গ ম প ধ ন র্স
স্বরের মাঝের অনুপাত ... ১২/১১ ৮৮/৮১ ৯/৮ ৯/৮ ১২/১১ ৮৮/৮১ ৯/৮
স্বরের মাঝের শ্রুতি সংখ্যা দাঁড়াল ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪

পরবর্তীকালে এটাকে বদলে আমরা ইউরোপীয় অনুপাত গ্রহণ করেছি। সুতরাং সপ্তকটি বোধ হয় দাঁড়িয়েছিল নিম্নরূপ :

স, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ৯/৮ ম, ৯/৮ প, ১০/৯ ধ, ১৬/১৫ ন, ৯/৮ র্স।

বর্তমানে বিলাবল ঠাটের মত সপ্তক হওয়ায় তার অনুপাত দাঁড়িয়েছে :

স, ৯/৮ র, ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ৯/৮ প, ৯/৮ ধ, ১০/৯ ন, ১৬/১৫ র্স।

শ্রুতির হিসাবকালে বর্তমানে ভারতের দিল্লীস্থিত 'সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি' পঞ্চম ও ধৈবতের মাঝে তিন শ্রুতি ধরেছেন। সেক্ষেত্রে 'প' ও 'ধ'-এর মাঝের অনুপাত হবে ১০/৯, এবং 'ধ' ও 'ন'-এর মাঝের অনুপাত হবে ৯/৮। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, মধ্যযুগের প্রাচীন নিখাদকে যদি আমরা 'স'-রূপে ধরি, তাহলে যে সপ্তক পাওয়া যায়, সেটা নিম্নপ্রদর্শিত (খ)-এর মত হবে :

প্রাচীন : (ক) ন়, ৯/৮ স, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ৯/৮ ম, ৯/৮ প, ১০/৯ ধ, ১৬/১৫ ন

বর্তমান : (খ) স, ৯/৮ র, ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ৯/৮ প, ৯/৮ ধ, ১০/৯ ন, ১৬/১৫ র্স।

স্বর

শ্রুতির ব্যবহারিক অবস্থাই **স্বর**। নাদের অনুরণন থেকে যে কোমল আনন্দদায়ক ধ্বনি বেরোয়, তাকেই স্বর বলে। শুদ্ধ স্বর সাতটি। পণ্ডিতেরা শ্রুতিবিভাগে প্রত্যেকটি স্বরের এক একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন; সেই বিশেষ জায়গায় অবস্থানই তার (অর্থে স্বরের) পরিচয়। ইংরাজীতে এদের "নোট" (**note**) বলা হয়।

স্বরের সংখ্যা সাত ; এদের নাম :

ষড়্জ বা খড়জ = স, ঋষভ বা রিখব = র, গান্ধার = গ, মধ্যম = ম, পঞ্চম = প, ধৈবত = ধ, নিষাদ বা নিখাদ = ন।

এই স্বরসপ্তকের প্রাচীন যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা নীচে লেখা হল। এই সাত স্বরের নামের যে প্রাচীন ব্যাখ্যা "সঙ্গীত-রত্নাকর"-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের টীকাকার সিংহ-ভূপাল "সঙ্গীত সময়সার" থেকে উদ্ধৃত করে রত্নাকরের প্রথম খণ্ডে সঙ্গীতাধ্যায়ে শ্লোকটির যে অনুলিপি দিয়েছেন, সেটি নীচে লিখছি। বাংলায় এক কথায় তার সহজ অর্থ ও অন্য মতের কথাগত শ্লোক উল্লেখ না করে কেবলমাত্র ব্যাখ্যাগুলি সংক্ষেপে লিখছি :

ষড়্জ— নাসা কণ্ঠ উরস্তালু জিহ্বা দন্তাস্তথৈব চ।
ষড্‌ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎষড়্জ ইতি স্মৃতঃ ॥

স—(১) শরীরের ছয় স্থান থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম ষড়্জ।
(২) অপরাপর ছয় স্বরের জনক (অর্থাৎ জন্মদাতা) বলে একে ষড়্জ বলা হয়।

ঋষভ (বা রিখব)—নাভেঃ সমুত্থিতো বায়ুঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।
নদত্যৃষভবত্তস্মাত্তস্মাদৃষভ ঈরিতঃ ॥

র—(১) শির থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম ঋষভ।
(২) প্রথম এবং প্রধান স্বর বলে এর নাম ঋষভ। (গাভীদের মধ্যে যেমন বৃষভ, স্বরেব মধ্যে তেমনি ঋষভ।)
(৩) ঋগ্‌বেদ এই সুরে পাঠ করা হত বলে এর নাম ঋষভ।

গান্ধার—নাভেঃ সমুত্থিতো বায়ুঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।
গন্ধবস্থখহেতুঃ স্যাদ্‌গান্ধারস্তেন হেতুনা ॥

গ—(১) নাসিকা থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম গান্ধার।
(২) গন্ধ বহন করে বলে এর নাম গান্ধার।
(৩) গন্ধর্বলোক থেকে পাওয়া যায় বলে এর নাম গান্ধার।

মধ্যম—বায়ুঃসমুত্থিতো নাভেহৃর্দয়ে চ সমাহতঃ।
মধ্যস্থানোদ্‌ভবত্বাত্তু মধ্যমস্তেন কীর্তিতঃ ॥

ম—(১) সাত স্বরের মাঝখানে আছে বলে এর নাম মধ্যম।
(২) বক্ষ থেকে জন্ম বলে এর নাম মধ্যম।

পঞ্চম—বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেরোষ্ঠকণ্ঠ শিরোহৃদি।
পঞ্চস্থানসমুদ্ভূতঃ পঞ্চমস্তেন কীর্তিতঃ ॥

প—(১) শরীরের পাঁচটি স্থান থেকে জন্ম নেয়, তাই এর নাম পঞ্চম।
(২) 'সা' থেকে গুণলে পঞ্চম সংখ্যার স্থানে পাওয়া যায় বলে পঞ্চম।

ধৈবত—নাভেঃ সমুত্থিতো বায়ুঃ কণ্ঠতালুশিরোহৃদি।

তত্তৎস্থানধৃতো যস্মাত্ততোঽসৌ ধৈবতোমতঃ॥

ধ—(১) নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির ও হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধৈবত।

(২) অধিকৃতভাবে ধরে থাকার জন্য ধৈবত।

নিষাদ—নাভেঃ সমুত্থিতে বায়ৌ কণ্ঠতালুশিরোহতে।

নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে॥

ন—(১) শরীরের সর্বস্থান থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম নিষাদ।

(২) সপ্তস্বরের শেষ স্বর বলে এর নাম নিষাদ।

এখানে দেখা যায় প্রত্যেক স্বরের আদ্যাক্ষরকে অবলম্বন করেই স্বরের সাতটি চলিত নাম জন্ম নিয়েছে।

প্রমাণে—কবিচক্রবর্তী জগদেকমল্ল তাঁর "সঙ্গীত-চূড়ামণি" গ্রন্থে লিখেছেন যে মতঙ্গ-প্রণীত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে স্বরনির্ণয় প্রকরণে ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য রেখে অ-বর্গ, ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ, য-বর্গ, শ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত করে স্বরমাত্রাযুক্ত হিসাবে প্রত্যেক স্বরকে বিভিন্ন বর্গাশ্রিত বলা হয়েছে। বর্তমানে যে "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে এ জাতীয় বিন্যাস বা লেখার সাক্ষাৎ যদিও আমরা পাই না, তবুও আগে এরকম লেখা হয়তো ছিল, এই আশায় আমরা সেটি দেখাচ্ছি :

শ—	বর্গ	থেকে	'স'—ষড়্জ
অন্তঃস্থ	,,	,,	'র'—রিষভ
ক—	,,	,,	'গ'—গান্ধার
প—	,,	,,	'ম'—মধ্যম
,,	,,	,,	'প'—পঞ্চম
ত—	,,	,,	'ধ'—ধৈবত
,,	,,	,,	'ন'—নিষাদ

চল স্বর—যাদের বিকৃতি ঘটানো চলে, তারা স্বস্থান থেকে এদিক-ওদিক যেতে পারে। তারাই হল **চল স্বর**। তাদের নড়ানো বা সরানো যায়।

অচল স্বর—যাদের বিকৃত নেই ও যারা অনড়, তারাই হল **অচল স্বর**। তাদের নড়ানো বা সরানো যায় না।

সাত স্বর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী মত—এই মতে 'স' ও 'প'-কে অচল স্বর ও

শুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। বাকী পাঁচটি (অর্থাৎ, র-গ-ম-ধ-ন)-কে চল স্বর বলা হয় ; এগুলি কোন সময়েই শুদ্ধ নয়, এই তাঁদের অভিমত ; যথা—আমাদের শুদ্ধ 'ম' = কোমল 'ম' ; আমাদের তীব্র 'ম' = কড়ি 'ম' ; অর্থাৎ উচ্চশ্রুতির চল স্বরদের তীব্র ও নিম্নশ্রুতিদের কোমল বলা হয়। আমাদের শুদ্ধ 'র' = তীব্র 'র' ; আমাদের কোমল 'র' = কোমল 'র'-ই।

কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্যা দাঁড়াল বারটি, যথা :—

স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন।

এখানে **শুদ্ধস্বর** কেবলমাত্র স ও প, কিন্তু চলিত নিয়মে সাতটি স্বরই তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কালে শুদ্ধস্বর নামে পরিচিত। অতএব এই হিসাবে শুদ্ধস্বর সাতটি—এই শুদ্ধস্বরকে অনেকে **প্রাকৃত স্বর** বলে থাকেন।

বিকৃত স্বর—শুদ্ধ স্বরের নির্দিষ্ট স্থানচ্যুতি থেকেই বিকৃত স্বরের জন্ম। মোট পাঁচটি বিকৃত স্বরের ব্যবহার প্রচলিত, যথা—'র' 'গ' 'ম' 'ধ' 'ন'। এদের মধ্যে 'র গ ধ ন' এই চার বিকৃত স্বরকে **কোমল (কোমিল) স্বর** ও বিকৃত 'ম' স্বরটিকে **তীব্র মধ্যম** (তীবর মধ্যম) বা **কড়ি** ম বলা হয়। 'কড়ি' ও 'তীবর' শব্দটি হিন্দী। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে 'স' ও 'প' স্বরদ্বয়ের যে বিকৃতি হয় না, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধরূপেই স্বীকৃতিলাভ করেছে।

এখন আমরা মোট বারটি স্বর পাচ্ছি। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত। কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্যা দাঁড়াল বারটি :

স র র গ গ ম ম প ধ ধ ন ন।

এই দ্বাদশ স্বর আমাদের রাগ গঠনের মূলধন। বারটি স্বরের মধ্যে ষড়জ (অর্থাৎ 'স') স্বরটিই আমাদের প্রধান স্বর। ইউরোপীয় সঙ্গীতে যেমন 'স' স্বরটির নির্দিষ্ট উচ্চতা (pitch) আছে, আমাদের সঙ্গীতে তেমন নেই। ইউরোপীয়দের যেমন C-নামক একটা নির্দিষ্ট 'স্কেল' (tonic scale) বাঁধা আছে, আমাদের তেমন নেই। আমাদের সঙ্গীতে 'স' স্বরটি গায়কগণ স্ব স্ব কণ্ঠের ওজন (volume) অনুযায়ী, এবং বাদকগণ তাঁদের বাদ্যের মাপ অনুযায়ী নিজ নিজ সুবিধামত স্বরের উচ্চতা (pitch) স্থির করে শ্রুতির অন্তর্বিভাগ অনুযায়ী সপ্তকের অন্যান্য স্বর সাজিয়ে নেন।

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর পদ্ধতি

উভয় ক্ষেত্রেই বারটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি কর্ণাটক পদ্ধতিতে বিকৃত স্বরগুলির নাম শ্রুতির হিসাবে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পার্থক্যটি আমাদের জানা দরকার। আমরা তাদের বিভিন্ন নামের পরিচয় নীচে লিপিবদ্ধ করলাম। বাহাত্তর ঠাট আলোচনার সময় এই পরিচয় আমাদের কাজে লাগবে।

ক্রমিক সংখ্যা	দক্ষিণী পদ্ধতির বারটি স্বর ও তাদের দক্ষিণী নাম	ভেঙ্কটামখীর কায়দায় [প্রতিটি স্বরের] অবস্থান-জ্ঞাপনের জন্য সঙ্কেতলিপি	হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে কোনটি কোন্ স্বরের অন্তর্ভুক্ত
১	স	স	স
২	শুদ্ধ 'র', (একশ্রুতিক	র	র (কোমল)
৩	শুদ্ধ গ বা চতুশ্রুতি র*	রি, গ	র (শুদ্ধ)
৪	ষট্শ্রুতি র বা সাধারণ গান্ধার	রু গি	গ (কোমল)
৫	অন্তর গান্ধার	গু	গ (শুদ্ধ)
৬	শুদ্ধ মধ্যম	ম	ম (শুদ্ধ বা কোমল)
৭	প্রতি মধ্যম	মি	ম (তীব্র বা কড়ি)
৮	প	প	প
৯	শুদ্ধ ধ (একশ্রুতিক)	ধ	ধ (কোমল)
১০	শুদ্ধ ন („) বা চতুশ্রুতিক ধ	ধি } ন }	ধ (শুদ্ধ)
১১	ষট্শ্রুতিক ধ } বা কৈশিকী ন }	ধু } নি }	ন (কোমল)
১২	কাকলী ন	নু	ন (শুদ্ধ)

* আধুনিককালে প্রাচীন কর্ণাটক পঞ্চশ্রুতিক 'র' ও 'ধ' চতুঃশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে এবং হিন্দুস্থানী শুদ্ধ 'র' ও শুদ্ধ 'ধ' সমশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

এই স্বরবিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভেঙ্কটামখী প্রতিটি স্বরের বিভেদ, বিকৃতি ও শ্রুতিগত অবস্থান বোঝানোর জন্য ভাষার বর্ণমালার মাত্র তিনটি স্বরবর্ণের সাহায্য নিলেন। এটি তাঁর এক অভিনব পন্থা; নানা চিহ্নের আবর্তে না হারিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন মাত্র তিন স্বরবর্ণের, যথা 'আ', 'ই' ও 'উ'। অতি সহজ এক উপায়ে তিনি বিকৃত স্বরদের যথাক্রমিক নাম দিলেন: 'র', 'রি', 'রু', 'গ', 'গি', 'গু', 'ম', 'মি', 'ধ', 'ধি', 'ধু', 'ন', 'নি' ও 'নু'। অনেকে বলেন তাঁর এই স্বরবর্ণের কায়দাটি তাঁর পিতা গোবিন্দ দীক্ষিতের আবিষ্কার। শ্রীযুত গোবিন্দ দীক্ষিত তাঞ্জোরের রাজা অচ্যুতাপ্পা নায়কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (রাজত্ব-কাল ১৫৭২ খৃঃ—১৬১৪ খৃঃ)। অনুমিত আছে, তিনি দক্ষিণ ভারতের কুদিমিয়া-মালাই নামক স্থান থেকে প্রস্তরে উৎকীর্ণ স্বরলিপি দেখে সেটি নিজ সংগ্রহের মধ্যে রেখে দেন। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এই লিখন সপ্তম শতাব্দীর। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত; কাজেই এটি তৎপরবর্তী ঘটনা। যদিও ভারতবর্ষের Epigraphy Department ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এটি আবিষ্কার করেন, তথাপি দক্ষিণ পণ্ডিতবর্গের অনেকের ধারণা যে যেহেতু রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ দীক্ষিতের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা প্রবল ছিল, তখন এই কায়দাটি তিনি এখান থেকেই নকল করে নিজের কাছে রেখেছিলেন; তাঁরই আবিষ্কাররূপে চিহ্নিত করে পরবর্তীকালে পণ্ডিত ভেঙ্কটামখী এটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন।

আমাদের মতে এই পদ্ধতির প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যাই হউক না কেন, আমাদের স্বরের কড়ি-কোমল চিহ্নিত করার উপায় বা কারণ হিসাবে এই সহজ উপায়টির সাহায্য আমরা নিতে পারি। বর্তমানে দিল্লীস্থিত ভারতীয় সরকারের সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি বিকৃত স্বরের চিহ্নস্বরূপ এই সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি (syllabo-phonetic system) অনুমোদন করার চেষ্টা করছেন।

স্বর ও সুর

এই দুটি শব্দ বহুক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের জানা দরকার যে **'স্বর'** অর্থে স র গ ম প ধ ন এই সাতটি স্বরের যে কোন একটি বিশেষ স্বরধ্বনিকে (a particular note) বোঝায়। **সুর** অর্থে কোন এক বিশেষ স্বরবিন্যাসকে বোঝায়; যেমন, এই গানের সুরটা এই রকম, ঐ গানের

স্বরটা আপনি দিয়েছেন? ইত্যাদি। আমরা উপযুক্ত স্থানে এই দুই শব্দ সকল সময়ে যথোপযুক্ত অর্থে ব্যবহার করি না। হিন্দী ভাষাতেও এই দোষ বর্তমান।

একশ্রুতি স্বর ঃ এই একশ্রুতি স্বরের অর্থ এক ধরণের অপরিবর্তিত শ্রুত স্বর। এখানে শ্রুতি কথাটি স্বরান্তর হিসাবে ব্যবহার করছি না। দূর থেকে ডাকার সময় বা একভাবে কান্নার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরের কোনও বৈচিত্র্য থাকে না, একভাবেই শোনা যায়; সেই কারণে এই ধরণের স্বরকে একশ্রুতি স্বর বা **একশ্রুত স্বর** বলা হয়। কারখানার কলের বা উড়োজাহাজ প্রভৃতির একঘেয়ে স্বরধ্বনিও এর কোঠায় পড়ে।

সপ্তক ঃ স্বরান্তর নিয়ে সাত সুরের সমবায়কে **সপ্তক** বলা হয়। স র গ ম প ধ ন—এই সাত স্বরধ্বনি ও তাদের স্বরান্তর নিয়েই একটা সপ্তক গঠিত হয়। অনেকে এই সপ্তককে **নাদস্থান** বলেন। স্বরের উঁচু-নীচুর কথা ভেবেই নাদস্থানকে ত্রিধা ভাগ করা হয়েছে ঃ—

মন্দ্র স্থান ঃ উদারার স্বর সপ্তক (খাদ)।
মধ্য স্থান ঃ মুদারার ,, (মাঝ)।
তার স্থান ঃ তারার ,, (চড়া)।

আমাদের কণ্ঠে বা যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে ২॥ (আড়াই) সপ্তকের প্রয়োজন। যত্ন নিলে কণ্ঠে আড়াই সপ্তক স্বর সাধনা সম্ভব। বহু কষ্টে ও যত্নে এবং বিশেষ সাধনাবলে তিন সপ্তক পর্যন্ত স্বরসাধনা করা সম্ভব হয়। লক্ষ লোকের মধ্যে দু-একজনের কণ্ঠে ৩॥ (সাড়ে তিন) সপ্তক শোনা যায়। আমাদের গায়কদের মধ্যে অনেকের কণ্ঠে আড়াই সপ্তকও পরিষ্কারভাবে শোনা যায় না।

॥ স্বরের পরিচয় পত্র ॥

	স্বরের নাম	অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ	ভিন্নমতে	বর্ণ অর্থে রং	ঋষি	ছন্দানুক্রম	রসভাব: সঙ্গীত দর্পণ মতে স্বরের রস	সঙ্গীত পারিজাত মতে স্বরের রস	সঙ্গীত রত্নাকর মতে স্বরের রস
স	ষড়্‌জ	অগ্নি		লাল পদ্মের মতন	অগ্নি	অনুষ্টুপ্‌	রৌদ্র	হাস্য	বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র
র	ঋষভ	ব্রহ্মা		হলদে বা গোলাপী	ব্রহ্মা	গায়ত্রী	বীর	শৃঙ্গার	" "
গ	গান্ধার	সরস্বতী,	চন্দ্রমা	স্বর্ণবর্ণ	চন্দ্রমা	ত্রিষ্টুপ্‌	করুণ	হাস্য	করুণ
ম	মধ্যম	মহাদেব	বিষ্ণু, ইন্দ্র	শ্বেতবর্ণ	বিষ্ণু	বৃহতী	হাস্য	শৃঙ্গার	হাস্য
প	পঞ্চম	লক্ষ্মী,	বিষ্ণু, নারদ	কাল বা বেগুনী	নারদ	পংক্তি	হাস্য	ভয়ানক,	শৃঙ্গার
ধ	ধৈবত	গণপতি		নীল	তুম্বুরু	উষ্ণিক	বীভৎস	বীভৎস	বীভৎস
ন	নিষাদ	সূর্য		বহু রং মিশ্রিত বা সাদা	কুবের	জগতী	করুণ	করুণ	করুণ

	কোন কোন জীব বা জন্তুর স্বরগত	শারীর স্থান	স্বরের জন্মস্থান	স্বরের জাতি	স্বরের বংশ পরিচয়	স্বরের স্ত্রী সকল (অর্থে শ্রুতি)	স্বরের পুত্রগণ
স	ময়ূর	কণ্ঠ	জম্বুদ্বীপ	ব্রাহ্মণ (সমস্ত	দেবকুল	তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী ।৪	ভৈরব
র	বৃষ বা চাতক	মস্তক	শাকদ্বীপ	ক্ষত্রিয় কোমল (ঋষি)	মুনিকুল	দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা ।৩	মালকোশ
গ	ছাগল	নাসিকা	কুশদ্বীপ	বৈশ্য ও কড়ি	দেবকুল	রৌদ্রী, ক্রোধা ।২	হিন্দোল
ম	ক্রৌঞ্চ মানে বক বা কোঁচ বক	উরু	ক্রৌঞ্চদ্বীপ	ব্রাহ্মণ স্বরকে শূদ্র জাতি	দেবকুল	বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী ।৪	দীপক
প	কোকিল	উরু, শীর, কণ্ঠ	শাল্মলীদ্বীপ	ব্রাহ্মণ বলা হয়)	পিতৃকুল	ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী ।৪	মেঘ
ধ	অশ্ব বা ব্যাং	ললাট	শ্বেতদ্বীপ	ক্ষত্রিয়	মুনিকুল	মদন্তী, রোহিণী, রম্যা ।৩	শ্রী
ন	হস্তি	সর্বসন্ধি থেকে	পুষ্করদ্বীপ	বৈশ্য	দৈত্যকুল	উগ্রা, ক্ষোভিনী ।২	নিঃসন্তান

স্বরের এই পরিচয়পত্রের প্রতিটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সব বিভাগের যুক্তিযুক্ত অর্থও সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন তবে প্রাচীন যুগের পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুশীলন দ্বারা বা গভীর ভাবে চিন্তা করে যা পেয়েছিলেন সে সমস্তকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। এর মধ্যে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে নেই এমন নয়। বর্তমানে আমরা সে সব আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত

বেদের কালে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ ভঙ্গী নিম্নাভিমুখী হওয়ার ফলে 'উদাত্ত' বলতে উচ্চস্বর, 'অনুদাত্ত' বলতে তার থেকে নিম্ন স্বর ও 'স্বরিত বলতে এই দুই স্বরের বিশ্রান্তি অবস্থাকেই বুঝাত। উদাহরণ:

	উদা.	অনু.	স্ব.
	গ	র	স
অথবা	ন	ধ	প

স্বরিত স্বরগুলির উচ্চারণকালে যে অর্ধস্বরের কণ্ ব্যবহার হত, তাকে **প্রচয়** বলা হত।

অনেকে বলেন বেদের উচ্চারণ-ভঙ্গিমা বুঝানোর কারণেই এই শব্দ সকল প্রচলিত হয়েছিল। বেদের শেষ যুগ থেকে এই নামগুলির প্রকৃত অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাঙ্গীতিক ব্যবহারে এদের প্রয়োগ কি ভাবে করা হয়েছিল, সেকথা পরে বলব।

উদাত্ত: পাণিনীয় স্বরবিচারে বলা হয়েছে "উচ্চৈরুদাত্তঃ" (পা ৪.২.২৯)। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে বড় নাদ দিয়ে এর বিচার করা হবে না। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি জায়গার উপর দিক থেকে খুব কষ্ট করে যা বার করা হবে, যে স্বরসমূহ প্রকাশ করতে শরীরে টান পড়ে (কষ্ট হয়), স্বর রুক্ষ ও তীব্র ভাবে প্রকাশ পায়, কণ্ঠবিবর সঙ্কোচ করে উচ্চারণ করতে হয়, সেই স্বরগুলিই উদাত্ত। সুতরাং এদেরকে আমরা তার স্থানের, অর্থাৎ চড়ার স্বর বলে ধারণা করতে পারি।

অনুদাত্ত: পাণিনীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "নীচৈরনুদাত্তঃ" (পা. ৩০)। এই স্বরের প্রকাশকালে শরীর শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়, স্বরগুলি মোটা হয়, কণ্ঠবিবর বড় হয়, আর স্বরগুলি স্নিগ্ধভাবে প্রকাশ পায়। ফলে আমরা অনুদাত্তকে উদারা স্থানের স্বর, অর্থাৎ খাদের স্বর বলে ধারণা করতে পারি।

স্বরিত ঃ পাণিনীয় ব্যাখ্যায় আমরা পাই "সমাহারঃ স্বরিতঃ" (পা. ৩১), "তস্য আদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্" (পা. ৩২), "বৃত্তি-উদাত্তানুদাত্ত স্বর-সমাহারঃ স্বরিতঃ"। "তৌ সমাস্থিয়েতে যস্মিন তস্য স্বরিত ইত্যেষা সংজ্ঞা ॥" অতএব দেখা যায় যে এই স্বরগুলি উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যস্থলের বা সংযোগস্থলের স্বরসকল এবং এরা উদাত্ত, অর্থাৎ তার স্থানের স্বরগুলির চেয়ে লঘু হবে। এইভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে স্বরিত স্থানকে আমরা মুদারার স্থান বলে ধরে নিতে পারি।

দেখা যায়, পরবর্তীকালে যাজ্ঞবল্ক্যে ও নারদীয় শিক্ষায় বলা হয়েছে, "উদাত্তৌ নিষাদগান্ধারৌ", অর্থাৎ 'ন' ও 'গ' উদাত্ত জাতীয়। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে বর্তমান 'ন' ও 'গ' দুই শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর। "অনুদাত্তৌ ঋষভধৈবতৌ", অর্থাৎ 'র' ও 'ধ' অনুদাত্ত স্বর এবং এরা তিনশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর। "স্বরিতপ্রভবা হ্যেতে ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ" ; অর্থাৎ 'স', 'ম' ও 'প' এই তিন স্বরকে স্বরিতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে ; এরা চারশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর।

অতএব দেখা যায় :	উদাত্ত=গ,	ন	=২ শ্রুতি ;
	অনুদাত্ত=র,	ধ	=৩ শ্রুতি ;
	স্বরিত=স,	ম, প	=৪ শ্রুতি ;

পাশ্চাত্ত্য বৈয়াকরণিক হুইট্‌নি (Whitney) তাঁর "Whitney's Grammar" অনুচ্ছেদ ৮১ (para 81)-তে লিখেছেন যে এগুলি সংস্কৃত ভাষার স্বরাঘাত (accent) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত। তিনি উদাত্তকে acute, অনুদাত্তকে grave ও স্বরিতকে circumflex বলেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এগুলি ভাষার ব্যাকরণে ছিল এবং পরে সঙ্গীতের ব্যাকরণে স্থান লাভ করেছে। সামবেদের কালে ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য প্রভৃতি সপ্ত-স্বরের ব্যবহার-যে প্রচলিত ছিল, একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানকালের স্বর সঠিক মিলান সম্ভব হয়নি। এমনও সম্ভব যে এগুলি গন্ধভাষিক স্বর ছিল এবং পরবর্তীকালে সঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই সব নানা কারণে, একদিকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এবং অন্যদিকে আগের দিনের স্বরসপ্তকের প্রকৃত-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত।

আগের দিনের স্বর স্থান ও স্বর সপ্তক বর্তমানে প্রচলিত স্বরস্থান ও স্বরসপ্তক থেকে ভিন্ন ছিল এই কথাটি মনে রেখে বর্তমান প্রচলিত ধারার সঙ্গে জোর করে মিল করতে না চাইলে অনেক জটিলতার নিরসন হবে।

মূর্চ্ছনা ঃ "আরোহশ্চাবরোহশ্চ স্বরাণাং যায়তে যদা।
তাং মূর্চ্ছনাং তদা লোকে প্রাহুর্গ্রামাশ্রয়ং বুধাঃ"
—সঙ্গীত পারিজাত

—গ্রামের আশ্রিত স্বরসপ্তকের ক্রমানুযায়ী আরোহণ ও অবরোহণকেই **মূর্চ্ছনা** বলা হয়। মূর্চ্ছনা শব্দের অর্থ বিস্তৃত হওয়া বা মূর্চ্ছিত হওয়া। মূর্চ্ছনা বহু প্রকারের হয়। যেমন :

(১) **গ্রাম মূর্চ্ছনা ঃ** যখন 'স' ছাড়া অন্য কোনও স্বরকে ধরে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী উঠা-নামার মারফতে একটা গ্রাম (scale) রচনা করা হয়, তখন তাকে **গ্রাম মূর্চ্ছনা** বলে। এই গ্রাম মূর্চ্ছনাকে **বর্গও** বলা হয়।

(২) **স্বর মূর্চ্ছনা ঃ** রাগের প্রারম্ভিক স্বর অনুসারে আরোহণ-অবরোহণকে **স্বর মূর্চ্ছনা** বলা হয়। কোন রাগ কোন বিশেষ স্বর থেকে আরম্ভ করলে স্বর মূর্চ্ছনা সৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ইমন রাগটি 'ন' থেকে আরম্ভ করা হল; অতএব একে 'ন' স্বরের মূর্চ্ছনা ধরা হল।

(৩) **যান্ত্রিক মূর্চ্ছনা ঃ** বীণা বাজাবার সময় ডান হাতের জায়গা বদল ও বাঁ হাতের তৈরী উঠা-নামাকে আগের দিনে **'মূর্চ্ছনা'** বলা হত। প্রাচীনকালে যন্ত্রে কোন স্বর থেকে আন্দোলনযুক্ত মীড় বা ঘসিট দিয়ে সম্পূর্ণ সপ্তকে উঠা-নামাকেও মূর্চ্ছনা বলা হত। অনেকে একে **গমক মূর্চ্ছনা**-ও বলেন।

(৪) **রাগ মূর্চ্ছনা ঃ** "মূর্চ্ছতে যেন রাগঃ"। একটা রাগের রূপ যখন বিশেষ স্বরসমষ্টির উঠা ও নামার মাঝে ফুটে উঠে, তখন তাকে **রাগ মূর্চ্ছনা** বলা হয়। সমস্বর বিশিষ্ট অন্য রাগের কোন বিশেষ লক্ষণ যখন বিশিষ্ট মূর্চ্ছনার কারণে ধরা পড়ে, তখন তাকেও 'রাগ মূর্চ্ছনা' বলা হয়। এই সংজ্ঞা মতঙ্গের মতানুযায়ী বলেই আমরা জানি।

(৫) **সপ্তকূট মূর্চ্ছনা ঃ** আগের দিনে এক স্বরের ছয় ভেদ মানা হত। কোমল, কোমলতর, কোমলতম এবং তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম এই ছয়টি ভেদ এবং মূল স্বরটি নিয়ে সপ্তকূট মূর্চ্ছনার সৃষ্টি বলা হয়।

আল্লাবন্দে খাঁ সাহেবের ঘরাণার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী স্বর্গীয় তানসেন পাণ্ডেজী এক স্বর থেকে অন্য স্বরের মাঝে শ্রুতিভেদে ছয়টি পৃথক্ পৃথক্ স্বরধ্বনি বের করে আমাদের শুনিয়েছিলেন; এক স্বরের মাঝে এই শ্রুতিভেদ প্রদর্শন করাকে তিনি সপ্তকূট মূর্চ্ছনা দেখান বলেছিলেন।

(৬) **একবিংশতি** (একুশ) **মূর্চ্ছনা ঃ** আমাদের সঙ্গীতে তিন গ্রাম মানা হত। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মূর্চ্ছনা ধরা হয় ; সেই হিসাবে মূর্চ্ছনার মোট সংখ্যা ৭×৩ বা ২১।

তিন গ্রামের এই একুশটি মূর্চ্ছনার নাম নীচে দেওয়া হল :—

[ক] **ষড়্জ গ্রাম মূর্চ্ছনা ঃ—**

নারদ মতে	**ভরত মতে**	
(১) উত্তরবর্ণা	(১) উত্তরমন্দ্রা	স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।
(২) অভিরুদ্গতা	(২) রজনী	ন স র গ ম প ধ ; প ধ ম গ র স ন।
(৩) অশ্বক্রান্তা	(৩) উত্তরায়তা	ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।
(৪) সৌবীরী	(৪) শুদ্ধ ষড়্জা	প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প।
(৫) হৃষ্যকা	(৫) মৎসরীকৃতা	ম প ধ ন স র গ ; গ র স ন ধ প ম।
(৬) উত্তরায়তা	(৬) অশ্বক্রান্তা	গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।
(৭) রজনী	(৭) অভিরুদ্গতা	র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র॥

[খ] **গান্ধার গ্রাম মূর্চ্ছনা** (অধুনা লুপ্ত) ঃ—

নারদ মতে—

(১)	নন্দা—	গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।
(২)	বিশালা—	র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র।
(৩)	সুমুখী—	স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।
(৪)	চিত্রা—	ন স র গ ম প ধ ; ধ প ম গ র স ন।
(৫)	চিত্রবতী—	ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।
(৬)	সুখা—	প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প।
(৭)	আলাপী—	ম প ধ ন স র গ ; গ র স ন ধ প ম॥

[গ] **মধ্যম গ্রাম মূর্চ্ছনা ঃ—**

নারদ মতে	ভরতমতে	
(১) আপ্যায়নী	(১) সৌবীরী—	ম প ধ ন স র গ ; গ র স ন ধ প ম।
(২) বিশ্বকৃতা	(২) হারিনাশ্বা—	গ ম প ধ ন স র ; র স ন ধ প ম গ।
(৩) চন্দ্রা	(৩) কলোপনতা—	র গ ম প ধ ন স ; স ন ধ প ম গ র।
(৪) হেমা	(৪) শুদ্ধমধ্যা—	স র গ ম প ধ ন ; ন ধ প ম গ র স।
(৫) কপর্দিনী	(৫) মার্গী—	ন স র গ ম প ধ ; ধ প ম গ র স ন।
(৬) মৈত্রী	(৬) পৌরবী—	ধ ন স র গ ম প ; প ম গ র স ন ধ।
(৭) চান্দ্রমসী	(৭) হৃষ্যকা—	প ধ ন স র গ ম ; ম গ র স ন ধ প॥

—উপরিলিখিত মূর্চ্ছনাগুলিই আমাদের সঙ্গীতে একুশ মূর্চ্ছনা। এই গ্রামের এই মূর্চ্ছনাদের বলা হত **শুদ্ধ মূর্চ্ছনা**।

এ ছাড়া বিকৃতস্বরযুক্তা মূর্চ্ছনাও ছিল; তাদের তিন ভাগ; যথা: কাকলী-কলিতা, সান্তরা ও কাকল্যন্তরা। আবার এদেরকেও সম্পূর্ণা, ষাড়বী ও ঔড়বী মূর্চ্ছনা নামে আরও তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। সমস্ত নাম ও তাদের স-র-গ-ম লেখা এখানে সম্ভব হল না।

মূর্চ্ছনা ও প্রাচীন তান: প্রাচীনকালে তানে কেবল স্বরের আরোহী গতি ছিল। কিন্তু মূর্চ্ছনার বেলায় স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দুই-ই আছে। ভরতের পুস্তকে ষাড়ব মূর্চ্ছনায় ৪৯টি তান, ঔড়ব মূর্চ্ছনায় ৩৫টি তান ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলিকে ভরত মূর্চ্ছনা(গত) তান বলেছেন।

মূর্চ্ছনা ও তান: প্রাচীন প্রথা হিসাবে অনেকের ধারণা মূর্চ্ছনা মানে তান। মূর্চ্ছনার সঙ্গে তানের মিল আছে সত্য, তবে তানে ক্রমিক আরোহণ-অবরোহণের নিয়ম মানা হয় না। কিন্তু মূর্চ্ছনায় ক্রম মানতেই হবে। পরে তানের বিষয়ে আরও বিশদভাবে লেখা হয়েছে।

মূর্চ্ছনা ও ক্রম: 'ক্রমে'র অর্থ আমরা গতি বলে ধরতে পারি (এর থেকেই আমরা 'পরিক্রমা' শব্দটি পেয়েছি।) সুতরাং ক্রম হচ্ছে স্বরগুচ্ছের গতিনির্ধারক; আর মূর্চ্ছনা হচ্ছে স্বরসমষ্টির আরোহী ও অবরোহীর মিশ্রণ।

[মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জ্ঞাতব্য আছে। স্থানাভাববশতঃ বর্তমানে সে সকল তথ্য অনুল্লিখিত রইল।]

মেল বনাম ঠাট

ঠাট মানে কাঠামো। কোন মূর্তি তৈরীর আগে যেমন কাঠ, খড়, মাটি ইত্যাদি দিয়ে একটা কাঠামো গড়া হয়। রাগ-রচনার আগেও তেমনি বিশিষ্ট স্বর সমষ্টির ক্রমপর্যায়ে রাগের একটা কাঠামো গড়া হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঠাট রাগরচনার সম্বন্ধসূত্র। রাগে অবশ্য ব্যবহার্য স্বরসমষ্টিই তার ঠাটের পরিচয়। ঠাট কতকগুলি স্বরের অভিব্যক্তি মাত্র; তার গতি নাই, ভাবনা নাই, ব্যঞ্জনা নাই,—শুধুই একটা কাঠামো। সেটা রাগের মূর্তি বা আসল চেহারা নয়। অতি সহজে রাগদের বর্গীকরণের ও সহজে মনে রাখার কারণেই মেল বা ঠাটের প্রয়োজন।

আমাদের ধারণা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দেই প্রথম মেল বা ঠাটের প্রবর্তন করা হয়। যদিও সঠিকভাবে আমরা এটি নির্দেশ করতে পারি নি, ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দাজের উপর নির্ভর করেই বলছি। ডাঃ বিমল রায়, এম্. বি. মহোদয় লিখিত "ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই : "ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মাধবাচার্য পঞ্চদশ মেলের প্রবর্তন করেন।" অন্যত্র আমরা পাই : "১৬০৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত সোমনাথ তেইশটি মেলের প্রবর্তন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'রাগতরঙ্গিনী'কার লোচনকবি দ্বাদশ সংস্থানের প্রবর্তন করেন।"

রেভারেণ্ড পোপলে সাহেব রচিত **The Music of India** গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি (১৭৭৯-১৮০৪ খৃঃ) জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিং শুদ্ধ ঠাটপদ্ধতি নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের নির্দিষ্ট রূপদান ও শ্রেণী-বিভাগের কারণে তৎকালিন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেছিলেন আলাপ-আলোচনার জন্য। এই সূত্রেই আমরা "শুদ্ধ বিলাবল" ঠাটের কথা পাই। এই সভার চেষ্টায় "রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসার" নামে একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয় ; তবে এ পুস্তকে তেমন উঁচুদরের কোন কথা পাওয়া যায় না।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তানাপ্পাচার্যের শিষ্য ও গোবিন্দ দীক্ষিতের পুত্র দক্ষিণী সংগীত-শাস্ত্রী পণ্ডিত ভেঙ্কটামখী "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" নামক গ্রন্থে বাহাত্তর মেলের (ঠাটের) প্রথম প্রবর্তন করেন। অনেকে বলেন যে ইনি শার্ঙ্গদেবের কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরায় শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন : অবশ্য কিছু লোক এ কথা অস্বীকার করে থাকেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও গণিত শাস্ত্রের হিসাবে এই ঠাট পদ্ধতিকে অনেকেই নির্ভুল ও ত্রুটিহীন বলে মনে করেন। আমরা এটিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হিসাব বলে মনে করতে কিছু দ্বিধা বোধ করি। কোন রাগে একই সঙ্গে শুদ্ধ (অর্থে কোমল) 'ম' ও বিকৃত 'ম'-র ব্যবহারই তার প্রমাণ। তাঁর লেখার মধ্যেও তিনি সারঙ্গ রাগে এই প্রকার মধ্যমের ব্যবহার স্বীকার করেছেন ; অথচ ঠাট সম্বন্ধে সেটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন। এখানেই তাঁর হিসাবের গলদটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সে যাই হোক, আমরা তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারি না। এই বর্গীকরণ এত সুন্দর যে আমরা তাঁর গাণিতিক হিসাবে মুগ্ধ হয়ে যাই। এখন আমরা সাধারণভাবে তাঁর বাহাত্তর ঠাটের সরল হিসাবের কথায় আসছি।

বাহাত্তর (৭২) ঠাট ঃ প্রথমে শুদ্ধ সপ্তককে দুই ভাগ করা হল। সপ্তক বলতে 'স র গ ম প ধ ন' এই সাত স্বরকে বুঝায়, এ কথা আগেই

বলেছি। এখন সপ্তকের 'স' ও 'প'-কে (স্বতঃসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী) অবিকৃত রেখে 'র', 'গ', 'ধ' ও 'ন' এই চারটি স্বরকে বিকৃত করলে এবং হিসাবের সুবিধার জন্য 'ম' স্বরটিকে বাদ দিলে আমরা প্রথম ভাগে পাচ্ছি 'স র র গ গ' ও দ্বিতীয় ভাগে পাচ্ছি 'প ধ ধ ন ন'। এই বিভাগে অপর এক লক্ষণীয় বিষয় এই যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর ব্যবহারের রীতি নাই। এই নিয়ম সর্বদাই মেনে চলা হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে কোন রাগে একই স্বরের বিভিন্ন রূপ (অর্থে বিকৃত রূপ) বিভিন্ন স্বর-নামে পর পর ব্যবহারে বাধা নাই। সেই কারণে ঠাট পদ্ধতি নিরূপণ করার সময় তিনি পর পর স্বর লাগিয়ে বিভাগ করতে পেরেছেন।

স্বরের অদল-বদলে আমরা কি কি বিন্যাস পাই, তা জানাই। প্রথমেই বলেছি যে দুটি বিন্যাস পাই :—

(ক) স র র গ গ (ম) ও (খ) প ধ ধ ন ন (র্স)।

প্রথম বিভাগটির নামকরণ হয়েছে **পূর্ব মেলার্দ্ধ** ও দ্বিতীয় বিভাগটির নামকরণ হয়েছে **উত্তর মেলার্দ্ধ**।

'ক' বিভাগ	**'খ' বিভাগ**
(পূব মেলার্দ্ধ)	(উত্তর মেলার্দ্ধ)
(১) স র গ	(১) প ধ ন
(২) স র গ	(২) প ধ ন
(৩) স র গ	(৩) প ধ ন
(৪) স র গ	(৪) প ধ ন
(৫) স র র	(৫) প ধ ধ
(৬) স গ গ	(৬) প ন ন

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে উত্তর মেলার্দ্ধেই আমরা ৬ প্রকার স্বরবিন্যাস পাচ্ছি। বোঝাবার সুবিধার জন্য আমরা 'ম' স্বরটিকে বাদ দিয়ে রেখেছি, একথা আগেই বলেছি। এখন আমরা পূর্ব মেলার্দ্ধের সঙ্গে শুদ্ধ (বা কোমল) মধ্যম যুক্ত করে

ক্রমান্বয়ে ‘ক’-বিভাগের ১নং-এর সঙ্গে ‘খ’-বিভাগের ১নং থেকে ৬নং পর্যন্ত, পরে ‘ক’-বিভাগের ২নং-এর সঙ্গে ‘খ’-বিভাগের ১নং থেকে ৬নং পর্যন্ত,—এই ভাবে ‘ক’-বিভাগের ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর প্রতিটি সংখ্যার বিন্যাসের সঙ্গে ‘খ’-বিভাগের বিন্যাস উপযুক্তভাবে যদি যোগ করে চলি, তাহলে আমরা পাব ৬ × ৬ অর্থাৎ ৩৬টি বিন্যাস।

এখন শুদ্ধ মধ্যমের স্থলে যদি আমরা বিকৃত মধ্যমটিকে (কড়ি ‘ম’-কে) ব্যবহার করি এবং উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় তাদের যোগাযোগ ঘটাই, তাহলে আমরা আরও ছত্রিশটি (৩৬) (কড়ি ‘ম’-যুক্ত) বিন্যাস পাব।

অতএব ৩৬টি শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত বিন্যাস ও ৩৬টি বিকৃত মধ্যমযুক্ত বিন্যাস মিলিয়ে ৩৬ + ৩৬ অর্থাৎ ৭২-টি বিন্যাস পাওয়া যাচ্ছে। এই ৭২টি ভিন্ন ভিন্ন স্বর-বিন্যাসই “বাহাত্তর ঠাট” নামে পরিচিত।

বিকৃত মধ্যমের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : “যেমন এক ঘড়া দুধে এক ফোটা ‘চোনা’ (অর্থে গোমূত্র) পড়লে দুধের রূপটি বদলে যায়, তেমনি ৩৬টি স্বর বিন্যাসের মধ্যে যেইমাত্র বিকৃত মধ্যমের ব্যবহার ঘটলো, অমনি সমস্ত বিন্যাসটির রূপ বদলে গেল।” পণ্ডিত ভেঙ্কটামখী ১২টি চক্রের আওতায় এই ৭২টি বিন্যাস ভাগ করে আবার ওই বারটি চক্রকে দুভাগ করে এক এক ভাগে ৬টি করে চক্র গড়ে অতি নিপুণভাবে ভাগটি দেখিয়েছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র চক্রগুলির নাম ও বিভাগ দেখিয়েই বাহাত্তর ঠাটের কথা শেষ করছি। সময়ান্তরে বিশদভাবে বোঝাবার ইচ্ছা রইল।

কেবলমাত্র চক্রগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হল :

১। একে—ইন্দু ॥	৭। সাতে—ঋষি ॥
২। দুয়ে—নেত্র ॥	৮। আটে—বসু ॥
৩। তিনে—অগ্নি ॥	৯। নয়ে—ব্রহ্ম ॥
৪। চারে—বেদ ॥	১০। দশে—দিশি ॥
৫। পাঁচে—বাণ ॥	১১। এগারোয়—রুদ্র ॥
৬। ছয়ে—ঋতু ॥	১২। বারোয়—আদিত্য ॥

বত্রিশ (৩২) ঠাট : হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এই হিসাব মত কি করে বত্রিশ ঠাট রচনা করা হয়, এখন সেই কথা বলছি। আগে বলেছি, আমাদের ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও কোমল ভাব পর পর ব্যবহার করা হয় না;

অতএব উপযুক্ত হিসাব থেকে পর পর দুটি স্বর বাদ দিলে কি দাঁড়ায়, সেটা বিবেচনা করে দেখা যাক্।

‘ক’-বিভাগ (পূর্ব মেলার্দ্ধ)	‘খ’-বিভাগ (উত্তর মেলার্দ্ধ)
(১) স র গ	(১) প ধ ন
(২) স র গ	(২) প ধ ন
(৩) স র গ	(৩) প ধ ন
(৪) স র গ	(৪) প ধ ন

অর্থাৎ পর পর দুটি স্বর রাখা হল না। অর্থাৎ:

(৫) স র র (৫) প ধ ধ

(৬) স গ গ (৬) প ন ন

এই বিন্যাসগুলি বাদ দেওয়া হল। ‘র’, ‘গ’ ও ‘ধ’, ‘ন’ কোমল ধরাতেই ১৬টি বিন্যাস পাওয়া গেল।

এখন ঠিক পূর্ব প্রক্রিয়া অনুসারে ‘ক’-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ‘খ’-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং-এর সঙ্গে যুক্ত করলে আমরা পাচ্ছি ৪ × ৪ বা ১৬টি বিন্যাস। এইবার শুদ্ধ ‘ম’-এর স্থলে কড়ি ‘ম’ ব্যবহার করলে পাই আরও ১৬টি বিন্যাস। অতএব ১৬+১৬, অর্থাৎ মোট এই বত্রিশটি (৩২) বিন্যাস আমরা পাই।

ডাঃ বিমল রায় এই বত্রিশ ঠাটের প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সেটি সঙ্গীত-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। স্বর্গীয় বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করের ছাত্র নারায়ণ মোরেশ্বর এই ধরণেরই ত্রিশ ঠাট প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন বোম্বাই সহরে; সে প্রচেষ্টাও স্বীকৃতি পায় নি।

স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীর “দশঠাট” পদ্ধতিই এ যুগে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়েই এই ঠাট

পদ্ধতিকে মান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের পাঠ্যসূচীতে (সিলেবাসে) ঠাটের কথায় এই মতটিকেই গ্রাহ্য করা হয়েছে। এই পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি আমাদের সম্মানার্হ। অবশ্য বর্তমানে অনেক গুণী ব্যক্তি তাঁর অনুসৃত এই ঠাট পদ্ধতি অনুমোদন করেন না ; উদাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে তাঁরা এই ঠাটের বহু ভুল ও ত্রুটি প্রমাণ করেছেন। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে এর কিছু সংশোধন করা প্রয়োজন। দশ ঠাটের মধ্যে রাখতে পারি না, এমন কয়েকটি রাগের নাম উদাহরণ-স্বরূপ আমরা করছি :

		বর্তমানে
পটদীপ	...	কাফী ঠাটে
শুদ্ধ সারং	...	,,
ললিত	...	মারবা ঠাটে
পিলু	...	কাফী ঠাটে

ইত্যাদি আরও অনেক বলা যায়। তাদের জন্য আলাদা ঠাট হলে ভাল হয়।

'রাগ তরঙ্গিনী', 'হৃদয় কৌতুক', 'হৃদয় প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ঠাট সম্বন্ধে অতি সরল ও সুন্দর ভাবের আলোচনা হয়েছে। কাজেই ভেঙ্কটামখীর বাহাত্তর ঠাট যদি আবিষ্কৃত নাও হত, তবুও আমরা দশ ঠাটের প্রবর্তন করতে পারতাম। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন তিনি বাহাত্তর ঠাটের হিসাব থেকেই দশ ঠাটের হদিস পেয়েছেন। তাঁর এ উক্তির তাৎপর্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

যাই হউক, এখন আমরা তাঁর রচিত ও প্রতিষ্ঠিত দশ ঠাটের কথায় আসছি। উত্তর ভারতে প্রচলিত প্রায় সমস্ত রাগকেই তিনি দশ ঠাটের আওতায় নিয়ে এসেছেন। এই দশটি ঠাটের নাম হল :—

(১) বিলাবল,	(৬) ভৈরবী,
(২) কল্যাণ,	(৭) ভৈরব,
(৩) খমাজ,	(৮) টোড়ী,
(৪) কাফী,	(৯) পূর্বী,
(৫) আশাবরী,	(১০) মারোয়া॥

এই দশ ঠাটের প্রত্যেকটির নামকরণকালে তার স্বর-স্বরূপে প্রচলিত কোন একটি প্রসিদ্ধ রাগের নামে ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ রাগটিকে

আশ্রয় রাগ এবং ঠাটটিকে জনক-ঠাট বলে। নিচে ভাতখণ্ডেজীর দশ ঠাটের সঙ্গে দক্ষিণী মেলের তুলনামূলক আলোচনা করা গেল।

ভাতখণ্ডেজী প্রবর্তিত দশ ঠাটের নাম : আশ্রয়রাগ বা জনকঠাট	দক্ষিণী মেলে এদের নাম	৭২ ঠাটের মেল-সংখ্যা	স্বর-রূপ
(১) বিলাবল	ধীরশঙ্করাভরণ	২৯	স র গ ম প ধ ন
(২) কল্যাণ	মেচকল্যাণী	৬৫	স র গ ম̍ প ধ ন
(৩) খমাজ	হরিকাম্ভোজী	২৮	স র গ ম প ধ ন̲
(৪) কাফী	খরহরপ্রিয়া	২২	স র গ̲ ম প ধ ন̲
(৫) আশাবরী	নটভৈরবী	২০	স র গ̲ ম প ধ ন̲
(৬) ভৈরবী	হনুমংতোড়ী	৮	স র̲ গ̲ ম প ধ̲ ন̲
(৭) ভৈরব	মায়ামালবগৌল	১৫	স র̲ গ ম প ধ̲ ন
(৮) টোড়ী	শুভপন্তুবরালী	৪৫	স র̲ গ̲ ম̍ প ধ̲ ন
(৯) পূরবী	কামবর্দ্ধিনী	৫১	স র̲ গ ম̍ প ধ̲ ন
(১০) মারোয়া	গমনশ্রম	৫৩	স র̲ গ ম̍ প ধ ন

জনক ঠাট : গণিত শাস্ত্রের সৌজন্যে বহু ঠাট রচনা করা সম্ভব। সেই সকল ঠাট থেকে রাগ রচনা করা সম্ভব হলেও অনেক সময় দেখা যায় যে সেগুলি লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না, বা রচনায় নানা অসুবিধাও দেখা যায়। তাই ঠাটের সাহায্যে রাগ রচনাকালে বহু ঠাটের মধ্যে থেকে সর্বজনগ্রাহ্য কতকগুলি ঠাট আমরা বেছে নিই। দক্ষিণী পদ্ধতিতে পণ্ডিত ভেঙ্কটামখীর বাহাত্তরটি ঠাট গ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কেবলমাত্র ১৯টি ঠাটই জনক ঠাট হিসাবে মান্য পায়। আমাদের উত্তরী পদ্ধতিতেও তেমনি ৩২টি অথবা তদধিক ঠাট রচনা করা গেলেও পূর্বোক্ত দশটি ঠাটই প্রধানতঃ জনক ঠাট হিসাবে

মান্য পেয়ে থাকে। দশ ঠাটের নাম আগেই বলেছি ১৯টি দক্ষিণী জনক ঠাটের নাম দিলাম :

১। মুখারী ॥	৭। ভৈরবী ॥	১৩। দেশাক্ষী ॥
২। সামবরালী ॥	৮। শ্রীরাগ ॥	১৪। নাট ॥
৩। ভূপাল ॥	৯। হেজুজ্জী ॥	১৫। শুদ্ধবরালী ॥
৪। বসন্ত ভৈরবী ॥	১০। কাম্ভোজী ॥	১৬। পন্থবরালী ॥
৫। গৌল ॥	১১। শঙ্করাভরণ ॥	১৭। শুদ্ধরামক্রিয়া
৬। আহিরী ॥	১২। সামন্ত ॥	১৮। সিংহরব ॥
	১৯। কল্যাণী ॥	

দক্ষিণের শুদ্ধ ঠাট বলতে তাদের সমস্ত শুদ্ধ স্বর নিয়ে রচিত ঠাটকেই বুঝায়। তাদের শুদ্ধ ঠাট বলতে কনকাঙ্গি মেল। বাহাত্তর ঠাটের প্রথম "মেল কর্তা" রাগ এটি। স্বরাধ্যায়ে দক্ষিণী স্বর পদ্ধতির তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন।

দক্ষিণী শুদ্ধ স্বর	আমাদের শুদ্ধ স্বর
স	স
(শুদ্ধ) র	র্
(শুদ্ধ) গ	র
(শুদ্ধ) ম	ম
প	প
(শুদ্ধ) ধ	ধ্
(শুদ্ধ) ন	ধ

আমাদের শুদ্ধ স্বর বলতে বিলাবল ঠাটকেই বুঝায়। আমাদের শুদ্ধ ঠাটেও স্বর-পদ্ধতির সমস্ত শুদ্ধ স্বরই (অর্থাৎ, শুদ্ধ স র গ ম প ধ ন) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেটি বিলাবল ঠাটের স্বরূপ। আমাদের শুদ্ধ ঠাটের সঙ্গে

দক্ষিণী শঙ্করাভরণ ঠাটটি মেলে। আর দক্ষিণী শুদ্ধ ঠাটের নাম কনকাঙ্গী, অর্থাৎ কনকাঙ্গী মেল,—এ কথা উপরে বলেছি।

বর্ণ

বর্ণ: প্রাচীনকালে গেয় রচনাকে 'বর্ণ' বলা হত। পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্যা বদলে যায় এবং গান করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে বর্ণ বলে ধরা হয়।

"গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ॥ (সঙ্গীত রত্নাকর)

বর্ণ মানে বর্ণনা করা বা বিস্তার করা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজ দিয়ে গানের স্বরসমষ্টির এক একটি পদ দেখান হয়, সেই রকম কাজগুলিকেই বর্ণ বলা হয়।

কথিত আছে, বর্ণ চার রকমের: (১) এক স্বরকেই পর পর বারবার দেখানকে **স্থায়ী বর্ণ** বলা হয়। 'স্থায়ী' বলতে গেলে গানের বা গতের স্থায়ী, অস্থায়া প্রভৃতি বিভিন্ন কলিকে বুঝায় না; উচ্চারণভঙ্গী দিয়ে বিশেষ স্বরধ্বনির প্রয়োগকেই বুঝায়: যেমন—স স স স, র র র, গ গ গ গ, ইত্যাদি। (২) স র গ ম প ধ ন—এই ভাবে স্বরের পর পর আরোহণকে **আরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৩) ন ধ প ম গ র স: আরোহীর ঠিক বিপরীত ভাবে ক্রমিক নেমে আসাকেই **অবরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৪) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী —এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে **সঞ্চারী বর্ণ** বলা হয়। উদাহরণ: স র গ র, ধ প ম গ ম প, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সে বিকশিত হল। এখানে বর্ণ মানে তাহলে দাঁড়ায় 'বিকাশ'।

অলঙ্কার

"বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভমলংঙ্কারং প্রচক্ষতে॥" (সঙ্গীত রত্নাকর)।

অলঙ্কার মানে ভূষণ বা আভরণ। ভরত বলেছেন:

"শশিনা রহিতেব নিশা বিজলেব নদী লতা বিপুষ্পেব
অবিভূষিতেব কান্তা গীতিরলঙ্কারহীনা স্যাৎ॥"

—অমাবস্যা রাত্রি, শুকনো নদী, ফলফুলহীন গাছ এবং নিরাভরণা নারী যেমন মনোহারী হয় না, তেমনি অলংকারবিহীন গান-বাজনাও মধুর শোনায় না।

সঙ্গীতশাস্ত্রে অলংকারের অর্থ মনোহর স্বরবিন্যাস রচনা। বর্ণের সঙ্গে অলংকারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে; তাই সঙ্গীতালঙ্কারকে বর্ণালংকার নাম দেওয়া হয়েছে। শব্দালংকারে যেমন অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু, বক্রোক্তি; অর্থালংকারে যেমন—উপমা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়, সঙ্গীত-শাস্ত্রেও সেই রকম ৫০।৬০ রকমের অলংকারের নাম দেখা যায়। শৃংখলাবদ্ধ নানা স্বরবিন্যাসে বহু রকমের অলংকার রচনা করা সম্ভব; তাই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন: "অনন্তাস্তুতে শাস্ত্রেণ সমস্তেন কীর্তিতাঃ।" স্থায়ীবর্ণের সাতটি, আরোহীবর্ণ ও আরোহীবর্ণের বারটি, সঞ্চারীবর্ণের পঁচিশটি অলংকারের নাম শাস্ত্রে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকার সুন্দর সুন্দর অলংকারের নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; তদুল্লেখে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হতে পারে, এই আশংকায় বিরতি বাঞ্ছনীয়।

বর্ণের সঙ্গে অলংকারের প্রভেদ সহজে নজরে আসে না। কয়েকটি বর্ণের শৃংখলাবদ্ধ স্বরবিন্যাসে অলংকার রচিত হয়। অনেকে 'তান'-কে অলংকার মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তান ও অলংকার এক বস্তু নয়। তান যেহেতু গানের ভূষণ, সেই কারণে তানকে অলংকার মনে করা অসমীচীন নয়। কিন্তু শাস্ত্রমতে অলংকার এক বিশেষ ধরণের স্বরগুচ্ছ; এটি ঠিক তান নয়। বর্ণে আমরা স স স, ন ধ প, স র গ, ধ প ম, ন স র গ—এই ধরণের নানা স্বরবিন্যাস দেখতে পাই। কিন্তু অলংকারের ক্ষেত্রে আমরা স গ র ম, র ম গ প, গ প ম ধ, ম ধ প ন, ন প ধ ম—এই ধরণের স্বর-বিন্যাসের সম্মুখীন হই। (তানের কথায় তানের স র গ ম দ্রষ্টব্য।)

বাক্যের মধ্যে যেমন পদ গীতরূপ ভাষায় তেমনি বর্ণ। এই বর্ণের আলংকারিক রূপই অলংকার। তাই অলংকারকে বলা হয় "বর্ণালংকার"।

রাগ জাতিঃ হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, বণিক প্রভৃতি বংশজাতদের (এক ভাষাভাষী হলেও) যেমন বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আচরণভেদে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখতে পাই সঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন ধরণের রাগকে তাদের স্বরসংখ্যা ও মূর্ছনাভেদে নানা জাতিতে বিভাজিত দেখা যায়।

জাতি ঃ ভরতের কালে ১৮ প্রকার জাতির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি শুদ্ধ জাতি ও ১১টি বিকৃত জাতির উল্লেখ দেখা যায়।

রাগ শ্রেণী ঃ রাগজাতি ছাড়া আর এক ভাবে রাগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল—'শুদ্ধ', 'ছায়ালগ' ও 'সঙ্কীর্ণ'। ছায়ালগকে 'সালগ' বা সালংক'-ও বলা হত। 'অবিমিশ্র রাগ'দের বলা হত **শুদ্ধ**; দুয়ের মিশ্রণজাতদের বলা হত **ছায়ালগ**; বহু রাগের মিশ্রণজাতদের বলা হত **সংকীর্ণ**। বর্তমানে মিশ্র ও অবিমিশ্র জাতির রাগ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর; কাজেই এ প্রথাও যুগোপযোগী নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব এদের কথা আমরাও এড়িয়ে যাচ্ছি।

এর পরে মধ্যযুগে আর একভাবে বর্গীকরণের চেষ্টা চলেছিল। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রাদি ভেদের দ্বারা কতকগুলি রাগকে একটি বৃহৎ পরিবারভুক্ত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল, এ কথা রাগের ইতিহাসে বলেছি। এইভাবে লিঙ্গভেদে জাতিভেদ সৃষ্টি করে রাগ-রাগিনীদের সবিশেষ কল্পনাধ্যান-প্রসূত মূর্তি আঁকা হয়েছিল। যদিও এই ধরণের জাতিবিভাগ বর্তমানে মেনে চলা হয় না, তথাচ বর্তমান যুগেও অনেকের মনে এই ধারণা সুগভীরভাবে রেখাঙ্কিত রয়ে গিয়েছে।

স্বরসংখ্যার ব্যবহার অনুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত রাগসমূহকে মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ (১) **সম্পূর্ণ**, (২) **ষাড়ব ও** (৩) **ঔড়ব**।

নীচে সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল ঃ

(১) **সম্পূর্ণ ঃ** যে সমস্ত রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই সাতটি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোন সাত স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের "সম্পূর্ণ" বলে।

(২) **ষাড়ব ঃ** যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই ছয়টি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোনও ছয়টি স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের বলে "ষাড়ব"।

(৩) **ঔড়ব ঃ** যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচটি করে স্বরের (শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোন পাঁচটি স্বরের) ব্যবহার আছে, তাদের বলে "ঔড়ব"।

একের সহিত অপরের মিশ্রণের ফলে এই তিনটি জাতি ৩ × ৩ অর্থাৎ ৯টি জাতিতে বিভক্ত হয় :—

	আরোহণ		অবরোহণ	
(১)	সম্পূর্ণ	...	সম্পূর্ণ	ভৈরবী
(২)	ষাড়ব	..	সম্পূর্ণ	জৌনপুরী
(৩)	ঔড়ব	...	সম্পূর্ণ	শ্রী
(৪)	সম্পূর্ণ	...	ষাড়ব	
(৫)	সম্পূর্ণ	...	ঔড়ব	
(৬)	ষাড়ব	...	ষাড়ব	মারোয়া, পুরিয়া
(৭)	ষাড়ব	...	ঔড়ব	
(৮)	ঔড়ব	...	ষাড়ব	নারায়ণী
(৯)	ঔড়ব	...	ঔড়ব	মালকোষ, দুর্গা, ভূপালী প্রভৃতি।

আমরা আগে বলেছি, হিন্দুস্থানী মতে প্রধানতঃ ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই তিন রকম জাতি আছে ও তাদের মিশ্রণে আরও নানা জাতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণী মতে, অর্থাৎ কর্ণাটক পদ্ধতিতে, ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ, বক্র ও সঙ্কীর্ণ এই পাচ রকম জাতি আছে ; এই পাচ জাতির মিশ্রণে আরও বহু জাতির জন্ম হয়েছে।

গ্রাম

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়জগ্রাম আদিমঃ ॥ ১৪ ॥
(সঙ্গীত-রত্নাকর)

'গ্রাম' শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ হল লোকালয়, অর্থাৎ মানুষের আশ্রয়স্থল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'গ্রাম' মানে স্বর ও মূর্চ্ছনাদের আশ্রয়স্থল।

গ্রাম দুই প্রকার : যথা—**ষড়্জ গ্রাম** ও **মধ্যম গ্রাম**। কোন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে **গান্ধার গ্রামেরও** উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরাজীতে গ্রামকে বলে **স্কেল (scale)**।

সকল গ্রামের আদি বা আদিম স্বর বিধায় দুই গ্রামের মধ্যে ষড়্জ গ্রামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মধ্যম স্বরটিকেও 'অবিলোপী স্বর' বলা হত। পুরাকালে কোন রাগেই মধ্যম স্বরটিকে বর্জন করা হত না; তাই মধ্যম স্বরের নামে "মধ্যম গ্রামটি"ও প্রচলিত হয়।

এদের স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উক্ত আছে:

পঞ্চমশ্চেন্নির্বিকারঃ ষড জগ্রাম স্তদোচ্যতে।
স্বোপান্ত শ্রুতিসংস্থোয়ং গ্রামঃ স্যান্মধ্যম স্তথা॥

—অর্থাৎ, 'প' স্বরটি নিজের চতুর্থ শ্রুতিতে থাকলে, তার আশ্রিত স্বরসমূহ ষড়্জ গ্রাম হবে, এবং পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতিতে স্থাপিত হলে তার আশ্রিত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম হবে।

গান্ধার গ্রাম: তখনকার দিনে ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামটিই প্রচলিত ছিল। গান্ধার গ্রামে পর পর অনেকগুলি ত্রিশ্রুতি ব্যবহারের নিয়ম থাকায় গান্ধার গ্রামের স্বরান্তরগুলি প্রচলিত স্বরান্তরযুক্ত স্বরসমষ্টি থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ায় তদানীন্তন সঙ্গীত সমাজে গ্রামটি ত্যাজ্য হয়েছিল। এটাই হল তার গন্ধর্বলোকে গমনের কারণ। এইভাবে গান্ধার গ্রামের মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ গ্রামটি লোপ পায়।[১]

"সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" পুস্তকে গ্রন্থকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ প্রমাণ করেছেন যে ভরতের গ্রন্থে গান্ধার গ্রামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেছেন, দত্তিল, মতঙ্গ, মকরন্দকার নারদ এই গান্ধার গ্রামের সামান্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। অতএব আমরাও এ গ্রামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। তিন গ্রামের শ্রুতিস্থান পরে চার্টে (chart) দেখান হয়েছে।[২]

বর্তমানে ষড়্জ গ্রামই একমাত্র প্রচলিত। গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম সম্পূর্ণ লুপ্ত। যে ষড়্জ গ্রাম বর্তমানে প্রচলিত সেটিকেও সঠিকভাবে ষড়্জ গ্রাম বলা

১। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বলেছেন: দ্বিশ্রুতি গান্ধার র ও ম এর এক এক শ্রুতি এবং দ্বিশ্রুতি নিষাদ ধ ও স এর এক এক শ্রুতি গ্রহণ করলে গান্ধার গ্রামের সৃষ্টি হয়।

২। আনদ্ধ বাদ্যের সুর মেলাবার পদ্ধতির আলোচনাকালে ভরত গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।

যায় না। কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রুতিস্থিত পঞ্চম স্বরের উপর নির্ভর করেই এটিকে আমরা ষড়্জ গ্রাম বলে থাকি।

গমক

"স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃচিত্তসুখাবহঃ।
তস্য ভেদাস্তু তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতস্তথা।
লীন আন্দোলিতবলিত্রিভিন্নকুরুলাহতাঃ।
উল্লাসিতঃ প্লাবিতশ্চ গুম্ফিতো মুদ্রিতস্তথা॥
নামিতোমিশ্রিতঃ পঞ্চদেশৈতে পরিকীর্তিতাঃ॥"

—সঙ্গীত-রত্নাকর।

—স্বরের এক বিশেষ ধরণের দোলনযুক্ত কম্পনকে **গমক** বলে; সঙ্গীতের এক বিশেষ ধরণের অলংকরণ বা স্বরভঙ্গী হল গমক। গমকের সময় স্বর সাময়িকভাবে স্ব-শ্রুতি থেকে সরে যায় ও স্ব-শ্রুতিতেই ফিরে আসে। শাস্ত্রে আছে, এই অলংকার ছাড়া রাগ বা গীতের যথাযথ সৌন্দর্য ফুটে উঠে না; এটি সংগীতের একটি অপরিহার্য অলংকার।

উপরের শ্লোকে আমরা উল্লেখ পাই মাত্র পনেরটি গমকের নামের। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্র মন্থন করে আমরা প্রায় ৭০।৮০ রকম গমকের নাম পাই। এদের মধ্যে অনেকগুলি আবার কেবল নামান্তরমাত্র গ্রহণ করেছে, কিন্তু কার্যতঃ তাদের প্রকাশভংগী একই। প্রাচীনকালে গমক বলতে কেবল স্বরের বিশেষ আন্দোলনকেই নয়, আকর্ষিত, স্পর্শিত ও ঘর্ষিত স্বর সকলকেও এক কথায় গমক বলা হত।

আধুনিককালে গমক বলতে আমরা বুঝি এক থেকে চার স্বরের মধ্যে আবদ্ধ বিশেষ ধরণের দোলনযুক্ত স্বরধ্বনিকেই। এখানে একটি স্বরকেই মুখ্যভাবে ধরে তার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য আগের বা পরের ২।৩টি স্বরের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ২।৩টি শ্রুতির) সাহায্য নেওয়া হয়। আলাপের সময় বা তানের সময় যখন পর পর নানা স্বরে গমকের কাজ দেখান হয়, তখন তাকে যথাক্রমে **গমকী জোড়** ও **গমকী তান** বলা হয়।

প্রাচীনকালে এদের মধ্যে যে ৫৪ প্রকার গমক প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ণানুক্রমিকভাবে (alphabetically) তাদের নাম দিচ্ছি :—

(১) অগ্রস্বস্থান	(১৯) গুম্ফিত	(৩৭) প্লাবিত বা প্লুতি
(২) অনুহতি	(২০) ঘর্ষণ	(৩৮) বলি বা বলিত
(৩) অবঘর্ষণ	(২১) চ্যাবিত	(৩৯) বিকর্ষ বা বিকর্ষণ
(৪) অহতি	(২২) ঢালু	(৪০) মিশ্র বা মিশ্রিত
(৫) আন্দোলিত	(২৩) তারাহত বা উত্তরাহত	(৪১) মুকুলিত
(৬) আস্ফালন	(২৪) তিরিপ	(৪২) মুটেয়
(৭) আহত	(২৫) ত্রিভিন্ন	(৪৩) মুদ্রা বা মুদ্রিত
(৮) আহতি	(২৬) দোলন	(৪৪) মূর্চ্ছনা
(৯) উচ্চতা	(২৭) দ্বিরাহত	(৪৫) লীন
(১০) উৎক্ষিপ্ত	(২৮) দ্রুতি	(৪৬) শান্ত
(১১) উদঘর্ষণ	(২৯) নিজতা	(৪৭) সন্নিবিষ্ট
(১২) উল্লাসিত	(৩০) নামিত বা নৈম্ন	(৪৮) স্থঢালু
(১৩) কম্পিত বা কম্প	(৩১) পরতা	(৪৯) স্পর্শ
(১৪) কর্তরী	(৩২) পীড়া	(৫০) স্ফালন
(১৫) কুরুল	(৩৩) পুনঃ স্বস্থান	(৫১) স্ফুরিত
(১৬) কৈবল্য বা কেবল	(৩৪) পূর্বাহত	(৫২) হতাহত
(১৭) খণ্ডিত	(৩৫) প্রকম্পিত	(৫৩) হুংকৃত
(১৮) গমক	(৩৬) প্রতিহতি	(৫৪) হুম্ফিত ॥

এই চতুঃপঞ্চাশৎ গমকের বিশ্লেষণ এই খণ্ডে সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র প্রচলিত ২০টির ব্যাখ্যা এখানে লিখছি।

(১) আহত—কোন স্বরধ্বনি প্রকাশ করার সময় আগের স্বরের সাহায্যে প্রকাশ করাকে **আহত গমক** বলে।

(২) আহতি—বিনা আঘাতে এক স্বর থেকে অন্য স্বর প্রকাশ করাকে **আহতি গমক** বলে।

(৩) আন্দোলন—স্বরের একবার দোলনে যে গমক দেখান হয়, তাকে **আন্দোলন গমক** বলে।

(৪) আন্দোলিত—কোন স্বরকে তার আগের বা পরের স্বরের সাহায্যে লঘুমাত্রার বেগে দোলায়িত করলে তাকে **আন্দোলিত গমক** বলে।

(৫) উৎক্ষিপ্ত—তার থেকে আঙ্গুল তুলে নিয়ে আবার তারে আঘাত করলে যে গমক হয়, তাকে **উৎক্ষিপ্ত গমক** বলে।

(৬) উল্লাসিত—ক্রমিক স্বরের মিলিত আন্দোলনজাত গমককে **উল্লাসিত গমক** বলা হয়।

(৭) কম্প—দুটি স্বরে দুটি দ্রুত আঘাত দিলে যে গমক করা হয়, তাকে **কম্প গমক** বলা হয়।

(৮) কম্পিত—এক আঘাতে দুটো স্বর অল্প দ্রুত লয়ে প্রকাশিত হলে **কম্পিত গমক** সৃষ্ট হয়।

(৯) কুরুল—পর্দার মাঝখানের তারে প্রকাশিত নানা রকমের জটিল গমকের নাম **কুরুল গমক**। [কুরুল গমক দুই রকম : (ক) মুটেয় ও (খ) মুকুলিত।] কুরুল ঈষৎ কমনীয় ধরণের হয়।

(১০) খণ্ডিত—বিভিন্ন পর্দায় দ্রুত অঙ্গুলি চালনাকে **খণ্ডিত গমক** বলে।

(১১) গমকী—পুনঃ পুনঃ স্বরের দোলনকে বলা হয় **গমকী** গমক।

(১২) ঘর্ষণ—এক স্বর থেকে তারে আঙ্গুল রেখে ঘসে অন্য স্বরে যাওয়াকে **ঘর্ষণ** গমক বলে।

(১৩) চ্যাবিত—একটি স্বরেই একটি জোরদার আঘাত দিয়ে যে গমক উৎপন্ন হয়, তার নাম **চ্যাবিত** গমক।

(১৪) তিরিপ—আবর্তনযুক্ত দ্রুত গমককে বলা হয় **অতিদ্রুত কম্পন**; দ্রুতলয়ে একমাত্রার এক চতুর্থাংশের (¼ অংশের) মধ্যে যে গমক দেখান হয়, তার নাম **তিরিপ** গমক।

(১৫) ত্রিভিন্ন—অবিশ্রাম গতিতে তিন সপ্তকে দ্রুতলয়ে কোন একটি বা কয়েকটি স্বরকে দোলনের সাহায্যে প্রকাশ করাকে বলে **ত্রিভিন্ন** গমক।

(১৬) দ্বিরাহত—এক আঘাতে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে দু'বার যাওয়া-আসা করার অপর নাম **দ্বিরাহত** গমক।

(১৭) প্লাবিত—প্লুত মাত্রায় আন্দোলনকেই **প্লাবিত** গমক বলা হয় (যদিও অনেকে বলেন যে এটি মীড়ের মতন।)

(১৮) বলি—বক্রতাযুক্ত দ্রুত জোরদার আন্দোলনকে **বলি** গমক বলা হয়।

(১৯) লীন—কোন স্বর থেকে আওয়াজ ক্রমিক গতিতে মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে মিলিয়ে যাওয়াকে **লীন** গমক বলে।

(২০) স্ফুরিত—তারে আঙ্গুল রেখে এক স্বরে এক আঘাতে দ্রুত দুটি স্বর প্রকাশ হলে তাকে **স্ফুরিত** গমক বলা হয়। (এটি অনেকটা মূর্কীর কাজের মত।)

কেবলমাত্র যে ২০টি বিশেষ গমকের বিশ্লেষণ উপরে লিপিবদ্ধ হল, তা থেকে বোঝা যায় যে তদানীন্তনকালে প্রায় সকল প্রকার অলংকারকেই এক কথায় গমক বলা হত।

তান

'তন্' ধাতু থেকেই তান শব্দটির ব্যুৎপত্তি। প্রাচীনকালে তানে স্বরের একক যোগই ব্যবহৃত হত। ছোট ছোট বিস্তার করাকেও তান বলা হত।

তখনকার দিনে চার রকমের তান ব্যবহৃত হত; যথা:—

(১) **আর্চিক** (এক স্বরের তান); (২) **গাথিক** (দুই স্বরের তান);
(৩) **সামিক** (তিন স্বরের তান); (৪) **স্বরান্তর** (চার স্বরের তান)।

মধ্যযুগেও চার রকমের তান ব্যবহৃত হত; যথা:—

(১) **শুদ্ধ** (স র গ ম প ধ ন ইত্যাদি); (২) **অলংকারিক** (স গ র স, র ম গ র ইত্যাদি); (৩) **মিশ্র** (গ র ম গ, পমধপ ইত্যাদি) ও (৪) **কূট** (স গ গ র স, প ন ন ধ প, ইত্যাদি)।

বর্তমানে তান বলতে বুঝায় কতকগুলি স্বরের দ্রুত গমনাগমন ও বিস্তার করা। আজকাল বর্ণ, অলংকার সব মিশিয়ে এক কথায় তান বলেই চলছে। এখন তানের বিশেষ নিয়ম আমরা সব সময়ে মেনে চলি না। এখন স র গ ম প ধ ন এই সাত স্বরের সব রকম সম্ভাব্য বিন্যাস ও সংযোগে যে ৫০৪০ তানের উৎপত্তি হয়, তার (ফর্মূলা) সহজ গাণিতিক সূত্র বা সঙ্কেতের কথা প্রথমে জানিয়ে পরে তানের প্রসঙ্গে আসছি।

(১)	১	= ১	
(২)	১ × ২	= ২	
(৩)	১ × ২ × ৩	= ৬	
(৪)	১ × ২ × ৩ × ৪	= ২৪	
(৫)	১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫	= ১২০	(ঔড়ব রাগের তান-সংখ্যা)
(৬)	১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬	= ৭২০	(ষাড়ব " " ")
(৭)	১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ৭	= ৫০৪০	(সাত স্বরের সম্পূর্ণ তান-সংখ্যা)

স র গ ম দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় সাধারণভাবে সূত্র দিয়ে বুঝান হয়েছে। ১, ২, ৩…ইত্যাদি সংখ্যার পরিবর্তে স র গ ইত্যাদি বসিয়ে হিসাব ধরলে সহজেই জিনিষটি (স র গ ম ভেদ) পাওয়া যাবে। এতে কোন স্বরের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না।

এখন আসল তানের কথায় ফিরে আসছি।

বর্তমানে প্রচলিত তানসমূহকে আমরা স্থূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : (১) **সরল** তান, (২) **জটিল** তান ও (৩) **অতি জটিল** তান।

(১) সরল তান—সপাট, পলট, উলট, সুঁত, আশ, কড়ক্, বিজলী, দানেদার, ছুট প্রভৃতি।

(২) জটিল তান—ফিরত, ফিরকত, উলটি, কূট, লড়ন্ত, খটকা, ঝটকা, বল, চক্র ইত্যাদি।

(৩) অতি জটিল তান—বল-পেঁচ, মূরক, রেবক, লড়ি, লড়গুথাও, ফান্দা, লড়লপেট প্রভৃতি।

এক সপাট তানের-ই ৩-৪টি প্রকারভেদ রয়েছে : যথা—সপাট, বেড়া-সপাট, বল-সপাট, টেরা-সপাট প্রভৃতি। আমাদের সংগ্রহে ৮০-৮৫ রকম তানের নাম রয়েছে। বর্তমান খণ্ডে সে সবের উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না ; কেবলমাত্র মীড়খণ্ডি, ঝালকা, লড়ি, লাড়গুথাও প্রভৃতি যে সকল তান সাধারণতঃ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, সে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল।

খণ্ডমেরু ঃ 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' উল্লিখিত খণ্ডমেরুর প্রস্তার বর্তমান কালের **মীড়খণ্ডি তান।** সপ্তস্বরের বিন্যাসে ৫০৪০ তান যে কায়দায় উদ্ভাবিত হয়েছিল, এটিও সেই সূত্রের অনুরূপ। (সূত্রটি আগে লেখা হয়েছে।) প্রাচীনকালের খণ্ডমেরু চার স্বরের প্রস্তারে বৈদিক যুগের স্বরান্তরের-ই নামান্তর মাত্র ; এটিকে দুই প্রকারে দেখাচ্ছি। প্রথম প্রকারে চারটি সারিতে 'স' ৬-টি, 'র' ৬-টি, 'গ' ৬-টি ও 'ম' ৬-টি করে দেখান হয়েছে।

	[ক] 'স'	[খ] 'র'	[গ] 'গ'	[ঘ] 'ম'
(১)	স র গ ম	র ম স গ	গ ম স র	ম গ র স
(২)	স গ র ম	র স গ ম	গ ম র স	ম স গ র
(৩)	স ম গ র	র গ স ম	গ স ম র	ম স র গ
(৪)	স গ ম র	র স ম গ	গ র ম স	ম র গ স
(৫)	স র ম গ	র ম গ স	গ স র ম	ম গ স র
(৬)	স ম র গ	র গ ম স	গ র স ম	ম র স গ

এবারে দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করা যাক। প্রথমটিতে যেমন ক-খ-গ-ঘ বিন্যাসে আরম্ভ স-র-গ-ম করে ধরা হয়েছে, এটিতে তেমনি শেষ থেকে ম-গ-র-স প্রত্যেক বিন্যাসের শেষে রাখা হয়েছে :

	[ক] 'ম'	[খ] 'গ'	[গ] 'র'	[ঘ] 'স'
(১)	স র গ ম	স র ম গ	স গ ম র	র গ ম স
(২)	র স গ ম	র স ম গ	গ স ম র	গ র ম স
(৩)	স গ র ম	স ম র গ	স ম গ র	র ম গ স
(৪)	গ স র ম	ম স র গ	ম স গ র	ম র গ স
(৫)	র গ স ম	র ম স গ	গ ম স র	গ ম র স
(৬)	গ র স ম	ম র স গ	ম গ স র	ম গ র স

দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পংক্তিতে ৬টা করে বিন্যাস রয়েছে। অতএব দেখা যায় এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ৬ × ৪ অর্থাৎ ২৪ প্রকার বিন্যাস হচ্ছে।*

এখানেও সংখ্যার সংন্যাস ও বিন্যাসের (Permutation & Combination) কায়দা অবলম্বন করা হয়েছে : যেমন—১২৩ = ১৩২, ২৩১, ২১৩, ৩১২, ৩২১, ১২৩ ; অর্থাৎ ১ × ২ × ৩ = ৬, আবার সেই একই বিন্যাসে তিনটি স্বরের কোন একটি স্বরকে দুবার করে ব্যবহার করলে পাই :

১১৩, ২২৩, ৩৩১, ৩৩২, ২২১, ১১২,
১৩১, ২৩২, ৩২৩, ৩১৩, ২১২, ১২১

প্রভৃতি ভেঙে। এই রকমে ১, ২, ৩-এর পরিবর্তে স, র, গ স্বরকে ধরে নিয়ে এই পদ্ধতিতে সাজালে আমরা 'স' 'র' 'গ' স্বরের নানা বিন্যাস পাচ্ছি।

রাগানুযায়ী স্বরের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিবেচনা করে এই সূত্র (formula) অনুযায়ী বিস্তার করলে আমাদের কাছে তান গড়া ও স্বরবিস্তার করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

হলকা বা **হালকা :** যন্ত্রে ব্যবহৃত আর এক ধরণের তানের কথা বলছি। এই ধরণের তানকে **হালকার তান** বলা হয়। হালকার তানে একটি স্বরগুচ্ছ দিয়ে একটা তানের ছন্দ রচনা করার পর সেই ছন্দের, এবং স্বরগুচ্ছের স্বরসংখ্যা একটি করে ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে এনে অন্য ছন্দ সৃষ্টি করা (এবং অনেক ক্ষেত্রে শেষের দিকে পূর্বছন্দে প্রত্যাবর্তন করা) হয়। যথা :—সঁ রঁ সঁ ন, ধ ন স ন, ধ প ম প এই তান দিয়ে আরম্ভ করে পাবে সঁ রঁ সঁ সঁ, ন সঁ ন ন, ধ ন ধ ধ,

* আসলে দুটি ক্ষেত্রের স্বর বিন্যাস একই। পৃথক ভাবে সাজান বলে আলাদা মনে হচ্ছে।

প ধ প প ; পরে আবার স্বর কমিয়ে হালকা করা যেতে পারে, যেমন—স র স, ন স ন, ধ ন ধ, প ধ প ; আরও কমানো হলে দাঁড়ায় স র, ন স, ধ ন, প ধ, ইত্যাদি।

লড়িঃ অনেকে বলেন যে "লড়াই" থেকে "লড়ি" কথাটি এসেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। লড়ি কথাটি হিন্দি "লড়" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ *। এই লড়ি কথার বঙ্গার্থ হল—পংক্তি, লহর বা মালা। স্বরের পংক্তি (line), স্বরের লহর (ঢেউ) বা স্বরের মালাকে **লড়ি** বলা হয়। যে তানে এই সব ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়, তাদেরই **লড়ির তান** বলা হয়। সাধারণতঃ স্বরের মালার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ; যথা : স র গ র গ ম গ র, গ র গ ম প ম গ র ইত্যাদি।

লড়ির তানের আরও অনেক ভেদ দেখা যায় ; যথা : 'লড়ি-লিবেত', 'লড়ি-লপেট', 'লড়ি-সপাট', 'লড়-গুথাও', 'লড়-লড়ন্তু' প্রভৃতি। যন্ত্রে লড়ির তানে নানা বোল ব্যবহার করা হয় ; লড়ির বোলের নানা ভেদের পর থেকেই 'ঝালা', 'তারপরণ' ইত্যাদি আরম্ভ করা হয়।

লড়গুথাও ঃ—হিন্দি "গুথাও" শব্দটির বঙ্গার্থ গেঁথে চলা বা গাঁথা। যেখানে স্বরের মালা পর পর গেঁথে চলা হয়, সেই ধরণের তানকে **লড়গুথাও** বলা হয়। উদাহরণ :—স র গ ম প ম গ র ; ন ধ প ম গ ম গ র ; ধ প ম গ প ম গ র ; ইত্যাদি। অবশ্য যন্ত্রে লড়গুথাও বাজাবার সময় কিছু কঠিন বোল প্রয়োগ করা হয়। লড়গুথাওতে দ্রারডা, দাড্রারডা ইত্যাদি বোল বাজাবার রীতি দেখা যায়। ঝালা বাজাবার আগেই এই ধরণের তান বাজাবার রীতি। গানের তানে ও যন্ত্রের লড়িতে কিছু প্রভেদ আছে। (সেগুলি পরে প্রকাশসাপেক্ষ রইল।) সাধারণতঃ তবলার বা পাখোয়াজের লড়ির বোলগুলিই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। (দ্বিতীয় খণ্ডে এই বোলগুলিও প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।)

গানের আলাপের সময়, ধ্রুপদ গানে বা যন্ত্রে রাগ-আলাপনে তান ব্যবহারের রীতি নাই। দ্রুত বিস্তারের সময় তানের বদলে সেখানে জোড়ের কাজ করা হয়।

* দ্রষ্টব্য : 'রাষ্ট্রভাষা পরিচয়' (নবম সংখ্যা) ; (২) শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী রচিত 'হিন্দী-বাংলা অভিধান' ; (৩) নবল-জী সম্পাদিত—'নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর' নামক হিন্দী অভিধান।

টপ্পায় একই ধরণের দানাদার তান ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র খেয়াল গানে ও যন্ত্রে গত্ বাজাবার সময় নানা ধরণের তান ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ কায়দার কয়েক প্রকার তান বিভিন্ন ঘরাণায় ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা

সঙ্গীতে ব্যবহৃত সময়ের সূক্ষ্ম স্থায়িত্ব বুঝাবার একক পরিমিত ক্ষুদ্র বিভাগ হল **মাত্রা**। সময় নির্ধারণসূচক ঘণ্টা, মিনিট প্রভৃতিকে পরিমাপ করবার জন্য যেমন ঘড়ির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি লয়কে মাপা ও তালকে বাঁধার জন্য সৃষ্ট হয়েছে মাত্রা। অপরিমেয় সময়কে পরিমাপ করার জন্য এর ব্যবহার। এই ছোট ছোট ক্ষণস্থায়ী এক একটি মাত্রার স্থায়িত্বই লয়ের মাপকাঠি। এই মাত্রার ছন্দোবদ্ধ সমষ্টিতেই আমরা তালের হদিশ পাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'মা' ধাতুর অর্থ পরিমাপ করা. এই 'মা' ধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দ হল 'মাত্রা'।

আমাদের সঙ্গীতে মাত্রার স্থায়িত্বের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ, অর্থাৎ মাপকাঠি নেই। ব্যাকরণবিদ্‌গণ এক একটি বর্ণের উচ্চারণকালকে একমাত্রা সময় বলে থাকেন। একবর্ণের উচ্চারণকাল অতি ক্ষুদ্র সময়, এই বিবেচনায় সাঙ্গীতিকেরা পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণকালকে এক মাত্রা ধরে নিলেন। এ সম্বন্ধেও আবার মতদ্বৈধ দেখা গেল; কেউ ছয়টি বর্ণের, কেউ বা চারটি বর্ণের উচ্চারণকালকে মাত্রার সময়কাল বলে স্থির করলেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রাধা-নামের ডাককে বলা হয় তিন মাত্রা। আবার বলা হয়েছে, শশীকলা, কনকরেখা ও পারিজাত এই বংশীত্রয়ের আওয়াজে যথাক্রমে গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রার সৃষ্টি হয়েছে। নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক একমাত্রা, কাকের ডাক দুই মাত্রা ও ময়ূরের ডাক তিন মাত্রা,—শাস্ত্রে এবংবিধ বর্ণনা আছে। সবশেষ বক্তব্য এই যে, একমাত্রার কাল-পরিমাণের যে সূক্ষ্ম বিভাগ আমরা শাস্ত্রপাঠে অবগত হই, সেগুলি বিভ্রান্তিকর। পণ্ডিতেরা বলেছেন **ক্ষণকাল** হল মাত্রার **প্রথম প্রাণ**; ক্ষণের সময়-নির্দেশ প্রসঙ্গে তাঁরা উপমা দিলেন যে গরুর শিং-এর উপর একটি সর্ষে রাখলে সেটি গড়িয়ে পড়তে যে সময় লাগে, সেটি হল "এক ক্ষণকাল"। ভিন্ন মতে একশোখানা পদ্মপত্র উপর-উপর একসঙ্গে সাজিয়ে একটি সূঁচ দিয়ে সেগুলি বিঁধে ফেলতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় "ক্ষণকাল" বা **কাল**।

কাজেই ক্ষণের নির্দিষ্ট সময়কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। এই ক্ষণকালকে মাত্রায় নিয়ে যেতে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করলেন তাঁরা:

৮ ক্ষণকাল = ১ লবকাল ; ৮ লব = ১ কাষ্ঠা ; ৮ কাষ্ঠা = ১ নিমেষ ; ৮ নিমেষ = ১ কলা ; ২ বা ৮ কলা = ১ ক্রুটি ; ২ ক্রুটি = ১ অনুমাত্রা ; ২ অনুমাত্রা = ১ অর্ধমাত্রা এবং ২ অর্ধমাত্রা = ১ মাত্রা।

সুস্থ ও সবল যুবাপুরুষের নাড়ীর স্বাভাবিক স্পন্দনের প্রতিটি আঘাতের গতিকে এক মাত্রার সাধারণ পরিমাপ বলে ধরা হয়েছে কোন কোন গ্রন্থে। এই মতটি আমরাও গ্রহণীয় বলে মনে করি। বর্তমানে বিজ্ঞানের দয়ায় মাত্রামান যন্ত্রে আমরা মাত্রার সময়মান নির্দিষ্ট করার সহজ পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী।

"লঘু", "গুরু" ও "প্লুত" এই তিন রকম মাত্রার ব্যবহার দেখা যায় মার্গ তালে। এতে লঘুকে ১ মাত্রা, গুরুকে ২ মাত্রা ও প্লুতকে ৩ মাত্রা ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া আরও অনেক রকম মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়:—দ্রুত অর্ধ (½) মাত্রা, অনুদ্রুত সিকি (¼) মাত্রা, কাকপদ ৪ মাত্রা ইত্যাদি। মাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার আছে, সে সমস্তই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইতি করতে বাধ্য হলাম।

ছন্দ

"স্বরজাত রাগ সম যাহার আকার।
যতি-মাত্রা সহকারে উচ্চারণ যার॥
শ্রবণ-মধুর যাহা হৃদয়-রঞ্জন।
তাহাকে কহেন ছন্দ আদি কবিগণ॥"

—(মধুসূদন বাচস্পতি কৃত 'বাংলা ছন্দমালা')

—'ছন্দ্' ধাতু থেকে ছন্দ কথাটির উৎপত্তি। সাধারণ বিচারে এর অর্থ হল 'গতি-সৌন্দর্য' ; যে কোনও গতিশীল ব্যাপারেই ছন্দ প্রয়োগ করা যায়। সঙ্গীত গতিশীল ; তাই তার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে ছন্দের। ছন্দ ব্যতীত সে চলতেই পারে না। সঙ্গীতে সীমিত লয়ের মাঝে নতুন কায়দায় নানা ধরণের স্বরাঘাত ও স্বর সঞ্চালন করে তান ও লয়ের নির্দেশ বজায় রেখে অভিনবভাবে মাত্রা ও তালের যে হেরফের করা হয়, তাকে বলে **ছন্দ**।

সাহিত্যে দেখা যায় লঘু ও গুরু মাত্রাতে ছন্দের সমাপ্তি। কিন্তু সঙ্গীতে আমরা অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুত এই পাচ রকম মাত্রা দেখতে পাই। সঙ্গীতে নানা ছন্দের তান যখন সুর ও তাল লয়ের মাধুর্যে ভরপুর হয়ে বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন সংখ্যক স্বর সমষ্টির মাত্রাগত বিভাগে গাওয়া বা বাজান হয়, তখন

শ্রোতামাত্রেই তাতে আনন্দিত হয়ে উঠেন। ছন্দবৈচিত্র্য না থাকলে সঙ্গীত একঘেয়ে হয়ে ওঠে; তাই সঙ্গীতে ছন্দ অপরিহার্য।

কাব্যের ছন্দকে ছন্দমঞ্জরীকার প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন :—অক্ষর গণনা করে যে ছন্দ বাঁধা হয়, তাকে বলেছেন **বৃত্ত**। আর লঘু-গুরু-মাত্রায় বর্ণ বাঁধা ছন্দের নাম দিয়েছেন **জাতি**। কাব্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এখানে বাদ দিচ্ছি।

বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিই ছন্দ থেকে; এক এক বিশেষ প্রকাশের মাঝে সৃষ্টির আদিপর্ব রচিত। সেই সৃষ্টি থেকে এসেছে ছন্দ; সেই ছন্দ আসন পেতেছে সঙ্গীতে। জীবধর্মের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃভাবে রয়েছে সঙ্গীত; নানা জীবজন্তুর নৃত্যের মধ্যে মানুষ সন্ধান পেয়েছিল প্রথম ছন্দের; বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা ও পরিশীলনের মাধ্যমে সে সেই সমগ্র ছন্দকে নিজস্ব করে নিতে চেষ্টা করেছে।

কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের ছন্দ কিছু ভিন্ন ধরণের; জোর করে মিলাতে চাইলেও সব সময়ে তার ঠিক মিল হয় না। আধুনিক প্রতিটি তালই কোন-না-কোন ছন্দের অধীন। অথচ সেই ছন্দগুলি আমাদের পরিচিত না ও হতে পারে; দাদরা, কাহারবা, একতাল, তিনতাল প্রভৃতি তালের অনুরূপ ছন্দ আমরা কবিতায় দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় "যখন সঘন গগন গরজে", "জীবন যখন শুকায়ে যায়", "কলকল মুখরিত মণিময় বলয়ং" ইত্যাদি। কিন্তু যখন পাঞ্জাবী-ঠেকা, ঝুমরা, সওয়ারী প্রভৃতির ছন্দবিভাগ সাধারণ্যে ব্যবহৃত ছন্দের উদাহরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, স্বভাবতঃই তখন মনে প্রশ্নের উদয় হয়—গানের ছন্দ কাব্যছন্দের অধীন কি না? অতি প্রাচীন সময়ের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তদানীন্তনকালে ভাষাসৃষ্টির পূর্বেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর সেই সঙ্গীতের নৃত্যের মাঝে মধ্যমণি ছিল ছন্দ। আমাদের মনে হয়, যেমন নৃত্য থেকে তালের সৃষ্টি, তেমনই নৃত্য থেকেই ছন্দেরও সৃষ্টি।

কাব্যছন্দের প্রধান উপাদান হল অক্ষর, মাত্রা আর যতি। এদের সুসংযত বিন্যাসে তার প্রকাশ। সঙ্গীতে মাত্রার লঘু-গুরু ভেদ ও তাদের সমষ্টিভেদে ছন্দের উদ্ভব। অক্ষরের লঘু ও গুরুর উপর কবিতার বাণী নির্ভরশীল। কবিতার বাণী ও ছন্দকে সেই এক ভাবেই এবং এক নির্দিষ্ট ছন্দে চলতে হয়। অক্ষর ও শব্দের হেরফের না হলে তাকে বদলানো যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়; সময়ের মাপকাঠি বজায় রেখে সে নানা কায়দায় নানা ছন্দ সৃষ্টি করে চলে। এটাই সঙ্গীতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য। লঘু-গুরু মাত্রা বিন্যাসে সঙ্গীতের বৈচিত্র্য

প্রকাশমান হলেও, তার মাত্রা বা ছন্দ অক্ষরের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার মুখাপেক্ষী নয়। তালের ক্ষেত্রে সে একটা নির্দিষ্ট ছন্দকে স্বীকার করে নিলেও সেই তালেরই বাদ্যে বা গীত-অলংকরণের সময় সঙ্গীত তার নির্দিষ্ট তালের নির্দিষ্ট ছন্দ মেলে চলে না। তালের সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নব নব নবীন ছন্দ সে গড়ে তোলে। কবিতার বেলায় এই ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না।

অতি প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তবে তাল সম্বন্ধে প্রামাণিক যে বই প্রথম দেখতে পাই, সেটি হল ভরতের "নাট্যশাস্ত্র"। ধ্রুবা গীতি প্রসঙ্গে ছন্দের কথায় ভরত তাঁর পুস্তকের দ্বাত্রিংশ (৩২) অধ্যায়ে বলেছেন যে ধ্রুবার পদ গঠিত হবে ছন্দে, কিন্তু গান হবে চচ্চৎপুট ইত্যাদি তালে। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে, ছন্দের যে বৃত্তিগুলি ধ্রুবাগীতিতে ব্যবহৃত হত, সেগুলি তাল নয় ; সেগুলি গীতিভাষার কাব্যিক ছন্দ। চচ্চৎপুট তালের মাত্রা বিন্যাস হল : গুরু, গুরু, লঘু, প্লুত। কাব্যিক ছন্দে আমরা পাই :

॥ ॥ । । ॥
কাঁদে ললনা
॥ ॥ । । ॥
শোকাভরণা ; এই যে ছন্দ, এ ছন্দ বর্ণগণ নয়, মাত্রাগণ ছন্দ, এর বৈশিষ্ট্য হল ছন্দযুক্ত মাত্রায় বোল-বাণীর ব্যবহার। একটা লঘু মাত্রায় পাঁচটা বা ছটা বর্ণ উচ্চারণ করতে হবে, অথবা ঐ বর্ণদের উচ্চারণকালও একটা মাত্রার স্থিতিকালেই হবে। মাত্রাগণে এ ধরণের মাত্রা সম্ভব নয় : তাছাড়া দ্বিকল ইত্যাদি হলে ছন্দের কাঠামো-পরিবর্তনও মাত্রাগণছন্দে সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রাচীনকালে তালের ছন্দ নিজস্ব পদ্ধতিতেই চলত। তদানীন্তনকালে প্রচলিত দেশী তালসমূহের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে কবিতা-ছন্দের অভাব আরও স্পষ্ট হয়। যথা, রাসতালে আছে ১ লঘু ; এর ছন্দ খুঁজে পাই না। এক লঘুতে চার বর্ণ ধরলেও দাঁড়ায় "ধ দি ঘ ন" ; এই বোলটি বারবার আবৃত্তি করে গেলে একটা ছন্দের ধারণা হয়ত আসবে। আবার দেখতে পাই : চতুর্থক তালে আছে ১ লঘু, ১ লঘু, ১ দ্রুত ; একে যদি বাণীতে বসাই, তবে 'ধিননক তক তক তিন' এই বোলটি পেতে পারি। কিন্তু কাব্যের ছন্দ এখানেও পাই না। এই সকল আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় যে তালের ছন্দ কাব্যাধীন নয়, বা কাব্য থেকে তার জন্ম নয়। কাব্যের দ্বিপদ বা চতুষ্পদ ব্যবহারকে গ্রাহ্য না করে যদি একটা পদের মাঝে আমরা ছন্দ খুঁজি, তবে তালের ছন্দের সঙ্গে একটা মোটামুটি মিল আমরা দেখতে পাব।

আমাদের গানে চৌতাল, ঝাঁপতাল, শূলতাল, ঝুমরা, তেওড়া, আড়া-চৌতাল,

তিনতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা (কহরবা) প্রভৃতি তাল-ই আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশে দাদরা ও কাহারবার কয়েকটি রূপান্তর দেখা যায়; তাদের রূপান্তরিত নাম আড়খেমটা, ঠুমরী ইত্যাদি। হিন্দুস্থানের অন্যত্র এই নামের ব্যবহার নেই; সেই কারণে আমরা এদের দাদরা ও কাহারবার রূপান্তর বলেই মনে করতে পারি। ছন্দের কথা বেশী বাড়িয়ে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না; তাই সাধারণভাবে কয়েকটি কাব্যিক ছন্দের সঙ্গে প্রচলিত তালের মিল দেখিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

তিনতালের সঙ্গে মিল দেখানোর জন্য প্রথমে আমরা বিদ্যুন্মালা ছন্দের আশ্রয় নিলাম। এই ছন্দে আছে ২টি মগন ও ২টি গুরু; কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে ৮টি গুরুর সমষ্টি দেখা যায়; যথা—

বিদ্যুন্মালা লোলান্ ভোগান্
মুক্ত্বা মুক্তৌ যত্নং কুর্যাৎ ॥

অথবা

মেঘাচ্ছন্নে চন্দ্রাদিত্যে
ভস্মাচ্ছন্নে বহ্নিজালে ॥

প্যানোৎপন্নং নিসসামান্যং সৌখ্যংভোক্তুংযত্ত্বাকাঙ্ক্ষেৎ ॥

ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা—**তিনতালের** ঢিমালয়ের এই ঠেকার মিল করা যায়। এটিকে প্রাচীন **বিন্দুমালী** তালের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। এটি **অষ্টাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ**।

এখন **মত্তা ছন্দটি** আলোচনা করা যাক। ছন্দ হিসাবে মগন, ভগন, সগন ও গুরুর সমষ্টির সঙ্গে **ঢিমা তিন তাল**-এর মিল করা যেতে পারে:

লীলা রামে কল কল কূজ ল্লোলাম্বালী শুক কল কণ্ঠে।

—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধাগে তক ধিন ধা। ইত্যাদি।

ঢিমা তিনতালের সঙ্গে **কন্যা ছন্দটির**ও মিল করা যায়। (কন্যা ছন্দেও প্রত্যেক চরণে দু'টি করে গুরুবর্ণ আছে।) উদাহরণ:

রাজা | মারে | কেবা | রাখে |

—প্রাচীন **কেন্দুমালী** তালের সঙ্গেও এর সমতা আছে। এই ছন্দটি **দুই অক্ষরবৃত্তি ছন্দ**।

তুণক ছন্দ ঃ রগণ, জগণ, রগণ, জগণ, রগণ—এদের সমষ্টি-প্রয়োগে

দেখা যায় ঃ বীর | পাল | যেন | কাল | ; মাল | সাট | মারি | ছে-এ

বার | বার | মার | মার | ; হান | হান | ডাকি | ছে-এ

ত্রাস | নাই | মান | পাই | এই | ভাব | ভাবি | ছে-এ

অথবা ঃ পঙ্ক | বাণ | বাণ | জাল | পূর্ণ | হেম | তূণ | কম্

—**একতালের** ত্রৈমাত্রিক ঠেকার সঙ্গে আমরা একে মিলাতে পারি ;

যেমন ঃ ধিন ধিন ধা | ধা থুন না | —ইত্যাদি।

—এটি পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তিছন্দ।

অথবা দাদ্রার একটি খেমটা প্রকারের সঙ্গে মিলাতে পারি ; যেমন ঃ

ধী গ্ ধা | ধা তি না | তী ক্ তা | তা তি না |

ত্বরিত গতি

মানবক ছন্দ ঃ হিসাবে ভগণ, তগণ, লঘু ও গুরুর সমষ্টি।

বার বধূ | কেলি মন্ত্রীং | বাগু | রি কাং | প্রাপ্য | জনঃ |

—এর সঙ্গে আমরা দাদ্রার মিল দেখাতে পারি ; যেমন—

ধি গ ধা | ধা তি ন্ | ইত্যাদি।

সমানিকা

বৃহতী ঃ হ্রদ তট নিকট ক্ষৌণী ভুজগ শিশু ভৃতা যা সাঁং।

চৌতাল প্রকারের সঙ্গে মিল আছে। সামগানের একটি প্রধান ছন্দ।

শশীকলা ঃ কলকল | মুখরিত | মণিময় | বলয়ং

পুলকিত | তনুঘন | মনসিজ | বিসরম্ ॥

—একে আমরা তিনতাল বা কাহারবা উভয় তালের সঙ্গেই মিলাতে পারি।

ধা ধিন্ ধিন ধা, অথবা ধাগি নাতে নাগ ধিন্।

আমরা এখানে আরও ২।১টি ছন্দের সঙ্গে তালের মিল দেখিয়ে কথা শেষ করছি।

মৌক্তিকমালা ছন্দ ঃ এর প্রয়োগ হল চার মাত্রার :

।। ।। ॥ ॥ ॥।। ॥ ।।
শশিবদনা পংক্তি কল কল কাঞ্চী কঙ্কন জালং

।।। । ॥॥ ॥ ।। ॥ ।।
মধুর বিহারং মানস চোরম্ ॥

—এর সঙ্গে আমরা কাহারবা তালের সাদৃশ্য দেখাতে পারি ; যথা :

। । । । ।। ।।
ধাগি তেটে | নক্ ধিন্ |

ভ্রাগিনী ঃ গো | রসং | চো | রয়ন্ | গো | পিকা | মন্দিরে

সতী, গজগতি সখি | বলে | সচ | কিতে |

—এর সঙ্গে মিল দেখানো যায় ঝাঁপতালের ; যথা :

ধিনা | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না |

সুমুখী ঃ প্রয়োগ হিসাবে মিশ্র ছন্দের অন্তর্গত :

মম | হৃদয়ে | সততং | স্ফুরণাং |

তনু | রতসী | কুসুম | প্রতিমা |

—আড়া চৌতালের সঙ্গে পাই এর মিল ; যথা :

ধা গে | ধা গে দিন তা | কং তাগে দিন তা |
তেটে কতা গদি ঘেনে |

ধি ন | ধা গে থু না | তে টে তা ধি | না ধি ধি না | ইত্যাদি।
ছন্দ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যার ইচ্ছা রইলো।

॥ তাল ॥

মাত্রার ছন্দোবদ্ধ নিয়মানুগ সমষ্টিকে বলে **তাল**।

তাণ্ডব নৃত্যের 'তা' ও লাস্য নৃত্যের 'লা' থেকে 'তাল' শব্দটি পাওয়া যায় এবং নৃত্য থেকেই তালের সৃষ্টি। বৈয়াকরণিকেরা বলেন, 'তল্' ধাতুতে ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন করলে 'তাল' শব্দ পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, পঞ্চানন তালের আদি স্রষ্টা : শিবের তাণ্ডবনৃত্য ও পার্বতীর লাস্যনৃত্য থেকে তালের জন্ম।

আবার শোনা যায়, সুরপতি ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্সরাদের নৃত্য থেকে তালের জন্ম। যে ভাবেই হোক্ না কেন, একথা সহজেই বুঝা যায় যে আদিম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ থেকে যে নৃত্যের উদ্ভব হত, তার বিভিন্ন ছন্দ ও গতির ফলে তালের জন্ম।

শাস্ত্রপাঠে পৌরাণিক কাহিনীতে আরও জানা যায় যে পঞ্চাননের পাঁচ মুখ থেকে পাঁচটি তালের সৃষ্টি। অমরাপুরীতে সুরমুনিগণের একান্ত নিজস্ব ছিল এই পাঁচটি তাল। বর্তমানে মর্তলোকে এই তালের প্রচলন নেই। মার্গ সঙ্গীতে চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পক্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট—এই পাঁচটিই মার্গতাল নামে প্রচলিত এবং এই পাঁচটি তালই এখন অমর্তলোকের বাসিন্দা। আমরা মনে করি এরা সমস্ত তালের জনক, যদিও মার্গ সঙ্গীতের মত এরাও আজ লুপ্ত।

স্বর্গলোকের এই তাল সকল মর্তলোকে আজও বেঁচে আছে, কেবলমাত্র মার্গ নামে ও তাদের মাত্রা সমষ্টির বিভাগে। অথচ অতীতে এমন একদিন ছিল যখন এই সমস্ত তাল-ই আমাদের ভারত-ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। সংখ্যাবাচকভাবে তিন-চারশো বা ততোধিক হতে পারে, এমন বহুসংখ্যক দেশী তালের সমুদ্ভব হল মাত্র এই পাঁচটি তাল থেকেই। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ অমরলোকবাসী। যাদের গতি ও ছন্দ আমাদের ভাল লাগে, কেবলমাত্র তারাই ব্যবহার-সৌজন্যে আমাদের মনোমাঝে প্রতিষ্ঠিত রয়ে গিয়েছে তাদের ছন্দমাধুর্যে। কালস্রোতে সবই ভেসে যায়; শুধু স্মৃতির মর্মে যারা দোলা দিয়ে চলে, তাদের ভোলা যায় না, এবং মাত্র তারাই রয়ে যায়। আজ যে সব তাল প্রচলিত, হয়তো পাঁচশো বছর পরে তাদের সবাইকে স্মরণ করতে আমরা পারবো না। ভাঙা-গড়ার চিরন্তন রীতিতে তলিয়ে যাবে পুরাতন, এগিয়ে আসবে নূতন। আমাদের এগিয়ে চল্‌তে হবে বর্তমান যুগের স্রোতে; যা সামনে পাচ্ছি, তাকে কী করে সুন্দরতর করে তোলা যায়, তারই সাধনায় লেগে পড়তে হবে। ইতিহাসকে চর্বিত চর্বণ করার জন্য বা মাত্র পরিচয়ের খাতিরে অতীতকে জানার প্রয়োজন নয়; তাকে সম্মান নিবেদন করার জন্যই তাকে জানা দরকার; কিন্তু তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। সুষ্ঠু তাললিপি না থাকায় অতীতের তালের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত তালদের মিলানো যাবে না, মিলন-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাতে কোন ক্ষতি নেই; বর্তমানকে নিয়েই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। সুদূর নীহারিকার আবরণ ভেদ করে অতীতকে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে যদি আমরা মিলাতে না পারি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের

আজ বিশেষ উপকার হবে না ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তা নিয়ে ভাবনা করা চলবে না।' গভীর দুঃখের কথা এই যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা কেহই পৃথক্‌ভাবে পারম্পর্য-অনুযায়ী সঙ্গীতের বিশদ ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস রচনা করে যাননি ; তাই বর্তমানের মধ্যে বসে অতীতের সঠিক বিবরণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেকাল ও একালের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ দুর্ভেদ্য যবনিকা ; এ যবনিকা উত্তোলন অতি কঠিন। অন্য প্রকারে বলা যায়, এই দুই কালের মধ্যে হিল্লোলিত অপার সমুদ্র ; এ সমুদ্র দুস্তর ; পারাপার হওয়া কঠিন। একমাত্রার পর আর এক মাত্রার লয়ের ব্যবধান অনতুমেয়।

তালের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের উপপাদ্য বিষয় নয়। তথাপি শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিষয় জানার কৌতূহল-উদ্দীপনার কারণে ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু বলেই এর আলোচনা করছি।

তালের দশ প্রাণ ঃ আমাদের জীবন অনন্ত, কিন্তু প্রাণ মাত্র একটি (সেটি মহাপ্রাণ)। তাল অসংখ্য, কিন্তু তার প্রাণ দশটি। তালের এই দশ প্রাণের নাম ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হল : (১) কাল, (২) মার্গ, (৩) ক্রিয়া, (৪) অঙ্গ, (৫) গ্রহ, (৬) জাতি, (৭) কলা, (৮) লয়, (৯) যতি, (১০) প্রস্তার। একে একে এদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

গান, বাজনা বা নাচের সঙ্গে তাল অপরিহার্য। সঙ্গীতে একঘেয়ে ভাব কাটিয়ে উঠার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে তালের। সঙ্গীতের যে কাণ্ডেই আপনি জ্ঞানলাভ করতে চান, আপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তালের সম্বন্ধে জ্ঞানাধিকারের। একমাত্র সেই প্রয়োজনের খাতিরেই যন্ত্রের কথা লিখতে গিয়ে আমরা শেষের দিকে তালের কথায় এসেছি। সঙ্গীতের যে কোন ভাগে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সবাগ্রে আমাদের উচিত তালের বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাল সম্বন্ধে রচনা বিস্তারিত না করে সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ হল এখানে।

(১) **কাল ঃ** মাত্রা-প্রসঙ্গে বলেছি, তালের প্রথম প্রাণ হচ্ছে **কাল,** অর্থাৎ **একক্ষণ** কাল। মাত্রার সময় নিরূপণ করা হল কালের কাজ।

(২) **মার্গ ঃ** তালের চলার পথকে (অর্থাৎ, তার বিভিন্ন গতিপথের নিয়মকে) বলা হয় **মার্গ**। শাস্ত্রোক্ত মার্গ পাঁচ প্রকার : (ক) চার মাত্রায় **বার্তিক,** (খ) দুই মাত্রায় **চিত্র,** (গ) এক মাত্রায় **ধ্রুবক,** (ঘ) আধ মাত্রায় **চিত্রতর** ও (ঙ) সিকি মাত্রায় **চিত্রতম**। এই **পঞ্চমার্গই তালের দ্বিতীয় প্রাণ।**

তালের পদ নিরূপণ ও বিভিন্ন পদাশ্রিত গতিকে তালাঘাত দিয়ে প্রদর্শন করাই মার্গগুলির আসল কাজ।

(৩) **ক্রিয়াঃ** বলা হয়েছে ক্রিয়া দ্বিবিধ : (ক) **নিঃশব্দ ক্রিয়া** ও (খ) **সশব্দ ক্রিয়া**। হাতে তালি বাজিয়ে দেখানোকে বলা হত "সশব্দ ক্রিয়া"; বিনা শব্দে ফাঁক দেখানোকে বলা হত "নিঃশব্দ ক্রিয়া"। নিঃশব্দ ক্রিয়ার নামান্তর ছিল **কলা**; এই কলা চতুর্ধা বিভক্ত : (ক ১) হাত তোলা অবস্থায়, (অর্থাৎ যে হাত উপরে রাখা হয়েছে, সেই হাতের) আঙ্গুল গুটানোকে বলা হত **আবাপ**; (ক ২) নীচে রাখা বাঁ হাতের আঙ্গুল ছড়ানোর নাম ছিল **নিষ্ক্রাম**; (ক ৩) উপরে রাখা ডান হাতের আঙ্গুল ছড়ানোকে বলা হত **বিক্ষেপ** ও (ক ৪) বাঁ হাতের আঙ্গুল গুটানোকে বলা হত **প্রবেশ**।

নিঃশব্দের নাম যেমন ছিল কলা, সশব্দের নাম তেমনি ছিল **কলাপাত*** বা **পাতকলা**।

(খ) সশব্দ ঘাত : যেমন নিঃশব্দ ছিল চার রকমের, তেমনি সশব্দও ছিল চার রকমের। যথা : (খ ১) তুড়ি দিয়ে হাত নামানোকে বলা হত **ধ্রুব**; (খ ২) ডান হাতের (পাতনকে) তালকে বলা হত **শম্পা**; (খ ৩) বাঁ হাতে তাল দেওয়ার নাম ছিল **তাল** ও (খ ৪) উভয় হাতে তাল দেওয়াকে বলা হত **সন্নিপাত**॥

তালের বিভিন্ন পদ বুঝানোর কারণে এই বিভিন্ন ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রতিচিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হত। এই **ক্রিয়াই** তালের **তৃতীয় প্রাণ**। ক্রিয়ার আরও যে আটটি বিভাগ আছে, তাদের আলোচনা বর্তমানে মুলতুবি রইলো।

(৪) **অঙ্গঃ** তালের **চতুর্থ প্রাণ** হল **অঙ্গ**। অঙ্গের অর্থ তালের মাত্রাবিভাগ। শাস্ত্রে সাত রকম মাত্রার কথা লিপিবদ্ধ আছে : (১) অণুদ্রুত, (২) দ্রুত, (৩) দ্রুত বিরাম, (৪) লঘু, (৫) লঘু বিরাম, (৬) গুরু ও (৭) প্লুত। এই সপ্ত মাত্রার গতির ব্যাখ্যায় শাস্ত্রে পাই অণুদ্রুতে দেড়, দ্রুতে তিন, লঘুতে ছয়, গুরুতে বার ও প্লুতে আঠারো আঙ্গুল দূর থেকে আঘাত করলে গতির তফাৎ বুঝা যাবে; কিন্তু এটি যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। এখানে আমরা সহজ উপায়ে বিভিন্ন নামধারী মাত্রার বিভিন্ন পরিমাণ নিম্নলিখিত-ভাবে ভেবে নিতে পারি।

* রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।

এক অক্ষর উচ্চারণকালকে, অথবা খুব তাড়াতাড়ি সময়কে, এক আঘাত ধরা হলে,—

অনুদ্রুততে	এক	আঘাত	ধরা হল	(অতি সূক্ষ্মাঘাত);
দ্রুততে	দুই	,,	,,	(সূক্ষ্মাঘাত);
দ্রুত বিরামে	তিন	,,	,,	
লঘুতে	চার	,,	,,	(পূর্ণাঘাত)
লঘু বিরামে	ছয়	,,	,,	
গুরুতে	আট	,,	,,	(পূর্ণাঘাত এবং উৎক্ষেপ)
প্লুততে	বার	,,	,,	(পূর্ণাঘাত, উৎক্ষেপ ও করভ্রমণ)

এ ভাবে ধরলে সহজে আমরা একটা হিসাব অনুমান করতে পারি। মাত্রার কথা আমরা আগে বলেছি।

(৫) **গ্রহ** : শাস্ত্রমতে গ্রহ চতুর্বিধ : **সম, অতীত, অনাগত** ও **বিষম**। যে স্বরটি থেকে রাগ আরম্ভ হয়েছে, রাগের বেলায় তাকে যেমন গ্রহস্বর বলা হয়, এখানেও ঠিক সঙ্গীতক্রিয়ার আরম্ভ স্থানকে **গ্রহ** বলা হয়। তালে সমকে স্থির স্থান ধরে ও মিলন স্থান ধরে বলা হয়েছে :

(ক) সম : সমের জায়গা থেকে গান বা গৎ ও তাল আরম্ভ করা হলে, তাকে বলা হত **সমগ্রহ**।

(খ) অতীত : গানের পর যে কোন মাত্রা থেকে তালের আরম্ভ স্থানের নাম **অতীত**।

(গ) অনাগত : তাল আগে থেকে আরম্ভ করা হলে, তাকে বলা হত **অনাগত**।

(ঘ) বিষম : অনাঘাত থেকে ধরে অসমান গতিতে চল্‌তে চল্‌তে এসে সূক্ষ্মভাবে সমে মিলানোকে বলা হত **বিষম**। (বিষম শব্দটি এখানে কঠিন অর্থে ব্যবহার হয়েছে।)

এই চার গ্রহ হল তালের **পঞ্চম প্রাণ**।

(৬) **জাতি** : শাস্ত্রে আছে জাতি পাঁচ প্রকারের : **চতুরস্র** (বা **চতস্র**), **ত্রিস্র, খণ্ড, মিশ্র** ও **সংকীর্ণ**। (পাঁচটি মার্গতালকে এখানে ত্রিস্র ও চতুরস্র জাতিতে ভাগ করা হয়েছে। চতস্রের মাঝে কেবলমাত্র চচ্চৎপুটকে ধরা হয়েছে; চাচপুটকে ত্রিস্র জাতির মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, অন্যগুলি ত্রিস্রের ভেদ। তখন আট

মাত্রায় চতস্র, ছয় মাত্রায় ত্রিস্র, দশ মাত্রায় খণ্ড, চৌদ্দ মাত্রায় মিশ্র ও আঠার মাত্রায় সংকীর্ণ জাতি কল্পনা করা হত।

এই জাতি হল তালের **ষষ্ঠ প্রাণ**।

৭। **কলা ঃ** তালের তৃতীয় প্রাণ ক্রিয়ার কথায় বলেছি যে নিঃশব্দ ক্রিয়াকে **কলা** বলা হত; আবার 'কলা' বলতে বিলম্বিত লয়ও বুঝাত। শাস্ত্রমতে কলা অষ্ট প্রকারের। "সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থে যে আটটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, অনেকে সেই অষ্টক্রিয়াকে **অষ্টকলা*** বলে থাকেন :—

(৵০) শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হলে মাত্রার নাম **ধ্রুবকা**;
(৶০) বামদিক-গামিনী মাত্রার নাম **সর্পিনী**;
(৷৵০) দক্ষিণ " " " **কৃষ্ণা**;
(।০) অধোগতি " " **পদ্মিনী**;
(।৵০) বহির্গতা " " **বিসর্জিতা**;
(।৶০) কুঞ্চিতা " " **বিক্ষিপ্তা**;
(।৷৵০) ঊর্দ্ধগামিনী " " **আয়তা বা পতাকা**;
(॥০) হস্তপাতন " " **পতাকা বা পতিতা**॥

—এই কলাকে বলা হয় তালের **সপ্তম প্রাণ**।

"সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ)" গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠায় কলা সম্বন্ধে ভরতের উক্তির ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন :—"নিঃশব্দ ক্রিয়াকেই কলা বলে; সেই কলা আবাপাদি ভেদে চার রকম। আবার **মানকেও** অনেক সময় কলা বলে। চিত্রা, বার্ত্তিক ও দক্ষিণাভেদে কলা আবার তিন রকম। অনেকে ধ্রুবকলা স্বীকার করে কলা চার রকমও বলেন।"

আবাপ, নিষ্ক্রাম প্রভৃতি ক্রিয়াকে যখন আমরা ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে ধরেছি, তখন কলা-অর্থে বাজাবার একটি বিশেষ কায়দা বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

৮। **লয় ঃ** তাল, মাত্রা এবং নানা ছন্দকে সমভাবে সুনিবদ্ধ করার উপযুক্ত নির্দিষ্টকালের অবিচ্ছেদ্য গতির সমতাকে বলে **লয়**।

সঙ্গীতে ৩।৪ প্রকার লয়ের ব্যবহার আছে : (১) **বিলম্বিত**, (২) **মধ্য**,

* **দ্রষ্টব্য ঃ** রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত "সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা" গ্রন্থে উপরিলিখিত আট প্রকার ক্রিয়াকে কলা বলা হয়েছে।

(৩) **দ্রুত**—এই তিন প্রকার লয় চিরাচরিতভাবে প্রচলিত। তবে বর্তমানে (৪) **অতিদ্রুত** লয় বলে আর এক প্রকার লয় চালু হয়েছে; একে শুধু মাত্র দ্রুতলয় বলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আবার **অতিবিলম্বিত** নামক এক লয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে গানে; "বিলম্বিত" বলে একে অভিহিত করে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। এই হিসাবে লয়ের গতি অনেক রকমের হতে পারে। তবে সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সহজে বুঝাবার জন্য লয়কে মাত্র তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

বর্তমান যুগ হল অতিদ্রুত গতির যুগ; প্রতিটি যান-বাহনের বেলায় বা জীবনের অন্যান্য প্রতি পদক্ষেপেই গতি একমাত্র প্রাণ, গতির গুরুত্বেই তার মান। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে যন্ত্রে, অতিদ্রুত লয়ের প্রচলন হয়েছে। এই অতি-দ্রুত গতির গত্‌গুলির বাঁধনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারবো এর বাঁধনে কঠিন বোলের চিহ্নমাত্র নেই। কোন কঠিন বোল, এমন কি ডার্, ডেরে প্রভৃতি বোলও এর রচনায় বাদ দিয়ে চলা হয়। আমাদের লয়ের মাপকাঠি হল মাত্রা, একথা আগেই বলেছি। মাত্রার বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ না থাকায় আমাদের বিলম্বিত, দ্রুত প্রভৃতিরও কোনও নির্দিষ্ট সময়মান আমরা দিতে পারি না। (এ কথা 'মাত্রা' লেখার ক্ষেত্রে বলেছি।) বাজারে প্রচলিত নিয়মকে ধরে নির্দিষ্ট ধারায় আমাদের চলতে হবে এগিয়ে। প্রয়োজনবোধে লয়ের বাঁধনের বিভেদকরণে "মেট্রোনোমে"র সাহায্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শাস্ত্রমতে দ্রুতলয়ের দ্বিগুণ ঠায়ে (নিম্নগতিতে) মধ্য ও মধ্যলয়ের দ্বিগুণ ঠায়ে বিলম্বিত। কিন্তু এই মতানুসারী হলেও লয়ের হিসাব আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। এই লয়কে বলা হয় তালের **অষ্টম প্রাণ**।

(৯) **যতি**ঃ লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে বলা হয় **যতি**। লয়গতিকে নিয়ন্ত্রিত করাই হল যতির কাজ। ভরতের কালে হাতের তিন রকম সংযোগকে "যতি" বলা হত; তাদের নাম ছিলঃ **রাদ্ধ, বিদ্ধ** ও **শয্যাগত**।

পরবর্তীকালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যতির সংখ্যা পাঁচ ঃ—

(ক) **সমা**ঃ আদি, মধ্য ও অবসানে একই গতিকে বলা হত "সমা";

(খ) **স্রোতোগতা** (বা **সরিৎ**)ঃ প্রথমে মধ্য, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষে দ্রুত গতির নামান্তর ছিল স্রোতোগতা বা সরিৎ।

(গ) অন্ত্যা : প্রথমে দ্রুত, মধ্যে বিলম্বিত ও শেষে দ্রুত গতিকে বলা হত "অন্ত্যা"।

(ঘ) পিপীলিকা : প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে দ্রুত গতির নাম ছিল "পিপীলিকা"।

(ঙ) গোপুচ্ছা : প্রথমে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্যলয় ও শেষে দ্রুত গতির নামান্তর ছিল "গোপুচ্ছা"।

অধুনা-প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে এর মিল দেখা যায় না। এই যতিই হল তালের **নবম প্রাণ**।

(১০) **প্রস্তার**—ক্রিয়াদির অঙ্গের নানা ছন্দের ব্যবহারের নামান্তর **প্রস্তার**। তালাশ্রিত বোলের বিস্তার করাকে বলতো প্রস্তার। প্রস্তার তালের দশম প্রাণ।

গণ ঃ ছন্দের কথায় আমরা গণের নাম করেছি, কিন্তু গণের মাত্রা ও ছন্দ বিভাগের কথা বলিনি। গণের দুইটি বিভাগ (১) বর্ণ গণ (২) মাত্রা গণ। যথা :

বর্ণ গণ	**মাত্রা গণ** (ক) (খ) (গ) তিন ভাগে বিভক্ত
নগণ = ৩ লঘু—বিজয়	দগণ = ২ মাত্রা S
মগণ = ৩ গুরু—কেদারী	তগণ=৩ " S I
জগণ = মধ্য গুরু—মহেশ	চগণ=৪ " S S
তগণ=শেষ লঘু—আলাপ	পগণ = ৫ " S S I
যগণ = প্রথম লঘু—ভবানী	ছগণ = ৬ " S S S
রগণ = মধ্য লঘু—মালবী	
ভগণ=প্রথম গুরু—আসন	
সগণ=শেষ গুরু—কমলা	

(ক) **রতিগণ**	(খ) **কামগণ**	(গ) **বাণগণ**
অত্যুক্তা	**ত্রিবর্ণ মধ্যা**	**প্রতিষ্ঠা**
(১) ২+২ মাত্রা SS	(১) ২+২+২=SSS	(১) SSSS, ISSS, SISS
(২) ১+২ " IS	(২) ১+২+২=ISS	(২) IISS, SSIS, ISIS
(৩) ২+১ " SI	(৩) ২+১+২=SIS	(৩) SIIS, IIIS, SIII
(৪) ১+১ " II	(৪) ১+১+২=IIS	(৪) ISSI, SISI IISI
	(৫) ২+২+১=SSI	(৫) SSII ISII SIII
	(৬) ১+২+১=ISI	(৬) IIII ইত্যাদি।
	(৭) ২+১+১=SII	
	(৮) ১+১+১=III	

সংগীতে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ পরিভাষার পরিচয়

অনুলোম বা আরোহী ক্রম : অর্থ—স্বরের ঊর্দ্ধগতি, স্বরের ওঠা বা চড়া, স্বরের আরোহণ (যেমন : স র গ ম প ধ ন র্স ইত্যাদি)।

বিলোম বা অবরোহী ক্রম : অর্থ—স্বরের নিম্নগতি, নেমে আসা ; স্বরের অবরোহণ (যেমন : র্স ন ধ প ম গ র স ইত্যাদি)।

আশ বা **আঁশ (ঘর্ষণ) :** মেজরাব দিয়ে এক আঘাত করার পর সেই আঘাতের অনুরণন থাকতে থাকতে বাঁ হাতে আঙ্গুলের ঘর্ষণে এক, দুই বা তিন পর্দায় ক্রমান্বয়ে এক বা ততোধিক স্বরধ্বনি-প্রকাশ করাকে **আঁশ** বলা হয়। ছড়ের যন্ত্রে এক ছড়ের টানের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। যন্ত্র-সংগীতের এটি এক অবিচ্ছেদ্য অলংকার। আঁশে মধ্যবর্তী স্বরগুলি পর পর প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

সূত বা **সূঁত** বা **ঘষিট :** প্রকৃতপক্ষে আঁশ ও সূঁত একই ধরণের কাজ। পর্দাযুক্ত যন্ত্রের বেলায় আঁশ কথাটি প্রযুক্ত হয়, আর পর্দাহীন যন্ত্রের বেলায় সূঁত কথাটি ব্যবহৃত হয়। মেজরাব দিয়ে বাজানো যন্ত্রে আঁশের কাজটিকে **ঘষিট**-ও বলা হয়; ঘষিট-কে "সংগীত-রত্নাকর" গ্রন্থে বলা হয়েছে **খশিত**। যাঁরা বলেন ঘষিটে মাঝের স্বরগুলি প্রকাশ পাবে না, তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। আঁশ, সূঁত বা ঘষিট—এই তিনটি কাজের বেলাতেই তারকে পর্দার উপর দিয়ে ঘষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনটি কাজের বেলাতেই মাঝের স্বরগুলি প্রকাশিত থাকা উচিত।

মীড় : বীণা, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে ডান হাতে তারের উপর মেজরাবের ঘা মেরে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে তার টেনে পরের যে কোন স্বরে বা তার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছানোকে **মীড়** (টানা) বলা হয়। মীড়ে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়ার সময় মাঝের স্বরগুলিকে প্রকাশ করা হয় না। ঠিক জলের ঢেউ-এর মত এক স্বর থেকে গোলভাবে তুলে অন্য স্বরে গড়িয়ে পড়া হয়। এতে প্রথমে উচ্চারিত স্বরধ্বনির রেশ থাকতে থাকতে পরের স্বরে পৌছাতে হয়।

অনুলোম মীড় : ঠোকের যন্ত্রে কোন স্বর থেকে এক আঘাতে তার টেনে, এবং ছড়ের যন্ত্রে বা পর্দাবিহীন যন্ত্রে আলগাভাবে ঘষে তার পরের যে কোন চড়ার স্বরে পৌছানকে, **অনুলোম মীড়** বলা হয়।

বিলোম মীড়ঃ কোন এক স্বর থেকে তার নীচের যে কোন স্বরে (নিম্নস্বরে) নেমে আসাকে **বিলোম মীড়** বলে। (যে স্বর থেকে মীড়টি টানা হবে, আঘাত না দিয়ে আগে সেই নির্দিষ্ট স্বরে তারটিকে টেনে পরে আঘাত দিলে তবেই এই কাজটি সম্পন্ন হবে।) অনেকে এটিকে **উল্টো মীড়** বলেন।

কায়দাঃ যন্ত্রে গৎ বাজানর পর গতের মূল স্বরগুলি যে বাণী (অর্থে বোল) দিয়ে বাজান হয়, সেই বোলগুলি বদলে সেই স্বরগুলি ডেরে ডেরে ডেরে ডা, ডা ডেরে প্রভৃতি বোল দিয়ে বাজান হলে এবং সময়ে মুরকী প্রভৃতি নানা রকম ছোট ছোট কাজ দেখান হলে, তাকে **কায়দা** বলা হয়। বলা বাহুল্য, উপরিলিখিত বোলগুলি স্বরাশ্রিত মাত্রার সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ বাদিত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেতার যন্ত্রেই এই কায়দা বাজান হয়। ছড়ের যন্ত্রে কায়দাটি ঈষৎ ভিন্ন ভাবে স্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যবহারেই প্রকাশ করা হয়। (তবলার বিষয়ে আলোচনাকালে তবলার কায়দার কথা আলাদাভাবে লেখা হবে।)

জমজমাঃ (এই কাজ বাজনাতেই বিশেষভাবে দেখান হয়।) কোন পর্দায় তর্জনী রেখে এক আঘাতের মধ্যে তার পরের স্বরে মধ্যমা দিয়ে তাড়াতাড়ি আঘাত করে আওয়াজ বার করাকে **জমজমার কাজ** বলা হয়। প্রথম আঘাতটি মেজরাব বা জওয়া দিয়ে করতে হয় এবং মাঝের আঙ্গুল জোর করে পর্দার উপর ফেলে পরের আঘাত বার করতে হয়। অর্থাৎ সুরের রেশ থাকতে থাকতে মাঝের আঙ্গুলে পর পর আঘাত করে একটা ঘা দিয়েই কাজটা শেষ করতে হয়। টপ্পার মত দানাদার তানের কাজকে গানে "জমজমার কাজ" বলা হয়। জমজমা শব্দের তিনটি অর্থ। (১) কাকু—স্বরের বৈচিত্র্যময় সঞ্চার। (২) গান (৩) চড়াই পাখির ডাকের মত শব্দ।

চপকঃ মাঝের আঙ্গুলটা দিয়ে তার চেপে স্বরোদ, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি বাজনাতে পটরিতে বা প্লেটের উপর ঘা দিয়ে যে আওয়াজ বা বোল বার করা হয়, তাকে **চপক** বলে।

স্থায়ঃ গান বা বাজনায় রাগের বিস্তারে যে ছোট ছোট রাগরূপ প্রকাশক স্বরগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাকে **স্থায়** বলে।

কৃন্তনঃ এক পর্দার উপর আঙ্গুল রেখে তার পরের কোন পর্দায় মাঝের

আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অল্প চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাপা তার পিছলে কেটে নেওয়াকে **কৃন্তন** আখ্যা দেওয়া হয়। ছড়ের যন্ত্রে এই সকল কাজ এক ছড়ের টানের মধ্যেই করা হয়।

স্পর্শ-কৃন্তন ঃ উপরিলিখিত পদ্ধতিতে মাঝের আঙ্গুল (মধ্যমা) পরের পর্দায় জোরে ফেলে সেই পর্দার স্বরধ্বনিটি প্রকাশিত হওয়ার পর (তারটি থেকে) কৃন্তনের কায়দায় পিছলে কেটে নিলে তর্জনীর টিপে যে স্বরটি ধরা আছে, তৎপ্রকাশকে **স্পর্শ-কৃন্তন** বলে।

খণক ঃ সেতারে কৃন্তনের কাজের পর তার থেকে ছোট যে ক্লীং-জাতীয় এক প্রকার শব্দ বের হয়, তাকে **খণক** বলা হয়। (শব্দটি উর্দু।)

বিক্ষেপ ঃ কোন পর্দায় বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার চেপে ধরে ডান হাতে সেই তারে একটি ঘা দিয়ে, সেই আঘাতের রেশ থাকৃতে থাকৃতে বাঁ হাত দিয়ে চাপা আঙ্গুল দিয়ে দু-তিন পর্দা ঘষে নেমে যাওয়াকে **বিক্ষেপ** বলা হয়।

প্রক্ষেপ ঃ প্রক্ষেপের বেলায় পদ্ধতি ঠিক উল্টো ; উপরিলিখিতভাবে নিম্ন স্বরে নেমে আসা হয়। (উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাঝের স্বরগুলি প্রায় অপ্রকাশিতই থাকে। যে স্বরে ঘা দেওয়া হয় ও যে স্বরে এসে শেষ করা হয়, সেই দুটি স্বরই বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে।)

মূর্কী বা **মুরকী ঃ** কেউ কেউ একে "মূড়কী" বলে থাকেন, সেটি ঠিক নয়। মূর্কী শব্দটিই ঠিক। কোন স্বরে দাঁড়িয়ে, এক ছড়ের টানে বা এক আঘাতের মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে, মীড় না টেনে, আঙ্গুলের কায়দায় নির্দিষ্ট স্বরটি এবং তার উপরের ও নীচের স্বর নিয়ে (অর্থাৎ তিনটি স্বর একসঙ্গে) প্রকাশ করা হলে তাকে **মূর্কী** বলা হয়। উদাহরণ: 'গ' ও 'ম'-এ পর পর তর্জনী ও মধ্যমা রেখে ঘা-এর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা তুলে নিয়ে তর্জনীকে 'র'-তে এনে 'ম-গ-র' বা ঐভাবে র-স-ন ইত্যাদি করা হয়।

খটকা ঃ উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্বর থেকে উপর-নীচে চার স্বরের প্রয়োগকে **খটকা** বলে।

কণ্ ও **স্পর্শ ঃ** কোন স্বর প্রকাশকালে যখন তার আগের বা পরের কোন স্বর ছুঁয়ে অর্থাৎ স্পর্শ করে প্রধান স্বরটি প্রকাশ করা হয়, তখন সেই অল্পস্পৃষ্ট স্বরগুলিকে **কণ্** বলা হয় (অনেকে এদেরকে **স্পর্শ স্বরও** বলে থাকেন।) তর্জনী দিয়ে কোন পর্দায় তার চেপে রেখে মধ্যমা দিয়ে তার পরের পর্দা

আলগাভাবে ক্ষণকালের জন্য ছোঁয়াকে **স্পর্শ** বলে। কণ্ ও স্পর্শ দুটি শব্দের অর্থই এক। রাগের মাধুর্য বাড়ানো বা রাগরূপের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার কারণেই এর ব্যবহার।

ছুট ঃ একটি স্বর প্রকাশ করে সেই স্বরের রেশ থাক্‌তে থাক্‌তে, খাদে বা চড়ায় তার সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট বা দূরবর্তী কোন স্বরের দ্রুত প্রকাশকে **ছুট** বলা হয়।

পুকার ঃ উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় এক বা ততোধিক স্বরকে বিভিন্ন সপ্তকে প্রদর্শন করাকে **পুকার** বলা হয়। (আমাদের কাছে অযৌক্তিক বিবেচিত হলেও অনেকে পুকার-কে "লাগডাঁট বলেন।)

লাগডাঁট ঃ শুদ্ধ ভাষায় একে "লগ্নদণ্ড" বলা হয়। সুরের জমজমাট ভাব প্রদর্শনকে বলে **লাগডাঁট**। নানা স্বরের ব্যবহার ও তাদের মিলিত স্বরধ্বনিগুলি এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য মধুর সুরধ্বনিতে প্রকাশিত হলে বা কোন রাগের রাগবাচক স্বরের বহুল প্রয়োগে যে মধুর সুরের জমজমাট ভাব প্রকাশ পায় তাকে "লাগডাঁট" বলা হয়। লাগডাঁট ভাল হলে গান-বাজনা জমে এবং প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। (আমাদের কাছে বেঠিক মনে হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেকে আরোহণের ঘষিট মীড়কে "লাগ" এবং অবরোহণের ঘষিট মীড়কে "ডাঁট" বলেন।) একই স্বরগুচ্ছকে বিভিন্ন সপ্তকে অতিদ্রুত বাজনাকেও লাগডাঁট বলা হয়। যদিও প্রাচীন মত অনুসারে লাগডাঁটের অর্থ এরূপ হয় কিন্তু আমাদের কাছে এটি সমীচীন বলে বিবেচিত হয় না। ফিরোজ ফ্রেমজীর মতে শব্দটি **লাগডাট**। লাগ অর্থে পারম্পর্য ও ডাট অর্থে—বক্রতা বা বাধা। দু-এ মিলে লাগডাটের অর্থ দাঁড়ায়, পারম্পর্য ও পারম্পর্যহীনতার সুষ্ঠু আলংকারিক প্রয়োগে মাধুর্যময় রচনা।

কর্তব ঃ (শুদ্ধ ভাষায় এটিকে "কর্তব্য" বলা হয়।) কোন রাগে নানা ভাবে কৌশল করে স্বরবৈচিত্র্য দেখানকে **কর্তব** বলা হয়।

দম ও খম ঃ বহুক্ষণ এক দমে এক স্বরধ্বনিকে ধরে রাখাকে **দম** বলে। লয়ের সঙ্গে সুরের অল্প অল্প বিরাম প্রদর্শনের নামান্তর **খম**। এই ধরণের কাজ দেখানোকে **দম-খমের কাজ** বলে। যন্ত্র সঙ্গীতে ছড়ের সাহায্যে দমের কাজ দেখানো হয়।

বিড়ার বা বিটাড় বা বিঢ়ার ঃ (একে কেউ কেউ "বিঢ়ারের কাজ"-ও

বলে থাকেন।) এই কাজ দেখাতে কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়; রাগের উপর ভাল দখল না থাকলে পারম্পর্য-বহির্ভূত অস্বাভাবিক স্বরসঙ্গতি দেখান কঠিন। সাধারণতঃ আলাপের সময় মধ্‌জোড়ের কাজেই এর ব্যবহার দেখা যায়। যে রাগ নিয়ে এই বিস্তারের কাজ করা হয়, সে রাগটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না; অথচ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেই রাগের-ই কয়েকটা স্বর নিয়ে কাজটা দেখান হচ্ছে।

বিদারী: বিঢ়ারের কাজকে "বিদারী" বলা ঠিক নয়। আমরা জানি, আলাপে ন্যাস ও অপন্যাস স্বরের ব্যবহারের সময় যে স্বরে একটি খণ্ড স্বর-বিন্যাসের সমাপ্তি ঘটে, তা'কেই **বিদারী** বলা হয়। এটি বিডাব বা বিঢ়াড থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

আন্দোলন: স্বরটির আগের ও পরের শ্রুতির ছায়ায় ধীরে ধীরে আন্দোলিত করাকে **দোলন** বা **আন্দোলন** বলে। এই আন্দোলন এক স্বরের উপর অতিদ্রুত ভাবে করা হলে এটিও "কম্পন" হয়ে যায়। গমকের* ক্ষেত্রে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ২।৩ শ্রুতি বা ২।৩ স্বরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়।

কম্পন: কোন স্বরধ্বনিকে সেই স্বরের পর্দায় আঙ্গুল রেখে কাঁপানো হলে তাকে **কম্পন** বলে।

ধুয়া: গত বা গানের স্থায়ী অংশটির নামান্তর "ধুয়া"। **ধুয়ার কাজ** বলতে অস্থায়ীর কাজকেই বুঝায়। (গতের স্থায়ী অংশে যে কায়দা বাজানো হয়, অনেকে তাকেও "ধুয়ার কাজ" বলেন।) আবার মেন (main) অর্থাৎ প্রধান তারে কাজ করার সঙ্গে চিকারীর তারে লড়ি ইত্যাদি বাজালে অনেকে তাকেও "ধুয়ার কাজ" বলে থাকেন। ধুয়া "সঙ্গীত-রত্নাকর"-এর ধ্রুব-র নামান্তর।

মাঠা: প্রধান তারে ও চিকারীর তারে যদি পর্যায়ক্রমে তানের মালা ও ঝালার হেরফের রচনা করা যায়, তাকে বলা হয় **মাঠার কাজ**। মাঠা "সঙ্গীত-রত্নাকর"-এর **মণ্ঠ**-র নামান্তর।

পরমাঠা: বর্তমানে যন্ত্রে এই ধরণের কাজ করা হয় না। অনেকের ধারণা "সঙ্গীত-রত্নাকর"-আখ্যাত **প্রতিমণ্ঠ** থেকেই এর উদ্ভব। তারপরণের কাজের সময় মধ্যমের তারে তালের ছন্দ (অর্থাৎ পরণের) কিছুটা বাজিয়ে

---

* "গমক" দ্রষ্টব্য।

চিকারীর কাজ দিয়ে পরণের সমগ্রটা শেষ করাকে **পরমাঠা** বলা হত। এই ধরণের কাজ বর্তমানে কচিৎ শোনা যায়।

পদবিদারী বা **মুখ ঃ** রাগ-আলাপের সময় প্রতি কলির শেষে যে স্থায়ী অঙ্গটি বাজানো হয়, অনেকে তাকেই বলেন **মুখ**। এটা **মোহড়া** নামে পরিচিত। মোহড়া বলতে আমরা তবলার ফাঁক থেকে বাজানো ছোট ছোট টোকরাকে বুঝি। তবলার মোহড়াকে যদি "মোহড়া" বা "মোড়া" বলা হয় ও আলাপের মুখকে যদি "মুখড়া" বলা হয়, তবে কোন গোলমাল থাকে না। গানে অথবা গতে বিস্তার করার পর স্থায়ী তুকে ফিরে আসা (অর্থাৎ গান বা গতের ধরার জায়গায়, অর্থাৎ মুখে ফিরে আসার জায়গাটিকেও) "মুখ" বলা হয়।

গৎ বা গত্ ঃ নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্দি অভিধানে গত শব্দটির অর্থে লেখা হয়েছে : (১) 'বাজোঁকে কুছ বোলোঁ কা ক্রমবদ্ধ মিলান।' (২) 'নাচনে কা এক ঢংগ।' গত শব্দটিকে অনেকে হিন্দি বা পারসিক শব্দ বলেন। কিন্তু আসলে সংস্কৃত গতি শব্দ থেকেই গতের উৎপত্তি। রাগাশ্রিত স্বরের কোন একটি তালে বাঁধা ছন্দবদ্ধ স্বর-সমষ্টিকে গত বলা হয়। এই গতকে শুদ্ধ ভাষায় **স্বর-নিবন্ধনী** বলা হয়। গতে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রে বাদনোপযোগী বাণী অর্থে বিভিন্ন ধরণের কাল্পনিক বোল ব্যবহার করা হয়। এসরাজ, বেহালা, সারেঙ্গী প্রভৃতি ধনুযন্ত্রে বাদিত গতকে অনেকে "**লেহারা**" বলেন। তাঁদের মতে লেহারা শব্দটি পারসিক শব্দ। গত সব সময়ে তালের সঙ্গে চলে। তাল-বাদ্য তার লয় বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য প্রাধান্য পেলেও বাদ্যটি থাকে অধীন হয়ে। ভরতের প্রকৃতি বা গত-এর তিনটি অবস্থাকে **ত্রিগত** বলা হত। কাজেই গৎ গত-এর বিবর্তন হতে পারে।

অনেকের ধারণা বোলহীন গৎ, গৎ পর্যায়ভুক্ত নয়। কথাটি বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমস্ত বাদ্য যন্ত্রের গতের ক্ষেত্রে খাটে না। ধনুর্যন্ত্রে বাদিত অথবা হারমোনিয়মাদি যন্ত্রে বাদিত অধিকাংশ গতেই কোন কাল্পনিক বোল অর্থে বাণী ব্যবহার করা হয় না অথচ তাদের গত বলা হয়। সেতারাদি যন্ত্রে মসীদখানি ও রেজাখানি গত প্রচলিত হবার আগেও ধ্রুপদের ও খেয়ালের তুকের অনুকরণে গত বাজান হত ও তরানার অনুকরণে অতি দ্রুত গতও বাজান হত। সেতারের গত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু তুকের (তুক অর্থে চরণ বা বিভাগ) হত। (১) স্থায়ী ও (২) অন্তরা। স্থায়ী বিভাগের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভোগাভোগ

যুক্ত হত। মসিদখানি ও রেজাখানি গতেও আমরা এ নিয়ম দেখতে পাই। বর্তমানে মসিদখানি ষ্টাইলের সেতারের গতে স্থায়ী ও অন্তরার মাঝে মান্ঝা বা মাঞ্ঝা নামে একটি তুক দেখতে পাই। স্থায়ীর দীর্ঘত্ব কমানোর কারণেই এর প্রচলন বলে আমাদের ধারণা। এটা প্রাচীনকালের মেলাপকের কায়দায় রচিত। দুই বা তিন আবৃত্তির অথবা তিন চার সমযুক্ত গত আজকাল কচিৎ কাউকে বাজাতে শোনা যায়। কিছু দিন আগেও দেড়মুখী গৎ, আড়াইমুখী গত, আস্থায়ীর গত প্রভৃতি নানা ধরণের গত বাজান হত, আজকে সে সব কম শোনা যায়। সাজ্জাদ মহম্মদ, গোলাম মহম্মদ, প্যার খাঁ প্রভৃতির রচিত বা বাদিত গতে এই লম্বা বড় মুখের গতের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে রেজাখানি গতে বোল বেশী থাকায় অতিদ্রুত বাজান অসুবিধা হওয়ায় অনেকে বোল কম করে দিয়ে অতিদ্রুত গত বাজান। বর্তমানে তুনী গতের ষ্টাইল আগেকার ফিরোজখানি গতের নকল বলা যায়।

পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতির ঠেকা ও ঠেকার কায়দাকেও অনেকে গৎ বলেন। নাচের বিশেষ কায়দা বা বোলের উপর নাচকে অথবা বোল বাতলানকেও গত বলা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে গতের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত-ভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

তোড়া ঃ তানের নামান্তর। যন্ত্র সঙ্গীতে গৎ বাজাবার সময় স্থায়ী বা অন্তরা অথবা বিস্তারের সময় যে সব বোলদার তান বাজান হয় তাদের তোড়া বলে।

জরব ঃ কোন যন্ত্রে আঘাতজাত বোলকে জরব বলা হয়।

ছেড় ঃ হিন্দী ছেড়্না শব্দের অপভ্রংশ ছেড়। নায়কীর তারে (মেন তারে বা বাজের তারে) আঘাতে কোন স্বর প্রকাশের পর, সেই স্বরের দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনির সময়ের মধ্যে চিকারীর তারে ধ্বনি উৎপাদন অর্থাৎ আঘাত করাকে ছেড় বা ছেড়-বাদন বলা হয়।

উপজ ঃ রাগানুযায়ী ছোট ছোট তান করাকে উপজ বা উপেজ বলা হয়। গান বা গত আরম্ভ করার পরই উপজ বা উপেজ বাজাইবার রীতি। উপজের পরে গান বা গতের অস্থায়ীতে ফিরে আসার নিয়ম আছে।

মাতু ঃ গানের ভাষার নাম মাতু।

ধাতু ঃ (১) গানের স্বর ও শ্রুতি বা সুর। (২) গানে বা গতের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিটি অঙ্গকেও আলাদা আলাদা ভাবে ধাতু বলা হয়, অর্থা· প্রতিটি অঙ্গই এক একটি ধাতু।

তুক : গানের বা গতের এক একটি কলি অর্থে এক একটি অংশ বা চরণকে তুক বলে। ধাতু ও তুক দুইটিই প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বোল : বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের আঘাতের তারতম্য অর্থে বিভিন্নতা বোঝাবার জন্যে যে কাল্পনিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারই নাম **বোল**।

বাঁট বা **বাট :** বণ্টন শব্দ থেকেই বাট কথাটি এসেছে, অর্থ ভাগ করা। গানের ভাষা বা গতের বাণীকে দু-এক ফেরের মাঝে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে তালের মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার নাম **বাট**। বলা বাহুল্য বাটের সময় মাত্রার হেরফের করা হলেও লয়কে একভাবে রাখা হয়।

আবর্ত্ত : কোন তালের সম থেকে আরম্ভ করে পরের সম পর্যন্ত গ্রহণ করে একটা পূর্ণমঞ্চকে এক **আবর্ত্ত** বলা হয়। কোন তালের যেখান থেকে (অর্থাৎ যে মাত্রা বা তাল) কোন গত্ বা গান আরম্ভ করা হয়, একটি পূর্ণ তালের মাত্রা সমষ্টির মধ্যে সেখানে ফিরে আসাকেও এক **আবর্ত্ত** বলা হয়। ফাঁকের সময়, বিরাম নেওয়ার ব্যবস্থা আগের দিনে ছিল; এই বিশ্রামস্থলকে বলা হত **মান**। তখন সম থেকে বিরাম স্থান পর্যন্ত সময়কে এক "আবর্ত" (অর্থাৎ একটি "পূর্ণমঞ্চ") বলা হত; বর্তমানে এ নিয়মটি খাটে না। শুদ্ধ ভাষায় একে **আবর্ত্তন** বলা হয়। অনেকে একে "আওরাদ" বা "আওরাত" বলেন; অনেকে আবার নামকরণ করেন "আওয়র্দ্ধা"। কিন্তু এই নামকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল; "আবর্ত" বা "আবর্তন" শব্দটিই যথাযথ। এর চলতি নাম **ফের**।

ঝালা : এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রে নায়কীর তারে ঘা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাশের সুরের তারে আলাদা আলাদা ভাবে বা যুক্তভাবে ঘা দিয়ে বাজানোকে বলা হয় **ঝালার কাজ**। সেতার প্রভৃতির নায়কী তারে ও চিকারীর তারে ক্রমানুযায়ী বোল বাজানোকে বলা হয় **ঝালা**। যন্ত্র-সংগীতে ঝালা এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শুধ্ ঝালা (উলট ঝালা) : নায়কীর তারে 'ডা' বোল দিয়ে আরম্ভ করে চিকারীতে রা-রা-রা ইত্যাদি বাণী বাজানোকে অনেকে হিন্দীতে **উলট ঝালা** বলেন। এটি হল **সিধা ঝালা** বা **শুধ্ ঝালা**; ভিন্ন মতে সুলট ঝালা।

সুলট ঝালা : নায়কীর তারে 'রা' বোল দিয়ে বা 'রা-ডা' বোল দিয়ে ঝালা আরম্ভ করলে অনেকে তাকে **সুলট ঝালা** বলেন। আমরা একে **উলটি ঝালা** বলি। আমাদের মতে সিধা ঝালাকেই সুলট ঝালা বলা উচিত।

বোলদার ঝালা বা **বোল ঝালা** ঃ নায়কী তারে ডা র্-ডা বা ডেরে-ডেরে ইত্যাদি বোলের সঙ্গে চিকারীতেও অতি দ্রুতভাবে ডি-রি-ডি-রি বা রা-রা-রা-রা বোলের ব্যবহারযোগে সৃষ্ট ঝালাকে **বোলদার ঝালা** বলে।

মীড় ঝালা ঃ ঝালা বাজানোর সময়ে সঙ্গতি বজায় রেখে বিভিন্ন পর্দায় মীড় সহযোগে যে ঝালা বাজানো হয়, তার নাম **মীড় ঝালা**।

কত্তোর ঝালা ঃ যন্ত্রে ঝালা বাজাবার সময় পাখোয়াজের কৎ-যুক্ত বোলের অনুকরণে যে ঝালা বাজানো হয়, তার নাম **কত্তোর ঝালা**। বীণ, রবাব, সুরশৃঙ্গার যন্ত্রেই সাধারণতঃ এগুলি বাজানো হয়। আজকাল এর নকল চলছে সেতার ও স্বরোদে। অনেকে তারপরণের সময় এই কায়দায় ঝালা বাজিয়ে থাকেন।

ঠোক ঝালা ঃ নায়কীর তারে এক মাত্রায় ডা-ডা বা রা-রা টোকা দিয়ে পরে চিকারীর তারে ঝালা বাজানোকে বলে **ঠোক ঝালা**। অনেকে বোলদার ঝালাকেও বলেন "ঠোক ঝালা" ;

তান ঝালা ঃ ডা-রা ডা-রা বাণী দিয়ে ৩।৪ স্বরের ছোট ছোট তান নিয়ে তারপর চিকারীর তারে ঝালা নেওয়া, আবার ছোট তান ও ঝালা পর পর বাজানোকে বলা হয় **তান ঝালা**।

কমছড় ঝালা ঃ এই ঝালা অনেকটা শুধ্ ঝালার মতই ; মাঝে মাঝে বাণীর হেরফের করে বাজানো হয়।

লমছড় ঝালা ঃ তান ঝালারই প্রকারান্তর মাত্র।

তারপরণ ঃ মধ্যমের তারে (অর্থাৎ নায়কী তারে) পাখোয়াজের পরণ-এর বোলের অনুকরণে যে বোল ও বাণী সংগতের সাথে বাজানো হয়, তাকে বলে **তারপরণ**। সাধারণতঃ বীণায়, সেতারে বা সুরবাহারে আলাপ বাজাবার পর পাখোয়াজের সঙ্গে এটি বাজাবার রীতি। বলা বাহুল্য যে, রাগের কাঠামো ঠিক রেখেই এই ছন্দবন্ধন করা হয়। পাখোয়াজের পরণের অনুকরণে বাজান হয় বলেই এর নাম তার-পরণ রাখা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য—দ্বিতীয় খণ্ডে উপরিলিখিত সকল রকম ঝালা ও তারপরণের বোলের সহিত স-র-গ-ম ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়ার ইচ্ছা রইলো।

সংযোগ অলংকার

দুই বা তিনটি অবিরোধী স্বর এক সঙ্গে বাজালে মিশ্রিত যে আওয়াজ প্রকাশ পায়, তাকে বলে **সংযোগালংকার**। কোন যন্ত্রে কোন রাগ বাজানোর সময় বৈচিত্র্যের কারণে মাঝে মাঝে এই **সংবাদন অলংকার** ব্যবহার করা হয়। সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রে ঝালা বাজাবার সময় নায়কীর তারে এবং খাদের বা চিকারীর তারে এক সঙ্গে বা পর পর যে আঘাত করা হয়, সেটি এই অলংকারের অঙ্গবিশেষ। কোন কায়দায় এক সঙ্গে দুইটি স্বরকে একই তারে যদি প্রকাশ করা হয়, সেটিকেও এই অলংকারের অঙ্গীভূত করা হয়। একেই ইংরাজীতে বলে "কনকর্ড" **(concord)**; এর নামান্তর **harmony chord** বা **plurotone**। সমষ্টিগতভাবে একাধিক স্বর যেখানেই এক মধুর ধ্বনি হিসাবে প্রকাশ পায়, সেখানেই আমরা এটিকে বলি "সংবাদন অলংকার" বা "সংযোগ অলংকার"।

এই স্বর-সংযোগকে ভাগ করা হয়েছে চার রকমে ; যথা :

(১) বাদী সংযোগ ; (২) সমবাদী সংযোগ ; (৩) অনুবাদী সংযোগ ও (৪) বিবাদী সংযোগ।

(১) **বাদী সংযোগ :** দ্বিধা বিভক্ত ; যথা—(ক) "স্বজাতীয় বাদী সংযোগ" :—যেমন উদারার 'র', মুদারার 'র' ও তারার 'র' ; উদারার 'গ', মুদারার 'গ' ও তারার 'গ' ; ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামে একই স্বরের সংযুক্তি।

(খ) "বিজাতীয় বাদী সংযোগ" : এতে সমান শ্রুতির পরের স্বর বা আগের স্বর ছাড়া যে কোন দুটি স্বর সংযোগ করা হয় ; যথা :—

৪-শ্রুতির 'স' ও 'প'-এর মিলন,
৩- " 'র' ও 'ধ'-এর " ,
২- " 'গ' ও 'ন'-এর " , ইত্যাদি।

(২) **সমবাদী সংযোগ :** সমবাদী স্বরের পরস্পরের যোগ ৭, ৮ বা ১২ শ্রুতির ব্যবধানের যে কোন দুই স্বরের একক যুক্ত ধ্বনির ব্যবহারকে **সমবাদী সংযোগ** বলা হয়। উদাহরণ :

'স' ও 'গ'-এর যোগ ,
'গ' ও 'প'-এর " ,
'ম' ও 'ন'-এর " , ইত্যাদি।

(৩) **অনুবাদী সংযোগ ঃ** অনুবাদী স্বরের পরস্পরের যোগ বাদী, সমবাদী এবং ঠিক আগের ও পরের স্বরটি ছেড়ে যে স্বর সংযোগ করা হয়, তাকে **অনুবাদী সংযোগ** বলা হয়। যথা : কড়ি 'ম' ও 'ন'-এর যোগ। কোন রাগে তার অনুবাদী স্বর বিবেচনা করে তবেই এর ব্যবহার করা উচিত।

(৪) **বিবাদী সংযোগ ঃ** কোন স্বরকে তার ঠিক পরের বা ঠিক আগের স্বরের সঙ্গে যুক্ত করে এক সাথে কোন সুরধ্বনি প্রকাশ করলে, তাকে বলা হয় **বিবাদী সংযোগ**। এরূপ মিলিত ধ্বনি শ্রুতিকটু হয় বলেই এ ধরণের সংযোগ শাস্ত্রে দোষনীয় বলে গণ্য হয়েছে। যদি একান্তই এ ধরণের সংযোগের প্রয়োজন ঘটে, তবে সবিশেষ বিচারে ও অতি সাবধানে ব্যবহার করা সঙ্গত।

সঙ্গীতগুণীদের উপাধির পরিচয়

নায়ক ঃ যিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রচলিত লোক সঙ্গীত সবই নিজে কার্যতঃ করে দেখাতে পারেন, প্রবন্ধাদি রচনা করতে পারেন, এবং সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। গান, নাচ ও বহু রকমের বাজনা (বাদ্যযন্ত্র) যিনি ভালভাবে তালিম (শিক্ষা) দিতে পারেন, নিজে ভাল অভিনয় করতে পারেন, সঙ্গীতের বিভিন্ন রস ও অলংকারের উদ্দেশ্য কী সেগুলি জানেন, সমস্ত রকম গুণ ও দোষের পরীক্ষক, পরের মনের অভিপ্রায় বোঝেন, যশোভিলাষী, ক্ষমাশীল ও দাতা ; যাঁর আত্মা পবিত্রভাবে পূর্ণ, যিনি এরকম শান্তস্বভাবের এবং সমস্ত গুণের অধিকারী তাঁকেই সঙ্গীতনায়ক বলা হয়।

পণ্ডিত ঃ যিনি সঙ্গীতের ঔপপত্তিকাংশে (Theory-তে) অর্থাৎ সঙ্গীতের ব্যাকরণে পণ্ডিত, কিন্তু কার্যতঃ করে দেখাতে পারেন না তাঁকে সঙ্গীতপণ্ডিত বলা হয়।

গায়ক ঃ যিনি দেখে শুনে শিক্ষা নিতে পারেন, অনুকরণ করতে উস্তাদ, সুরসিক ও লোকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম, এইরূপ ভাবুক গায়কদের গায়ক বলা হয়, অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধিকদের গায়ক বলা হয়।

উপাধ্যায় ঃ যিনি অতি সুপুরুষ, নাচের কায়দা ভাল রকম জানেন, এবং নিজে নাচতে পারেন, নানা রকমের বাজনা বাজাতে পারেন, তাল ও লয় সম্বন্ধে

তাল জ্ঞান আছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ শিল্পীদের সঙ্গীত উপাধ্যায় বলা হয়।

গন্ধর্বঃ যাঁরা প্রাচীন ও আধুনিক দেশী রাগ-রাগিণী অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং প্রচলিত মতের সঙ্গীত কার্যতঃ করে দেখাতে পারেন ও এইসব শেখাতেও পারেন, তাঁদের গন্ধর্ব বলা হয়।

গুণী বা গুণকারঃ কেবলমাত্র প্রচলিত গান বাজনা বা নাচের ক্রিয়াসিদ্ধাংশে ভাল জ্ঞান আছে (অর্থাৎ practical side-এ ভাল জ্ঞান আছে) তাঁকে গুণী বা গুণকার বলা হয়।

কলাবন্ত বা কলাবৎঃ যাঁরা ধ্রুপদ, ত্রিবট প্রভৃতি ভালভাবে গাইতে পারেন, কিন্তু বাজনা বা নাচের নিয়ম ভাল জানেন না, তাঁদের কলাবৎ বলা হয়। চলিত ভাষায় কলাবৎকে কালোয়াত বলা হয়।

কওয়াল, কবাল বা **কুন্তল**ঃ যাঁরা কেবল খেয়াল, তেলেনা ইত্যাদি গাইতে পারেন, তাঁদের কওয়াল বলা হয়।

ঢাড়ি বা **ধারী**ঃ যাঁরা কড়্খা টপ্পা খেয়াল প্রভৃতি গান গাইতে পারেন, তাঁদের ঢাড়ি বলা হয়। ঢাড়িরা সবই গাইতে পারতেন। নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গীত ব্যবসায়ী বলে তাঁদের মান অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল।

মার্দঙ্গীঃ যিনি ধীর, বাদ্যবিশারদ, মিষ্টভাষী, বাজনার বোলগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ভালভাবে তাল দিতে পারেন, গমক প্রভৃতি অলংকারের জ্ঞান আছে, বহুরকম বাজনা ভালভাবে বাজাতে পারেন, বহু রকম গানের নিয়ম যাঁর জানা আছে, বাজনার বোল মুখে তাল দিয়ে ভালভাবে বলতে পারেন, এই রকম সন্তুষ্টচিত্ত অতি চতুর সঙ্গীতজ্ঞকে মার্দঙ্গী বা মার্দঙ্গীক বলা হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রকারঃ সঙ্গীত-পণ্ডিতদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকার বলা হয়। শাস্ত্রকারেরা সকলে ভাল গাইতে বা বাজাতে না পারলেও ব্যাকরণগত দোষগুণ ধরে দেন ও সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারেন।

অতাই, আতাইঃ গুরুর কাছে যথাযথ শিক্ষা না পেয়ে যিনি নানাজনের সঙ্গীত শুনে বা দেখে নকল করে শেখেন, তাঁকে অতাই নামে অভিহিত করা হয়।

কস্‌বীঃ যিনি উপযুক্ত গুরুর কাছে যথাযথ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা পেয়েছেন, তাকে কস্‌বী বলা হয়।

ঘরানাঃ কোন গুণী গায়কের প্রতিভাদীপ্ত বৈশিষ্ট্য থেকেই ঘরাণার জন্ম। ঘর শব্দটি থেকেই ঘরাণা কথাটি এসেছে। প্রতিভাধর কোন গায়কের

শিষ্যদের মধ্যে যখন একই রকম গায়কীর প্রকাশ ঘটে তখন গায়কীর ভঙ্গিমার কারণে সেই উস্তাদের নামে অথবা সেই দেশ বা স্থানের নামে ঘরাণার নামকরণ করা হয়।

রাগ লক্ষণ

প্রাচীন শাস্ত্রে রাগের যে ১৩টি লক্ষণ আমরা দেখতে পাই, আগে তাদের কথা বলছি। (বর্তমানে বহু স্থলেই এই নিয়ম মেনে চলা হয় না।)

১॥ **গ্রহ** বা **গ্রহস্বর ঃ** যে স্বর থেকে রাগের মূর্ছনা আরম্ভ করা হত, তাকেই "**গ্রহস্বর**" বলে।

২॥ **অংশ** বা **অংশস্বর ঃ** যে কয়েকটি স্বরকে কেন্দ্র করে একটি রাগের প্রকাশ ও যাদের বহুল ব্যবহার এবং ব্যাপকত্ব রাগের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাদের "**অংশস্বর**" বলে।

আবার অংশস্বরের অর্থ **'জীবস্বর'** বা **'বাদীস্বর'** বলা হয়. সেক্ষেত্রে অংশের বিশেষ স্বরসৃষ্টিকেই বাদীস্বর বা অংশস্বর বলা হয়। "বদনাৎ বাদী", অর্থাৎ একজন লোকের (বদন) মুখ দেখে যেমন চেনা যায়, তেমনি অংশের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান স্বর, সেই বহুব্যবহৃত স্বরটিই "বাদী", এবং তার দ্বারাই রাগকে চেনা সম্ভব হয়।

৩॥ **ন্যাস ঃ** যে স্বরে রাগটি শেষ করা যায়, অর্থাৎ একেবারে শেষ করা হয়, অথবা যে স্বরে এসে দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়া হয়, তাকে "**ন্যাস**" বলে।

৪॥ **অপন্যাস ঃ** রাগের প্রথম অংশ যে স্বরে এসে থামে, তাকে "**অপন্যাস**" বলে।

৫॥ **সংন্যাস** বা **সন্যাস ঃ** রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো স র গ ম দ্বারা অলংকৃত করে প্রকাশ করার পর যে স্বরে থামে বা যেখানে এসে তার প্রথম অথবা শেষ কলি শেষ করা হয় তাকে "**সংন্যাস**" বা "**সন্যাস**" বলে।

৬॥ **বিন্যাস ঃ** রাগের প্রথম অংশের প্রথম টুকরো সরগম দ্বারা অলংকৃত না করে যে স্বরে এসে থামে, তাকে "**বিন্যাস**" বলা হয়।

অপন্যাস, বিন্যাস প্রভৃতিতে যে স্বরে এসে রাগটি শেষ করা হয়, সেটি **বিদারী** নামে পরিচিত।

৭॥ **বহুত্ব ঃ** রাগে যে স্বর বারবার অর্থে বহুবার ব্যবহার করা হয়, **"বহুত্ব"** বলে তাকে।

বহুত্ব দু' রকমের ঃ (ক) **অলংঘন** ও (খ) **অভ্যাস** বা **আবৃত্তি**।

(ক) যে স্বরটির প্রয়োগ খুব প্রয়োজনীয়, সেই স্বরের বার বার স্পর্শের নাম **"অলংঘন"** বা **অলংঘনমূলক বহুত্ব**। এই অলংঘন-জনিত বহুত্ব প্রায় বাদীর মত। (খ) **অভ্যাস** অথবা **আবৃত্তি ঃ** রাগে যে স্বরের আবৃত্তি বারংবার করা হয় অথচ ঠিক অলংঘনের মত অত বেশীবার নয়, কিন্তু প্রায় সমবাদী স্বরের মতই ব্যবহৃত হয়, তাকেই **"অভ্যাস"** অথবা **"আবৃত্তি"** বলে। এটিকে **অভ্যাস-মূলক বহুত্ব**ও বলা হয়।

৮॥ **অল্পত্ব ঃ** রাগে যে স্বর অল্প ব্যবহৃত হয়, তাকে **"অল্পত্ব"** বলা হয়।

এই অল্পত্বও দুই রকমের ঃ (ক) **'লংঘন'** ও (খ) **'অনভ্যাস'**।

(ক) কোন রাগে কোন স্বর অতি অল্প স্পর্শ করাকে বা লোপসাধন করাকে **লংঘন** বা **লংঘনমূলক অল্পত্ব** বলে। (খ) রাগে যে স্বরের ব্যবহার নাই বললেই চলে, তাকেই **অনভ্যাস** অথবা **অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব** বলে।

৯॥ **মন্দ্র ঃ** অংশ-স্বর ভেদে উদারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর পর্যন্ত অবরোহণের নিয়মকে **মন্দ্র** লক্ষণ বলে।

১০॥ **তার ঃ** অংশ-স্বর ভেদে তারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্বর ব্যবহারের নিয়মকে **"তার"** লক্ষণ বলে। রাগের যে সকল স্বর মন্দ্র ও তার সপ্তকে নিয়ে যাওয়া যেত রাগে তাদের ব্যবহার বেঁধে দেওয়া নিয়ম ছিল।

১১॥ **ষাড়বত্ব ঃ** নির্দিষ্ট কোন কারণে কোন রাগে ব্যবহৃত কোন একটি স্বরকে যখন বর্জন করা হয়, তখনই সেটি **"ষাড়বত্ব"** নামে পরিচিত হয়।

১২॥ **ঔড়বত্ব ঃ** বিশেষ কোন কারণে যখন রাগে ব্যবহৃত কোন দুটি স্বরকে বর্জন করা হয়, তখন সেটি **"ঔড়বত্ব"** নামে আখ্যাত হয়।

১৩॥ **অন্তরমার্গ ঃ** ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতির জায়গা ছেড়ে রাগের মাঝে বিশেষ স্বরগুচ্ছ সৃষ্টি করে যখন চমক লাগান হয়, তখন তাকে **"অন্তরমার্গ"** নামে বিভূষিত করা হয়। আগের দিনে স্বরের পাশের কমাগুলিকেও অন্তরমার্গ বলা হত।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ লক্ষণে বর্তমানে যে সব আইন-কানুন মানা হয়, তাদের কথা বলছি।

(ক) এক সপ্তকের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে এবং শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে পাচ স্বরের

কম থাকলে, সেটি রাগ-পদবাচ্য হয় না। ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রমে চার স্বরের রাগ দেখা যায়; কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয়।

(খ) মধ্যম স্বরটি ছাড়া কোন রাগেই একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর ব্যবহার করা হয় না। কদাচিৎ এরূপ ঘটলেও সেটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

(গ) প্রতিটি রাগের আরোহণ ও অবরোহণ থাকা চাই, এবং তার স্বরগুচ্ছ কোন-না-কোন ঠাটের অন্তর্গত হওয়া দরকার। সব সময়েই আরোহণ-অবরোহণের এক নিয়ম মেনে চলতে হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। সেই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এক নিয়ম মেনে চলাই বিধি।

(ঘ) যে কোন রাগেই হোক, 'স' স্বরটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়া চলবে না; আবার 'ম' ও 'প' এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে রাখতেই হবে। অর্থাৎ, কোন রাগে এক সঙ্গে 'ম' ও 'প'-কে বাদ দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম বজায় রেখে অন্য যে কোন পর পর দুটি স্বর বাদ দেওয়া চল্‌তে পারে।

(ঙ) প্রত্যেক রাগেই একটা নির্দিষ্ট বাদী ও একটা নির্দিষ্ট সংবাদী স্বর থাকা চাই।

(চ) বিভিন্ন রাগের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই নির্দিষ্ট সময়েই রাগের পরিবেশন হওয়া উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ("রাগের সময়" দ্রষ্টব্য।)

(ছ) রাগ শ্রুতিমধুর ও রসভাবযুক্ত হওয়া চাই। ("রাগরস" দ্রষ্টব্য।)

রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাবঃ রাগের আলাপ বা বিস্তার করার সময় রাগকে "আছোপ" (অর্থাৎ গোপন) রাখার জন্য বা মাধুর্যের কারণে অথবা রাগের উপর পরিবেশকের কতটা দখল আছে, শ্রোতাকে সেটি বুঝাবার জন্য রাগকে নিয়ে এইভাবে লুকোচুরি খেলা হয়। প্রায় অধিকাংশ রাগেই অপর রাগের সংক্রমণ দেখা যায়। সেই সংক্রমণ স্থানের স্বরগুলির উপর জোর (stress) দিয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আসল রাগটিতে ফিরে আসাই এর বৈশিষ্ট্য। নিপুণভাবে ফিরে আসা কঠিন। ঠিক ভাবে পরিবেশিত রাগে ফিরে আসতে না পারলে রাগভ্রষ্ট হওয়ার ভয় থাকে।

যে রাগটি আপনি পরিবেশন করছেন (অর্থাৎ মূল রাগটি থেকে যখন অন্য রাগের ভাবের দিকে যেতে চাইছেন), তখনই আসলে হবে তিরোভাব। আবার সেখান থেকে যখন মূল রাগে ফিরে আসবেন, তখনই আপনার মূল রাগের

আবির্ভাব হবে। সাধারণতঃ সমপ্রকৃতির রাগেই এই ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকলে অন্যান্য রাগেও এই কায়দা দেখান চলে।

প্রাচীন কালের দেশী রাগঃ মার্গরাগকে এদের **"জনক"** রাগ বলে কল্পনা করা হত।

রাগাঙ্গঃ গ্রাম রাগের ছায়া যে রাগে থাকতো তাকে রাগাঙ্গ বলা হত। রাগাঙ্গে আটটি রাগকে ধরা হত, পরে আরও ১৩টি যুক্ত করা হয়। শুধু শাস্ত্রীয় রাগদেরই **রাগাঙ্গ** বলা হত। সুতরাং আমরা এদের তখনকার দিনের ক্ল্যাসিক্যাল রাগ বা প্রথম শ্রেণীর রাগ বলে মনে করতে পারি। তখনকার দিনে শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করার উপায় ছিল না; নিয়মভঙ্গ হলে রাগাঙ্গ থাকত না। তাই নিয়ম মাফিক বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়া হলে তবেই তাকে রাগাঙ্গ রাগ বলা হত। রাগের অনুগামী ও সহায়তাকারী কতকগুলি পরিপোষক ক্রিয়াকেও রাগাঙ্গ বলা হত।*

ভাষাঙ্গঃ ভাষার ছায়ায় যারা আশ্রিত, তাদের বলতো **ভাষাঙ্গ**। আদিতে ভাষাঙ্গের অধীনে ১১টি রাগ প্রসিদ্ধ ছিল; পরে আরও ৯টি রাগ ভাষাঙ্গে প্রচলিত হয়। শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর এরা প্রতিষ্ঠিত নয়। এরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নিয়মের অন্তর্গত ছিল। রাগাঙ্গ রাগের খুব নিকটবর্তী অথচ গানের চালে যাদের কিছু ভিন্নভাব লক্ষিত হত, সেই রাগদের ভাষাঙ্গ বলা হত।*

উপাঙ্গঃ কোন অংশে ছায়া লাগলে তাকে **"উপাঙ্গ"** বলা হত। উপাঙ্গে আগে ৩টা রাগ ও পরে ২৭টা রাগ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উপাঙ্গ-জাতীয় রাগে বিশুদ্ধি নষ্ট করে অনেক সময়ে রাগের মূল স্বরগুলিকেই পাল্‌টে ফেলা হত।* এতে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গের ছায়া থাকত।

ক্রিয়াঙ্গঃ করুণ ও উৎসাহাদি রস যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকত, তাদের বলা হত **"ক্রিয়াঙ্গ"**। সেকালে ক্রিয়াঙ্গের অধীনে ১২টা রাগ ছিল; পরে আরও ৩টি রাগ ক্রিয়াঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিবাদী স্বরের প্রয়োগে ক্রিয়াঙ্গ রাগকে মধুরতর করে তোলা হত; তাতে রাগ ভ্রষ্ট হত। কিন্তু উপাঙ্গের মত ক্রিয়াঙ্গে অনেক স্বর একেবারে বদলে ফেলা হত না। রাগের বিশুদ্ধতা এতেও নষ্ট করা হত। তবে সম্পূর্ণভাবে নয়; সামান্য ইতর-বিশেষ ঘটত।*

* পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির ১ম ভাগে পণ্ডিতজী এই রূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রাম রাগ ঃ আগেকার দিনে গ্রামরাগ জনকরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ; কিন্তু দেশী রাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এতে পাঁচটি ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, যথা—**রাগালাপ, রূপকালাপ, করণ, বর্ত্তনী** ও **আক্ষিপ্তিকা**। "সংগীত-রত্নাকর" পুস্তকে বহু প্রকার গ্রাম রাগের নাম পাওয়া যায়। গ্রাম রাগ পাঁচ রকমের ছিল : (১) শুদ্ধ ৭টি, (২) ভিন্ন ৫টি, (৩) গৌড় ৩টি, (৪) বেসর ৮টি, (৫) সাধারণ ৭টি।

ভাষা, বিভাষা ও অন্তর ভাষা ঃ ভাষা রাগের জনকরাগ ছিল গ্রামরাগ। গ্রামরাগের মত ভাষারাগও অনেক রকমের ছিল। ভাষার আশ্রয়ে মূল রাগ থেকে ভাষা রাগেরা কিছু বদ্‌লে যেত। গ্রাম রাগের আলাপযোগ্য **জন্য** রাগগুলিকে ভাষা রাগ বলা হত। এদের স্বরগুলি কোমল ও মসৃণ হত।

ভাষারাগের এই বিকৃতির ফলেই বিভাষাদের উদ্ভব। কোন গ্রামরাগের শেষের দিকে যদি স্বরবৈচিত্র্যাদি দেখিয়ে তাদের বিশেষ ভঙ্গিতে গাওয়া হত, তবে তাদের বলা হত **বিভাষা**। ভাষার লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম করা হত। স্বরগুলিকে গমকযুক্ত ও উঁচু দিকে মোলায়েম ভাবে লাগান হত।

অন্তর ভাষা ঃ বিভাষার 'জন্য' রাগদের অন্তর ভাষা বলা হত; যেগুলি জনকের সামান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করত। রঞ্জকতা গুণকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হত।

কাণ্ডারণা ঃ রাগ বিস্তারে গমকাদি অলংকার দিয়ে তিন সপ্তকে অনায়াস গতিতে চলাফেরা করাকেই আগের দিনে "**কাণ্ডারণা**" বলা হত।

আক্ষিপ্তিকা ঃ বাণী ও স্বর দিয়ে আলাপ ও তালে বাঁধা শেষ অংশের গানকেই "**আক্ষিপ্তিকা**" বলা হত।

একটি রাগকে প্রকাশ করতে, সেই রাগে স্বরের ব্যবহারের তারতম্য বোঝানর কারণে তাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চার ভাগ নিম্নে বর্ণিত হল :

(১) **বাদী স্বর ঃ** কোন একটি স্বরের রূপ-বিন্যাসক স্বরের মধ্যে যেটি প্রধান স্বর তাকে "**বাদী স্বর**" বলা হয়। রাগে অন্যান্য সমস্ত স্বর ব্যবহারের উপর এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে রাগের বাদী স্বরকে বলা হয় **রাজা স্বর**। তার পরিচয়েই রাগের পরিচয়।

(২) **সংবাদী স্বর ঃ** বাদীর পরেই সংবাদীর স্থান। রাগে এর ব্যবহার বাদীর থেকে কিছু কম, তবে অন্য সব স্বর থেকে বেশী। যে রাগে বাদী স্বরের

ঠিক আগের বা পরের স্বরটি ছাড়া বাদীস্বরের সমশ্রুতি-স্বরবিশিষ্ট যে কোন এক স্বর সংবাদী স্বর হতে পারে, এরকম একটা নিয়মও আছে। অথবা বাদীস্বর থেকে আট বা বার শ্রুতির ব্যবধান থাকবে সংবাদী স্বরে, এ কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন কোন রাগে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। বলা হয়, রাগের স্বররাজ্যের মন্ত্রী হল **সংবাদী স্বর**; আর রাজা হল বাদী স্বর।

(৩) **অনুবাদী স্বর:** বাদী, সংবাদী ও বিবাদী স্বর ছাড়া রাগে ব্যবহৃত অন্য সমস্ত স্বরকেই বলা হয় "**অনুবাদী স্বর**"। এদেরকে বলা হয় রাগের স্বররাজ্যের "অনুচর"।

(৪) **বিবাদী স্বর:** যখন রাগে কোন স্বর নিয়মিতভাবে কাজে লাগে না এবং তার অযথা প্রয়োগে রাগটি অশুদ্ধ হতে পারে, তখন তাকেই বলা হয় **বিবাদী স্বর**। ক্ষেত্রবিশেষে এই বিবাদী স্বরকেও কাজে লাগান যেতে পারে; রাগকে মধুরতর করে তোলার জন্য কোন কোন রাগে আমরা মাঝে মাঝে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করে থাকি। এখানে মনে রাখতে হবে যে বিবাদী স্বর রাগের "**বর্জ্জ্য স্বর**" নয়। উদাহরণের খাতিরে ভূপালিতে শুদ্ধ মধ্যমের উল্লেখ করা যায়; একে আমরা মাধুর্যের খাতিরে ভূপালি রাগে কোন রকমেই ব্যবহার করতে পারি না, কারণ ভূপালিতে শুদ্ধ 'ম' একটি বর্জ্জ্য স্বর। মধুরতার কারণে কেদারাতে কোমল 'নি'-এর পরশ আমরা লাগাতে পারি, যদিও কেদারাতে সে বিবাদি স্বর কিন্তু বর্জ্জ্য স্বর নয়। এই রকম অনেক রাগেই বিবাদী স্বর আছে এবং তাদের বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করা যায়।

যার সঙ্গে আপনার বিবাদ আছে, তাকেও আপনি কায়দা করে কাজে লাগিয়ে নিতে পারেন। অবশ্য এই নিয়োগ অনেক ভেবে-চিন্তেই করা উচিত। এখানেও ঠিক তেমনি। বিশিষ্ট রাগের স্বররাজ্যের শত্রুর সঙ্গে এদের তুলনা করা হয়েছে।

বক্র স্বর: রাগের আরোহণ বা অবরোহণে যখন কোন স্বর সোজাভাবে লাগে না,—একটু ঘুরিয়ে দেখাতে হয়,—তখন তাকে সেই রাগের "**বক্র স্বর**" বলা হয়।

রাগের পকড় ও উঠান (বা উঠাও): রাগ-প্রকাশক কয়েকটি স্বর নিয়ে যে স্বরবিন্যাস গড়া হয়, তাকেই আমরা **পকড়** বলি। এটি হিন্দী শব্দ।

রাগপ্রতিষ্ঠা করার সময় অন্য রাগ এসে পড়ার ভয় থাকে। রাগের পকড় জানা থাকলে, রাগরূপ-প্রকাশে আর কোন বাধা আসে না। পকড় রাগের মুখ্য অংশ।

তবলার ঠেকা ধরার আগে যে বোল বাজান হয়, তাকে আমরা **উঠান** বলি ; কিন্তু অনেকে "উঠাও"-কে "উঠান" বলে থাকেন ; আবার যে স্বরটি থেকে গৎ বা গান আরম্ভ করা হয়, তাকেও অনেকে "উঠান" বলেন।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে "উঠাও" কথাটি ব্যবহার করা হয় রাগের রূপপ্রকাশক বিন্যাসের ক্ষেত্রে। সেটি বাদী-সমবাদী যুক্ত হয়ে রাগের চলনটিকে আলাপের ঢঙে প্রকাশ করে এবং যে স্বর-বিন্যাস শুনলেই রাগের স্বরূপটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, সেটিই "উঠাও"। এই উঠাও-কে আবার অনেকে দুভাগে ভাগ করে "আস্থায়ীর উঠাও"ও "অন্তরার উঠাও" বলে থাকেন। যে রাগে যেখান থেকে অন্তরা ধরার নিয়ম, সেইখান থেকে আরম্ভ করে তারার স-তে শেষ করা হয়, বা সময়ে নীচে নেমে আসাও হয়। এখানে রাগের রূপপ্রকাশক বিন্যাসটিকে স্পষ্ট করে দেখান হয়।

জনক রাগ, আশ্রয় রাগ, জন্য রাগ :—ঠাটের প্রসঙ্গে বলেছি যে এক একটি ঠাটকে সেই ঠাটে ব্যবহৃত এক একটি বিশিষ্ট রাগের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। যে রাগের নামে ঠাটটি ব্যবহৃত হয়, তাকেই **জনক রাগ** বলা হয়। কিন্তু ঠাটই জনক, কারণ ঠাট থেকেই রাগ উৎপন্ন হচ্ছে বলে ধরা হয়।

যে রাগটির নামে ঠাটটি প্রচলিত, সেই রাগটি আবার **আশ্রয় রাগ**-ও হচ্ছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও ঠাটই জনক, তবুও জনক রাগ এবং আশ্রয় রাগ বললে আমরা সেই রাগটিকে বুঝবো, যেটির নামে ঠাটটি প্রচলিত। আশ্রয় রাগের বৈশিষ্ট্য এই যে সে ঠাটের স্বরারোহণের সঙ্গেই বহুলাংশে মিলে যায়।

আশ্রয় রাগের অধীনস্থ যে সব রাগ, অর্থাৎ ঐ ঠাট থেকে আর যে সব রাগ প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাদের বলা হয় **জন্য রাগ**।

সন্ধিপ্রকাশ রাগ ঃ—"রাগের নির্দিষ্ট সময়" প্রসঙ্গে সন্ধিপ্রকাশ রাগের একটু আভাষ আমরা দিয়েছি। এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলছি। চতুর পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী সাধারণতঃ ভৈঁরো, পূর্বী আর মারওয়া ঠাটের সন্ধিপ্রকাশ রাগের কথা বলেছেন। সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি বিচার করবার সময় তিনি বলেছেন যে সন্ধিপ্রকাশ রাগে আমরা সাধারণতঃ কোমল 'র', তীব্র 'গ' ও শুদ্ধ 'ন'-র ব্যবহার দেখতে পাই। এটা যে একটা সহজ উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও আমরা এ নিয়মটি সাধারণভাবে মেনে নিতে পারি।

পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ-প্রধান রাগের লক্ষণ ঃ এ সম্বন্ধে আমরা আগেই

বলেছি যে, যে সমস্ত রাগের স র র গ গ ম ম এর মধ্যে কোন একটি স্বর বাদী হয় এবং যাদের বিস্তারে খাদের ও মাঝের স্বরসমষ্টির ব্যবহারই বেশী দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় **"পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগ"**। অপিচ, যে সমস্ত রাগে প ধ ধ ন ন স-এর মধ্যে কোন একটি স্বর বাদী হয় এবং যাদের বিস্তার মধ্যসপ্তক ও তারা স্থানেই বেশী চলাফেরা করতে দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় **"উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ"**।

রাগের নির্দিষ্ট সময়

সঙ্গীত শাস্ত্রকার ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি পণ্ডিতদের সময়ে রাগ-রাগিণী গীত হওয়ার বিশেষ সময় ছিল বলে জানা যায় না। রাগদের গাইবার কোন বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবস্থা থাকলে তাদের পুস্তকে সে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকত।

আমরা নারদ-কৃত "সঙ্গীত মকরন্দ" পুস্তকেই সর্বপ্রথম রাগ পরিবেশনের সময় সম্বন্ধে নির্দেশ দেখতে পাই। সকালে, দুপুরে বা রাত্রে গাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ রাগের ব্যবস্থা সে পুস্তকে ছিল। তদানীন্তন কালের অন্যান্য পুস্তকেও রাগের সময়-নির্দেশ পাওয়া যায়। মুসলমান আমলে অর্থাৎ বাদশাহদের রাজত্বকালে তখনকার শাস্ত্রীদের রচিত গ্রন্থমালায় ও উস্তাদদের ব্যবহারিক নিয়মে আমরা রাগের সময়-নির্দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাই। এই সময়-নির্দেশ সম্বন্ধেও মতভেদ ছিল। গোয়ালিয়র ঘরাণা, রামপুর ঘরাণার উস্তাদেরা সময় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সময়-নির্দেশ কোন রাগে বাদীস্বরের উপর নির্ভর করে, কোথাও বা রাগে ব্যবহৃত কড়ি-কোমল স্বরের উপর বিচার করে, আবার কোথাও বা পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ বিভেদের উপর চিন্তা করে, অর্থাৎ এই সব বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখেই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, রাগের স্বর ব্যবহার সম্বন্ধেও মতভেদ ছিল। কাজেই সময় সম্বন্ধে কোন নির্ভুল সমাধানে পৌছান কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

প্রাচীন মতে সংগীতশাস্ত্রে সময়কে যাম, দণ্ড ও প্রহর হিসাবে ভাগ করা হয়েছে।* দেখা যায়, দণ্ড = ২৪ মিনিট এবং যাম বা প্রহর = দিবা বা রাত্রির

* ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্যাবধি এই ত্রিধা বিভাগ মেনে চলা হয়।

এক চতুর্থাংশ কাল, অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা সময়। তখনকার দিনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কিন্তু এ নিয়ম গ্রাহ্য করেন নি। রাত বারোটা থেকে দুপুর বারোটা এবং দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটা—এই দু ভাগে দিবারাত্রির ২৪ ঘণ্টা সময়কে তিনি পাশ্চাত্য নিয়মানুসারে ভাগ করেছেন। তিনি দিন বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সময়কে **পূর্বার্ধ** ও রাত বারোটা থেকে দিন বারোটা পর্যন্ত সময়কে **উত্তরার্ধ**—এই দুই নামে চিহ্নিত করেছেন; এবং তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে "স র গ ম প ধ ন র্স" এই অষ্টককেও দুভাগে ভাগ করেছেন: 'স র গ ম'-কে তিনি **পূর্বাঙ্গ** এবং 'প ধ ন র্স'-কে **উত্তরাঙ্গ** বলেছেন। এই পূর্বাঙ্গের, অর্থাৎ 'স র গ ম'-এর মধ্যে কোন একটি স্বর যখন কোন একটি রাগে বাদীর স্থান অধিকার করেছে, তখন সেই রাগটি দিনের পূর্বার্ধের আওতায় আসছে। অনুরূপভাবে উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ 'প ধ ন র্স' এর মধ্যে কোন একটি স্বর যখন কোন একটি রাগে বাদীর স্থান অধিকার করেছে, তখন সেই রাগটি সময়-বিভাগে উত্তরার্ধের আওতায় আসছে।

এই ভাবে সন্ধিপ্রকাশ সময়ে (ঊষাকালে) ভৈঁরো ও ললিতাঙ্গ রাগদের এবং পরে বেলা বারটার মধ্যে বিলাবল, ভৈরবী ও আসাবরী জাতীয় রাগদের এবং বেলা চারটে পর্যন্ত সারং, কাফী ও টোড়ী জাতীয় রাগদের গাইবার বা বাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন। পুনঃ সন্ধিপ্রকাশ সময়ে (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে) মারবা পূর্বী ও শ্রী জাতীয় রাগদের, এবং সন্ধ্যার পর থেকে রাত বারটা পর্যন্ত কল্যাণ, খাম্বাজ, কাফী, বিলাবল ও আসাবরী জাতীয় রাগদের গাইবার বা বাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভাতখণ্ডেজীকৃত এই বিভাগটি অনেকের পছন্দ নয়, তাই তার মত সকলে মানতে চান না। বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় রাগের সময় নির্দেশে একটা নির্দিষ্ট মত মেনে চলা হয়; এই মত বা নিয়ম ভাতখণ্ডেজী-প্রবর্তিত নিয়ম থেকে কিছুটা ভিন্ন।

ডাঃ বিমল রায় এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দিবারাত্রকে ৮টি প্রহরে বিভক্ত করে এক-একটি প্রহরের দুটি অংশ স্বীকার করেন।

তার মতে ২৪ ঘণ্টায় ২২টি শ্রুতির ব্যবহার হচ্ছে অতএব প্রতি ৩ ঘণ্টার প্রহরে ২¾ শ্রুতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি ৬টা থেকে ৯টা বা সূর্য্য উদয় থেকে ৩ ঘণ্টাকে

প্রথম প্রহর বলেছেন। ঘণ্টার গতির সঙ্গে ১ম প্রহরে সকারী, অতিকোমল ও কোমল র ব্যবহৃত হচ্ছে, জন্মাচ্ছে ভৈরব, বিলাসখানি টোড়ী, টোড়ী ১ম অংশে; এবং ভৈরবী ২য় অংশে।

২য় প্রহরে কোমল র, শুদ্ধ র, অতি কোমল ও কোমল গ ব্যবহারে আসে। অতএব ১ম অংশে জন্মায় কোমল দেশী, আসাবরী, জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী, বেলাবল জাতীয় রাগ এবং ২য় অংশে জন্মায় বৃন্দাবনী সারং, মুখারী দেশাখ্য জাতীয় রাগ।

৩য় প্রহরে কোমল ও শুদ্ধ গ এবং শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়। মধ্যাহ্নে শুদ্ধ ম কড়ী ম-র দিকে ঝোঁকে। অতএব ১ম অংশে জন্মায় ধানী, ধন্যাসী, সুহা, সুঘরাই জাতীয় রাগ, বেলাবল জাতীয় রাগ, দুই ম যুক্ত বেলাবল, সারং গৌড় সারং এবং ২য় অংশে শুধ্ সারং মালশ্রী প্রকৃতির রাগ।

৪র্থ প্রহরে ম, তীব্র, তীব্রতর ম ব্যবহৃত হয়। অতএব প্রথম অংশে জন্মায় ভীমপলাসী, পটমঞ্জরী, প্রদীপকী, হংসকঙ্কনী প্রভৃতি এবং ২য় অংশে জন্মায় মধুবন্তী, মূলতানী, ধনাশ্রী, মূলতানী-ধনাশ্রী, শ্রী, গৌরী।

৫ম প্রহরে তীব্রতর ম, প, সকারী ধ ব্যবহৃত হয়। অতএব প্রথম অংশে জন্মায় (গোধূলিতে) শ্রী জাতীয় রাগ, পূর্বী, পুরিয়াধনাশ্রী, দিনকী-পুরিয়া, পুরিয়া, মারবা, সাজগিরি, পূর্বা এবং শেষ অংশে জন্মায় পূর্বকল্যাণ, পুরিয়া-কল্যাণ, মালিগৌরা, কেদার-পুরিয়া, ইমন, কল্যাণ। কড়ী ম শুদ্ধ ম-র দিকে নামবার চেষ্টা করলে জন্মায় ইমনকল্যাণ জাতীয় রাগ।

৬ষ্ঠ প্রহরে সকারী, অতিকোমল, কোমল ও শুদ্ধ ধ ব্যবহৃত হয়। ম নিজের জায়গায় ফিরে যায়, প কড়ী ম-র দিকে ঝোঁকে। অতএব জন্মায় কামোদ, কেদার জাতীয় রাগ এবং শেষ অংশে বেলাবল জাতীয় রাগ। পূর্বদিকে আলোড়নের জন্য শুদ্ধ ন কোমল ন-র দিকে প্রসরণ করে বলে নট, খাম্বাজ জাতীয় রাগ জন্মায়।

৭ম প্রহরে 'ধ' অতিকোমল, কোমল ও শুদ্ধ 'ন' ব্যবহারে আসে। অতএব ১ম অংশে খাম্বাজ, কাফী জাতীয় রাগ জন্মায় এবং ২য় অংশে কাফী ও কানরা জাতীয় রাগ সৃষ্ট হয়।

৮ম প্রহরে শুদ্ধ, তীব্র ন, স ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব ১ম অংশে শুদ্ধ ম গ-র দিকে প্রসরণ করে বলে চল স্বরগুলি স্থানচ্যুত হয় এবং বসন্ত, পরজ, পঞ্চম, সোহিনী জন্মায়। ২য় অংশে অর্থাৎ ঊষায় তীব্র ন স-র ব্যবহার সীমিত

করে ; ললিত জাতীয় রাগ সৃষ্ট হয়। উষার শেষ দিকে স প্রাধান্য লাভ করে, জন্মায় ভৈরব, ভাটিয়ার। তারপর প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বেলাবল দেখা দেয়— যে রাগে স-র নিকটবর্তী স্বরগুলির প্রাধান্য থাকে।

"গীত সূত্রসার" গ্রন্থে সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আসলে রাগ-রাগিনীদের গাইবার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, ভ্রমসঙ্কুল সংস্কারের বশেই আমরা চালিত হয়ে থাকি।" সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর "রাগ-রূপায়ণ" পুস্তকে এ বিষয়ে একটি যুক্তি দেখিয়েছেন ; তিনি বলেছেন, "সকাল বেলাকার রাগে স্বাভাবিক শান্তভাব, আর সন্ধ্যাবেলাকার রাগে কর্মচঞ্চল ভাব প্রতিফলিত হওয়া চাই।" সকালের রাগে 'স' স্বরের বিশেষ উল্লঙ্ঘন কোথাও নাই। ন র গ অথবা ন কোমল, র গ সকালের কোন রাগেই প্রযোজ্য নয়। আবার সন্ধ্যাবেলার কোন রাগেই এই স্বরবিন্যাস দুটি বর্জনীয় নয়। আমরা দেখি সকালের রাগে একটা শান্ত ভাবের আমেজ পাওয়া যায়। রাগের সময় বিভাগ কঠোরভাবে মানার পক্ষপাতী আমরা নই ; তবে দিনের রাগকে রাতে গাওয়া আমরা পছন্দ করি, সেটি আমাদের বক্তব্য নয়।

আমরা দেখতে পাই গাছের মত জড় জীবও প্রাকৃতিক নিয়ম ও সময়-পরিবর্তন অনুসারে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীই সময়ের নিয়মের অধীনে স্বাভাবিক ভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করে চলে। কারণে-অকারণে অনেক নিয়মই সমাজবদ্ধজীবেরা মেনে চলে। এই মানার ফলে অনেক বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একটা স্বাভাবিকতা সংস্থাপনের কারণে রাগের সময় সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ নিয়ম মেনে চলা অসঙ্গত বা অসমীচীন নয়। তবে এ সম্বন্ধে কোনও কঠিন বাঁধন না থাকাই শ্রেয়ঃ, এই কথাই আমরা বলতে চাই। যেখানে রাজাজ্ঞায় বা অভিনয়কালে যে কোন রাগ যে কোন সময়ে গীত হলে দুষ্য হয় না, বা কোন রাগ ভ্রমবশতঃ অকালে গীত হলে, সুরসা গুজরী রাগের গানে সে দোষ খণ্ডন করা যায় (এ ধরণের প্রতিকার-ব্যবস্থা প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়), তখন আমরা সময়ের বাঁধন কিছু আলগা করতে পারি। অসময়ে গীত হলেই কোন রাগ অপাংক্তেয় হবে, এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবুও সাধারণভাবে আমরা সময়ের নিয়ম অনুবর্তন করে চলাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

আজকের দিনে বিভিন্ন মতের পরিপোষকতা না করে রাগের সময় সম্বন্ধে বিচার করে একটি সর্বসম্মত নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করি। এই

প্রয়োজন সিদ্ধ হলে নানা মুনির নানা মতের চাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে এবং এ বিষয়ে যথেচ্ছাচার করাও সম্ভব হবে না।

রাগের রসভাব

শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ"। গান, বাজনা, নাচ, অভিনয়, কবিতাপাঠ, আবৃত্তির মাধ্যমে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় বা দর্শনে আমাদের মানসপটে যে ভাব জেগে উঠে আমাদের মনকে কোন এক রসভাবে সিঞ্চিত করে তোলে, তখন সেই ভাবাবেগজনিত অনুভূতিকে আমরা **রস** বলি। কাযকারণভেদে কাব্যরস, সঙ্গীতরস বা অভিনয়াদিজনিত রসের ভোগ পৃথক হলেও মূলতঃ রস বস্তুটি একই।

সঙ্গীতশাস্ত্রে মান্য পেয়েছে রসের আট রকম ভেদ। রাগরসের ক্ষেত্রেও এই আট রকম রসের কথাই বলা হয়েছে; তাদের নামকরণ নিম্নরূপ: 'শৃঙ্গার', 'হাস্য', 'করুণ', 'বীর', 'রৌদ্র', 'ভয়ানক', 'বীভৎস' ও 'অদ্ভুত'। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—শৃঙ্গারের অর্থ 'রতি', হাস্যের অর্থ 'হাসি', করুণের অর্থ 'শোক', বীরের অর্থ 'উৎসাহ', রৌদ্রের অর্থ 'ক্রোধ', ভয়ানকের অর্থ 'ভয়', বীভৎস (বা জুগুপ্সা)-র অর্থ 'ঘৃণা', অদ্ভুতের অর্থ 'বিস্ময়'। কাব্যের বেলায় 'শান্ত' নামে আর একটি রস যুক্ত হবার ফলে সাকুল্যে 'নবরস' সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া 'বাৎসল্য রস', 'ভক্তিরস' প্রভৃতি যোগ করলে রসসংখ্যা প্রায় বারটি দাঁড়ায়।

কাব্যের পরিধিতে আমরা চাঁদের আলো, কোকিলের ডাক, বিরহ, মিলন, শৃঙ্গারাদি নানা বিষয়ের শ্রবণ-স্পর্শন-মনন প্রভৃতি দ্বারা এক এক রকম রসভাব সঞ্চারে প্রয়াসী হই। কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় আমাদের হাতে থাকে একটিমাত্র বস্তু; সেটি হল রাগ; তাকে নানা ছন্দে, বর্ণে, তালে ও অলংকারে ভরিয়ে আমরা রসভাব জাগাতে সচেষ্ট হই।

ভরত-বর্ণিত উক্ত আট রস আসলে নাট্য-সঙ্গীতেই প্রযোজ্য; তবুও রাগসঙ্গীতে যে এগুলি অপ্রযোজ্য, সে কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিটি স্বর এবং প্রতিটি স্বরাশ্রিত শ্রুতিকে এক একটি বিশেষ রসের ধারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোন রাগ আমাদের মনে গভীর দাগ কাটে তাতে আমরা কোন এক রস অনুভব করি। তবে কোনও একটি বিশেষ স্বর বা স্বরাশ্রিত কোনও একটি শ্রুতি যে একটি বিশেষ রসভাব বহন করে বা তার প্রতিক্রিয়ায় বা ফলশ্রুতিতে যে আমাদের মনে রস সঞ্চারিত

হয়, এরূপ বোধ করি না ; কোন সুযুক্তি দিয়ে সেটি প্রমাণও করতে পারি না। কতকগুলি স্বরের ব্যবহার-পরম্পরায় আমাদের মনে কোন এক রসভাব জাগিয়ে তুলতে পারে, সে কথা মানা যায়।

এ কথা জোর করে বলা যায় যে শুধু রাগ বা কোন একটি বিশেষ স্বর প্রকৃতভাবে রাগরস সৃষ্টি করে না। সংযুক্তভাবেই রসভাব ফুটিয়ে তোলে, এমন কিছু উপাদান তার সঙ্গে থাকে। গানের ক্ষেত্রে তার বাণী ও কণ্ঠস্বর, যন্ত্রের ক্ষেত্রে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। রসসৃষ্টিতে আধার হল এক প্রধান উপাদান। তা ছাড়া রাগের রচনা-কৌশল, তার মধুর ভাব, রাগাশ্রিত কোন বিশেষ স্বরের বিশিষ্ট প্রয়োগ ও পরিবেশনের নিপুণতাই আধারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রস-সৃষ্টি করে।

বর্তমানে অনেকের ধারণা সঙ্গীতরস এক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বস্তু ; এই বস্তু পূর্ববর্ণিত আট রসের আওতার বাইরে ও একটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন রস। একান্তভাবে অনুভূতির যে বস্তু হৃদয় রসের গভীরতার মধ্যে আমাদেরকে অবগাহন করায় এবং যাকে লৌকিক ভাষায় বোঝান যায় না, এমন এক রসভাব আমাদের রাগে আছে। এই রস সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক, বাজার চলতি রস নামে একে ধরা যায় না, বা অভিহিত করা যায় না। এটি কেবলমাত্র উপলব্ধির দ্বারাই লাভ করা যায়।*

রাগের সংজ্ঞা ও তার ইতিহাস

পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় যে আদি ছয় রাগের জন্মদাতা হলেন স্বয়ং মহাদেব ও দেবী পার্বতী। দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চানন : তাঁর পাঁচটি আনন থেকে জন্ম হল 'শ্রী', 'ভৈরব', 'পঞ্চম', 'বসন্ত' ও 'মেঘ' এই পাঁচটি রাগের, আর পার্বতীর মুখ থেকে জন্ম হল নট-নারায়ণ রাগের। সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই রাগ রাগিণী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায় : যেমন **ব্রহ্মার মতে** গিরিজাপতির সদ্যোজাত (ঊর্দ্ধ) মুখ থেকে বেরোলেন 'শ্রীরাগ' ; বামদেব (পূর্ব) মুখ থেকে 'বসন্ত' ; অঘোর (দক্ষিণ) মুখ থেকে 'ভৈরব' ; তৎপুরুষ (পশ্চিম) মুখ থেকে 'পঞ্চম' এবং ঈশান (উত্তর) মুখ থেকে 'মেঘ'। আবার **ভরত মতে** বলা

* গ্রন্থকারের 'সঙ্গীতে রসসৃষ্টি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : "মাসিক তৌর্যত্রিক" পত্রিকা, পূজা-সংখ্যা, (১৯৬৭)।

হয় যে শঙ্করের অঘোর (দক্ষিণ) মুখ থেকে 'ভৈরব' ; তৎপুরুষ (পশ্চিম) মুখ থেকে 'শ্রী' ; সদ্যোজাত (আকাশ বা উর্দ্ধাঙ্গ) মুখ থেকে 'মেঘ' ; বামদেব (পূর্ব) মুখ থেকে 'দীপক' ; ঈশান (উত্তর) মুখ থেকে 'হিন্দোল' ; এবং পার্বতীর মুখ থেকে 'মালকোশ' রাগের জন্ম হয়। কোন মতটি ঠিক, কোন মতটি বেঠিক, এ নিয়ে তর্ক করে বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের কোন নূতন অধ্যায় আমরা রচনা করতে পারব না। মহাদেবের কোন মুখ থেকে কোন রাগের জন্ম হয়েছিল সেটা জেনে আজকের দিনে বিশেষ লাভ নেই ; কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণেই জানার প্রয়োজনীয়তা। এই ধরণের নানা পৌরাণিক কাহিনীই আমাদের রাগের আদি ইতিহাস।

শাস্ত্রে রাগ মাত্রকেই গম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক বলা হয়েছে ; এদের গতি মন্থর, চটুলতা এদের মধ্যে মোটেই দেখা যাবে না। এরা শুদ্ধ জাতিবিশিষ্ট, এবং নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এদের থাকবে, এসব বলা হয়েছে। রাগিণীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এরা রাগেরই অংশ-বিশেষ, এরা চটুল ভঙ্গীর ধারক এবং শৃঙ্গারাদি রস-প্রকাশের উপযুক্ত। রাগ ও রাগিণীর আর বিশেষ কোন তফাৎ কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না। একমাত্র রাগাদির ধ্যানের বাণীর মধ্যেই রাগ ও রাগিণীর বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া বর্তমানে কোন কিছু বোঝানও শক্ত।

বর্তমানে নট-নারায়ণ রাগিণী বলে তার ধ্রুপদ বা খেয়াল কেবলমাত্র করুণ ও শৃঙ্গার রসাত্মক করে গাওয়া হয়, এমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। মালকোশ রাগের গান কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর বীর রসাত্মক হবে এমন কথাও নয়। অবশ্য তখনকার দিনের রাগরাগিণীরা অনেকেই ভিন্নরূপে নূতন সাজে সেজে আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে তাই বর্তমানে প্রচলিত রাগরাগিণীর মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত।

শাস্ত্র পাঠে দেখা যায় যে ভরত মুনির আমল থেকেই এদের বেশী প্রচার। ভরতের আগে প্রাচীনকালে 'রাগ' নামে কোন শব্দ আমরা দেখতে পাই না। সেকালের গ্রাম রাগ বা জাতি গানের কথা যা পাওয়া যায় সেগুলি বর্তমানের রাগ গাইবার রীতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতেই প্রথম আমরা রাগ নামটি পাই। প্রচলিত এই সমস্ত রাগরাগিণীর স্রষ্টা যে প্রকৃত কারা ছিলেন তার সঠিক কোন হদিস পাওয়া যায় না। আজকের মত তখনকার দিনেও বিশেষ বিশেষ মতবাদ ছিল একথা আগেই বলেছি, যথা—ভরত মত, কল্লিনাথ মত, ব্রহ্মা মত, হনুমন্ত মত ইত্যাদি এবং কোন একজন শিল্পীর দ্বারা গীত কোন

একটি রাগ অপরের দ্বারা অন্যভাবে গীত হত। নিচেকার পৌরাণিক গল্পটিই তার প্রমাণ।

নারদ মুনিকে তখনকার দিনে একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং ঔপপত্তিক তৌর্যত্রিকে তার বিশেষ জ্ঞান থাকায় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁকে একজন মত-গ্রাহ্য ব্যক্তি অর্থাৎ Authority বলে মান্য করা হত। রাগ-রাগিণীদের সঠিকভাবে গাইতে পারেন, এ গর্বও তাঁর ছিল। একদিন বিষ্ণুর দরবারে গাইবার সময়ে নারদ মুনির সেই অহঙ্কার ফুটে উঠে। অন্তর্যামী বিষ্ণু নারদের অহঙ্কার খর্ব করার মানসে সভাভঙ্গের পর মুনিকে নিয়ে গন্ধর্বলোকে বেড়াতে বেরলেন। পথে যেতে যেতে দেখা গেল কয়েকটি সুপুরুষ যুবক ও সুশ্রী যুবতী হাত-পা ভাঙ্গা অবস্থায় পথের ধারে পড়ে আছে। নারদ তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের এমত অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, "আমরা হতভাগ্য রাগ-রাগিণীর দল, নারদ নামে এক অবাচীন গায়ক অশুদ্ধভাবে ভিন্নরূপে আমাদের গাওয়ার ফলে আজ আমাদের এই হাল। আমরা নারায়ণের কাছে এই মুনিকে রাগ গাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আর্জি জানিয়েছি, কবে তাঁর দয়া হবে জানি না।" মুনির অহঙ্কার মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বিষ্ণুর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি সরে পড়লেন। এই গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হতে পারে। নারদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে সঙ্গীতশাস্ত্রে। নারদ ২।৩ জন আছেন, ইনি কোন নারদ তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। আসলে এমন ঘটনা ঘটেছিল কিনা, তাও জানা নেই। তবে তখনকার দিনেও যে রাগরাগিণী সম্বন্ধে নানা মতভেদ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাগ গোষ্ঠী-করণের উপায় হিসাবে প্রত্যেক রাগের সঙ্গে কয়েকটা রাগিণী জুড়ে তাদের রাগভার্যা নামে চালানো হয়েছিল। রাগ-রাগিণীদের মনে রাখার জন্যে যখন 'মেল' সৃষ্টি হয়নি, তখন এটাই তাঁরা রাগ বিভাগের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেছিলেন। তখনকার দিনে সমাজে বহু-বিবাহ গণ্য ছিল; প্রত্যেক উচ্চকুলশীলসম্পন্ন ব্যক্তির বা রাজা মহারাজাদের সকলেরই একাধিক ভার্যা ছিল। অতএব সহজে মনে রাখার জন্য রাগ মহারাজদের প্রত্যেকের ছয় ছয়টি করে স্ত্রী ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল, এরকম ভাবতে আপত্তি কি? রাগের কাঠামোর সঙ্গে রাগিণীর কাঠামোর মিল প্রায় বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় না। তার কারণ তখনকার দিনে তাদের ঠাট হিসেবে ভাগ করা হয়নি।

রাগের সংজ্ঞা সঙ্গীতশাস্ত্রে আমরা যা পাই, সেটি হচ্ছে—

"যোঽসৌ ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥"

—অর্থাৎ যে ধ্বনি বিশেষ স্বর ও বর্ণে ভূষিত হয়ে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'রাগ' বলে থাকেন। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে রাগ এবং রাগিণী উভয়কেই এক 'রাগ' আখ্যায় বর্ণিত করা হয়েছে, অতঃপর আমরাও রাগ-রাগিণী উভয়কেই 'রাগ' নামে ডাকব। অবশ্য রাগের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা রাগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারব না। আজকের দিনে নিত্য নব নব সৃষ্টির উদ্দীপনায় নানা ধরণের সুর-মিশালীতে, নানা ঢঙের ও চালের নিত্য নূতন গানে রাগের দিশা সঠিকভাবে পাওয়া না গেলেও অনেকের চিত্তরঞ্জন করতে এরা যে সমর্থ, একথা অস্বীকার করতে পারি না। রং ও মেজাজে ভরপুর এই ধরণের গান গোঁড়া শাস্ত্রীয় সাঙ্গীতিক ব্যাতিরেকে অনেকেরই চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ। রাগের সংজ্ঞায় যদিও 'রঞ্জয়তি' কথাটা রয়েছে, তবুও এই ধরণের চলতি গানের স্বরবিন্যাসকে নিশ্চয়ই আমরা রাগ বলতে পারব না, তাছাড়া রাগের রঞ্জকত্ব গুণ সম্বন্ধেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কোন রাগ গীত হলে তাতে সকলের মনোরঞ্জন হবেই, একথা হলফ করে বলা যায় না। একের কাছে যা ভালো লাগে, অন্যের কাছে তা নাও লাগতে পারে। রাগের যে দশবিধ লক্ষণ যথা—গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ষাড়বত্ব, ওড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার, এগুলোর যথাবিধি প্রয়োগ বা বিশেষ বিশেষ রাগ-রূপ প্রকাশক স্বর-বিন্যাস, বাদী, সম্বাদী, লঙ্ঘন ইত্যাদি নানা নিয়মকানুন বজায় রেখে কোন রাগ গীত হলেই যে সেটি সকলের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রাগ বস্তুটি তাহলে কি? রাগ হচ্ছে বহুগুণসম্পন্ন এমন একটি বিশেষ স্বর-মিল (melody), যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তার প্রশস্ত বিস্তারে, তার নিজস্ব বিকাশের মাঝে আছে নানা খুঁটিনাটিযুক্ত ব্যাকরণ, অথচ সেই নিয়মগুলিই তার চরম কথা নয়। রাগ সম্বন্ধে কোন ধারণায় আসতে হলে ধৈর্য ধরে অনুশীলন করতে হবে, তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কোন স্বর কোন 'কন্'-এর আশ্রয় নিচ্ছে, কোনটি কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে, কোথায় রাগটি এসে শেষ হচ্ছে,—এসব দিকে বিশেষ

লক্ষ্য রাখলে তবেই রাগকে চেনা যাবে। রাগ তার সংজ্ঞার বহু ঊর্দ্ধে বিচরণ করে; অনুভবের জিনিষকে ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়, তাই রাগের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুরূহ। তবুও সাধারণভাবে এখন আমরা রাগের সংজ্ঞা এইভাবে ধরতে পারি—কয়েকটি স্বরধ্বনি যখন বিশেষ বিশেষ বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে একটি নিজস্ব ধারায় ও আবেদনে আমাদের প্রাণে বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ এক বিশেষ রসভাবে ভরপুর সেই স্বর-মিলকে আমরা **"রাগ"** বলতে পারি।

"সঙ্গীত দামোদরে" রাগের জন্মকথার পৌরাণিক কাহিনীর নিদর্শনস্বরূপ এক শ্লোক পাওয়া যায়:

"গোপীভির্গীতমারব্ধং একৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগানাং সহস্রানি তু ষোড়শঃ॥"

রাগ-সৃষ্টির ইতিহাসে তার উৎপত্তির কথায় এটিকে প্রামাণ্য বলে না ধরতে পারেন তবে রাগ রচনা যে এক একজনের চেষ্টায় এক একটি করে রচিত হয়েছিল, এবং বহুর চেষ্টাতেই বহু রাগ রূপ নিয়েছিল, সেকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আগেই বলেছি রাগরচনার সত্যকারের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কাজেই এই ধরণের ইতিহাসেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

স্বরলিপি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অতি প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯ শতকের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে কোন স্বরবিন্যাস অর্থাৎ স্বরকে লিপিবদ্ধ রাখার উচ্চ মানের কোন সুষ্ঠু সাংকেতিক চিহ্ন ছিল বলে জানা যায় না। প্রকৃত স্বরলিপির অভাবে আমাদের অতীত সঙ্গীতের বহু মূল্যবান (সংগ্রহ ও রচনা) সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কিছুদিন পূর্ব থেকে স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁদের সঙ্গীতের ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির প্রমাণ পাওয়া যায়। অতিপ্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব কালে ভারতবর্ষে স্বরলিপি প্রথা প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর "সঙ্গীত সার" পুস্তকের ২য় সংস্করণে ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন - "অতি প্রাচীন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রমাণ আছে, ভারতবর্ষে পূর্বে স্বরলিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। গমক, মূর্চ্ছনা, তাল, বাট, মাত্রা প্রভৃতি জ্ঞাপক চক্র গবাক্ষাকৃতি প্রভৃতি নানা জাতীয় চিহ্ন, ও বিশ্রাম জ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন তৎকালে ব্যবহৃত হইত।" স্বরলিপির বিষয় বিশদভাবে জানার জন্য তিনি Asiatic Researches Vol. III দেখতে বলেছেন। আমাদের হাতে সঠিক কোন প্রমাণ না থাকায় বর্তমানে আমাদের দ্বারা এই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হল না। গ্রীক ইতিহাসের উপর নির্ভরে জানা যায় যে বিখ্যাত দার্শনিক গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস দ্বারাই ইউরোপে স্বরলিপি প্রথা প্রথম সংস্থাপিত হয়। পোকক সাহেবের লেখা India in Greece নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে পিথাগোরস সাহেব ভারতবর্ষ থেকে বহুবিধ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই সকল বিষয় প্রবর্তন করেন। Barney সাহেব তাঁর বিখ্যাত History of Music গ্রন্থে বলেছেন—খৃঃ দশম শতাব্দীতে ওজ নামক একজন রোমীয় মনক কর্তৃক রৈখিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথম সৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বন্ধে লেখা আমাদের উপপাদ্য বিষয় নয়, অতএব আমরা আমাদের স্বরলিপি সম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ করছি। অতীতে আমাদের কোন স্বরলিপি চিহ্ন ছিল না এরূপ নয়, তবে কোন সুষ্ঠু সাংকেতিক চিহ্ন ছিল না বলেই আমাদের ধারণা। কিছুদিন আগে থেকে আমাদের দেশে এই বিষয়ে নানা গবেষণা চলছে। পণ্ডিতেরা এখন ভাষার বর্ণমালার মত উচ্চতর মানের কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে আমরা সেই কারণে আমাদের অধুনা প্রচলিত হরেক রকমের স্বরবিন্যাসকে যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে

লিপিবদ্ধ করতে পাচ্ছি। আমাদের স্বরলিপিতে আমরা গানের চলাফেরা ও তার প্রকৃত কাঠামো পাই, কিন্তু স্বরলিপিকৃত গানের ভাব, স্বরের শ্রুতির বাহার ও নানা ঢং-এর দোলনকে ধরতে পারি না। আমাদের গানে গায়কের নিজস্বত্ব বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সুযোগ আছে, যেটি কোন বিশেষ গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবহারে ফুটে ওঠে। গানের প্রতিটি স্বরের বল, প্রস্বন, গমকভঙ্গী, কম্পন, মীড়, গীটকারী প্রভৃতির বিচিত্রতা, যা কোন একজন কুশলী শিল্পী তাঁর গানে বা বাজনায় প্রকাশ করেন সেই স্বর-বৈচিত্র বুঝবার মত ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রকাশের যোগ্য স্বরলিপি আজও আমরা তৈরী করতে পারিনি। আমাদের গানকে স্বরলিপির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় সঙ্গীতে স্বরগাথক (Composer)-এর স্বরসঙ্গতি (Composition) মতই গায়ক বা বাদককে গাইতে বা বাজাতে হয়, তাই ওঁদের গান বা বাদনভঙ্গিমা স্বরলিপি দেখে অনুধাবন করা কঠিন নয়। আমাদের সঙ্গীতের প্রতিটি স্বরবিন্যাসের বল, প্রস্বন, স্বরের দোলন, মাত্রা বিভাগ প্রভৃতি বজায় রেখে সঠিক স্বরলিপি লেখা খুবই কঠিন। স্বরলিপি দেখে সম্ভবমত স্বরলিপিকৃত গান বা গতের সম্বন্ধে মোটমাট একটি ধারণা যাতে আমাদের হয় ও সাধারণভাবে সেটি পুনঃপ্রকাশ করতে পারি সেরকম একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি।

এইবার খৃষ্টপূর্ব কাল অর্থে বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত স্বরলিপির ধারাবাহিক ইতিহাস, যাতে সহজেই স্বরলিপি প্রথার ক্রমোন্নতির বিষয় ও কোন ধরণের স্বরলিপি কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি জানা যায় তাই লিখছি।

খৃষ্টপূর্ব কাল ঃ সালতারিখের হিসাব ১৫০০ খৃঃ পূঃ ধরা যায়।

১। **রেখাভিত্তিক স্বরলিপি ঃ** বেদের কালে ভাষা বর্ণের মাথার উপর, ও নীচে লম্বা ও তীর্যক রেখা ব্যবহার করে উদাত্তাদি স্বর বোঝান হত। খৃঃ পূঃ ১০০০-৭০০-র মাঝামাঝি সময়, **সংখ্যাভিত্তিক স্বরলিপি**—ভাষা বর্ণের মাথায় ১, ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে অনুদাত্তাদি স্বর বোঝান হত। এবং সংখ্যার সঙ্গে (র) অক্ষর যুক্ত করে দীর্ঘ স্থায়ীত্বও বোঝান হত। পরবর্তী কালে যখন প্রথমাদি স্বরের ব্যবহার আরম্ভ হয় তখন ১ ২ ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা স্বরগুলিকে প্রকাশ করা হত। সে সংখ্যা ভাষার মাথায় বা পাশে ব্যবহৃত হয়ে স্বরের স্থায়িত্ব, দীর্ঘত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করত। বেদের কালে কোন স্বরলিপি চিহ্নটি আগে,

আর কোনটি পরে তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। আন্দাজমত একটিকে আগে ও অন্যটিকে পরে লেখা হয়েছে। সাম গানের বা বেদ গানের আগে মহেঞ্জোদাড়োর খননে আবিষ্কৃত নানা ভাস্কর্যের মাঝে সঙ্গীতের উৎকর্ষতার নিদর্শন পেলেও আমরা স্বরলিপির সঙ্কেতের সন্ধান পাই না। এই শিল্পকলা প্রায় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগের অর্থাৎ বৈদিক যুগেরও আগে বলে অনেকের ধারণা।

খৃষ্ট পশ্চাৎকাল ঃ

১। **সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি ঃ** প্রথম দেখা যায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে কিছু প্রাচীন, মতঙ্গের দ্বারা প্রচারিত। এতে স্বরাক্ষরের সাহায্যে অর্থাৎ স র গ ম প ধ ন-র সাহায্যে গান বা গত্ বোঝান হত। সা রা গা ইঃ লিখে দীর্ঘত্ব বা স্থায়ীত্ব বোঝান হত। মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশীতে মন্দ্র ও তার স্বর বোঝাবার কারণে কোন বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হত কিনা সেটি সঠিক ভাবে জানা যায় না। কারণ দুই একটি মন্দ্র চিহ্ন ছাড়া বৃহদ্দেশীতে আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। বৈদিক যুগে সামবেদ প্রভৃতিতে যে সব গানের কথা জানা যায়, সে সব আজ লুপ্ত।

২। **অক্ষরচিহ্নযুক্ত সরগম স্বরলিপি ঃ**—হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর পদ্ধতির প্রসঙ্গে আমরা কুদিমিয়ামালাইয়ের পাথরে খোদা স্বরলিপি অথে শিলালিপির কথা বলেছি। এর বয়স ৭০০ খৃঃ ধরা হয়। এখানে স র গ ম প্রভৃতির সঙ্গে আকার ইকার উকার লাগিয়ে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর প্রকাশ করার নমুনা দেখা গেলেও এটি সম্পূর্ণ নয়, কারণ তাল মাত্রা প্রভৃতির চিহ্ন এতে নাই।

৩। তেরশো খৃষ্টাব্দের অল্প কিছু আগে শার্ঙ্গদেবের আবিষ্কৃত উচ্চতর মানের স্বরলিপি আমরা দেখতে পাই। এটিও সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি। স, রি, গ, ম = লঘ্ স্বর, সা, রী, গা, মা = গুরু স্বর, স্বরের নীচে বিন্দুযুক্ত (স̣) মন্দ্র স্বর ও স্বরের উপরে দাঁড়ি যুক্ত (স) চিহ্ন দ্বারা তার স্বর বোঝান হত। সরি ইত্যাদি জোড়া থাকলে লঘ্ মাত্রিক স্বর বোঝাত। স্বরের নিম্নে ভাষাক্ষর না থাকলে, যথা—রগ = ভাষা বর্ণের অ-প্রয়োগ, বিলোপ বা টান। শার্ঙ্গদেবের স্বরলিপির তিনশো বছর আগেই তালের লঘু-গুরু মাত্রা বোঝাবার জন্য অবশ্য । S O প্রভৃতি চিহ্নগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই রেখাদের মধ্যে আজ আমরা দণ্ড ' । ' বা ঋজু রেখাটিকে দণ্ড মাত্রিক স্বরলিপিতে 'ঌ' এই অবগ্রহটিকে ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপিতে,

'০' শূন্য চিহ্নটিকে বিষ্ণুদিগম্বরজীর স্বরলিপিতে ও আকার মাত্রিকে দেখতে পাই। শার্ঙ্গদেবের কালে আমরা প্রকৃত বা বিকৃত স্বরের পৃথক চিহ্ন দেখতে পাই না।

৪। পনেরশো শতকে অর্থাৎ ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রাণা কুম্ভ শার্ঙ্গদেবের অনুকরণে প্রায় একই প্রকারের স্বরলিপি প্রকাশ করেন (সঙ্গীতরাজ—মহারাণা কুম্ভ। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নেপাল রাজ্য সংস্কৃত গ্রন্থমালা—৫)

৫। সতেরো শতকে সোমনাথ রাগবিরোধে (১৬০৯ খৃঃ) বীণাবাদ্যের বিষয়ে

ഗ S

লিখতে গিয়ে কিছু অলংকার চিহ্ন যোগ করেন (স স স স স) কিন্তু তবুও

∞ ০ ᑌ

স্বরলিপি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। জনক মেল ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ উন্নত ধরণের কোন স্বরলিপি আমরা সে কালের কোন পুস্তকেই দেখতে পাই না। উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বাংলা দেশেই প্রথম বিশেষ ধরণের স্বরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলি জনক মেল প্রভৃতি ছাড়াই সম্পূর্ণ। নানা গ্রন্থ থেকে সাল তারিখ ও অবিষ্কারকর্তার নাম আমরা যেরূপ পেয়েছি সেইরূপই লিখছি।

৬। ১৮৫৮ সালে প্রথম তিন রেখার **দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি** ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ঐক্যতানে ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়।

৭। ১৮৬৭ খৃঃ—ষ্টাফ্ নোটেশন পাশ্চাত্যের অনুকরণে কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত। (বঙ্গৈকতান গ্রন্থ)

৮। ১৮৬৮ খৃঃ—তিন লাইনের **রৈখিক-দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি**—"ঐকতানিক স্বরলিপি"—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে সংগৃহিত)

৯। ১৮৬৯ খৃঃ—**কষি বা তির্যক মাত্রিক স্বরলিপি**—"তত্ত্ববোধিনী"—দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর। তিন লাইন দণ্ডমাত্রিক পাকাপাকি ভাবে প্রকাশিত হল—("সঙ্গীত সার"—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী)।

১০। ১৮৭২ খৃঃ—**সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি**—১ = শুদ্ধ ম (অর্থে কোমল ম) ২ = কড়ি ম (অর্থে তীব্র ম) ইত্যাদি পাশ্চাত্য ট্যাবলেচরের অনুকরণে গঠিত। (বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদর্শন)।

১১। ১৮৭৩ খৃঃ—**কর্ণাটক সর্গম স্বরলিপিতে** অব্যবহৃত লঘু স্বরের পরিবর্তে কমার (,) ব্যবহার করা হয়েছিল। (History of Indian Music by Sambomurthy) এটিকে কর্ণাটকের প্রাচীন পদ্ধতির

মেল ভিত্তিক স্বরলিপিও বলা চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বরলিপির ভিত্তির উপর নির্ভর করেই এটি রচিত হয়েছিল। কমা (,)=এক অক্ষরকাল।

১২। ১৮৭৬ খৃঃ—**পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি**—অর্থাৎ এক লাইনের দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১৩। ১৮৭৭ খৃঃ—অমৃত সেনের ঘরাণাদারেরা প্রকাশ করলেন **হিন্দী সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি**। ০ = ম, ১ = কড়ি ম-ইঃ।

১৪। ১৮৮০ খৃঃ—**কষিমাত্রিক স্বরলিপি** নিয়ে আরও নতুন গবেষণা আরম্ভ করলেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ কষিমাত্রিককে বিবর্তিত করা হয়েছিল।

১৫। ১৮৮০ খৃঃ—শ্রীযুত আন্নাঘারপুরে মারাঠি ভাষায় প্রথম স্বরলিপি প্রকাশ করলেন। (আন্নাঘারপুরে স্বরশাস্ত্র)

১৬। ১৮৮৩-৮৫ খৃঃ—**সার্গম স্বরলিপি** অর্থাৎ আমরা যাকে **বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপি** বলে থাকি। ইংরাজি টনিক সলফা স্বরলিপির অনুকরণে শ্রীযুত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটিকে **বাংলা টনিক সলফা** বলা হয়। এই একই সময়ে আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া **ষ্টাফ্ নোটেশন** কায়দার স্বরলিপি প্রচার করেন।

১৭। ১৮৮৫ খৃঃ—রেখামাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশিত হল। সা, রি, রে, গ, গা, ম, মা, পা, ধ, ধা, নি, নী,—বার অক্ষরের **রেখা ও ড্যাস মাত্রিক স্বরলিপি** বলা চলে। শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী (বালক ১২৯২)

১৮। হিন্দী স্বরলিপি প্রকাশ করলেন দণ্ডমাত্রিকের অনুকরণে মৌলা বকস।

ঘিবে খাঁর ঘরানার ধারক। (স, ঋ▽, ঋ, গ▽, গ, ম, ম-, প, ধ▽, ধ, ন▽, নি, সা)
(সঙ্গীত প্রকাশিকা)

১৯। ১৮৮৮ খৃঃ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংখ্যা মাত্রিক স্বরলিপির নবীন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এটিও দ্বাদশাক্ষর—স, রো, র, গো, গ, ম, মা, প, ধো, ধ, নো, ন, স̄ ; স১ বা র১গ = ১ মাত্রা। (১২৯৫,—ভারতী ও বালক)

২০। ১৮৯১ খৃঃ—প্রথম **আকার মাত্রিক স্বরলিপি** জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুর আবিষ্কার করেন। এই ধরণের স্বরলিপির ইনিই প্রথম প্রকাশক। স ল ঋ ঙ্গ গ ম হ্ম প দ ধ ঞ ন ; সা = ১ মাত্রা, র্স চড়া ইঃ।

২১। ১৮৯২—৯৩ খৃঃ—দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ ঘটলো; পণ্ডিত বেঙ্কটেশ শাস্ত্রীর প্রকাশে। এদিকে উত্তর ভারতের বাংলাদেশে তখন হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলা দেবী সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে নূতনভাবে গবেষণা করছেন। ১৮৯৩—আকারমাত্রিক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবর্তিত হল। (তত্ত্ববোধিনী)

২২। ১৮৯৭ খৃঃ—আকারমাত্রিক স্বরলিপিকে পাকা করে সাজালেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৩। ১৯০০—৪ খৃঃ—তিরুবোত্তিউরত্যাগেয়র এবং সুব্বারাম দিক্ষিতার দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ সাধন করলেন। (History of Indian Music by Sambomorthy) := ২ অক্ষর কাল, তারার স্বরচিহ্নে ˙ বিন্দুচিহ্ন। মাত্রার অংশ বোঝাতে কষিচিহ্ন (—) এবং বিকৃত স্বর বোঝাতে ইউরোপীয় accidental #, b, ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন।

২৪। ১৯০৫ খৃঃ—মারাঠি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের স্বরলিপি প্রকাশিত হল।

২৫। ১৯১০ খৃঃ—মারাঠি পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর কর্তৃক ত্রি-রেখা ভিত্তিক স্বরলিপি প্রকাশিত হল।

২৬। ১৯২৩ খৃঃ—বেনারসের পণ্ডিত সুদর্শনাচার্যের দ্বারা হিন্দুস্থানী **সংখ্যাস্বারিক স্বরলিপির** ব্যবহার প্রচলিত হয়। (—সঙ্গীত সুদর্শন, পণ্ডিত সুদর্শনাচায—দেখুন)

২৭। ১৯৩১ খৃঃ—পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের ত্রিরেখা স্বরলিপি—একরেখায়। (তাঁর ছাত্রদের দ্বারা বিবর্তিত)

২৮। ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদার আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—**স্বরদণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি**—

২৯। সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল, মহাশয় কৃত **স্বরপদমাত্রিক স্বরলিপি**—

৩০। ১৯৩৫—৩৭ খৃঃ কর্ণাটক **কলামাত্রিক স্বরলিপি**-র সরগম রোমান

অক্ষরে তৈরী, এক মাত্রার চিহ্ন নাই। s, r, g, m, etc. ১ অক্ষরকাল S R G M etc. ২ অক্ষরকাল।

৩১। ১৯৪৪—৪৫ সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত **রেখা-স্বারিক স্বরলিপি**।

৩২। ১৯৫৩ খৃঃ—ডাঃ বিমল রায়, এম. বি. প্রবর্তিত **প্রতীক স্বরলিপি**—১৯৫৩, "সঙ্গীত" মাসিক পত্রিকা হাথরাস।

বহু ব্লক ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় সকল প্রকার স্বরলিপির উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হল না বলে আমরা একান্ত দুঃখিত।

আকারমাত্রিক, দণ্ডমাত্রিক ভাতখণ্ডেজী ও বিষ্ণুদিগম্বরজীর স্বরলিপির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পৃথক ভাবে দেওয়া হল। উত্তর ভারতে বর্তমানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও বিষ্ণুদিগম্বরজী প্রবর্তিত স্বরলিপি প্রায় সর্বত্র চলছে। বাংলাদেশে আকারমাত্রিক প্রধান ও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিই বেশী ব্যবহৃত হয় বলে এই চার প্রকারের স্বরলিপির চিহ্ন এখানে দেওয়া হল।

(এই প্রবন্ধের অধিকাংশ পুস্তকই সঙ্গীত সাহিত্য পরিষৎ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সৌজন্যে সংগৃহিত।) স্বরলিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখা মাসিক তৌর্যত্রিকে শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। (তৌর্যত্রিক)

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী প্রণীত হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতি ঃ—

শুদ্ধ স্বর ঃ সা রে গ ম প ধ নি।

কোমল স্বর ঃ রে গ ধ নি।

তীব্র স্বর ঃ (কড়ি) ম।

উদারার স্বর ঃ খাদের স্বর মন্দ্র সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি

মুদারা ঃ মাঝের স্বর, মধ্য সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি কোনও চিহ্ন থাকে না।

তারা বা তার সপ্তক ঃ চড়ার স্বর সা রে গ ম প ধ নি

এক মাত্রার এক একটি স্বর ঃ—সা রে এইরূপে আলাদা ভাবে লিখতে হবে।

এক মাত্রায় একাধিক স্বর হলে একত্রে লিখতে হবে ও তলদেশে এই চিহ্ন দিতে হবে। যথা—র্সার্সানিধনিধ -র্সা সারে সারেগম

এক স্বর একাধিক মাত্রা স্থায়ী হলে স্বরের পাশে ড্যাশ — চিহ্ন দিতে হবে। যথা, গ —, ম — —, প — — —

ক্রমান্বয়ে ২, ৩ ও ৪ মাত্রা বুঝাবে।

গানের কোন অক্ষরকে যদি একাধিক মাত্রা বোঝাতে হয়, তবে অক্ষরের পর S অবগ্রহ চিহ্ন দিতে হবে। যথা : য়া S S S S। য়া চার মাত্রাকাল স্থায়ী হবে। মোং S S S। মো' ¼ সিকি মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হয়ে আরো ¾ কাল স্থায়ী হবে।

স্পর্শ স্বর, কণ্, বা ভূষিকা বোঝাতে হলে স্বরের পাশে উপরের দিকে কোন স্বরের কণ্ লাগে সেটি লিখ্তে হবে।

যথা : ^ম^গ ^স^গ, ^র^গ ইত্যাদি।

স্বরলিপির মাঝে বক্র বন্ধনী থাকলে, বন্ধনীর মাঝের স্বরটি তার আগের ও পরের স্বরের সঙ্গে যুক্তভাবে এক মাত্রার মধ্যে বলে বুঝতে হবে।

যথা : (ম)=গমপম ইত্যাদি।

মীড়ের ক্ষেত্রে স্বরের মাথায় ⌒ এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

যথা : সাম, রেপ ইঃ

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ-বিভাগ দাঁড়ি দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হয়।

× দ্বারা সমের স্থান চিহ্নিত করা হয়। ফাঁকের ক্ষেত্রে ০ চিহ্ন দেওয়া হয়। সম চিহ্নকে প্রথম তাল ধরে ও ফাঁকটিকে তালের বিশ্রাম স্থান ধরে তালের প্রতিটি বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। তাল চিহ্নগুলি তালের বিভাগের প্রথম বোল বা প্রথম স্বরটির নিচে রাখা হয়। যথা :

মাত্রা সংখ্যা :

১	২	|	৩	৪	|	৫	৬	|	৭	৮	|	৯	১০	
ধা	S	|	ধি	ন্	|	ন	ক	|	ধি	ন্	|	ন	ক্	
×		|	০		|	২		|	৩		|	০		

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তি	টে	ক	তা	গ	দি	ঘে	নে
৪		৫		৬		৭	

বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করজী প্রণীত স্বরলিপি পদ্ধতি (পরিশোধিত)

শুদ্ধ স্বর : সা রে গ ম প ধ নি
কোমল স্বর : রে্ গ্ ধ্ নি্
তীব্র স্বর : (কড়ি) ম

উদারার স্বর : খাদের স্বর মন্দ্র সপ্তক সা রে গ ম প ধ নি।

মধ্য সপ্তক : সা রে গ ম প ধ নি। (মাঝের স্বর)

তার সপ্তক : সা রে গ ম প ধ নি। (চড়ার স্বর)

এক মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ চিহ্ন থাকে। সা রে।

অর্দ্ধমাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ o চিহ্ন থাকবে। সা

সিকি মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকবে। সা

⅛ মাত্রায় স্বরের নিম্নে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকবে। সা

কোন স্বর যদি ১½ মাত্রা কাল স্থায়ী হয় তবে সেই স্বরের নিচে ড্যাশ ও পাশে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা, সা = ১½ মাত্রা।

কোন স্বরের পাশে s অবগ্রহ চিহ্ন ও গানের বাণীর পাশে "o" শূন্য চিহ্ন থাকলে যথাক্রমে সেই স্বরের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব ও বাণী অর্থে অক্ষরের স্থায়ীত্বকাল বোঝায়। যথা গ ম র s s s তোমারি o o o।

কণ্ বা স্পর্শ স্বর বুঝাতে হলে স্বরের পাশে উপর দিকে স্পর্শ স্বর লেখা হয়।

যথা : সা^র গ^ম ইত্যাদি

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ বিভাগ, অর্থে (বার) তাল বিভাজক বা তাল-নিয়ামক রেখা অর্থাৎ দাঁড়ি দিয়ে তাল ভেদ বুঝান হয়।

সমের চিহ্নে "১" সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফাঁকের বেলায় যোগ চিহ্ন

+ ব্যবহার করা হয়। সম ও ফাঁক চিহ্ন ছাড়া তালের অন্যান্য ভাগগুলিকে মাত্রার সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

	১	২		৩	৪		৫	৬
মাত্রা সংখ্যা যথা :	ধিন্	ধিন্	|	ধাগে	তেরেকেটে	|	তিন্	না
তাল বিভাগ মাত্রা	—	—	|	০ ০	◡◡◡◡	|	—	—
	১			৩			৫	

৭	৮		৯	১০		১১	১২	
কৎ	তা	|	ধাগে	তেরেকেটে	|	ধি	না	|
–	—	|	০ ০	৩ ৩ ৩ ৩	|	—	—	|
+			৯			১১		

আকারমাত্রিক

শুদ্ধ স্বর : স র গ ম প ধ ন।

কোমল স্বর : র = ঋ গ = জ্ঞ ধ = দ, ন=ণ

কড়ি স্বর বা তীব্র : ম = হ্ম

উদারার স্বর চিহ্ন—স্বরের নীচে হসন্ত যথা : স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্

মুদারার স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা : স র গ ম প ধ ন।

তারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ্। যথা : র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন।

এক মাত্রার চিহ্ন (আকার চিহ্ন) যথা : 'া'

যথা—সা = ১ মাত্রা।

দুটি অথবা ততোধিক স্বর এক মাত্রায় হলে যথা : রগা=১ মাত্রা।
মপধা=১ মাত্রা
মপধনা=১ মাত্রা

দুটি বা ততোধিক স্বর আধ মাত্রায় হলে যথা—সরঃ=½ মাত্রা।
সরগমঃ=½ মাত্রা বুঝায় ইত্যাদি।

দেড় মাত্রার চিহ্ন (ঃ½) যথা—সাঃ = ১½ মাত্রা, সাঃ+গঃ ½ মাত্রা দিলে দুই মাত্রা বুঝায়।

কণ্ স্পর্শ বা ভূষিকা : মূল স্বরের উপরে বাঁপাশে ছোট আকারে স্পর্শ স্বরটি লেখা হয়।

যথা—^ম^গা ^ব^জ্ঞা ইত্যাদি।

মীড় চিহ্ন—স্বরের নিচে বসে। যথা—সামা, সাপা, সাধা।

বিরামের চিহ্ন ও মাত্রার চিহ্ন একই স্বরের গায়ে লেগে না থাকলেও হাইফেন বর্জিত হলে সেটি হবে বিরাম= ।।

স্বরের মাথায় জোড়া দাঁড়ি দেখলে বুঝতে হবে এখানে থেমে গানের অন্য কলি

॥

ধরতে হবে অথবা গানটি শেষ হবে। যথা: গা।

পুনরাবৃত্তির চিহ্নে গুম্ফ বন্ধনী থাকে। যথা—{স র গ ম} এই অংশ দুইবার গাইতে হবে।

পুনরাবৃত্তির মধ্যে বক্র বন্ধনী চিহ্ন থাকলে বন্ধনী মধ্যস্থিত স্বরগুলি পুনরাবৃত্তি-কালে বাদ দিতে হবে।

যথা:—{র গ ম (প ধ)} ন ধ এতে গুম্ফ বন্ধনীস্থিত অংশটুকু দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করার সময় অর্থাৎ (প ধ) অংশটুকু বাদ দিয়ে একেবারে ন ধ অংশটি ধরতে হবে।

সরল বন্ধনী দিয়ে কোন স্বরের পরিবর্তন বোঝান হয়। এই পরিবর্তিত স্বর পূর্ব স্বরের মাথার উপর ব্রাকেটের মধ্যে রাখা হয়।

[মপা]

যথা—| সা রা গা মা] অর্থাৎ সা রা গা মা | গা রা গা মপা |

আবৃত্তির শেষে একটি দণ্ড রাখা হয় I, প্রত্যেক কলির শেষে জোড়া II (দণ্ড) দাড়ি বসে। কলির শেষে আস্থায়ীতে ফিরতে হলে আস্থায়ীর যেখান থেকে ধরতে হবে তার আগেও এই যুগল দাড়ি অর্থে দণ্ড চিহ্ন বসান হয়। কোন স্বরের মাথায় বিন্দু চিহ্ন থাকলে স্বরগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথক ঝোঁকে উচ্চারণ করতে হবে।

যথা—সা রা গা মা। (প্রতিটির মাথায় বিন্দু)

কোন মূল স্বরের রেশ যখন অন্য স্বরে এসে দাঁড়ায় তখন শেষের স্বরটি ক্ষুদ্রাক্ষরে

ম

মূল স্বরের ডান দিকের উপরে লেখা হয়। যথা—ধ

স্বরের নিচে গানের বাণী অর্থে অক্ষর না থাকলে স্বরের মাঝে হাইফেন বসে ও গানের লাইনে অক্ষর স্থানে শূন্য বসান হয়। যথা—

পধা	পমা	গরা	-গরা	সা	সা	-া	সা
দ০	র০	শ০	০০	ন	আ	০	শে

যদি স্বরের নিচে গানের হসন্ত যুক্ত অক্ষর থাকে তবে স্বরের পরিবর্তে মাত্রা বসান হয়।

যথা—রা	-া	-া	সা
চ	০	ন	দ্র

তালের চিহ্ন :

স্বরের উপর সমের চিহ্নে ১, ২, প্রভৃতি সংখ্যার মাথায় রেফ্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—১´; ফাঁক বা খালি চিহ্নে ০ শূন্য ও অন্যান্য তাল চিহ্নে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

দণ্ডমাত্রিক

শুদ্ধ সাতটি স্বর—স ঋ গ ম প ধ নি।

উদারার স্বরের চিহ্ন স্বরের নিচে বিন্দু—নি ধ প ম গ ঋ স।

মুদারার স্বর সহজ কোন চিহ্ন নাই—স ঋ গ ম প ধ নি।

তারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথার উপর বিন্দু—স ঋ গ ম প ধ নি।

কোমল স্বরের চিহ্ন ত্রিকোণ। স্বরের মাথার উপর এটি বসান হয়। যথা—

△ △ △ △
ঋ গ ধ ন এই চারটি স্বরই কোমল। কোমল ঋ, অতি কোমল ঋ

স্বরের মাথায় পতাকা চিহ্ন দিয়ে কড়ি বা তীব্র স্বরকে বোঝান হয়। যথা—ম

স্বরের স্থায়িত্ব বুঝানর কারণে স্বরের মাথায় দণ্ড চিহ্ন দ্বারা মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়। যথা ১ মাত্রা = স, ২ মাত্রা = স, ৩ মাত্রা = স, ৪ মাত্রা = স ইত্যাদি।

অর্দ্ধ মাত্রায় স্বরের মাথায় চন্দ্র চিহ্ন = স

সিকি মাত্রায় স্বরের মাথায় ডমরু চিহ্ন = স

এক অষ্টমাংশ ⅛ মাত্রা বুঝাতে স্বরের মাথায় নেত্র চিহ্ন বসান হয়। যথা : স

স্বর কম্পন অর্থে গমক বুঝাতে স্বরের মাথায় গজকুম্ভ চিহ্ন এইরূপ। যথা : স

যতবার গমক হইবে স্বরের মাথায় ততগুলি চিহ্ন বসিবে। যথা : স মানে ২ বার গমক।

স্বরের নিচে সরল রেখা দিলে আশ বুঝায়। যথা—রগমপ

স্বরের নিচে দুইটি সরল রেখা দিলে মীড় বুঝায়। যথা : রম

কণ্ বা ভূষিকা আকার মাত্রিকের মতনই। যথা : ^স^গ, ^র^ম ইঃ

গান বা গতের শেষে যুগল ছেদ চিহ্ন রাখা হয়।

মূর্চ্ছনার ক্ষেত্রে তরঙ্গিত রেখা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা সা ঋ

যেখানে বিলম্বিত গতিতে মূর্চ্ছনা যায় সেখানে বিন্দু রেখা ব্যবহৃত হয়। যথা : ঋ গ

ছেড় বাদনে ধনুশ্চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যথা :

's' অবগ্রহ চিহ্নটি যতি বা বিরাম চিহ্ন। স্বরের উপর এই চিহ্ন থাকলে চিহ্নিত স্থানে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হয়।

আকার মাত্রিকের মত এখানেও দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাৎ গুম্ফ বন্ধনীর (2nd Bracket) মাঝের স্বরগুলি দুইবার গাইতে হয়। যথা : { গ ম প ধ }

দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে প্রথম বন্ধনী (1st Bracket) থাকলে প্রথম বন্ধনীর মাঝের স্বরগুলি দ্বিতীয়বার গাইবার সময় বাদ দিতে হবে।

প্রথমে তাল চিহ্নে মোট তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হত।

তালের চিহ্ন :

+ যোগ চিহ্ন=সমের চিহ্ন

০ শূন্য চিহ্ন=ফাঁকের চিহ্ন

১=সম ও ফাঁক ছাড়া প্রতিটি তালের ক্ষেত্রেই তাল বিভাগের প্রথম স্বরের বা প্রথম মাত্রার উপর এই ১ সংখ্যাটি লেখা হত। বর্তমানে সম ও ফাঁক চিহ্ন ছাড়া প্রতিটি তালের কয়টি করিয়া বিভাগ আছে তাহা নির্দিষ্ট করার কারণে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যা, তাল বিভাজক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা : ১=প্রথম তাল, ২=দ্বিতীয় তাল, ৩=তৃতীয় তাল, ৪=চতুর্থ তাল ইত্যাদি।

প্রতিটি তালের বিভাগের মাঝে (Bar) দাঁড়ি অর্থে তাল বিভাজক (তাল নিয়ামক) রেখা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামের তাল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদের সমষ্টিতে বিভক্ত থাকে। যথা :

তিন তাল :—

+ | ৩ | ০ | ১ ||

। । । । | । । । । | । । । । | । । । । ||

ঝাঁপতাল :—

+ | ৩ | ০ | ১ ||

। । | । । । | । । | । । । ||

অনিবদ্ধ গীত

তালবন্ধন-মুক্ত রাগ আলাপ অথবা গীতকেই **অনিবদ্ধ গীত** বলা হয়।

(ক) আলাপঃ আলাপ শব্দটির অর্থ পরিচয় বা জানাশুনা। রাগের আলাপের ক্ষেত্রেও অর্থ ঠিক একই। রাগের আলাপে আমরা প্রকাশ করি রাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতটা। কোন রাগ সম্বন্ধে জানাশুনা যত বেশী থাকবে, সেই রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান যত গভীর হবে ততই সেই রাগকে আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করতে পারব। রাগের আলাপ পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। একটি রাগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় সহকারে তাকে বিশেষভাবে চর্চা করতে পারলে তবেই সেই রাগের স্পষ্ঠ আলাপ করা সম্ভব হয়।

আলাপের কায়দায় প্রাচীন পন্থারা ধ্রুপদাঙ্গীয় আলাপই পছন্দ করেন। আলাপে ফিকরাবন্দীর কায়দা, মূর্কীর ব্যবহার, ঠুংরীর চাল, বা চটুল তান প্রভৃতির ব্যবহার উচিং বলে বিবেচনা করেন না। কিন্তু আজকের দিনের আলাপে এসব নিয়ম সঠিক ভাবে মেনে চলা হয় না। অবশ্য ধ্রুপদগায়কদের মধ্যে অনেকেই এখনও এ নিয়ম মেনে চলেন। অধিকাংশ যন্ত্রীরাই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে থাকেন। যন্ত্রের শ্বাস (অথে দম) কম বলে অনেকেই আলাপে স্বরের দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতি বিশেষ ঝোঁক না দিয়ে মাধুর্যের কারণে আলাপে নানা চটুল অলংকার ব্যবহার করেন, ও জোড়ে এসে তানের ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরাও গান আরম্ভ করার পূবে অল্প বিস্তর চটুলাঙ্গের আলাপ করে থাকেন। খেয়ালীরা তাঁদের ঢিমা গানে স্বর বিস্তার জুড়ে রাগ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় দেন ও নানা অলংকারে রাগটিকে মধুর ভঙ্গিমায় ভরিয়ে তোলেন। খেয়াল গানে গানের আগে আলাপের প্রয়োজন তাই অল্প। আলাপের প্রথম দিকে মূর্কী, ফিকরাবন্দীর কায়দা, চটুল তান প্রভৃতি কোন কোন মতে দূষ্য হলেও যন্ত্রের আলাপে সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণে আজকের দিনের যন্ত্রীরা অনেকেই এগুলির ব্যবহার করে থাকেন। আলাপে এগুলির ব্যবহার প্রচলিত হলেও এদের ব্যবহার সীমিত থাকাই যুক্তিসঙ্গত। কাল-বিবর্তনে নানা পরিবর্তন আসে, তাকে মেনে নেওয়া স্বাভাবিক। পরিবর্তনের মাঝেই নূতনের আগমন ঘটে সেটি ঠিক তবে

পরিবর্তনের সুযোগে যথেচ্ছাচার না ঘটে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়।

আলাপের অঙ্গ ঃ

(১) **স্থায়ী ঃ** বর্তমানে আলাপ বিলম্বিত লয়ে আরম্ভ করা হয়। সাধারণতঃ মধ্য সপ্তকের ষড্‌জ অথবা রাগ প্রকাশক কোন একটি স্বর বা বাদী স্বর থেকে আরম্ভ করা হয়। আলাপের প্রথম অংশ অর্থে স্থায়ী বিভাগ বিলম্বিত রাখা হয় এবং মুদারার "স" স্বর থেকে উদারার "ম" "প" পর্যন্ত গিয়ে এবং রাগ বিশেষে মুদারার "ম" "প" বা "ন" অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে তারার "স" স্বরটি পর্যন্ত পৌছে আবার মুদারার "স" স্বরে ফিরে এসে স্থায়ী শেষ করা হয়। বলা বাহুল্য আলাপের প্রত্যেক কলির শেষে মুখড়া বাজিয়ে কলিটি শেষ করা হয়।

(২) **অন্তরা ঃ** মুদারার "ম" বা "প" স্বর থেকে অন্তরা আরম্ভ করা হয় এবং রাগ বিশেষে তারার "র" "গ" "ম" "প" প্রভৃতি স্বরে পৌছে তারার "স" বা মুদারার "ন" স্বরের উপর এসে দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে নানা স্বর ঘুরে মুদারার "স" স্বরে ফিরে এসে মুখড়া বাজিয়ে অন্তরা শেষ করা হয়।

(৩) **সঞ্চারী বা ভোগ ঃ** অন্তরার পর সঞ্চারী হবে না ভোগাভোগ হবে এসব নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। ভোগ কথাটির অর্থ বিস্তার করা। এবং সঞ্চারীর অর্থ গমনশীল কাজেই ভোগ বা আভোগ কথাটি অধিকতর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। যাই হোক এখান থেকেই আলাপের লয় দ্রুত হতে থাকে, গমক ও নানা অলংকারের ব্যবহারে, উদারার ও মুদারার স্বর সংযোগ ও স্বরবৈচিত্র্য প্রদর্শনে রাগটিকে প্রকাশ করা হয়। আবার একসঙ্গে রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রদর্শন করে তিন গ্রামে সংযোগ অলংকারের প্রয়োগ-চাতুর্যে, তিন গ্রামের স্বরবৈচিত্র্য দেখান হয়ে থাকে ও পরে মুদারার "স"-এ ফিরে এসে মুখড়া বাজিয়ে সঞ্চারী বা ভোগ শেষ করা হয়। নামভেদ থাকলেও উভয় তুকের কাজ একই ধরণের।

(৪) **আভোগ বা মুক্তায়ী ঃ** টিমা আলাপের শেষ অংশ। এই অংশে রাগটির অলংকৃত রূপ তারার সপ্তক থেকে ধীরে ধীরে এক একটি স্বরে স্থিত হয়ে অবরোহী স্বরের সংযোগে মুদারার দিকে বিস্তৃত হয়।

(৫) **জোড় ঃ** এবার জোড় বিস্তার আরম্ভ হয়. এখানে আলাপের লয় দ্রুততর হতে থাকে। এখানে স্থায়ী অন্তরা মিলিয়ে জোড় বাজান হয় আবার

সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্থায়ীর জোড় ও অন্তরার জোড় পৃথক ভাবেও দেখান হয়। জোড় শব্দটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না। মধ্যলয়ের সঙ্গে দ্রুতলয়ের সংযোগ ঘটায় বলে জোড বা স্থায়ী ও অন্তরা বিভাগের জুড়ি হিসাবে বাজান হয় বলে জোড় অথবা জোড়া জোড়া স্বর বাজানর কারণে জোড় সেটি বলা শক্ত। মধ্ জোড়ের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা গ্রামের স্বরের ব্যবহার অতি অল্প। সাধারণতঃ মুদারা ও উদারার স্বর বিস্তারেই আবদ্ধ। জোড়ের সঙ্গে কিছু অলংকারও মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হয় তবে মীড়ের কাজ এখান থেকেই মিটে যায়। এটিকে আমরা মধ্ জোড় বলি। মধ্ জোড সাধারণতঃ মুদারার মধ্যস্থান থেকে আরম্ভ করা হয়, অনেকে উদারার স্বর থেকে মধ্ জোড় আরম্ভ করেন। মধ্ জোড়ের পর আসে দ্রুত্ জোড।

দ্রুত্ জোড়ঃ সাধারণতঃ পঞ্চম থেকে আরম্ভ করা হয় ও পরে তারার স্বরে বিস্তার চলতে থাকে। রাগ বিশেষে এসবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জোড় শেষে দ্রুতলয়ে মুখড়া বাজিয়ে মুদারার "স"-এ এসে জোড় শেষ করা হয়। গানের আলাপ এখানেই প্রায় শেষ হয় এবং যন্ত্রের দ্রুততম কাজগুলি আরম্ভ হয়। গায়কেরাও অনেকে যন্ত্রের অনুকরণে কণ্ঠ স্বরের ব্যবহারে নানা ছন্দে তেলেনার বোলে অতিদ্রুত কাজ দেখিয়ে আলাপ শেষ করেন।

ঝঙ্কার, ঝার বা ঝালাঃ জোড়ের পর আসে ঝালার কাজ। চিকারীর তারে ঘা দিয়ে নানা ছন্দে ঝালা চলতে থাকে। ঝালার নানা প্রকার ভেদ রয়েছে। গুণী শিল্পীদের বাজনা শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। নানা ছন্দ দিয়ে ঝালার শেষ দিকে বিভিন্ন বোল বাণীর ব্যবহারে লড়ি, লড়-গুথাও লড়ন্ত প্রভৃতি ঝালার সঙ্গে বাজিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। ঝালার সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গতে অনেকে **তারপরন** বাজিয়ে আলাপ শেষ করেন।

(খ) আলাপ প্রাচীন প্রকার।

প্রাচীন স্বস্থান ও স্থাপনাযুক্ত আলাপঃ বর্তমান আলাপে আমরা চারটি তুক দেখতে পাই। প্রাচীন কালের স্বস্থান আলাপেও চারটি বিশেষ স্থান থেকে আলাপের পদ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। তখনকার দিনে কঠিন ভাবে এই সব নিয়ম পালন করে চলা হত। এই চারটি স্থানের নাম ছিল (১) মুখচাল, (২) দ্ব্যর্ধ, (৩) অর্ধস্থিত, (৪) দ্বিগুণ।

(১) **মুখচাল বা স্থায়-স্থান ঃ** এই স্থায় হল রাগের বাদীস্বরযুক্ত স্বরগুচ্ছ, এবং বাদীস্বর থেকেই আলাপ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। বর্তমানেও অনেকে বাদীস্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করে থাকেন। বাদীস্বর থেকে সংবাদী স্বর পর্যন্ত মুখচালের বিস্তার সীমিত থাকত।

(২) **দ্ব্যর্ধ স্বর ঃ** দ্ব্যর্ধ স্বরটি ছিল সংবাদী স্বরের মত। এই স্বরটি স্থায়ের চতুর্থ স্থানস্থিত স্বর। দ্বিতীয় ভাগের আলাপ সেইভাবে মন্দ্র সপ্তকের বাদীর হিসাবে চতুর্থ স্বর থেকে মধ্য সপ্তকের সম্বাদী অর্থে বাদীর চতুর্থ স্বর পর্যন্ত বিস্তারিত হত।

(৩) **অর্ধস্থিত স্বর ঃ** তৃতীয় ভাগের আলাপে অর্ধস্থিত স্বরগুলিও ব্যবহৃত হত। এই অর্ধস্থিত স্বর বলতে দ্ব্যর্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মাঝের স্বরগুলিকে বোঝাত। (যেমন বাদী স্বর 'স' হলে তার অর্ধ স্বর 'প' থেকে 'ন')।

(৪) **দ্বিগুণ স্বর ঃ** দ্বিগুণ স্বর অর্থে বাদীর অষ্টম স্বর অর্থাৎ দ্বিত্ব স্বর। অতএব দ্বিগুণ স্বর অর্থে সাধারণতঃ চড়ার স্বরকেই বোঝায়। তৃতীয় ভাগের আলাপ তাই বাদীর অষ্টম স্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করার রীতি ছিল।

(গ) **আলাপ ঃ** রামপুরের স্বর্গীয় উস্তাদ ছম্মন খাঁ সাহেবের মতানুযায়ী আধুনিক আলাপের প্রকারভেদ। এঁদের ঘরে আলাপ চার ভাগে বিভক্ত।

১। **রাগ আলাপ ঃ** প্রথমেই রাগের গ্রহ স্বর থেকে আরম্ভ করা নিয়ম। গ্রহ অর্থে বাদী স্বরটির বহুল প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে বাদী স্বরের সঙ্গে অন্যান্য স্বরগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে সব সময় রাগের আবির্ভাব প্রকাশিত থাকে। এইভাবে রাগকে আবির্ভাবযুক্ত রেখে এক একটি তুকে ভাগ করে আলাপ করা হয়। স্থায়ী তুকে তিন চার আবৃত্তিতে রাগের স্থায়ী শেষ করে, পরে অন্তরা দেখান হয়। অন্তরার পর আসা হয় সঞ্চারীতে; এটিও দু-তিন আবৃত্তিতে শেষ করে আভোগে আসা হয়। দু-এক আবৃত্তি আভোগ দেখিয়ে আলাপ শেষ করা হয়।

২। **রূপ-আলাপ ঃ** রূপ-আলাপে এক আবৃত্তি স্থায়ী ও এক আবৃত্তি অন্তরা দেখিয়ে, সঞ্চারী ও আভোগ পর পর এক এক আবৃত্তি দেখিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। কেবলমাত্র সাধারণভাবে রাগের রূপ দেখান হয় বলেই এঁদের ঘরে এই ধরণের আলাপকে রূপ-আলাপ বলা হয়।

৩। **সম-আলাপ ঃ** এটি বিস্তৃত আকারের আলাপ। রাগ-আলাপের

সকল কাজ বিস্তারিত ভাবে এবং তার থেকে আরও কয়েক আবৃত্তি বেশী করে দেখান হয়। এর পর নানা অলংকার ও জোড় দেখান হয়। অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার তুকের কাজ বিস্তৃতভাবে দেখাবার পর জোড়ে এসে আলাপ শেষ করা হয়।

৪। **থাই-আলাপ :** এই আলাপ প্রাচীন স্বস্থান ও স্থাপনাযুক্ত রাগ-আলাপের মতই।

(ঘ) **সেনী ঘরানার আলাপ :** বর্তমানে সেনী ঘরাণাতেও তিন চার রকমের আলাপের পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলাপ বিস্তারের কায়দার প্রভেদের কারণেই এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

১। **বিস্তার আলাপ :** এই ধরণের আলাপকে **রাগ-আলাপও** বলা হয়। এই আলাপে প্রথম থেকেই রাগ প্রকাশক সমস্ত স্বরের সাহায্যে রাগের রূপটি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোন স্বরকে কেন্দ্র করে এতে রাগের বাড়ত করা হয় না। অথবা কোন স্বর বা স্বরগুচ্ছের গণ্ডী বেঁধে রাগের বিস্তার করা হয় না। রাগের বিস্তারে গমক, মীড়, আশ প্রভৃতি অলংকারের সামান্য ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন রাগ-আলাপ পদ্ধতির সঙ্গে সঠিক মিল নাই। সেনী ঘরের আওচার আলাপ থেকে এটি বিস্তৃত বলেই এর নাম বিস্তার আলাপ রাখা হয়েছে।

২। **আওচার আলাপ :** এই ধরণের আলাপকে **সম-আলাপও** বলা হয়। এই আলাপে বিস্তারআলাপের মত রাগের বিস্তৃতি বা বাড়ত দেখান হয় না। কেবলমাত্র রাগের রূপ প্রকাশক বিন্যাসে রাগটিকে প্রকটিত করা হয়। এটি পরিপূর্ণাঙ্গের আলাপ নয়। চলতি কথায় খোটা আলাপ বলা হয়। কণ্ঠে কোন গান বা যন্ত্রে কোন গতকারী করার আগে এই ধরণের আলাপ করে সামান্য ভাবে রাগের পরিচয় দেওয়া হয়।

৩। **কয়েদ-আলাপ :** কৈদ শব্দের অর্থ কারারাস বা বন্ধন। আলাপের ক্ষেত্রে এটি স্বর-বন্ধন অর্থাৎ কোন স্বরকে কেন্দ্র করে রাগের আলাপ আরম্ভ করা হয়। সাধারণতঃ "স" অথবা বাদী স্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপের বাড়ত করা হয়। কয়েদ আলাপের বিস্তারে প্রথমে ছোট ছোট স্বরগুচ্ছের গণ্ডী থেকে ক্রমাগত বড় বড় বিস্তারে কেন্দ্রীয় স্বরটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা এর অপর এক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন কালের রূপক-আলাপের সঙ্গে অনেকে এ জাতীয় আলাপের তুলনা করে থাকেন, এবং সেই কারণে একে **রূপক-আলাপও** বলা হয়।

৪। **বন্ধান-আলাপ ঃ** বন্ধান আলাপকে বাঁধি আলাপ বলা হয়। বন্ধান শব্দটির অর্থ বাঁধা। তাই বাঁধি স্বরবিস্তার দিয়ে এই আলাপে রাগের রূপকে প্রকাশ করা হয়। এই বাঁধি তান দিয়ে রাগের রূপপ্রকাশ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিবিস্তারেই রাগটিকে চেনা যায়, এবং এইভাবে বাঁধি তান বিস্তারের পরিধি বাড়িয়ে ঘরাণাগত বন্দেজী বাঁধি তানের কায়দায় রাগের আলাপ করা হয়।

(ঙ) সঙ্গীত রত্নাকর মতে প্রাচীন আলাপের নিয়ম।

রাগালাপ ঃ যে আলাপে শাস্ত্রোক্ত রাগের দশটি নিয়মকে মেনে রাগকে বিস্তারিত করা হত, আগের দিনে তাকেই রাগালাপ বলা হত। এই আলাপে স্ফুরিত, কম্পিত প্রভৃতি গমকের ব্যবহারও ছিল। রাগের স্থূল আলাপকেই বলা হত রাগালাপ। (রাগের দশবিধ নিয়ম দেখুন।)

রূপকালাপ ঃ এই আলাপে রাগের রূপকে ছোট ছোট ভাগ করে দেখান হত। রাগালাপের নিয়মেই আলাপ চলতো তবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রাগের রূপ প্রকাশ করা হত।

আলপ্তি ঃ একাদশ শতাব্দিতে সোমেশ্বর লিখিত মানসোল্লাস নামক গ্রন্থে আমরা আলপ্তির কথা পাই। সঙ্গীত রত্নাকরে বিস্তৃত বিবরণ তেরশো শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। রাগকে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হত এই আলপ্তি আলাপে। নানাভাবে বিস্তার করে রাগের বৈচিত্র্য দেখান হত। রাগালাপ ও রূপকালাপের সমস্ত নিয়ম পালন করার পর আরও বিস্তৃতভাবে রাগকে প্রকাশ করা হত এই আলাপে।

(চ) নগমাতে আসরফীর লেখক মহম্মদ রজ্জা তাঁর গ্রন্থে চার প্রকার তানের অর্থাৎ বিস্তারের কথা লিখেছেন। (১) **অস্থাই বরণ ঃ** 'স' থেকে আরম্ভ করে খাদে গিয়ে মাঝের মধ্যম পঞ্চম পর্য্যন্ত নিয়ে স্থায়ীর মত, একটি চক্র তৈরী করা। (২) **সঞ্চাই বরণ :** অন্তরার মত তারার স পর্যন্ত যায়। (৩) **আভোগ বরণ :** খাদ মাঝের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মাঝের ম, প, ধ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করার নিয়ম। (৪) **ঝুলতি বরণ :** যে কোন স্বর থেকে বিস্তার আরম্ভ করা হয়। প্রাচীন আলাপের ক্ষেত্রেও এই বিভাগ ব্যবহৃত হয়েছে এবং নগমাতের লেখক হিন্দুদের প্রাচীন স্বস্থান আলাপের বিভাগই এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

নিবদ্ধ গান

বিভিন্ন শৈলীর বা প্রকারের মাত্রাযুক্ত ছন্দবদ্ধ তাল লয়ের গানকেই **নিবদ্ধ গীত** বলা হয়।

প্রাচীন কালের তালবদ্ধ গীতে আমরা প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক এবং সালগ-সূড় প্রভৃতি প্রবন্ধের নানা বিভাগের বিষয় জানতে পারি। প্রবন্ধ গীতে পাঁচটি তুকের নাম পাই। তুক গুলিকে বলা হত ধাতু। পরিভাষা পরিচয়ে ধাতুর বিভাগের কথা বলা হয় নি। ধাতু বিভাগে পাঁচটি ধাতুর নাম **উদগ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তর ও আভোগ।**

(১) উদগ্রাহ: এটি রাগের প্রথম অংশ বিশেষ। রাগটি কিরূপ সেটি বোঝা যায় এইরূপ প্রথম অংশকেই উদগ্রাহ বলা হয়।

(২) ধ্রুব: গানের দুটি চরণ অর্থে পদ থাকলে সাধারণভাবে দ্বিতীয় চরণটিকে বলা হয় ধ্রুব। ধ্রুব, উদগ্রাহ, স্থায় এই তিনটি শব্দ প্রায় একই অর্থবাচক। যদিও স্থায় বলতে বর্ণ বিশেষকেও বুঝায়।

(৩) মেলাপক: উদগ্রাহ ও ধ্রুবকে মিলিত করার কারণে এর নাম মেলাপক। এটি রাগের খাদের অংশ থেকে মধ্য সপ্তকের বাদীস্বর পর্যন্ত আসে এবং বাদী স্বরে এসেই এটি শেষ হয়।

(৪) অন্তর: সালগ-সূড় প্রবন্ধে এটির ব্যবহার ছিল।

(৫) আভোগ: গানের শেষ চরণ বা অংশই আভোগ নামে পরিচিত ছিল এখন বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন গীত-শৈলীর কথায় আসচি।

ধ্রুপদ

পদ্ম কোরকের প্রতিটি উল্লসিত পাপড়ির বিকাশে পদ্মটি যেমন ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্য সুষমায় ভরে ওঠে, ধ্রুপদে রাগের প্রতিটি বিস্তারিত কলিতে তেমনি ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে তার রাগরূপ। ধ্রুপদ ধীরপদী, খেয়ালের মত জোয়ারের বেগ বা ঠুংরীর মত চপলতা তাতে নেই। নানা কায়দার তান, টপ্পার দানা, বা ঠুংরীর মিশালি মসলা তার নেই। ধ্রুপদ ধীর গম্ভীর—ধ্যানস্তিমিত, অচঞ্চল, অন্তর্মুখী সম্পদে ভরা;—শান্ত, সংযত, সংগীতের সমাহিত মূর্তি। এ এক বিরাট সৌধ, যার অন্তঃপুর থেকে জন্ম নিয়েছে বহুপ্রকারের গীত-শৈলী।

ধ্রুপদের আর একটি নাম ধ্রুবক। জানা যায় ধ্রুব-প্রবন্ধ থেকেই ধ্রুপদ এসেছে। সঙ্গীতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা সালগসূড় প্রবন্ধের নাম পাই। প্রায় আটশো বছর আগে এই সালগসূড় প্রবন্ধ প্রচারিত ছিল এবং ধ্রুব-প্রবন্ধ সালগসূড় প্রবন্ধের প্রধান বিভাগরূপেই বিরাজিত হত। সালগসূড় প্রবন্ধের বিশেষ কায়দা অবলম্বন করে ধ্রুব-প্রবন্ধ নাম ভেদে ধ্রুবক, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ নামে জন্মগ্রহণ করে। তেরশো খৃষ্টাব্দে বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদকে পাচ্ছি না। তখন ছিল নিবন্ধ গীত যার মধ্যে প্রবন্ধ রূপক প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পনেরশো খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ধ্রুপদ একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে বলে জানা যায়। এই সময় থেকে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কিছু রদবদল ঘটতে থাকে; এর তুক ও তালের নামেরও পরিবর্তন ঘটে এবং চারণ-গীতি ধ্রুবপদার কিছু কায়দা সে গ্রহণ করে।

অনেকের মতে গোয়ালীয়রের রাজা মানসিংহ তোমরই ধ্রুবপদের অর্থাৎ ধ্রুপদের স্রষ্টা। ইনি ধ্রুপদের ভাষা চলিত শব্দে ও সরল বাক্যে রচনা করে এর প্রচার ও উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন।

শ্রীযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের লেখা "মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা" বইটিতে (গীত সম্বন্ধীয় বিবরণ পৃঃ ৫৩।৫৪) তিনি লিখেছেন: রাগ দর্পণকার প্রথমে রাজা-মানকে ধ্রুপদের রচয়িতা বলেছেন। ধ্রুপদ—উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুয়া ও আভোগ এই চার কলিতে নিবদ্ধ হত। বখ্‌শু, মামুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ প্রমুখের সাহায্যে এই গীত-পদ্ধতি রচিত হয়েছিল, এই রচনা অতি উত্তম ছিল। ধ্রুপদের দুই প্রকার পদ্ধতির কথা এখানে লেখা হয়েছে।

"প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদে, রাগ ও গীত মার্গ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। অপরটিতে রাগ সঙ্গীত অল্পতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি এবং এই জাতীয় সঙ্গীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে।"...... "দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্রুপদে গায়ন বৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত। সবকিছু থেকে সামান্য সামান্য গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত সৃষ্টি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তথাপি সেই প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুন্ন রয়েছে।"......"দেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে খরোড়া (সং উর্দু ভাষায়) ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায়

অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ গোয়ালীয়র থেকে আকবরাবাদ (অর্থে আগ্রা) ও বারী অঞ্চলে প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যন্ত এর সীমা। পূর্বে এটোয়া, দক্ষিনে উন্‌ছ এবং পশ্চিমে ভুয়াও ও বয়ানা পর্যন্ত এর সীমা নির্দিষ্ট।" "রাগ দর্পণকার" ফকিরুল্লা সাহেব তানসেনকে "আতাই" বলেছেন। তখন অন্যান্য সঙ্গীত সম্প্রদায়ের গুণীরা তানসেনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। দেখা যায় এই সময়ে তানসেনের প্রভাবে রাজা মান বখশু প্রভৃতি ধ্রুপদীদের রচিত গান ও তাদের ঘরাণাগত চাল লোপ পেতে থাকে। তাঁর ধারণা এতে সেণী ঘরাণার অন্যান্য শিষ্যদেরও হাত ছিল। যে কারণেই হ'ক পরবর্তীকালে তানসেনের প্রাধান্য প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ফকিরুল্লা সাহেবের কথায় কিছুটা সত্য থাকতে পারে কারণ সম্রাটের আশ্রিত লোকের প্রভাব যে বেশী হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তানসেনের ধ্রুপদে গান আরম্ভের পূর্বে আলাপের রীতি ছিল, গান, তিন চার তুকের হত এবং গানের স্থায়ী ও অন্তরায় গমকী বিস্তার থাকত। তার আগের প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতির মত ধ্রুপদে দু'গুণ তিনগুণ দেখাবার রীতিও ছিল তবে চপল লয়কারীর কাজ কম ব্যবহার করা হত। রাগের অনুকূলে বাণী ও ভাবের অনুকূলে তালের ব্যবহার ছিল। অলংকার ও গমক প্রভৃতির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান দিনের ধ্রুপদে অবশ্যই কিছু তারতম্য ঘটেছে কিন্তু প্রধানত তানসেনের ষ্টাইলই বজায় রয়েছে।

ধ্রুপদের বাণীতে আমরা দেবতাদের লীলা বিষয়ক বর্ণনা, রাজা বা গুণী ব্যক্তির প্রশংসা, যুদ্ধের বিষয়, নাদ ও রাগের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা প্রভৃতি এবং কচিৎ নর নারীর আকৃতি প্রকৃতি ও প্রেম-বৈচিত্র্যের বর্ণনা দেখতে পাই। গোয়ালীয়র, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেই ধ্রুপদের বিস্তার, তাই বাণীতে হিন্দী ও শুদ্ধ ব্রজভাষার শব্দ পাওয়া যায়। সং উর্দু ভাষাতেও ধ্রুপদ রচিত হত, এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্রুপদকে মার্গ রীতির ধ্রুপদ বলা হত। চৌতাল, আড়াচৌতাল, পটতাল, তিনতাল, ব্রহ্মতাল, শূলতাল প্রভৃতি প্রাচীন তালগুলি ধ্রুপদে ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে তেওড়া, ঝাঁপতাল প্রভৃতির নিদর্শনও দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ধ্রুপদে তালের কায়দায় ধামারের বাট, বাটোয়ারাও নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ধ্রুপদে ছয়প্রকার বিভাগের কথা শোনা যায়, (১) গীত ও (২) সঙ্গীত—এদের ব্যবহার বর্তমানে লুপ্ত। (৩) * ছন্দ—এই রীতির গানের মধ্যে 'ছন্দ' শব্দের উল্লেখ থাকে। (৪) যুগলবন্দ—দুইজনে একসঙ্গে গান করার রীতি। (৫) ধারু—এই জাতীয় গীতে ধারু শব্দের উল্লেখই বৈশিষ্ট্য।

ধ্রুপদের বাণী : ধ্রুপদ গানে চার রকমের বাণীর ব্যবহারের কথা শোনা যায়। প্রথম, গওহার, দ্বিতীয়, নওহার, তৃতীয়, ডাগুর, ও চতুর্থ, খাণ্ডার। ধ্রুপদের এই বিভিন্ন গীত-পদ্ধতির (style) ঘরাণার প্রচলন-কর্তার নাম এবং কীভাবে এদের জন্ম সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। আমরা প্রথমে বাণী শব্দটির কথা বলছি, পরে ঘরাণার কথায় আসবো। সঙ্গীতে এই শব্দটির প্রচলনের সাল, তারিখ এবং কী অর্থে এটি ব্যবহৃত হ'য়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না, কারণ কোন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যার না। মুশলিম যুগের শেষ দিকে শব্দটি ঘরাণাদার গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হ'তে শোনা যায়। বাণী শব্দটির অর্থ আমরা তিনরকম ভাবে কল্পনা করতে পারি যাতে আমরা এর আভিধানিক অর্থের সঙ্গে শব্দটির মিল দেখাতে পারি।

(১) বাণী—ভাষার সাঙ্গীতিক রূপ। কোন বিশেষ দেশের ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমা যেটি সেই দেশের গানে ব্যবহৃত হ'ত; যেমন গোয়ালীয়রের ভাষায় রচিত ও সেই ভাষার বাচন ভঙ্গিকে আমরা গোয়ালীয়রের বাণী বলিতে পারি।

(২) বাণী—শব্দটি বান্ শব্দের অপভ্রংশ, যার মানে প্রকৃতি বা ঢং (ষ্টাইল) এই অর্থে গোয়ালীয়রের গান গাইবার পদ্ধতিকে আমরা গোয়ালীয়রী বাণী বলেই মনে করবো।

(৩) বাণী—বর্ণ শব্দের অপভাষা এই বাণী। সঙ্গীতে বর্ণ বলতে আমরা "গীতক্রিয়া" অর্থে গানের বিস্তারিত রূপায়ণ বলে মনে করতে পারি। সোজা কথায় কোন দেশের গানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা বাণী বলতে পারি। যেমন খণ্ডার নামক স্থানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা খণ্ডার বাণী বলতে পারি।

আমাদের ধারণা যে বাণ শব্দটি থেকেই বাণী শব্দটির ব্যবহার সঙ্গীতে এসেছে। কোন স্থানের গাইবার ঢং (style)-কেই বাণী বলা হয়।

অনেকের ধারণা যে মুসলিম যুগে যে চার রকম বাণীর প্রচলন হ'য়েছে সেটি তানসেনের কাল থেকেই চলে আসছে। "মাদনুল মৌসিকী" গ্রন্থে লেখা আছে—তানসেন, নৌবাৎ খাঁ, বৃজচন্দ্ ও শ্রীচন্দ এই চারজনই চারবাণীর সৃষ্টি-কর্তা। তানসেনের নিম্নলিখিত গানটি প্রমাণ করে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। "বাণী চারোঁকে বেওহার শুন লিজে হো গুণীজন" * যখন আমরা খণ্ডার ও ডাগুর

* সঙ্গীত চন্দ্রিকা-গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী প্রকাশন—১৩৭৪, পৃ ৪৩০ (ভূপালী চৌতাল—তানসেন)

বাণী খণ্ডার গ্রাম ও ডাগুর গ্রাম থেকে উৎপত্তি বলি, আবার সেখানেই গৌরহারের বেলায় বলি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট ও নৌহারকে সিংহের লম্ফণ গতির সঙ্গে তুলনা করি সেখানে আমরা ভুল করিনা কী ? বাণী যখন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে জড়িত তখন সব বাণীই কোন না কোন স্থান থেকে উৎপন্ন বলাই উচিৎ। আমাদের মনে হয় গৌরহার বাণীটি এসেছে গোয়ালীয়র থেকে, খাণ্ডার রাজপুতানা প্রান্ত থেকে এবং ডাগুর ও নৌহার পাঞ্জাব প্রান্ত থেকে। পাঞ্জাবে এরকম নামের দুটো গ্রাম আছে সম্ভবতঃ এই গ্রামের নাম থেকেই এই বাণীর উৎপত্তি।

ধ্রুপদ গান বহুকালের, সুতরাং বাণীগুলিও যে প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। যাঁরা শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী প্রভৃতির সঙ্গে এই বাণীগুলির তুলনা করেন তাঁরা ঠিকই বলেন বলে আমাদের ধারণা। রাগের প্রকৃতি ও চলন হিসাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ গৌরহারেই প্রশস্ত। সারঙ্গ, খট্ প্রভৃতিতে খাণ্ডারের চলন, ভূপালী, মারবাতে ডাগুরের চাল এবং কামোদ, শংকরা প্রভৃতিতে নৌহার বাণীর ভাব প্রকাশিত। রাগের গতি প্রকৃতি থেকে বাণীর ব্যবহার এসেছে একথা ভাবাও খুব অসঙ্গত হবে না।

এখন প্রতিটি বাণীর উৎপত্তির সম্বন্ধে যেসব মত প্রচলিত, সেগুলি বলছি।

(১) গওহার (ক) প্রাচীন ভিন্না জাতীয় গীতি পদ্ধতির অনুকরণ। (খ) তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তার প্রবর্তিত বাণী হিসাবে এটি গৌড়হার, গওহার, গওরার বা গোবরহার নামে প্রচলিত। (গ) নায়ক কুন্তন দাসের বংশ থেকেই এই চালের প্রবর্তন। (ঘ) স্থান হিসাবে গোয়ালীয়র থেকে উৎপন্ন। (ঙ) গীত পদ্ধতির চাল ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বলে দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগের চাল থেকে উৎপন্ন।

(২) নওহার (ক) প্রাচীন বেসরা জাতীয় পদ্ধতি জাত। (খ) নওহার গ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ প্রবর্তিত। (গ) নবরসের একত্র মিলন ঘটানর কারণে নবহার বা নওহার। (ঘ) হিন্দী 'নাহর' শব্দের অর্থ সিংহ। সিংহের গতির মত এই পদ্ধতির গান দ্রুত লম্ফন (অর্থে ছুট) যুক্ত বলে ধারণা করা হয়, এটি নাহর শব্দ থেকে এসেছে। (ঙ) অনেকে সুজান খাঁকে এর প্রবর্তক বলেন। (চ) কামোদ, শংকরা প্রভৃতি রাগানুসারী।

(৩) ডাগুর (ক) প্রাচীন শুদ্ধা জাতীয় পদ্ধতির অনুকরণ। (খ)

ডাগুর গ্রাম নিবাসী বৃজচন্দ্র প্রবর্তক। (গ) ডাগুর ঘরাণার হরিদাস ডাগুর প্রবর্তক। (ঘ) পাঞ্জাব প্রান্তের ডাগুর গ্রাম থেকে উৎপন্ন। (ঙ) ভূপালী, মারবা প্রভৃতি রাগের চাল থেকে জন্ম নিয়েছে।

(৪) খাণ্ডার বাণী—(ক) প্রাচীন গৌড়ী জাতীয় পদ্ধতির অনুকরণ। (খ) খাণ্ডার গ্রাম জাত। অনেকের ধারণা এই স্টাইলে রুক্ষভাব প্রকাশিত হয় ও স্বরগুলি কাটা কাটা ভাবের হয়। (গ) সারং, নট প্রভৃতি রাগের চাল-জাত।

ধ্রুপদ ঘরাণা

১। **গোয়ালীয়র ঘরাণা ঃ** প্রথমেই গোয়ালীয়র ঘরাণার উল্লেখ প্রয়োজন। এটি তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) রাজা মানসিংহকে এর প্রবর্তক বলা হয়। প্রবন্ধাদি প্রাচীন গীত শৈলী অবলম্বনে ইনিই ধ্রুপদ প্রচলিত করেন। মানসিংহের দরবারে (১৪৮৬ থেকে ১৫১৮ সাল) বৈজু, ভানু, বখ্সু, চরজু, ভগবান্, রামদাস প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়কেরা ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় রাজা মানের পক্ষে ধ্রুপদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়েছিল। রাজা মানকৃত "মান-কুতুহল" গ্রন্থটি সঙ্গীতের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে পরিচিত। ফকিরুল্লা সাহেব মানসিংহের এই অপূর্ব আবিষ্কারের প্রশংসা করেন ও তাঁর পুস্তকের ফার্সী অনুবাদ করেন। এই ফার্সী গ্রন্থের নাম "রাগ দর্পন"। রাজা মানরচিত ধ্রুপদের (style) চালের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল বর্তমানে তা জানার উপায় নাই। ("হামারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ৫৫) (খ) পরবর্তীকালে তানসেনের পুত্র তানতরঙ্গের বংশধরেরা গোয়ালীয়র ঘরাণার সৃষ্টি করেন। লাগ-এর সুষ্ঠু প্রয়োগের সঙ্গে মীড, আশ ও গমকের ব্যবহার দ্বিতীয় গোয়ালীয়র ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ছিল। (গ) এরপর আমরা চিন্তামনি মিশ্রের নাম পাই। দুন, চৌদুনের ব্যবহার মিশ্র ঘরের এক বৈশিষ্ট্য।

২। **সেনী ঘরাণা ঃ** তানসেনের সৃষ্টি। সেনী ঘরের লাগ ও তার সঙ্গে আশ, মীড এবং প্রাচীন গমকের সংযোগে বিস্তারের ভঙ্গি লক্ষণীয়। সুরের মাধ্যমে ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিমা, ভাষার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা প্রভৃতি রক্ষা করার প্রাচীন পদ্ধতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। বিস্তারে দুন চৌদুনের দাপট তেমন দেখা যায় না।

৩। **তিলমণ্ডী ঘরাণা ঃ** অনেকে ধারণা করেন খৈরাবাদী ঘরণার প্রবর্তক চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। অনেকের ধারণা দৌলত খাঁ

খণ্ডারের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা এই ঘর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ধারণা এই ঘর পাঞ্জাব ঘরাণা থেকে জন্ম নিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন।

৪। **বেতিয়া ঘরাণা**ঃ বেতিয়া নামে বিহার প্রদেশে এক সামন্ত রাজ্য ছিল। বেতিয়া রাজ্যের নামেই এই ঘরাণা বেতিয়া ঘরাণা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেতিয়া ভারতের বিহার অঞ্চলের সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বেতিয়ার মহারাজা আনন্দকিশোর সিং এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন। মহারাজা আনন্দ-কিশোর তানসেনবংশজ হাইদার খাঁর কাছে ধ্রুপদ শিখে নিজ বৈশিষ্ট্যে এই ঘরাণার ইতিহাস রচনা করেন।

গৌরহার ও ডাগর বাণীর মিশ্রণে বাণীগুলির অল্প ব্যবহারে স্বর-বিস্তার এই ঘরাণার বিশেষত্ব। (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তৌর্য্যত্রিক নভেম্বর—১৯৬৫ দ্রষ্টব্য)

৫। **ডাগর ঘরাণা** বা **উদয়পুর ঘরাণা**ঃ বাবা গোপাল দাস (ইমাম খাঁ) থেকে শুরু। বৈরাম খাঁ এই ঘরাণার বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। উস্তাদ জাকিরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁ এবং পরে নাসিরুদ্দীন খাঁ প্রমুখ গুণীরা এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। ময়নুদ্দীন (স্বর্গত) ও আমিনুদ্দীন এই দুই ভাই ভারতের বাইরে ইউরোপ, জার্মান প্রভৃতি স্থানে এই ঘরাণার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘরে প্রাচীন অলংকার ও ডাগর বাণীর ব্যবহার লক্ষণীয়। বীনকারের কায়দায় প্রাচীন মেরুখণ্ড পদ্ধতি অবলম্বনে এঁরা বর্তমানে এঁদের ঘরের ধ্রুপদাঙ্গীয় আলাপের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছেন। রহিমুদ্দিন ডাগর, তানসেন-পাণ্ডে ফহিমুদ্দীন ডাগর প্রভৃতি গুণীদের নাম উল্লেখযোগ্য।*

৬। **অত্রৌলী ঘরাণা বা আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা**ঃ আল্লাদিয়া খাঁর পূব-পুরুষেরা এই ঘরাণার প্রবর্তক হলেও মানতোল খাঁর সময় থেকেই এই ঘরাণা প্রতিষ্ঠা পায়। শোনা যায় এই ঘরাণায় ধ্রুপদের সব কয়টি বাণীর ব্যবহার শোনা যেত। ডাগর ও নৌহার বাণীর বিশেষ ব্যবহার এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য ছিল। (খ্যাল ঘরাণা দেখুন)

৭। **বেনারস ঘরাণা**ঃ মনোহর ও হরপ্রসাদ মিশ্র (পরসাদু, প্রসদ্দু) বা

*১ জুনিয়ার ডাগরদের মধ্যে জাহির ও ফৈয়াজ ভাতৃদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

*২ 'To whom dhrupad owes its renaissance" booklet Published by Dagar sangeet siksha mandir.

তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আড়ি কুয়াড়ির ব্যবহার দূন চৌদূনের প্রয়োগ এই ঘরাণার একটি বিশেষ অঙ্গ। ("হামারে সঙ্গীত রত্ন")

৮। **বিষ্ণুপুর ঘরাণা:** বিষ্ণুপুরই বাংলায় ধ্রুপদের সব থেকে পুরাতন ঘরাণা। "দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর" নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "দিল্লী হইতে যে সকল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ বিষ্ণুপুরে আসিয়া বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতানুরাগী অধিবাসীগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাহাদুর খাঁ ও পীরবক্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাহাদুর খাঁকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দানে দিল্লী হইতে বিষ্ণুপুর আসিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন"। দ্বিতীয় রঘুনাথের কালে বাহাদুর খাঁর বিষ্ণুপুর আগমন সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দেহ পোষণ করেন।

আঠারো শতকেই বাংলা দেশে প্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শিক্ষা বিষ্ণুপুর থেকে আরম্ভ হয়। বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্ত্তী। ঐ মতে গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ঘরাণার প্রবর্তক। অপর মতে এই ঘরাণায় আদি সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। ইনিই প্রথমে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনা করেন এবং এঁকেই প্রথম ধ্রুপদের প্রচারক বলা হয়।

এই ঘরাণায় ৺নীলমনি চক্রবর্ত্তী, ৺অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৺দীনবন্ধু গোস্বামী. ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ৺রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, ৺গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘরের সঙ্গীতগুণী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এখনও এই ঘরের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। *

বিভিন্ন ঘরাণার সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইল।

ধমার বা ধামার: ধা-মার বললেও ধা মারবার উপায় নাই কারণ ধামারের সমে ধা নেই। ধা কে মেরেই ধামারের জন্ম। ধ্রুপদে ধা থাকা সত্বেও এত ধুমধাম নেই, বাট বাটোয়ারার এত কায়দা নেই যা আছে ধা বিহীন ধামারে। ধামারের সমে লঘুবর্ণ ক রয়েছে যেটি ধামার তালের বৈশিষ্ট্য। তালের নাম

* অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা "বিষ্ণুপুর ঘরাণা" বইটি পড়লে এই ঘরাণার সম্বন্ধে অনেক বিষয় আরও বিশদভাবে জানতে পারবেন।

ধামার এবং সেই তালের নামেই এই গীতি পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে। ধ্রুপদের ছোঁয়া থাকলেও ধামার তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে সম্পর্কিত নয়। এখন এর আসল নাম ধমার শব্দের কথা বলি। 'ধম' মানে কৃষ্ণ এই অর্থে ধমার কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান এরূপ অর্থ করা হয়। ধমার হচ্ছে ধর্মতাল বা ধর নামক তাল এমন অর্থও শোনা যায়, কিন্তু সবই কল্পনা। আসলে ধমারের নামকরণের রহস্য বা নামোৎপত্তির বিষয় কিছুই উদঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আমরা বৃন্দাবনে হোরী নামের গান পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি চচ্চরী অর্থে চাঁচরকে। আমাদের ধারণা হোলী নামক তৎকালীন লোক-সঙ্গীতই রূপ বদলে রাগ-সঙ্গীতের সহায়তায় চাঁচর নাম পেয়েছিল। চাঁচর এক জাতীয় তালের নাম যেটি সমস্ত গাইয়ে বাজিয়েরাই জানেন। সেটি ৭ মাত্রার যতেরই নামান্তর নয় কি? বলা হয় চচ্চরী তাল থেকেই চাঁচর তালটি এসেছে, রত্নাকরে চচ্চরী নামে এক প্রবন্ধের নামও দেখা যায় যাতে অনেকগুলি পদ ও ছন্দ থাকতো। এই প্রবন্ধ রূপ বদলে চাঁচর তালে পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা কে বলতে পারে? এই চাঁচরের সঙ্গে ধমারের একটা সম্বন্ধ রয়েছে বলেও আমাদের মনে হয়। হোলী কোনও তাল নয়, চাঁচর তালটি হোলীর গানের মধ্যেই বেঁচে রয়েছে। আমরা সঙ্গীত রত্নাকরে এ প্রমাণ পাচ্ছি, যে তখনকার দিনে বসন্তোৎসবের গান গ্রাম্য ভাষায় রচিত হত ও সেগুলি যথাক্রমে চৌদ্দ, ষোলো, বা ছয় মাত্রাদির বিভাগীয় তালে গীত হত।

আমাদের অসুবিধা আমরা ধমার, চাঁচর, হোলী এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না, তবে তিনটিই বসন্ত উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, এদের ভাষা, বিষয়বস্তু, পরিবেশ সবই বসন্তকে লক্ষ্য করেই গড়া, তা ছাড়া তালের ঝোঁকেও একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। যৎ বা চাঁচরের সমের ধা-তে প্রস্বনের অভাব বোধ করিনা কি? সেই অভাবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় ধমারের সমের বিস্বনবর্ণ "ক" কে। কিন্তু ধমারের গম্ভীরতা মনে জাগায় সন্দেহ। তবু আমরা ধমারে যৎ-এর প্রকাশনায় গম্ভীর ছাপ দেখতে পাই।

রাগের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা মালকোষ বসন্ত, হিন্দোল, বাহার, খাম্বাজ, ধানী, তিলং প্রভৃতি রাগকেই দেখতে পাই, অর্থাৎ মধ বা পণ সঙ্গত যুক্ত রাগই বসন্ত ফাগুয়ার গানে বেশী প্রচলিত। হোলীর গানে অবশ্য কাফী, তিলোককামোদ, সিন্ধু প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা যায় যাদের চচ্চরী বা ধমারে কমই দেখা যায়। ফাগুয়ার হোলী গান অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে

এসেছে কাজেই লোক-গীতি হোলী উন্নত হবার চেষ্টায় কোন্ বিশেষ স্থানের রাগ সঙ্গীতের সহায়তায় চচ্চরী নামক বিশিষ্ট ধারা পেয়েছিল সেই স্থানটির সঠিক সন্ধান আমরা পাইনি তবে জানতে পেরেছি যে ফাগুয়া যখন কৃষ্ণলীলায় পরিবর্ত্তিত হল তখন বৃন্দাবনেই এর প্রচলন বেশী হল আর এখানেই সে তার আগেকার আদি রসাত্মক রূপের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ কৃষ্টি-মিশ্রিত রূপ পেলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে চচ্চরী ও হোলী ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি—বৃন্দাবনের বা তার আশ-পাশে কোন জায়গা থেকে হোরী নামের মাধ্যমে আভিজাত্য পেলো।

আমাদের মনে হয় পরবর্ত্তীকালে বৃন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হোরীকে ধ্রুপদের সমপর্য্যায়ে আনার জন্যে তালটির নূতন নামকরণ করেন ও প্রবন্ধটিকে ধমার নামে প্রচারিত করার চেষ্টা চালান। "ধম" মানে হৈ চৈ। হোলীর দিনের হৈ চৈ বা বহুজনের মিলিত উৎসব হিসাবে হোলী ধমার নামে প্রবর্ত্তিত হয়েছে এ কথাও ভাবা যায়। চৌদ্দ মাত্রার ঝোম্বরা থেকে উচ্চারণ ভেদে ধমারের উৎপত্তি এ কথাও শোনা যায়। বল্লভ সম্প্রদায়ে ও হরিদাস সম্প্রদায়ে হোলীর গানের সমধর্ম্মী এক রকম গানের প্রচলন ছিল। এমনও হতে পারে যে পরবর্ত্তীকালে সাধারণ্যে এই ধরণের গান প্রচারিত হয়ে ধ্রুপদী গুণীদের দয়ায় রূপ পাল্‌টে ধমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে গান বাজনার যে সব নথিপত্র পাওয়া যায় তার মাঝে আমরা ধমার নামটি পাই না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে মীর্জা খাঁর বিখ্যাত তুহাফতুল হিন্দ্ গ্রন্থেও ধমার নামটি পাওয়া যায় না। ধমারের ভাষায় আমরা কিছু উন্নত ধরণের চলতি ভাষা দেখতে পাই যা ধ্রুপদে ব্যবহার করা হয় না। যদিও আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারি না তবু আমাদের বিশ্বাস যে ধমার ব্রজধামের হোলীর উন্নত সংস্করণ, লোক-সঙ্গীতেরই উন্নত অবস্থা, এটি ধ্রুপদের অনুসরণ নয়।

সাধারণতঃ ধ্রুপদ গাইয়েরাই ধমার গেয়ে থাকেন. অতীতে কয়েকজন ধ্রুপদী ধমার গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করায় ধামারী নামে পরিচিত হন, যথা, বিশ্বনাথ ধামারী, শুকদেব মিশ্র ধামারী। বিশেষভাবে ধমার ঘরাণা বলে কোন ঘরাণার নাম আমরা পাই নি।

খেয়াল বা খ্যাল ঃ খেয়ালে রাগের বাঁধন থাকলেও ধ্রুপদের মত রাগ বিস্তারের ধরা বাঁধা নিয়ম সে মেনে চলে না। খেয়াল হল দুরন্ত, দুর্বার, তরলতাই হল ওর ধর্ম ; ও উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু প্রাণোচ্ছল। কখনো সুরের পাখনা মেলে অসীম

আকাশে উড়ে চলে, কথনো পাখনার তান ঝাপটায় ওর দাপট দেখা যায়, কখনো চঞ্চল, কখনো স্থির, কিন্তু ধীর নয়, ধ্রুপদের মত গম্ভীর, শান্ত সমাহিত মূর্তি নয় তবে স্থির লক্ষ্যে রাগকে স্বীকার করে নানা ছন্দে রস সৃষ্টি করে চলে।

খ্যাল শব্দটি আরবি শব্দ, * অর্থ কল্পনা, বিচার বা ধ্যান। রাগের ধ্যান মূর্তি কল্পনা করে তাকে বিচার পূর্বক বিস্তারিত প্রকাশ করার নামই খ্যাল। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ খ্যাল মানে যথেচ্ছাচার বোঝেন সেটি ঠিক নয়।

মুঘল দরবারের ইতিহাসের পাতা থেকে ও সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে আমির খুসরোকেই এর প্রচলন কর্তা বলে জানতে পারি। পরবর্তীকালের প্রচারক হিসাবে নাম পাই সুলতান হুসেন সর্কীর। সম্রাট সাজাহানের (১৬২৮-৬৬) দরবারে এই দুই পদ্ধতিই চালু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে আকবর বাদশার আমলেও (১৫৪২-১৬০৫) খেয়ালের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন খেয়ালীও সে দরবারে ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ খেয়াল গাইতেন। আকবরের দরবারে খেয়ালীরা বিশেষ নাম করতে না পারলেও সেখান থেকেই খেয়াল স্টাইল রূপ বদলে সাজাহানের দরবারে এসে আসর জমায়। ধ্রুপদের সময়ে খেয়াল গান প্রচলিত থাকলেও কোন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাসরে খেয়ালীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত না। এতৎ সত্ত্বেও উপেক্ষা ও অবহেলার মাঝে খেয়াল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে তার মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তার সৌকুমার্যের ও লালিত্যের বৈশিষ্ট্যে। ঔরংজেবের সময় থেকেই খেয়াল বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্রাটের ছেলেরা বা নাতিরা গান শিখতেন এরকম নজীরও পাওয়া যায়। সঙ্গীত-গুণী সদারঙ্গই প্রথমে তৎকালীন চলতি বিভিন্ন ঢং-এর সমন্বয়ে এক বিশেষ চালের খ্যাল প্রবর্তন করেন। আমীর খুসরো বা হুসেন সর্কীর খ্যালের বিশেষ বিশেষ কায়দা যদিও কোন কোন ঘরে প্রয়োগ করা হত, তবুও সদারঙ্গ-এর খেয়ালকে অনুসরণ করেই বিশেষ ভাবে এক খ্যালি রীতি গড়ে উঠেছিল ও সাধারণের কাছে সেই কায়দাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। বিখ্যাত বীণকার নিয়ামৎ খাঁরই ছদ্ম নাম ছিল সদারঙ্গ, এই ছদ্ম নামেই তিনি বহু খ্যাল গান রচনা করে যান। খ্যালে এঁর সময় থেকেই বীণের জোড় ও বাণীর উপর জোর দিয়ে স্বর বিস্তারের সাহায্যে বোলতান যুক্ত হয়। ধ্রুপদের বাণীর মত খেয়ালেও নানা বাণী প্রচলিত হল যেগুলি রাগভাব,

* উর্দ্দু হিন্দি শব্দকোষ—মহম্মদ মুস্তাফা খাঁ (মদ্দাহ)

ভাষা ও তালের কায়দার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সদারঙ্গ-এর খেয়াল দুই তুক বিশিষ্ট ছিল। প্রথম হল স্থায়ী অঙ্গ ও দ্বিতীয় অন্তরা—এই অন্তরা ধ্রুপদের আভোগের কায়দায় রচিত হত এবং অন্তরায় গীত রচয়িতার নাম থাকত। আস্থায়ী অন্তরা গাইবার পর প্রথমে স্থায়ীর ও পরে অন্তরার বিস্তার করা হত। বিস্তারে গানের কোন একটি পদ অথবা আকারের ব্যবহার করা হত ও নানা অলংকার এবং গমকের ব্যবহারও থাকতো। গানের ভঙ্গী তার ভাষা ও ভাবের উপর নির্ভর করেই বিস্তার করা হত এবং সবশেষে দ্রুত গতিতে নানা ছন্দ ও অলংকার প্রকাশ করা হত। আজকে এই ধরণ সম্পূর্ণ বর্তমান নাই, এখন বোলতান, আকার যোগের তান, নানা ধরণের তেহাই, গমক, অতি দ্রুত তান ও সরগম ব্যবহার করা হয়।

খেয়ালের ভাষায় পূরব কি হিন্দি, ব্রজভাষা, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষা এবং খড়ি বোলি অর্থে উর্দ্দু ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ব্রজবুলিতে ভাষার আধিক্যই বেশী, ভাষার বিষয়বস্তুর মধ্যে নায়কের প্রশংসা, নায়িকাভেদ, প্রেম-কাহিনী ও প্রকৃতির বর্ণনা প্রভৃতি থাকে। এ ছাড়া প্রার্থনার বাণী, নাদ ও রাগের ধ্যানাদির বর্ণনাও দেখা যায়। খেয়ালের তালে তিনতাল, একতাল, ঝুমরা, পাঞ্জাবীঠেকা, নানা ধরণের সওয়ারী এবং ঝাঁপতাল, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালের প্রচলন দেখা যায়। যে সব রাগ গম্ভীর ওজঃযুক্ত অর্থাৎ যাতে Incitement আছে, বিস্তারের বেশী সুবিধা আছে বিদারী বা অপন্যাসের বহুল প্রয়োগ সম্ভব, সেই সব রাগই খেয়ালের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। চটুল চপল জাতীয় ক্ষুদ্র রাগেরা খেয়ালের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়।

খ্যাল ঘরাণা ঃ খ্যাল গানের ঘরাণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের আমীর খুসরোর কথা বলতে হয়। আমীর খুসরো সম্বন্ধে 'বাদশাহ্ নামায়' বলা হয়েছে ঃ

কৌল, কাবালি, তারাণা ও খ্যাল এই চার রকমের গীতি-পদ্ধতি আমীর খুসরো আরবী ও পারসীয়ান সঙ্গীতের মিশ্রণে তৈরী করে প্রচার করেন। এই কারণেই খ্যালের জন্মদাতা হিসাবে অমীর খুসরোকেই **দিল্লী ঘরাণার** প্রবর্তক বলা হয়। এর শিষ্যবর্গের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবে (হমারে সঙ্গীত রত্ন"—পৃঃ ১০৪) দিল্লী ঘরাণার বিভাগে তাই পাঞ্জাব ঘরাণা ও কবাল ঘরাণাকে ধরা হত। দিল্লী ঘরাণা মুলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন এর চার পাঁচটি বিভাগ ছিল। দিল্লী ঘর তার আস্থাই ও ফিকরাবন্দীর কায়দায়

বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য ও দ্রুত লয়ের প্রচলন বেশী ছিল। আস্থাই চটুল ঢং-এ ভরা হত। বহিলবা অঙ্গের আলাপ এতে শোনা যেত না। ঠেকায় তিন-তাল, ফরদোস্ত প্রভৃতি তালই বেশী ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে সিধারখানি ঠেকার বেশী ব্যবহার দেখা যায়। কম্মু খাঁ, আলিরেজা, শফিউল্লা, ইমাম বক্স, হসীর খাঁ প্রভৃতি গুণীদের নাম পাওয়া যায় দিল্লী ঘরাণায়। এঁরা সকলেই পৃথক পৃথকভাবে ঘরাণা রচনা করেছিলেন শোনা যায়। বর্তমানে বাহাদুরশার দরবারের গুণীদেরও দিল্লী ঘরাণা বলা হচ্ছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই গুণীরা অন্য স্থানের। অচপল এই ঘরাণার আদি প্রবর্তক। খ্যাল গানে ও কবিতা রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। ইনি আঠারো শত শতকের লোক ছিলেন বলে বলা হয়। (হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ৯৪)। বড়ে ছংগে খাঁ, শাদী ও মুরাদ খাঁ, বহাদুর ও দিলবার খাঁ, নাসির আহমদ, নূর খাঁ, আলি বকস্ খাঁ প্রভৃতিকেও দিল্লী ঘরাণার গায়ক বলে "সঙ্গীতজ্ঞকে স্মরণ" দিল্লী নাটক একাদেমি প্রকাশনে বলা হয়েছে (পৃঃ ৭৫)। অচপলের শিষ্য তানরস খাঁ (তানদ্রজ খাঁ) ও এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তানরস খাঁ ভাসনা গ্রামের গায়ক ছিলেন। বলদার স্থায়ী ভরণে এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। তানরস খাঁকে অনেকে শ্রীচন্দের ঘরাণার লোক বলেন। তারাণায় তানরস খাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল ("হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ৯১)। শোনা যায় শ্রীচন্দ পাঞ্জাব ঘরাণার ধ্রুপদীয়া ছিলেন। এই পাঞ্জাব ঘরাণাও আমীর খুসরোর শিষ্য বংশ থেকেই জন্ম নেয়।

কবাল বাচ্চা ঘরাণা : সুরছন্দা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ শারদীয়া সংখ্যায় কবাল ঘরাণার সম্বন্ধে ডাঃ রায় লিখেছেন "খ্যালের ঘরাণা বলতে গেলেই কবালদের মনে পড়ে যায়। অমীর খুসরোর গান-রীতিতে যে কজন কবাল সিদ্ধ ছিলেন তাঁদের মধ্যে চারজন নাকি চারটি ঘরাণার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের নাম পাওয়া যায় না, এমন কি বংশাবলীও মেলে না।"

আমরা বিলায়েৎ হুসেন খাঁ লিখিত "সঙ্গীতজ্ঞ কে স্মরণ"—দিল্লী সঙ্গীত নাটক একাডেমি দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থে যা পেয়েছি সেটির সারাংশ নিম্নরূপ :

সুলতান সামসুদ্দীন আল্‌তামাশের রাজত্বকালে দিল্লীতে সাবন্ত আর বুলা নামে দুই ভাই বাস করতেন। এঁরা একজন কালা ও অপরজন বোবা ছিলেন। দরবারের সঙ্গীতাসরে এঁদের আনার পরে ঈশ্বরের করুণায় রাজাজ্ঞায় এঁরা হঠাৎ বিশেষ শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত খ্যাল গান করেন। এঁদের দুজনকেই কবাল বাচ্চা ঘরাণার আদি পুরুষ বলা হয়। পরে মিঞা সক্কর খাঁ ও মখ্খন খাঁ, জদ্দু খাঁ

প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। তারও পরে বড়ে মহম্মদ (নাজীকাবাদ ঘরাণা বলে পরিচিত) হদ্দু ও হস্সু খাঁ (গোয়ালীয়র ঘরাণা দেখুন) আহমদ খাঁ, রহমত খাঁ, মহম্মদ খাঁর পুত্র আমন আলি, বাকর আলি (দিল্লী ঘরাণার বলা হয়) বারিস আলি, ইনায়েৎ হুসেন, (সহসোয়ান ঘরাণা) তথা স্বনামধন্য ভাইয়াসাব গণপত রাও, সাদিক আলি প্রভৃতির নামও উপরোক্ত গ্রন্থে এই ঘরের ঘরাণাদার বলে লেখা হয়েছে।

খৈরাবাদী ঘরাণা: এই ঘর পঞ্জাব ঘর থেকে এসেছে। ষোলশো শতাব্দীতে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁ এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা পাঞ্জাবে খৈরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পূর্বে এই দুই ভাই হিন্দু ছিলেন তখন এঁরা দিবাকর ও সুধাকর নামে পরিচিত ছিলেন। এই ঘরাণার চাল বর্তমানে বিলুপ্ত। অনেকে এঁদের তিলমণ্ডী ঘরাণার প্রচারক বলেন। এঁরা "খৈরাবাদী ভেদ" বলে এক বিশিষ্ট চালের জন্ম দেন। ("হমারে সঙ্গীত রত্ন—পৃঃ ১৭৯।)

গোয়ালীয়র ঘরাণা: নথন পীরবক্স আঠারোশো শতকের লোক ছিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌ-এ থাকতেন। ঘরাণার বাদবিসম্বাদের কারণে লখনৌ ছেড়ে ইনি গোয়ালীয়রে এসে পৃথক ঘরাণার সৃষ্টি করেন। লখনৌ-এ তখন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী তথা খেয়ালী গুলাম রসুল থাকতেন। যতদূর জানা যায় নথন পীরবক্স গুলাম রসুলের কাছেই তালিম পান। এই গুলাম-রসুলের পুত্র শোরীমীয়া টপ্পা গান আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করেন। এই ঘরাণায় পরবর্তীকালে হদ্দু খাঁ বড়ে মহম্মদ খাঁর অনুকরণে বোলতান, ফিরকৎ, চক্রাদার তান প্রভৃতির চলন আনেন। হদ্দু হস্সু খাঁ এই ঘরের বিশেষ সম্মান এনে দেন। ("হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ—১৫৯, ২১৫, ৩১৯।)

লখ্নৌ ঘরাণা: গোলাম রসুলের কথা আগেই বলেছি। ইনি সদারঙ্গের শিষ্য ও লখ্নৌ ঘরের আদি কলাবন্ত্। এই ঘরে প্যাঁচদার মুর্কীযুক্ত দ্রুত বিস্তার এবং কবাল ঘরের ফিক্‌রাবন্দী ও বহিলবা ঢং এর ব্যবহার ছিল। একতাল, তিনতাল ও ঝুমরা প্রভৃতি সরল তালই এঁদের গানে বেশী ব্যবহৃত হত। অনেকের ধারণা লখ্নৌ ঘর জোয়ানপুর নিবাসী হুসেন সর্কীর সময় থেকেই চলে আসছে। লখ্নৌ ঘরে পূর্ব দেশীয় মধ্যলয়ের খ্যাল প্রচলিত ছিল।

তিলমণ্ডী ঘরাণা: বা তলবণ্ডী ঘরাণা:—

আল্লানূর খাঁ এই ঘরের প্রধান প্রবর্তক। শোনা যায় শক্ষীউল্লার সময় থেকেই এই ঘরে খ্যালের চর্চা শুরু হয়। অনেকে বলেন শক্ষীউল্লার শিক্ষাও

কবাল ঘর থেকে। আদিতে এটি ধ্রুপদ ঘর ছিল। এই ঘরাণার শেষ প্রতিনিধি হলেন মিঠ্ঠু খাঁ।

অত্রৌলী ঘরাণা: মানতোল খাঁর সময়ে ধ্রুপদ ঘরাণাই ছিল। আল্লাদিয়া খাঁকে এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক বলা হয়। আল্লাদিয়া খাঁ তাঁর পিতা মরহুম খ্বাজা আহমদ খাঁর ও মুবারক আলীর কায়দা গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায় এই ধ্রুপদ ঘরাণা ইমাম বক্স থেকে চলে আসছে যদিও এর সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অত্রৌলী ঘরাণার মেহেবুব খাঁ ও পুত্তন খাঁকে লোকে ভোলে নি। ঘরাণার ধারক হিসাবে অজীজুদ্দীন খাঁ কোলাপুরেরও নাম করা হয়। এই ঘরাণায় মানতোল খাঁ, গুলাম গৌস খাঁ, করিম বক্স, চিম্মন খাঁ, ইমাম বক্স, দৌলত খাঁ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। **অল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণা** বলেও এই ঘরাণা পরিচিত। এই ঘরাণার গায়কী কঠিন ও তান জটিল। আল্লাদিয়া খাঁ বরোদা দরবারে সভাগায়ক ছিলেন। শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে শঙ্কর রাও সরনায়ক, গোবিন্দ রাও টোম্বে, মঘুবাঈ কুরদীকর, ভাস্কব বুয়া, মঙ্গুবাঈ, কেশরীবাঈ কেরকার ও খাঁ সাহেবের সুপুত্র ভুর্জী খাঁ এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেছেন। হিন্দোল, মালশ্রী, মারবা, বসন্ত-বাহার, মারু-বিহাগ, নায়কী-কানাড়া, গোরক্ষ-কল্যান, খট-তোডী, ললিত-মঙ্গল, জয়ন্ত-মল্লার প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ কঠিন রাগ গায়নে খাঁ সাহেব সিদ্ধ ছিলেন। ("হামার সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ১০৬)

কিরাণা ঘরাণা: সিকিন্দাবাদ ঘরাণার হিঙ্গারঙ্গ এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক। জানা যায় আগে ধ্রুপদ ঘর ছিল এবং তখন সেনী ঘরের প্রভাব ছিল এই ঘরে। আব্দুল করিম খাঁর ভায়েরা হিঙ্গারঙ্গের কায়দা গ্রহণ করেন। কিন্তু রহমৎ খাঁর প্রভাবে দক্ষিণী কায়দার অনুকরণে আব্দুল করিম এক নিজস্ব ঢং গড়ে তোলেন। ভাগিনেয় বাহরে বহীদ খাঁ কব্বাল ওহীদুল্লার নকল করে এক নূতন চালের সৃষ্টি করেন। বহীদ খাঁর চালে অতি ঢিমা লয় দেখা যায়। এই ঘরাণায় আল্লাদিয়া, নত্থন খাঁ প্রমুখ জয়পুর দরবারের বিশেষ গুণীদের প্রভাব পড়ে।

নবীন কিরাণা ঘরাণার বিস্তার আলাপের ঢং-এ হয়। চমকদার গমকী তান এর এক বৈশিষ্ট্য। হীরাবাঈ বরদেকার, গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, সরস্বতী রাণে, রোশনারা বেগম প্রভৃতি শ্রীমতীরা এবং সাওয়াই গন্ধর্ব, বহরেবুয়া, সুরেশ বাবু মানে, ভীমসেন যোশী প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেছেন। বর্তমানে ইন্দোরের আমীর খাঁ এই ঘরের যথেষ্ট নাম করেছেন।

সহসোয়ান ঘরাণা: হদ্দু খাঁর জামাতা ইনায়েৎ হুসেন খাঁ থেকে এই

ঘরাণার প্রারম্ভিক সূচনা। ইনায়েৎ হুসেন সেনী ঘরাণার বহাদুর হুসেনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা মহবুব খাঁ ও দাদামশাই ফতবুদ্দৌলার কাছে ইনায়েতের প্রথম শিক্ষা হলেও হদ্দু হস্সুখাঁদের কাছেই ইনি বেশী শিক্ষা লাভ করেন। রামপুরের উস্তাদ মুস্তাক হুসেন, ফিদা হুসেন খাঁ (বরোদা), হাইদার হুসেন খাঁ (রামপুর), হাফিজ খাঁ (মহীশূর), অমান আলি খাঁ (পুনা), ভাইয়া-সাব গণপতরাও, প্রভৃতি নাম করা শিষ্যদের ইনায়েৎ হুসেন খাঁ রেখে গেছেন। অনেকের ধারণা মুস্তাক হুসেন সহসোয়ান জেলার লোক ছিলেন এবং তাঁর নামেই এই সহসোয়ান ঘরাণা গড়ে ওঠে। মুস্তাক হুসেন অত্রৌলী ঘরাণার পুত্তন খাঁ, মহবুব খাঁ, রামপুরের উজীর খাঁ প্রভৃতি নানা গুণী ব্যক্তির কাছে তালিম নিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। ("হামারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ১২০)

আগ্রা ঘরাণা ঃ প্রথমে ধ্রুপদ ঘরাণা ছিল। হাজি সুজান খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। অনেকের ধারণা ঘগ্গে খুদাবকস গোয়ালীয়র থেকে শিক্ষা নিয়ে আগ্রায় এসে এই ঘরাণা গোড়ে তোলেন। নোম্ তোম্ প্রভৃতি বোল দিয়ে আলাপ করে গান আরম্ভ করা এই ঘরের এক বৈশিষ্ট্য। ধমারের কায়দায় ছন্দ, বাট, বোল বানানা প্রভৃতি লক্ষণীয়। এই ধরে বিলায়েৎ খাঁর পিতা নথন খাঁ বিলম্পত লয় ও দানেদার লপেটতান জোড়েন। সদারঙ্গ ঘরের শিষ্য বদল খাঁ ও ফৈয়জ মহম্মদ খাঁ এই ঘরাণার গুণী গায়ক ছিলেন। স্বনাম ধন্য ফৈয়াজ খাঁকে আগ্রা ঘরাণার রত্ন বলা হত। ফৈয়াজ খাঁ সম্ভবতঃ নথন খাঁর প্রভাবে গায়কীতে নূতন ঢং এনে এই ঘরাণার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যে দিলীপচাঁদ বেদী, নিসার হুসেন, বোম্বাইয়ের অজমত হুসেন, পণ্ডিত রতন ঝনকার, বশীর খাঁ, আতা হুসেন, মহতাব হুসেন, মালিকাজান, কলিকাতার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রথীন চট্টোপাধ্যায়, দীপালী নাগ, অর্পণা চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ("হামারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ২৪২)

পাঞ্জাব ঘরাণা বা পাতিয়ালা ঘরাণা ঃ দিল্লী ঘরাণার তানরস খাঁর কাছে আলিয়া ফতু (ফতে আলি ও আলি বকস) তালিম নেন। এই তানরস খাঁ নিজেকে শ্রীচন্দের ঘরাণার বলতেন। অত্রৌলী ঘরাণা লেখার সময় এঁদের কথা বলেছি। আসলে এঁরাই পাতিয়ালা ঘরের জন্ম দেন। অনেকের ধারণা বড়ে মিঞা কালু খাঁর শিষ্য এবং বড়ে গুলাম আলীর

কাকা কালে খাঁ পাঞ্জাব ঘরাণার প্রবর্তক। বর্তমানে বড়ে গুলাম আলি এই ঘরাণার নাম উজ্জ্বল করেন। বড়ে গুলাম আলির পুত্র মুনব্বর আলি এই ঘরাণার একজন ধারক। এই ঘরাণার গায়ক নজাকত ও সলামত খাঁও যথেষ্ট সুনাম করেছেন। গুলাম আলি খাঁ সাহেবের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কলিকাতার মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ;

বেনারস ঘরাণা ঃ ঠাকুর দয়াল মিশ্র থেকে শুরু। ইনি সদারঙ্গ অদারঙ্গের কাছ থেকে খেয়াল শিখেছিলেন। এই ঘরে মনোহরজী ও হরপ্রসাদজী (যিনি আপনার খ্যাতির কারণে প্রসিদ্ধ মিশ্র নামে খ্যাত) ছিলেন। এই দুইজন গুণীই এই ঘরাণার প্রধান প্রচারক হিসাবে সম্মান পান। প্রসিদ্ধজীরা (অনেকে বলেন প্রসাদ থেকে প্রসাদজী ও পরে প্রসিদ্দুজী হয়েছে) শাদী মিঞার কাছে টপ্পাও শেখেন। এই দুই ভাই কাশী নরেশ আয়োজিত ৪১ দিন ব্যাপি বিশাল সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে নির্বাচিত হন। এঁরা কথক ঘরের লোক বলে এঁদের ছন্দ চাতুর্য্য অপূর্ব ছিল। এঁদের গানের চালে বাহিলবার চালও দেখা যায়। ("হমারে সঙ্গীত রত্ন" পৃঃ ২৩৮) এই ঘরাণার পশুপতি সেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র লয়কারীর বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষ গুণী ভানু মিশ্র ও রামকৃষ্ণ মিশ্রের নাম এই ঘরাণাকে উজ্জ্বল করে। রামকিষণ-জীর ছোট ভাই বিষ্ণু মিশ্র বর্তমানে মালদহে থাকেন, ইনিও এই ঘরের একজন ধারক। এরপরে বেনারসের ঘরে নানা বিভাগ এল। রামু মিশ্র, ছোটেরাম দাস, শ্রীচান্দ মিশ্র, বড়ে রাম দাস প্রভৃতি অনেক গুণীরা বেনারসের বিশেষ গায়করূপে পরিচিত হন।

রামপুর ঘরাণা : বিভিন্ন ঘরাণার উস্তাদেরা রামপুরে এসে এক বিশাল সঙ্গীত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। তাই রামপুরের নিজস্ব ঘরাণা বলতে কিছু ছিল না। সেনী ঘরাণার বাহাদুর হোসেন, আমীর খাঁ, ছম্মন খাঁ, বজীর খাঁ, কবাল ঘরের বাকর আলি খাঁ প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণার নাম শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। কলিকাতার উস্তাদ দবীর খাঁ, মেহেদী হুসেন খাঁ প্রভৃতি গুণীরাও রামপুর ঘরাণার বলে পরিচিত হন। যদিও প্রথম জন সেনী ঘরাণা ও দ্বিতীয় হলেন কবাল বাচ্চা ঘরাণার ঘরাণেদার।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা ঃ ধ্রুপদের ঘর হলেও খ্যাল গানেও এঁদের দক্ষতা আছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাল গানে এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের বাহক। (ধ্রুপদের ঘরাণা দেখুন)

ঘরাণা সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান খণ্ডে সম্পূর্ণ লেখা সম্ভব হল না।

টপ্পা ঃ—মধুর ভঙ্গী, কিন্তু যেন কালচার-মুক্তাদানার কণ্ঠী। জৌলুষ ওর কিছু থাকলেও লালিত্য তেমন নেই। সাঁচ্চা মতির হারের কাছে ওর পরাজয় ঘটে, অবশ্য ধনীর ঘরে ওর সামান্য কিছু মান আছে, ও একেবারেই ঝুটো নয়। ধ্রুপদ খেয়ালের মত গভীর রসসৃষ্টি ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওর দানাদার তানগুলো একঘেয়ে, একই ধরণের পুনরাবৃত্তি, প্রকৃতরস উপভোগ করা যায় না। যে রস ওর আছে তা আমাদের মনকে গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। ওর জমকালো জরীর সাজ আমাদের হঠাৎ চমকে দেয়, কিন্তু মরমে পরশ লাগাতে পারে না। শোনা যায় আগে পাঞ্জাবের গ্রাম্য সঙ্গীতের মাঝেই ওর ঠাঁই ছিল, গ্রাম্য চালেই পাঞ্জাবের উষ্ট্রপালকেরা ওকে হৃদয়ে পালন করতো। বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পাঞ্জাবী রমণীরা সকলে মিলেমিশে ওর সুপ্রিয়তা বজায় রাখতো। *

আজকের দিনের প্রচলিত এই টপ্পা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা অষ্টাদশের প্রথমদিকে চালু হয়েছে। পাঞ্জাবের শোরী মিঁয়া এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে এতে রেরক মুরকের কায়দা ও ফিকরাবন্দীর চলন দিয়ে সাজিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দরবারে একে নিয়ে আসেন। টপ্পা, রাগের বাঁধনকে সর্বতোভাবে মেনে চলে, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঠাঁই পেয়েছে। তাছাড়া ওর নিজস্ব একটা ধরণ বা চলন আছে যেটা ওর আভিজাত্য বলে ও দাবী করতে পারে। এইসব কারণেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ও একটা আসন পেল, পেল না কোন উঁচু আসন, কেবল আসরে বসবার একটা অনুমতি পেল।

টপ্পা শোরী মিঞার নামে চালু হলেও এর প্রচলন-কর্তা আসলে গুলাম নবী রসুল, তিনি নিজের ছদ্ম নামে এটা চালু করেছিলেন। অনেকের ধারণা তাঁর প্রণয়িণীর নামেই তিনি এটি চালু করেন কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে সেটিও ঠিক নয়। শোরী শব্দের অর্থ সুন্দর। আমরা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে

* "নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর নামক হিন্দী অভিধানে লেখা আছে যে টপ্পা এক প্রকার চলতি পাঞ্জাবী গান এবং আরও লেখা আছে যে এক প্রকার ঠেকা যা তিনবাড়া তালে বাজান হয়। ঠেকার কথাটি আমাদের ঠিক বলে মনে হয় না।

টপ্পার নাম দেখতে পাই, সেটি তখন 'ডপ্পা' এই বিকৃত নামে চালু ছিল, তবে তার চলন আজকের দিনের টপ্পা থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। পাঞ্জাবী কবাল ঘরাণার খ্যাল গায়কদের ঘরেই এর জন্ম হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। বাংলাদেশে ১৭১৫ খৃঃ স্বর্গীয় রামনিধি গুপ্ত বাংলা ভাষায় টপ্পা চালু করেন, যেটি নিধু বাবুর টপ্পা নামে আজও প্রচলিত। অনেকের ধারণা তিনি শোরী মিঞার নকল করেছিলেন, অনেকে বলেন যে তিনি শোরী মিঞার কোনও আত্মীয়ের বা ছাত্রের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

টপ্পা গানে আমরা পাঞ্জাবী ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। যে সব রাগে খেয়াল গান তার স্বভাবিক স্ফূর্তি পেত না, যেমন ভৈরবী, কাফী প্রভৃতি ঠুংরী গানের উপযুক্ত সেই সব রাগেই সাধারণতঃ টপ্পার গান বাঁধা হত। এইসব রাগ খেয়ালের থেকে ভিন্ন ধরণের। রাগের চটুলতা, কোমলতা ও বিচিত্রতা দেখানোই টপ্পার বৈশিষ্ট্য। গম্ভীর প্রকৃতির রাগে টপ্পা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বলেই ঐ সব রাগে টপ্পার চলন নেই। দুটি মানুষের অন্তরের প্রেম ও বন্ধুত্বের বিষয় প্রভৃতির ভাব নিয়েই টপ্পার গান রচিত। কখনও কখনও ভগবানের কথা অথবা কিছু কাল্পনিক বিষয়ের রচনাও দেখা যায়। টপ্পার ভাষা পাঞ্জাবী একথা আগেই বলেছি, তালে পাঞ্জাবী তালই নানা রূপ ভেদে ব্যবহার করা হয়। এই টপ্পার সঙ্গে মিশে টপ্-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। টপ্পাই ঠুংরীর প্রথম সোপান, তার আবিস্কারের উৎস। আজকের দিনে টপ্পার চলন নেই বললেই চলে।

(১) **লখনৌ ঘরাণা**ঃ—শোরী মিঞা থেকে এসেছে। শোনা যায় কবাল ঘরেও টপ্পা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতি বিশেষ ঝোঁক থাকায় টপ্পাদার হিসাবে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

(২) **রামপুর ঘরাণা**ঃ—আসরফ্ খাঁর শিক্ষাতেই সৃষ্টি হয়।

(৩) **বনারস ঘরাণা**ঃ—মনোহর ও পরসদ্দু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

(৪) **বাংলা ঘরাণা**ঃ—দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঘরাণা গড়ে উঠে ইমাম বাঁদী ও রমজান খাঁর সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ঘরাণা গড়ে ওঠে বেনারসের মিশ্র বংশের সহায়তায়।

ঠুমরীঃ—ঠুং শব্দ থেকে ঠুমরী আসেনি। ঠুনকো অর্থে ক্ষণভঙ্গুর সেই হিসাবে আমরা ঠুনকো গীত, বা ছোট ছোট গীত এই মনে করতে পারি। নৃত্যের একপ্রকার বিশেষ সুষ্ঠু পদক্ষেপকে হিন্দীতে ঠুমক বলা হয়। এই

ঠুমক্ শব্দ থেকেই ঠুমরী নামটি এসেছে। নাচিয়েদের ঘর থেকেই ঠুমরী চালের গানের জন্ম এবং সেই কারণে কালকা-বিন্দাদিনের ঘর থেকে ঠুমরী প্রকাশ পেয়েছে বলা হয়। আমরা কালকাবিন্দার নামে গাঁথা কিছু ঠুমরী গানের রচনা দেখতে পাই। যাঁরা ঠুমরীর জন্ম নাচিয়ের ঘর থেকে বলেন তাঁদের মতকে আমরা অমান্য করতে পারি না, তবে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। জন্মের কথায় পরে আসছি, আসলে ঠুমরী হল সোনার কাঠি, ওর পরশে হাজার দুয়ার যায় খুলে। তানের টানে, মীড়ের মোহে, নানা রং মেশান সুরের জালে ও রচে সুর-স্বর্গের ইন্দ্রজাল। প্রাণের মাঝে জ্বালায় রং মশালের রঙ্গীন আগুন। বিচিত্রতায় ভরা, যেমনি মধুর তেমনি লাবণ্যময়ী। ও হল সুন্দরী তিলোত্তমা, তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করে ওকে ভরিয়ে তোলা হয়। ঠুমরী হল ধ্রুপদের দৌহিত্রী, তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে জড়িত থাকলেও ওর নবীন বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব। ওর পিতৃদেব খেয়াল রাগরূপকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি, সে স্বাধীনতা চেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় নি, ওর বোন টপ্পাও এ ব্যাপারে হার মেনেছে। কিন্তু ঠুংরী তার সুরসৃষ্টির চাতুরীতে পেয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, রাগমুক্তি। ও অসবর্ণা, তাই রাগের জাত মানে না, যখন যেমন খুশী মিশিয়ে চলে নানা রাগের সৌন্দর্য্যকে। ও জড়োয়ার নেকলেশ, বসিয়ে দেয় মুক্তার পাশে চুণী ও পান্না, আবার হীরার দ্যুতির ঝলকও দেখা যায় ওর গাঁথুনীতে। ও পাচফুলের সাজী, সেখানে রয়েছে রজনীগন্ধার পাশে গোলাপ, আবার তারি পাশে দেখা যায় স্বর্ণচম্পা, মাঝে মাঝে ছোট নানা বাহারী পাতা, এক অপূর্ব মিশ্রণ, অফুরন্ত উচ্ছলতা। প্রাণশক্তিতে মহীয়সী এই ঠুমরী। নিত্য নব নব রূপে ও জয় করে চলেছে শ্রোতার হৃদয়। ওর সম্পূর্ণতা নেই, ওর সম্পদ বেড়েই চলেছে নানা জনের নানা দানে।

শোনা যায় ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকেই ঠুমরী গান চলে আসছে, তবে সেকালের কোন ঠুমরী গায়কের নাম ধাম আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নি। ইংরাজ রাজত্বের সময় লর্ড ডালহাউসী ১৮৫৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যখন মেটেব্রুজে নির্বাসিত করেন তখন থেকেই ঠুমরীর চলন প্রাধান্য লাভ করে। নবাব ওয়াজিদ আলিশার সভায় একশো-দশ জন সভা-গায়ক গায়িকা ছিলেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই ঠুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই ছিলেন না, নাট্যগীতি বা কাব্যগীতির রচনায়ও তিনি উৎসাহী ছিলেন, অনেক গীতিকাব্য রচনাকে তিনি ঠুমরী নামে প্রচার করেছিলেন। তাঁর

এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলি কদর তাঁকে এই রচনার বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন, "কদরপিয়া" এই ছদ্ম নামে তিনি ঠুমরীর জন্য অজস্র গান রচনা করেছিলেন। এই ঠুমরীতে ব্রজভাষা বা পূর্বীভাষা ব্যবহার করা হত। এতে দুই থেকে ছটা আটটা পর্য্যন্ত তুক চালু ছিল। বিস্তারে কিছু খেয়ালের ভঙ্গীও থাকতো। এই সময়ে "লখনৌ ঠুমরী তাল" বলে একটি তালও চলেছিল যা ঠুমরী গানের সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া তিনতাল, একতাল ও পাঞ্জাবী ঠেকাতে ঠুমরী গাওয়া হত। ঐ সময়ে আরও দু এক জনের ঠুমরী গান রচনার কথা শোনা যায়। তাঁরা হলেন ইয়াশপিয়া, চাঁদশা প্রভৃতি। এঁদের অনেক গান লিপিবদ্ধ আছে, তবে এঁরা কোথা থেকে ঠুমরী গান শিখেছিলেন তার ঠিক ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। ঠুমরীর জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ, দিল্লীর আশে-পাশে বা অন্য কোথাও হতে পারে, সেটি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।

লক্ষ্ণৌ ঠুমরী থেকে জন্ম নিল বেনারসী ঠুমরী, যাকে অনেকে পূরবী ঠুমরী বলেন। শোনা যায় আলীবক্স খাঁ, মুন্নে খাঁ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্যাল গায়কেরা ঠুমরী অপূর্ব গাইতে পারতেন, তবে তাঁরা কোন সঙ্গীতাসরে তা পেশ করতেন না। কলকাতায় যাঁরা ঠুমরীকে চালু করেন, তাঁদের মধ্যে ভাইয়া-সাব গণপৎরাও এবং মৈজুদ্দিনের নাম সকলেই করেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব ঠুমরীতে উস্তাদ ছিলেন। তাছাড়া মোতী বাঈ, অচ্ছন বাঈ, জর্দন বাঈ, গহর বাঈ, মালকাজান, প্রভৃতি বাঈদের দানও কম নয়। এইসব বাঈরা অনেকেই মইজুদ্দিনের কাছ থেকে তালিম পেয়ে ছিলেন। আর একজন বাঙ্গালী গুণী স্বর্গীয় উস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর দানও অস্বীকার করা যায় না। মৈজুদ্দিন ঘরাণার এবং ভাইয়া সাহেবের ঠুমরীর তিনি একজন ধারক ও বাহক ছিলেন। অনেক সাগীর্দকেই তিনি যত্ন করে ঠুমরী শিখিয়ে গেছেন। ওয়াজীদ আলির ঠুমরী যখন চলছে, তখন কবাল ঘরের সাদেক আলি লচাও ঠুমরীর প্রচলন করেন। অনেকের ধারণা যে বর্তমানের এই ঠুমরী সাদেক আলির ঠুমরীর অনুসরণ। বর্তমানে উস্তাদ গোলাম আলি প্রভৃতির ঠুমরীকে পাঞ্জাবী ঠুমরী নাম দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবী "খড্ডা" তাতে মেশান আছে। ঠুমরী পরিবর্তনশীল, সবরকমের ষ্টাইল, সবরকমের সুন্দরতার মিশ্রণেই ওর বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রতাই ওর প্রাণশক্তি। আজকাল হোলীর গান, দাদরার গান, এমন কি কাজরী, চৈতী প্রভৃতি জাতীয় গানকেও অনেকে ঠুমরী বলেন, সেটা ঠিক নয়।

আধুনিক ঠুমরীতে দুটি তুক থাকে, কখনও কখনও তিন চারটে তুকও দেখা যায়। কিছু লচাও ভাব থাকে স্থায়ীর শেষে লগ্গীর ব্যবহার হয়, এবং লড়ীর মত তান দিয়ে বা মুখে এসে শেষ করা হয়। ঠুমরী সাধারণতঃ পাঞ্জাবী তালে, আটমাত্রা এবং সাত মাত্রার যৎতালে, বিলম্বিত অথবা মধ্য লয়ের তিন তালে কিম্বা ছেপকা অথবা আদ্ধায় গাওয়া হয়। দাদরা তালের ঠুমরীকে দাদরা বলা হয়, অনেকে এটিকে ভিন্ন এক জাতের ঠুমরী বলেন। ক্বচিৎ ঠুমরী অন্য দু একটি তালেও শোনা যায়। (দাদ্‌রা দ্রষ্টব্য)

দাদ্‌রা: ঠুমরীর সহোদরা এই দাদ্‌রা। দুই বোন একই ঘরের একই শিক্ষায় গড়ে উঠেছে। তাই ওদের চলাফেরা একই রকমের। জন্ম উত্তর প্রদেশে বলে মনে হয়, তবে জন্মের সাল তারিখ আমাদের জানা নেই। অনেকে বলেন দাদুর শব্দটি থেকে দাদ্‌রা কথাটি এসেছে। আমাদের ধারণা ধমারের মত এই গীতি পদ্ধতিরও নামকরণ হয়েছে তালের নামে। দাদ্‌রা তালে গীত হয় বলেই এর নাম দাদ্‌রা। (ক্বচিৎ কাহারবা তালেও শোনা যায়।)

দাদ্‌রা গানে একটি দোলন আছে যার প্রকাশ ভঙ্গী ঠুমরীর থেকে হালকা, লয় অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও ছন্দবৈচিত্রে সমৃদ্ধ। ঠুমরীর মত বোল বিস্তার বা 'বোল বানানা' দাদ্‌রায় বেশী করা হয় না। ঠুমরীর মত এতেও রাগের জাত মানা হয় না। কথা দিয়ে সুরের কাজে নানা চটুল ছন্দ রচনাই এর বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবী ঠুমরীর মত 'খড্ডা' মিশিয়েও রং ভরা হয়। রচনায় দেশীয় ভাষা, মৈথিলী, উর্দ্দু অথবা হিন্দী ভাষার পরিচয় মেলে।

ঠুমরী ঘরাণা: (১) লক্ষ্মৌ ঘরাণা: –ওয়াজেদ-আলি-শা ও কদর পিয়া এই ঘরাণার প্রবর্ত্তক। খেয়ালের লঘু চালের সঙ্গে ভাও বা অভিনয়ের ভঙ্গিমা যুক্ত করে এর সৌন্দর্য্য বাড়ান হয়েছে। পরে সাদেক আলি এই ঘরে লচাও ভাব ও টপ্পার সূক্ষ্ম কাজের ব্যবহার আনেন।

(২) বনারস ঘরাণা: মৈজুদ্দীনের প্রভাবে এই ঘরাণা, খ্যাতনামা বাঈজী-দের সহায়তায় গড়ে উঠে। দাদ্‌রা ও লোক-সঙ্গীতের মিশ্রণই এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য। দানেদার টপ্পার তানও শোনা যায়।

(৩) বাংলা ঘরাণা: গণপত রাও ও ওয়াজেদ-আলি-শার প্রভাবে এই ঘরাণা গড়ে ওঠে। এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যে লচাও ভাবের আধিক্য দেখা যায়।

(৪) পাঞ্জাব ঘরাণা: স্বর্গীয় বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব এই ঘরাণার প্রবর্ত্তক। পাঞ্জাবী খড্ডা এর বৈশিষ্ট্য।

সাদরা : ধ্রুপদের সহোদরা এই সাদরা ধ্রুপদের মত অত গম্ভীর না হলেও চটুল বা চপল-মতি নয়। খ্যালের সামান্য কিছু কায়দা এতে দেখা যায় ধ্রুপদের ভাবে। এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে ধ্রুপদ বলাও চলে না আবার খ্যাল বলে ধরলেও ভুল করা হবে। প্রায় আটশো বছর আগে সুলতান হোসেনের আমলে যখন জৌনপুরে 'চুটকলা' জাতীয় খ্যালের প্রচলন ছিল, তখন দু-লাইনের একধরণের গান সুলতান যুদ্ধের গান বলে সৃষ্টি করেন এবং সেই গানের নাম দেন সাধর্ চুটকলা।[১] মির্জ্জা খাঁর গ্রন্থ থেকে জানতে পারি যে সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে সাধ্রা চুটকলার কদর ছিল। ঐ পুস্তকেই সাধ্রাকে যুদ্ধবিষয়ক গীত বলা হয়েছে। গানটি কোন্ ঢং-এ গীত হত সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে আমাদের ধারণা ঢাড়ী ও কাবালদের হাতে সাধ্রা চুটকলাই নানা পরিবর্তনে বর্তমানের সাদরা।

এর ভাষায় সরল ব্রজভাষার আধিক্যই নজরে পড়ে। যুদ্ধের গান থেকে উৎপত্তি হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে ধ্রুপদের মত ভগবৎ প্রার্থনাদিই দেখা যায়।

অনেকের মতে খ্যাতনামা সঙ্গীত-নায়ক বৈজু বাওরার শিষ্যদ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথই এই ধরণের গীতপদ্ধতির স্রষ্টা ও প্রবর্তক।[২] দিল্লীর কাছে শাহাদারা গ্রামে তাঁরা বাস করতেন এবং সেই গ্রামের শাহদারা নাম থেকে এই সাদরা নামটি চালু হয়েছে। আমরা ধ্রুপদের বাণীর বেলায় যেমন তাদের এক একটি স্থানের নামের সঙ্গেই জড়িত দেখতে পাই এটিও সেইরূপ।

ধ্রুপদাঙ্গের বিষয় গ্রহণ করলেও এর বিস্তারে খেয়ালের ভাব দেখা যায়। তানকে বাদ দিলেও এর দ্রুত অঙ্গে ফিকরাবন্দির কাজ করা হয়। আবার ধামারের বাট বাটোয়ারার কাজও এতে সামান্য থাকে। ঝাঁপতালেই বেশী গাওয়া হয়, ক্বচিৎ রূপক বা শূলতালেও সাদরা শোনা যায়।

তেলেনা, তরানা বা তিল্লানা: 'তরানা' ফার্সি শব্দ এবং এক প্রকারের গান। তিল্লানা শব্দটিও ফার্সি "তিলা" শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় তরানাকে তেলেনা বলা হয়। আমীর খুসরোকেই এর আবিষ্কারক বলা হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তরানা ও তেলেনা এই দুই প্রকার গানে ভিন্ন ভাবে ভাষার ব্যবহার

১। মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা—শ্রীযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র—পৃঃ ৫৪।

২। সঙ্গীতকোষ—শ্রীযুত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।

ছিল। আমরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময় নির্গীত* নামের গীত পাই যাকে বহির্গীত বা নিরর্থক গীতও বলা হত। এই ধরণের নিরর্থক শব্দ (বাণী) যুক্ত গান প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলে গুণীরা মনে করেন। এই নির্গীতই বর্তমানের তরানা একথা অনেকে প্রমাণ করেছেন। দেবর্ষি নারদকে এই ধরণের গীতের রচয়িতা বলা হয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে এটি ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রাচীন গীতশৈলী। আমীর খুসরোকে এর আবিষ্কারক বলা যায় না। খেয়াল গায়কেরা প্রায়শঃই তেলেনা বা তরানা গেয়ে থাকেন। তরানাতে নে, তে, রে, দীম, তানা, না ইত্যাদি অথবা আদানি, তাদানি, তানি, আলা, আলি, আলালুম প্রভৃতি নিরর্থক বোল ব্যবহার করা হয়, পণ্ডিতেরা বলেন যে এগুলি কেবলমাত্র নিরর্থক বোল নয়, এগুলির দ্বারা ভগবানের নাম ও কথাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। কণ্ঠে আলাপের দ্রুত লয়ে তেলেনার ভাব প্রকাশ পায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও দ্রুতের সময় তেলেনার আভাষ মেলে। খ্যালের মত তরানায় রাগের সমস্ত বাঁধন মেনে চলা হয়, নানা ধরণের তান, ছোট ছোট দাঁড়া বিস্তারও করা হয়। তরানা অধিকাংশ সময়েই দ্রুত চালে গাওয়া হয়। ক্বচিৎ মধ্যলয়ের তরানাও শোনা যায়। অনেকেই ঢিমা বা মধ্যলয়ের খেয়াল গানের পর দ্রুত্ তরানা গেয়ে থাকেন। মুঘল যুগে তরানায় কিছু কাব্যাংশ থাকত কিন্তু তেলেনায় শুধু অর্থহীন বোলই ব্যবহৃত হত। দ্রুত তিনতাল, দ্রুত ঝাঁপতাল বা দ্রুত একতালেই তরানা বেশী গাওয়া হয়। ছোট বড় প্রায় সকল রাগেই তরানা গাওয়া হয়। যন্ত্রের চালে অতিদ্রুত লয়ে গাওয়া ও লয়কারীর কাজ দেখান তরানার এক বৈশিষ্ট্য। তরানার ঢিমা গান ক্বচিৎ শোনা যায়।

ত্রিবট: আমাদের প্রাচীন স্তোভ জাতীয় গীতই আমীর খুশরোর সময়ে ত্রিবটে রূপান্তরিত হয়। Rev. Popley সাহেব তাঁর Music of India নামক বইটিতে লিখেছেন—"It is a song beloved of Boatmen and Dhooly bearers as they take Sahib to his destination" ত্রিবট বা তেলেনা কোনটিই ঢুলি, পালকিবাহক, বেয়ারা বা নৌকার মাঝিদের গান ছিল

* ভরত নাট্য শাস্ত্র (গায়—সংর্ক-অ: ৫) এতে দেখা যায় যে লয়তালযুক্ত নির্গীত গান গন্ধর্ব সভায় গাওয়া হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রে স্তোভাক্ষর ব্যবহৃত হত। নির্গীতেও স্তোভাক্ষর ও শুষ্কাক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়। দেবর্ষি নারদকে নির্গীতের স্রষ্টা বলা হয়। আমীর খুসরো নির্গীতের সঙ্গে কোন ফার্সী গানের চালের মিল দেখে, এই জাতীয় গানকে তরানা বলে চালিয়ে দেন।

না বা এখনও নাই। তাঁর এই ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ত্রিবট তিনতুকবিশিষ্ট একপ্রকারের তেলেনা জাতীয় গান। এর প্রথম চরণে আলাপের বোল, দ্বিতীয় বা তৃতীয়ে তবলা পাখোয়াজের বোল এবং সরগম যুক্ত থাকে। বর্তমানে ত্রিবট ক্বচিৎ শোনা যায়। তিন তুকের কারণেই এটি ত্রিবট নাম পেয়েছে। মুঘল যুগে এটিতে চারটি পর্যন্ত কলি থাকত এবং এই গানের সঙ্গে পখাবজ ব্যবহৃত হত।[১]

চতুরঙ্গ: তরানা জাতীয় এই ধরণের গানে চারিটি তুক থাকে। প্রথম তুকের বাণীতেই আমরা চতুরঙ্গ শব্দটি পাই, দ্বিতীয় তুকে থাকে সরগম, তৃতীয়ে তরানার মত নিরর্থক বোল ও চতুর্থে তবলা পাখোয়াজের বোল থাকে। চারটি তুকে চার প্রকার বিশেষ বিশেষ বোলই এর বৈশিষ্ট্য, বাকী সব তরানারই মত।[২]

গুলনক্স্: আমীর খুসরোর সময়েই গজিয়ে উঠেছিল এই ধরণের গান। কোন সঙ্গীতাসরে বর্তমানে এই গান শোনা যায় না। আমরা বেনারসের উস্তাদ শ্রীচান্দ মিশিরের কাছে গুলনক্স্ শুনেছি। আরবী অথবা ফার্সী ভাষায় তৈরী এই বিশেষ চালের খ্যালে "গুল" এই শব্দটির উল্লেখ থাকে। অনেক উস্তাদের কাছে এইরূপ কিছু কিছু পুরাতন চালের জিনিষ গুপ্ত থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত, এই জাতীয় গানকে যত্ন করে সংগ্রহ করে রেকর্ড করে রাখা, কারণ এগুলি জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এই গান থেকেই আমীর খুশরো ছোট খেয়ালের সৃষ্টি করেন। মুঘল যুগে নক্স্ বলে তরানা জাতীয় এক ধরণের গীত প্রচলিত ছিল।

লক্ষণগীত: কোন রাগের গতি-প্রকৃতি, তার ঠাট-পরিচয়, তাতে কোন স্বর ব্যবহৃত হয়, তার বাদী, সম্বাদী, সেটি গাইবার সময় প্রভৃতি বিষয় যে গানের বাণীর মধ্যে বর্ণিত থাকে তাকেই লক্ষণগীত বলা হয়। প্রায় সকল রাগেই লক্ষণগীত ভিন্ন ভিন্ন তালে গাওয়া হয়।

স্বরাবর্ত, স্বরমালিকা, সরগম বা বন্দিশ: রাগোচিত নানা স্বর সুন্দর করে সাজিয়ে তালে বেঁধে মধুর ভাবে পরিবেশন করা হয়। রাগকে ও স্বরকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে তালের বিভেদ বোঝানর জন্যেই এগুলির সৃষ্টি। যন্ত্রে বাজলে

১। সঙ্গীত রত্নাকরের ত্রিপথ ও ত্রিভঙ্গী প্রবন্ধের সঙ্গে ত্রিবটের মিল আছে। উচ্চারণের দিক থেকে ত্রিপথের সঙ্গে ত্রিবটের মিল দেখা যায়। (সঃ রঃ ৪র্থ অধ্যায়)

২। পার্শ্বদেবের "সঙ্গীত সময় সার" গ্রন্থে বর্ণিত চতুরঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।

এগুলি বোলহীন গতের মতই শোনায়। প্রায় সমস্ত রাগের সরগমেই ভিন্ন ভিন্ন তালে বাঁধা বন্দিশ আছে।

রাগমালা বা রাগসাগর : কোন গান, তাতে যে বিষয়েরই বর্ণনা থাকুক, পরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাগ ও তালে বেঁধে গাওয়া হয়। প্রথমে যে রাগে গানটি আরম্ভ করা হয় তার থেকে পরের সময়োচিত রাগ, এবং তার পরের সময়ের রাগ এইভাবে পর পর উপযুক্ত সময়ের রাগ গেয়ে পুনরায় যে রাগে আরম্ভ করা হয়েছিল তাতে শেষ করাই বিধি। অনেকে যে কোনও পাঁচ বা দশটি রাগ গেয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত রাগে ফিরে এসে রাগমালা বা রাগসাগর গেয়ে থাকেন।

বিষ্ণুপদ : বিদ্যাপতি রচিত ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান এবং যে সকল গানে ভগবান বিষ্ণুর কীর্তন থাকতো সেগুলিকে বিষ্ণুপদ বলা হত। সুরদাস প্রভৃতি গুণীরা বিষ্ণুপদ শৈলীর গানের সৃষ্টি ও প্রচার করেন। এই গান ধ্রুপদের কায়দাতেই রচিত হত। এই গানের কোন নির্দিষ্ট পদসংখ্যা স্থির থাকতো না, যত ইচ্ছা তত পদই গান করা হত। বর্তমানে বিষ্ণুপদ লুপ্ত বলা চলে।

কওল-কালবানা : এই গান বর্তমানে কাওয়ালী বা কবাল গান বলে প্রচলিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গান প্রায় সীমাবদ্ধ। জগদীশ্বরের স্তুতি ও মুসলিম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের গুণকীর্তনই এই গানের একমাত্র বিষয়বস্তু। কবালেরাই এই গান গেয়ে থাকেন।

জাত বা জট : বর্তমানে এই ধরণের গানের প্রচলন দেখা যায় না। এই গানের এক একটি পদ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হত। গানের প্রতিটি পদ-ও ভিন্ন ভিন্ন রাগে বাঁধা হত। গুণী পরিবেশকেরা কখনও কখনও প্রতিটি পদে তালফেরতা (তালের বিভিন্নতা) দেখাতেন।

কড়্খা : ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত সঙ্গীতসারে লেখা আছে, "স্তুতি-পাঠক বন্দীবর্গ যে সকল গান সহকারে রাজাদের গুণকীর্তন বা স্তুতিবাদ করে তাহার নাম কড়্খা।" এই গান রাজপুত ভাষায় রচিত হয়। কড়্খা-গায়ক ব্যবসায়ীদের **ঢাড়ী** বলে। রাগদর্পণে লেখা আছে—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। ৪।৮টি কলি থাকে। দুটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গীত হয়।

জিগর : এক ধরণের অধ্যাত্ম বিষয়ের গানকে মুসলমান উস্তাদগণ জিগর বলে থাকেন। এই জিগর জাতীয় গান বর্তমানে প্রচলিত নাই। গুজরাটি গায়ক কাজি মামুদ এই জিগর গানের স্রষ্টা ছিলেন। ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত সঙ্গীতসারে এই জাতীয় গানের উল্লেখ আছে।

ভজন : ভক্তিমূলক গানকে ভজন গান বলা হয়। এই গান ভাবপ্রধান। ভক্তিরসে ডুবে শ্রীভগবানেব চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করার ভাবই এই গানে থাকা যুক্তিসঙ্গত এবং সেই মনোভাব নিয়েই এ গান পরিবেশন করা উচিত। সাধারণতঃ এই গানের ভাষা ও সুর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। সুরদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতির গানগুলির রচনাতে আমরা এই সহজ সরল ভাবের বিকাশ দেখতে পাই। এই গান পরিবেশন কালে এর ভাষার উচ্চারণভঙ্গীর শুদ্ধতার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ভজন গানকে পূজার একটি অঙ্গ বলে মনে করে শ্রীভগবানকে একান্ত ভাবে পাবার জন্য ও তাঁর জন্যই এই গান, এরূপ মনোভাব রেখেই ভজন পরিবেশন করা উচিত।

চৈতী : বিহার প্রদেশে এটি চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলেই এর নাম চৈতী। এটি বিহারের লোকসঙ্গীত বলেই প্রচলিত। চৈতী আদি রসাত্মক বিরহের গান। সাধারণতঃ রাম-সীতার লীলা-মাহাত্ম্য নিয়েই এই গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ও গীত হয়ে থাকে।

গজল : গজল শব্দটি আরবি শব্দ, শব্দটির অর্থ প্রেমিকার সহিত কথোপকথন, তাই গজলকে প্রণয়-সঙ্গীত বলা হয়। আসলে একে কাব্যসঙ্গীত বলাই ভাল। গজলের জন্মস্থান পারস্য। ইরানীরা ফার্সী ভাষায় এই গান গেয়ে থাকেন। এর কবিতায় প্রতি স্তবকে দুটি করে চরণ থাকে সেই দুটি চরণের মাঝেই এক একটি ভাব প্রকাশ পায়। স্তবকগুলি দ্ব্যর্থ বোধক, সাধারণতঃ পাচ থেকে এগারটির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। গজল যেমন একদিকে প্রণয়-সঙ্গীত অন্যদিকে আবার ভাব-সঙ্গীত। গজলের কবিতার "শের"গুলির অর্থ (শের অর্থে চরণ) দুভাবেই করা যায়। প্রেম যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তখন সে হয় ভাগবৎ-প্রেম; আবার সেই একই প্রেম যখন কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে তখন সে হয় জাগতিক-প্রেম বা মানবী-প্রেম। ওর শেরগুলির অর্থ দুভাবেই করা যায়। ভারতে

গজল উর্দ্দু ভাষাতেই গাওয়া হয়। চলতি উর্দ্দু গজলের ভাবে সস্তা প্রেম জানানোর মামুলি কায়দা। কয়েকটি উর্দ্দু দার্শনিক গজল ছাড়া উর্দ্দু গজলে আমরা সুরুচীহীন ছেবলামি দেখতে পাই। গজলের সুর একঘেয়ে লাগে। সব গজলের প্রকাশভঙ্গিও প্রায় একই ধরণের হয়, দু-চারটি গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইরানীরা ফার্সী ভাষায় গজল গেয়ে থাকেন, আমাদের এখানেও দু-একজন ফার্সী ভাষার গজল গান, এই ফার্সী ভাষার গজলকে আমরা উর্দ্দু ভাষার গজলের কোঠায় ফেলতে পারি না। ফার্সী গজলে আমরা গভীর কাব্য রসের সন্ধান পাই। ওর কবিতার ভাবার্থ আমাদের অতীন্দ্রিয়-লোকে নিয়ে যায়। আমাদের অন্তরে জাগায় গভীর অনুভূতি। এর ছন্দে একটা দোলা আছে, ধ্বনিতে আছে লালিত্য, তা ছাড়া বণঝঙ্কারের সমাবেশ প্রভৃতি এতে যেমন দেখা যায় সে ভাব আমরা উর্দ্দু গজলে পাই না।

ভারতে গজলের প্রবর্ত্তক বলতে আমাদের আমীর খুসরোর নামই মনে পড়ে। আকবর বাদশার দরবারে ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী সঙ্গীতকারগণ, হিন্দু ও মুসলিম সঙ্গীতকারদের সাথে সাথে দরবার গায়ক হিসাবে ছিলেন। এই দরবারের ইরানী কলাকারেরা যে গজল গাইতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সে সময়ে সৈয়দ খাঁ নৌহার ও দৌলত আফজ্ প্রভৃতি গজলের গুণীদের নাম পাওয়া যায়।

বাংলা গজলের অবস্থা বড় দীন। বাংলা ভাষায় প্রথম গজলের প্রবর্ত্তক ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু গজল লোকপ্রিয় করে তোলেন কবি কাজী নজরুল, সুরারোপ করেছিলেন তিনি নিজেই। সুরকার হিসাবে কাজী নজরুলের খ্যাতি কম নয়, সুরমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য তাঁর কাছে শেখার মতই ছিল কিন্তু তবুও বাংলা গজলের সুর তেমন সজীব হয়ে ওঠে নি।

গজলের রচনা শৃঙ্গাররসাত্মক। গজলের প্রথম 'শের' অর্থে প্রথম চরণটি স্থায়ী বলে গাওয়া হয়। পরের সব চরণগুলি এক সুরেই অন্তরাতে গাওয়া হয়। গজলে 'জবান' (অর্থে বাণী) খুব সাফ (পরিষ্কার উচ্চারণভঙ্গি) হওয়া দরকার। গজল সাধারণতঃ ভৈরবী, পাহাড়ী, মাণ্ড্, ঝিঁঝিট, কাফি, খাম্বাজ, পিলু প্রভৃতি রাগেই গাওয়া হয়। পোস্তু, দীপচন্দি, দাদরা প্রভৃতি তালই এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কীর্তন

"নামলীলা বিহারাণাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্"

কীর্তন শব্দের আভিধানিক অর্থ গুণকথন বা যশঃখ্যাপন। কোন মহাজনের গুণ, যশ ও কীর্তিগাথাই কীর্তন গান। সাধারণ ভাবে কীর্তন বলতে আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলার মহিমাপ্রকাশক গানকেই বুঝে থাকি। কীর্তনকে কী-রতন ভাবলে আমরা সঙ্গীতের কী বিশেষ রত্ন এর মাঝে লুক্কায়িত আছে সে কথাটি ভাবতে পারি। কীর্তনীয়া ও ভাবুক শ্রোতা মাত্রেই জানেন যে কীর্তনে সঙ্গীতের কোন বিশিষ্ট রত্ন রয়েছে। কীর্তনের কথায় আমরা সংকীর্তন কথাটিও পেয়ে থাকি। কীর্তন ও সংকীর্তন প্রায় একই অর্থ-বাচক। সংকীর্তনকে 'সমবেত-গুণগাথা-সঙ্গীত" বলা যায়। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে থাকেন তখন তাকে বলা হয় **সংকীর্তন**। বহুজনে একত্রে কীর্তন করতে করতে যখন নগর পরিক্রমা করেন তখন এই সমবেত কণ্ঠের কীর্তনকে **নগর-সংকীর্তন** নামে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত কীর্তিলহরী গান থেকেই বর্তমানের কীর্তন গান এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ভেবে থাকেন, আবার অনেকে একথা স্বীকার করেন না। মহাপ্রভুর কৃপায় বাংলাতেই কীর্তন গানের প্রচলন বেশী। সেই কারণে অনেকে কীর্তনকে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সঙ্গীত বলে মনে করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত।"…

"কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলার। যেজন রসিক, প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়।"—সংগীতচিন্তা।

"বাঙ্গালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ ও ফোক ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহু শাখায়িত নাট্যরস আছে, তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।" সুর ও সংগীত—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব উচ্চাঙ্গ ও বৃহদঙ্গ এই সঙ্গীতকে কাব্য-সঙ্গীত, নাট্য-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ভাব-সঙ্গীত প্রভৃতি নানা

নামে অভিহিত করা হয়। সুর ও ভাবের সুষমায় ভরা, কথার ওপর কথার জাল বুনে একে আবেগে ভরিয়ে তোলা হয়। তালকে মান্য দিয়ে রাগকে সম্মান জানিয়ে, হৃদয়াবেগ ও গভীর ভাবানুভূতিতে ভরা এই ভাব-সঙ্গীত, লীলা কীর্তনে মহান নাট্য-সঙ্গীতের আকারেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কীর্তনে রাগ মানা হলেও রাগের নিজস্ব মেজাজকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ওপর নির্ভর করে ভাব রসে ডুব দিয়ে এখানে আমরা রাগ-রসকে গৌন করি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি না থাকলে, তাকে একান্ত আপনজন বলে ভাবতে না পারলে কীর্তনে সত্যকার রস সঞ্চার করা সম্ভব হয় না। কীর্তনের মতিগতি, তার প্রাণ, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের। গভীর হৃদয়াবেগই এর সর্বস্ব। সেই আবেগের স্রোতে রাগ নিজেকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। রাগ এখানে গৌণ, প্রেমাশ্রিত ভাষাই এখানে মুখ্য। কীর্তনের গায়ককে ভাবানুযায়ী ভাষার প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই গায়কের এই অধিকার নাই। কীর্তনের ভাষা, তার সুর, তার আবেগ, তার ধর্মভাব প্রভৃতি সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশও পৃথিবীর কোন দেশের কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। এটিই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

অনেকের ধারণা যে কীর্তনের জন্মকাল শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব কীর্তনের এক বিশেষ ভাবধারার স্রষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তাঁর আগে সকলের সামনে কীর্তনকে এভাবে কেউ তুলে ধরতে পারে নি। আর কোন মহাজনই বাংলার সর্বসাধারণকে কীর্তনের ভাবে এমন মাতিয়ে তুলতে পারেন নি, তাই শ্রীচৈতন্যদেবকেই সকলে কীর্তনের স্রষ্টা বলে মনে করেন। প্রাক-চৈতন্যযুগেও কীর্তন গানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা হত। যতদূর জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই বাংলা দেশে কীর্তন গানের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

কীর্তনের দুটি বিভাগ, প্রথমটি হল নাম-কীর্তন বা নাম-সংকীর্তন, আর দ্বিতীয়টি হল লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" ; "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ, প্রভৃতি নাম-গানকেই নাম-কীর্তন বলা হয়। দীনতাসূচক গান, আত্মনিবেদনাদি বিষয়ক গান বা প্রার্থনাদিকে নাম-

সংকীর্তনের মধ্যে ধরা হয়। নাম কীর্তনে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তাই বৈষ্ণব সাধক মাত্রেই নাম কীর্তনের অভিলাষী, এখানে রাগ, তাল, সুর, লয়ের অপেক্ষা নামই প্রধান, যদিও এগুলি বিভিন্ন তালে বা ভিন্ন ভিন্ন সুরে গাওয়া হয়। এটি সাধনার সহজ অঙ্গ, তাই সাংগীতিক মূল্যে নাম-কীর্তনকে যাচাই করা যায় না।

দ্বিতীয়টি হল রস-কীর্তন—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, তাঁদের রূপগুণ বর্ণনা, তাঁদের প্রেমলীলা প্রভৃতির বর্ণনা বা প্রশংসাদির বিষয়ই লীলা-কীর্তনের অঙ্গ। এই লীলা-কীর্তনের উচ্চতর গীতশৈলীর ঐতিহাসিক বিকাশ প্রথম ঘটে খেতরির রাজা শ্রীসন্তোষ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় খেতরির মহোৎসবে। শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ সম্বন্ধে তাঁহার "কীর্তন গীত প্রবেশিকায়" (১৩৪৮) লিখেছেন "খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্তনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। এরূপ সাধু সজ্জন ভক্ত ভাবুক রসিক গায়কগণের সমাবেশ বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে এই উৎসবে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং খেতরি যে ভাব-বন্যা আনিয়া দিল, তাহার প্রেরণায় অগণিত ভক্ত কবি, গায়ক, বাদক এই নূতন ভাবের মাদকতায় এক শতাব্দীর অধিক কাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপনা আর হয় নাই। কীর্তন-সঙ্গীতের উচ্চতম শিখর এই খেতরিতেই অগণিত গুণীগণ সমাবেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানকালেও তাহারই ধারা চলিয়া আসিতেছে"। আবার বিশ্বভারতীর প্রকাশনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহে তাঁর লেখা "কীর্তন" বইটিতে ২৫ পৃষ্ঠায় খেতরির মহোৎসবের কথায় আরও লিখিয়াছেন "গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে গণ্য হন······তিনি তাঁর জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গ্রাম প্রান্তে কুটির নির্মাণ করিয়া সেখানে ভজন সাধনে জীবনাতিপাত করেন"। এই নরোত্তম দাস ঠাকুরই খেতরির মহোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পরই বৈষ্ণব জগতের সমস্ত মান্যগণ্য মহাপুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গৌরচন্দ্রিকা অর্থে গৌরাঙ্গ বন্দনা সহ প্রাচীন ধ্রুপদ গানের ভিত্তিতে লীলা কীর্তনের এক নূতন ধারা ঠাকুর নরোত্তম দাস কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়।

ধ্রুপদ বা খ্যাল গানের ঘরাণার মত কীর্তনেও চার পাঁচটি ঘরাণার নাম পাওয়া যায়। এগুলি বাংলা দেশের এক একটি স্থানের নামেই নাম পেয়েছিল। (১) **গরাণহাটি** ষ্টাইল—রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে এসেছে। (২) **মনোহরসাহী**—বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণা থেকে এসেছে। এই দুই ষ্টাইলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ ধরণের, এই মনোহরসাহী ষ্টাইল শ্রীনিবাস আচার্যের আবিষ্কৃত বলা হয়। মনোহরসাহী ষ্টাইলে নানা কাজ, মীড়, তান, মধুর বিস্তার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য শোনা যায়। (৩) **রেনেটি ষ্টাইল**—রাণীহাটি পরগণা থেকে এসেছে। মনোহরসাহী ও রেনেটি একই সময় থেকে প্রচলিত। (৪) **মন্দারিণী**—মেদিনীপুর জেলার গড় মান্দারণ থেকেই এর জন্ম। এই চার রকমের ঢঙ আজকের দিনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রচলিত নাই। কোন গায়কই আজ কোন একটি ঢঙে আবদ্ধ থাকেন না। পূজ্যপাদ পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী, যিনি কীর্তন জগতে "পণ্ডিত বাবাজী" বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বিশেষ বিশেষ ঘরানার চাল নানা জায়গায় ঘুরে শিখে এসেছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশিমবাজার রাজভবনে রেখে কীর্তনের উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কীর্তনের আর এক ঘরাণা **"ঝাড়খণ্ডী"** নামে পরিচিত, মেদিনীপুরের ঝাড়খণ্ড গ্রাম থেকেই এই চালের উৎপত্তি, বর্তমানে এই ঘরানার গান আর শোনা যায় না।

কীর্তনে ময়নাডাল ঃ "আজকাল ময়নাডালের কীর্তন" কথাটি শোনা যায়। ময়নাডাল বীরভূমের একটি গ্রামের নাম, সেই নাম থেকেই ময়নাডাল কথাটি এসেছে। এটি কীর্তনের একটি ঘরানার নাম। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রসরাজ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ই এই ঘরানার প্রবর্তক। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখানেও রসরাজ মিত্র ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কীর্তনের বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু ছাত্রকে কীর্তন শিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকের ধারণা অদ্বৈত দাস বাবাজীও মিত্র ঠাকুরের ঘরে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরানার ধারক ও বাহক নবগোপাল ও গোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয়েরা এই ধারায় কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন।

কীর্তনের কাব্য ঃ কীর্তন গানের কবিতাকে "পদাবলী" বলা হয়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে আমাদের অমর মহাকবি জয়দেবই সরল সংস্কৃতে প্রথম পদাবলী রচনা করেন। তাঁর লেখা গীত-গোবিন্দে পদাবলীগুলি পাওয়া

যায়। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলী ও বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন। তৎপরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির অনুকরণে "ব্রজবুলি" ভাষায় ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত (গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনশ্যাম, বাসু ঘোষ প্রভৃতি) বহু পদাবলী রচয়িতারা কীর্তনের অসংখ্য পদাবলী রচনা করেছেন।

কীর্তনের রাগ ও সুর : কীর্তনের সুর এক বিশেষ ঢঙে রচিত। কামোদ, গৌরী, ভীমপলশ্রী, ধানশী বা মায়ুর প্রভৃতি বিশেষ রাগের নাম কীর্তনের সুরে পাওয়া যায়। এর মধ্যে "মায়ুর" কীর্তনের এক বিশেষ মিশ্র সুর, যাতে বেহাগ, খাম্বাজ ও ঝিঁঝিটের মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে বলেন শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় থেকেই এই বিশেষ সুর প্রচলিত হয়েছে। এই সব রাগে রচিত কীর্তনের সুরগুলির একটি বিশিষ্ট ধরণের রূপ আছে।

কীর্তনের জাত সুর ঃ আগের দিনের নামকরা কীর্তন গায়ক ও সুর রচয়িতা মহাজনেরা কয়েকটি গানে অনেক চিন্তা করে যে ভাবের সুরারোপ করে গেছেন সেগুলি "দাগী" গান বলে চলে আসছে এবং সেই বিশিষ্ট গানের বিশিষ্ট সুরগুলিকে "জাত সুর" বলা হয়। অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদত্ত সুরগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোন কীর্তনীয়া যদি এই সব দাগী গানের জাত সুর লংঘন করেন, তবে তাঁরা কীর্তন সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। কোন কীর্তন সমাজই দাগী গানের সুরের অদল বদল অনুমোদন করেন না। স্বর্গীয় ডাক্তার অমিয় সান্যাল মহাশয় বলেছেন যে—কীর্তনের এই জাত সুরগুলি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত জাতিরাগের কায়দার অন্তর্ভুক্ত।

কীর্তনের তাল : কীর্তনে বহু প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দশকুশী (ছোট ও বড়), ডাঁশ পাহিড়া, দাসপ্যারী বা ডাঁশ পেড়ে, জপতাল, ধামালি, দোঠুকী, ছোট দোঠুকী, তেওট, কাটা ধরা, একতাল, দোজ, ঝাঁতি, লোফা প্রভৃতির নামই শোনা যায়।

কীর্তনের সঙ্গতে বাদ্য যন্ত্র ঃ কীর্তনে শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত আর কোন বাদ্যযন্ত্র অনুমোদন করা হয় না। কণ্ঠনিঃসৃত স্বরকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কীর্তনের আখর ঃ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উপস্থিত মত স্বর রচনা করে

রাগের বিস্তার করা হয় রাগের সৌন্দর্য বাড়ানোর কারণে; কীর্তনেও স্বর বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অনুকূলে, বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে উপস্থিত মত বাক্য রচনা করে ভাবকে গভীরতর করা হয়। গানে এইভাবে ভাষার অর্থে অক্ষরের বিস্তারকেই আখোর আখ্যা দেওয়া হয়। এতে গায়কের স্বতন্ত্রতা, তার কবিত্ব শক্তি, তার রসজ্ঞান এবং লয়-বোধ প্রভৃতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের বিস্তারে ও তানে গায়কের গুণপনার পরিচয় মেলে, কীর্তনের আখরে তেমনি কীর্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কীর্তনের সহিত সঙ্গতের ধারাঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মত অতি কঠিন ভাবে লয় মেনে চললে কীর্তনে কখন কখন তাল লয়ে ছোট বড় হতে দেখা যায়। আগেই বলেচি কীর্তন ভাবপ্রধান গান, ভাবের আতিশয্যে সময় সময় এতে তাল কাটা অসম্ভব নয়। কীর্তনের সঙ্গতে তাই দক্ষ খোল বাজিয়ের দরকার, যিনি সহজেই গাইয়ের ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে যথাস্থানে ঘা দিতে পারবেন। গভীর ভাবাবেশে খোল বাজিয়ে "লহর" বাজাবেন। অক্ষরে অক্ষরে ভাবের পরিপূর্ণতার সময় মাতান বাজিয়ে মান পাড়বেন এবং আখরের সময় বাজাবেন "কাটান", গানের সঙ্গে এই ভাবের সঙ্গত হলে তবেই শ্রোতারা আনন্দ পাবেন, গানটি রসভাবে ভরপুর হয়ে উঠবে, কীর্তনীয়াও আনন্দে মেতে উঠবেন এবং নূতন নূতন আখরে ও সুরের সূক্ষ্ম জাল বুনে গানকে উচ্চস্তরের করে তুলবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বাদ্য হবে গীত অনুযায়ী, তার ভাব হবে ভাষার অনুকূল এবং গীতের অনুসরণকারী, তবেই গানের মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে।

ঢপ কীর্তনঃ বাংলার যশোর (যশোহর) জেলার মধুসূদন (কিন্নর) কান নামে এক প্রতিভাবান গায়কই এই চালের প্রবর্তক। উনিশ শো শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢপ কীর্তনের জন্মকাল। এটিও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। গানে কীর্তনের ছাপ থাকলেও এর প্রকাশভঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী থাকে যে কারণে একে সহজেই কীর্তন থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এতে রাগের ব্যবহার ও চলন রক্ষা করা হয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে সুরে কথা বলার রীতিও রয়েছে। বর্তমানে এ গান আর বিশেষ শোনা যায় না। এটিকে কীর্তনের এক প্রকার সরল রীতি বলা চলে।

বাউলঃ বাউল শব্দটি বাতুল শব্দ থেকে বা হিন্দি বাওরা শব্দ থেকে এসেছে। বাতুল বা বাওরা শব্দের অর্থ পাগল। বায়ুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে

মিশে থাকে বলে বাউল এরূপ অর্থও অনেকে করে থাকেন। যাই হোক বর্তমানের প্রচলিত বাউলের জন্মকাল সতের শতকের শেষের দিকে ধরা হয়, তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ই বাউলের আদি উৎপত্তি কাল বলে জানা যায়। একতারা হাতে বৈরাগীরাই বাউল গান গেয়ে থাকেন, তাই অনেকের ধারণা যে ঘরছাড়া বাউণ্ডেলেরাই বাউলের স্রষ্টা এবং এই বাউণ্ডেলে শব্দ থেকেই বাউল শব্দটি এসেছে।

ছোট বয়স থেকে অনেক বাউল গান শুনে এসেছি, তখন এই কলকাতা সহরে একতারা বা খঞ্জনীহাতে মাথায় পাগড়ীবাঁধা অনেককেই দেখা যেত যাঁরা বাউল গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। সরল সহজ ভাষার গান, মানুষগুলিও তেমনি সরল, নরম স্বভাবের, অল্পেই সন্তুষ্ট, এঁরা রাজরাজড়াদের দরবার, বড় ধনীদের বাড়ি এড়িয়ে চলতেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুয়ারেই ছিল এঁদের আনাগোনা। বাউল গানের সুর ও ভাষা খুব সহজ সরল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাপে ওকে যাচাই করা চলে না। বাউল তাই (Folk songs) লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে এবং লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। ওর গানের বাণীতে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, না পাওয়াকে পাবার কথা, তারই চিন্তা, তারই জন্যে ওর সুর করে কেঁদে চলা। এই ধরণের গানে ভাবই একমাত্র সম্বল, তাই মেঠো বাউলকে আমরা ভাব-গীতি বলতে পারি। এই গানের মধ্যে বিরাট সুরৈশ্বর্য নেই বা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ভাষার ব্যবহার নেই তাই বিদ্বানের সভায় বা গণ্যমান্যদের আসরে এর তেমন মান নেই। তবু এর গানের ভাষা অতি সহজ সরল ভাবেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয়লোকে। সহজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বাউলের জন্ম এবং সুফীদের গজলের মতন বাউল গানও দ্ব্যর্থবোধক। এই বিখ্যাত বাউল গানটির বিষয় চিন্তা করলেই সে কথা বোঝা যায়। "আমার মনের মানুষ যে রে কোথায় পাব তারে। হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।" এই মনের মানুষের কথাটি ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বলা চলে আবার কোন প্রেমিক প্রেমিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপও বলা চলে। মানুষের নামেই এবং তার মাঝেই ওরা মানুষের ভগবানকে পেতে চায়, তাই বাউল গানের বাণীতে সর্বত্রই প্রায় একই ধরণের ভাব। বাউল গানে তাই আমরা পাই "মনের মানুষে এই মানুষ আছে লও চিনে, তারে দেখরে মন জ্ঞান নয়নে"। আবার—"এই মানুষে মানুষ আছে করণ ধরে নাওগো বেছে, অটল মানুষ যে

ধরেছে তার কি আছে তুলনা"। আত্মানং বিদ্ধি অর্থে ওদের গানে পাই "বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা, দেখ আপন ঘরে"।

বাউল গানের সুর এক বিশেষ ধরণের (type-এর), সুরগুলি উদাস করুণ, এর কাব্যও তাই সাধারণের জীবনের বেদনা, অপূর্ণতা, দুঃখ কষ্টের কথাকে আশ্রয় করে আত্মিক উন্নতির কারণে সাধারণের উন্নতি কল্পনায় সরল ভাষায় গড়ে উঠেছে। বাউলেরা মনে করেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই মানুষের অন্তরেই আছেন শ্রীভগবান এই তাঁদের বিশ্বাস, আর সেই কারণে নিজেকে সঠিক ভাবে জানার জন্যে আপনাকেই একান্ত আপন করে পাবার জন্যে তাঁরা আকুল। এঁদের কবিতা হল (Mystic) গুপ্ত রহস্যপূর্ণ আর মূল প্রেরণা হল (Psychic) আত্মিক। বাউলের গানে লালন ফকীর ও দীন বাউলের পদ রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলি লালন ফকীরের গান ও দীন বাউনের গান নামেই প্রসিদ্ধ।

"উল্টা-বাউল" : উল্টা বাউল বলে এক ধরণের বাউল গান শোনা যায়। এর সঙ্গে বাউলের সুরের বা চালচলনের কোন তফাং মেলে না। উল্টা বাউলে একই আসরে দুই দল বাউল গানের মাধ্যমে বাদানুবাদ চালায়, এটাকেই উল্টা বাউল বলা হয়। অনেকে একে উল্টা সাধনের অঙ্গ বলে মনে করেন।

শ্যামা-সঙ্গীত : কীর্তনে যেমন কৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনা দ্বারা বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে মনে কৃষ্ণ ভাবের সঞ্চার করে ও মনকে অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়, শ্যামা-সঙ্গীতেও তেমনি মা জগদম্বা কালিকার বর্ণনা দ্বারা শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে অন্তরে শক্তিময়ী জননীর প্রতি ভাবের বিকাশ ঘটায় ও মনকে সেই ভাবে ডুবিয়ে দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই এই সঙ্গীতের বিশেষ প্রচার বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। ১৭০০ শতাব্দীতে মহাসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনই শ্যামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে এই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত আজও "রামপ্রসাদী সুর" বলে চলে আসছে, কথায়, ভাবে, সুরে, এগুলির বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রয়েছে। তিনি মা জগদম্বার ভক্ত ছিলেন। ইনি ১৭২৩ সালে হালিসহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৫ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করে জগন্মাতার কোলে চিরশান্তি লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন কীর্তনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক

বলে গণ্য, কবি ও সাধক রামপ্রসাদ সেনকেও তেমনি আমরা শ্যামা-সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলে মান্য দিয়ে থাকি। রামপ্রসাদী সুর ছাড়াও শ্যামা সঙ্গীত অন্য সুরে রাগ তালের আশ্রয়ে গাওয়া হয় তবে প্রসাদী সুর শ্যামা-সঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্যামা-সঙ্গীত চৌতাল, তিনতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, যৎ প্রভৃতি তালে, এবং ভৈরবী, সিন্ধু, দেশ প্রভৃতি নানা শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে গীত হয়। কবি রামপ্রসাদ ছাড়াও দাশরথি রায়, হরু ঠাকুর, এণ্টনি সাহেব, কালী মির্জা, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির দান অনস্বীকার্য। শ্যামা-সঙ্গীতে বাংলার কবি কাজী নজরুলের দানও কম নয়। বাংলাদেশে প্রায় একশো দেড়শো কবি চার-পাচ হাজারের মত শ্যামা বিষয়ক গান লিখে গেছেন। বাংলার সাধকেরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করে সহজেই তাঁকে নিজের আপনজন বলে ধরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী পড়লে জানা যায় যে তিনি মা কালীকে মানবী দেহধারী মার রূপে দেখতে পেয়েছিলেন ও পুত্রভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মাতৃভাবের এই সাধনা বাংলাদেশের এক অভিনব সাধনা, এই সাধনার ধারা আমরা ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই বড় একটা দেখতে পাই না। এই মাতৃসাধনাই শ্যামামায়ের সাধনা, তারা মায়ের সাধনা, এই সাধনার অঙ্গ হিসাবেই শ্যামা-সঙ্গীতের জন্ম, সেই কারণে শ্যামা সঙ্গীতকে আমরা ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত বলি।

ভাটিয়ালিঃ এক ধরণের উদাস অশ্রুসজল সুর, গ্রামের মানুষের বিরহ, মিলন প্রভৃতি অন্তর্বেদনা ফুটে ওঠে ভাটিয়ালিতে। পূর্ববাংলার নদী-নালায়, খাল-বিলে, এই ভাটিয়ালি সুর আজও এখনও শোনা যায়। সেই কারণে একে মাঝি-মাল্লাদের গান বলা হয়। ফাঁকা মাঠে গাছতলায় বসে পথ-চলার মাঝেও ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয় এবং সেই হিসাবে একে মেঠো গানও বলা চলে। সব গানেই ভাটিয়ালির এক নিজস্ব কায়দার দীর্ঘস্থায়ী তান। তাল, লয়, কঠিন ছন্দ বা বাক্য-সুষমার বাহাদুরী অথবা রাগদারীর কায়দা এতে নাই। সহজ সরল আড়ম্বরহীন সাধারণ এই গান অশিক্ষিতদের মাঝে প্রাণের আবেগে গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সাল তারিখ নিয়ে মাথা ঘামালেও সঠিক জন্মতারিখ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে আন্দাজ করা যায় যে হয়তো পনেরশো শতাব্দীতে গজিয়ে উঠেছিল এই গান বাংলার কোন এক নিভৃত নদীর ধারে। রচনাকারের বা সুরকারের নামের কোন দিশা মেলে না। হয়ত কোন এক

সাধারণ মাঝির কণ্ঠেই গীত হয়েছিল, ও পরে ছড়িয়ে পড়েছিল মাঝি-মাল্লাদের জলে ভাসা নৌকার ঘরে ঘরে ও মাঠের ধারে ধারে। পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশে) পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর ধারে ধারেই এই গীতিপদ্ধতি জন্ম নেয়। এ ধরণের পল্লীগীতিতে বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরী না থাকলেও প্রাণের পরশ পাওয়া যায় এর বাণীতে: সুরে পাওয়া যায় করুণ কান্নার অশ্রুসজল ভাব। ভাটিয়ালি গায়কদের গানের ভাষা বদলাবার ও সুরের সামান্য রদবদলের অধিকার আছে। প্রাণের আবেগে সহজ ছন্দে জন্মেছে এই গান, এর সুরে তাই গ্রাম্য ঢং আছে। আনন্দের বিষয় আজকের দিনের শিক্ষিত সমাজ, সাধারণ নিরক্ষর পল্লীবাসীর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রাণের তাগিদে রচিত এই ধরণের রচনা ও সুরকে সম্মান দিতে আরম্ভ করেছেন। মেঠো সঙ্গীতকে সুর তাল মানে বেঁধে শিক্ষিত সহরবাসীদের কাছে শিক্ষার জন্য পরিবেশন করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রাণময় রূপ যেটি নদীর ধারে সুদূর-প্রসারী দিগন্ত মাঠে গাছতলায় গায়কের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ও তার উপযুক্ত পরিবেশ পায়, সেটিকে 'ইটের পাঁজরে' স্বরলিপির যূপ-কাষ্ঠে বলি দেওয়া কি ঠিক ?

সারিগান: বাংলাদেশের এক ধরণের প্রচলিত লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশ নদ-নদী খাল-বিল জলাশয়ে-ভরা, এখানে গাড়ী-পালকির থেকে নৌকাও বড কম নেই, এই নৌকা চালাবার সময় সারবেঁধে একসঙ্গে যে গ্রাম্য গান গাওয়া হয় বা নৌকা নিয়ে "বাচ" (Race) খেলার সময় দাঁড়ের টানের সঙ্গে তাল রেখে একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয় সাধারণতঃ তাকেই সারিগান বলা হয়। এটির সুরও ভাটিয়ালির মতই, তবে কিছু জলদ (দ্রুত) চালের, ভাটিয়ালির মত দীর্ঘস্থায়ী তান এতে দেখা যায় না। তাছাড়া ভাটিয়ালি একক সঙ্গীত, কিন্তু সারিগান ছন্দযুক্ত-সমবেত-সঙ্গীত। সারিগান স্বভাবতঃই করুণ সুরের গান এবং পুরুষরাই এ গান গেয়ে থাকে। ছাদপেটা, ধানকাটা, ঢেঁকিতে ধান কোটার সময়, পাটকাটার সময় সমবেত কণ্ঠে যে গান গীত হয়, কোন ভারী জিনিস তোলার সময় একসঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, সে সমস্ত গানকেও আমরা সারিগানের কোঠায় ফেলতে পারি। অর্থাৎ গানের ছন্দে একসঙ্গে সমবেত ভাবে কোন শারীর ক্রিয়া প্রকাশিত হলে ও সমবেত কণ্ঠে সেই শারীর ক্রিয়ার তালে তালে গীত হলে তাকেই সারিগান বলা যায়। সার অর্থে শ্রেণী, সারবেঁধে (বা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে) গান করা থেকে সারিগান কথাটি এসেছে। প্রধানতঃ নৌকাতে দাঁড় টানার সময়ের সমবেত সঙ্গীতকেও সারিগান বলা হয়। সারিগানে তাল

অপরিহার্য, ভাটিয়ালিতে তালের প্রাধান্য নেই বা তাল নেই বললেও চলে কিন্তু সারিগান তালযুক্ত ত বটেই, তালের নানা বৈচিত্র্যও এতে দেখা যায় তাই সারিগান ও ভাটিয়ালি সমসুরী হলেও তালের প্রাধান্যই সারিগানের বৈশিষ্ট্য।

জারীগান: বাংলার মুসলমানদের প্রিয় গান, এটিকে বাংলার মুসলমানদের ধর্মসঙ্গীতও বলা চলে। এই গানের সুর অতি করুণ, কারবালায় ইমাম হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করেই এই গান গড়ে উঠেছে। সারিগানের মত এটিও সমবেত সঙ্গীত। এই গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য ঢোল বাজাবার রীতি প্রচলিত।

ভাওয়াইয়া: উত্তরবাংলার এক বিশেষ ধরণের লোকসঙ্গীত। ভাটিয়ালির মতই এর ছন্দে কাটা কাটা ভাব, গাইবার কায়দার (style) কিছু তফাৎ আছে, যাতে সহজেই একে ভিন্ন রীতির গান বলে চেনা যায়। সাধারণ মানুষের বিরহ ও নৈরাশ্যের বেদনাটি করুণ সুরে এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ভাবের আতিশয্য ও গানের সঙ্গে ভাও বাতলানো অর্থে অঙ্গভঙ্গীর কায়দা এতে আছে। আমাদের ধারণা এই ভাও-এর কারণেই এর নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে। উত্তরবাংলায়, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এই গান বেশী প্রচলিত। "দোতারা" এর একমাত্র যন্ত্রসঙ্গী—দোতারা ছাড়া এ গান প্রায় শোনাই যায় না। সাধারণতঃ পুরুষেরাই এ গান গেয়ে থাকেন, নারীঘটিত নৈরাশ্য ও প্রেমের কথাই এর উপপাদ্য বিষয়। অন্যান্য অনেক লোকসঙ্গীতের মত এতেও রাগরাগিণীর বাঁধন নাই।

চটকা: সংসারের তুচ্ছ কথা ও ঘরোয়া ব্যাপারই এর বিষয়বস্তু। এটিও উত্তরবঙ্গের এক ধরণের লোকগীতি। সহজ সুরে দ্রুত গতিতে চটুল ছন্দে এই গান গাওয়া হয়। পুরুষেরা নারীর জবানীতেই এগুলি গেয়ে থাকেন। ভাওয়াইয়া ও চটকা প্রায় একই ধরণের গান।

গম্ভীরা গান, গাজনগান ও নীলের গান: আমাদের দেশে শিবের তিন রকম গান প্রচলিত, সেগুলি হল গম্ভীরা, গাজন আর নীলের গান, সাধারণতঃ শিব পূজার অঙ্গ হিসাবে গাওয়া হয়। যতদূর সম্ভব দশম শতাব্দীর শেষে ধর্মপালের রাজত্বের সময় থেকেই এই গানের প্রচার হয়।

১। **গাজনগান:** পশ্চিমবাংলায় বছরের শেষদিনে চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনের পূজাকে উপলক্ষ করে চড়ক বসান হয়। চড়কতলায় শিবের গাজন উৎসব হয়।

গাজনে কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, আগুনঝাঁপ প্রভৃতি বীরত্ব এখনও কোথাও কোথাও দেখান হয়। এখানেই ধর্মপূজার অঙ্গ হিসাবে গাজন গাওয়া হয়। শিব ও পার্বতীর নামে নানা স্তবস্তুতি এতে থাকে। এই সব গানে শিবকে একান্ত আপনজন হিসাবে মনে করা হয়। গাজনগানে তর্জার মত কাটান চাপান দেওয়া হয়, এগুলিকে "বোলান" বলা হয়। এই বোলানে অনেক সময় রাধাকৃষ্ণের লীলাদির বর্ণনাও শোনা যায়। **২। নীলের গান ঃ** পূর্ববাংলায় বর্ষশেষে নীলষষ্ঠীর দিনে পশ্চিমবাংলার গাজনের গানের মত শিবের গান গাওয়া হয়, এই গানে শিবের বিয়ে, গৌরীর শাঁখাপরা, শিব-পার্বতীর ঘরোয়া ঝগড়া, শিবের বন্দনা প্রভৃতি থাকে, এটি গাজনগানেরই অনুরূপ। এটিও শিবঠাকুরের গান। **৩। গম্ভীরা গান ঃ** এটি উত্তরবাংলার বর্ষশেষের গান। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের উপযুক্ত গম্ভীর সুরের আভাস পাওয়া যায় বলেই একে গম্ভীরা বলা হয়। মালদহে এই গান বেশী প্রচলিত বলে "মালদার গম্ভীরা" নামেই গম্ভীরা গান পরিচিত। এর সুরের মাঝে বাউল, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি সুরের আভাস পাওয়া যায়। যদিও এটি শিবের গান তবুও শিবের বন্দনা স্তুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জাতির সমাজব্যবস্থার দোষ-গুণ, জাতির দুঃখ, লাঞ্ছনা, তার উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি নানা বিষয় এর বিষয়বস্তু। এই ধরণের গান মনে যেমন ধর্মভাব জাগায় তেমনি সমাজ-সংস্কারেও সাহায্য করে। এর শোভাযাত্রায় নানা সং বার করা হয়। যাঁরা কলকাতার জেলেপাড়ার সং বা গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গাবন্দনার সং প্রভৃতি দেখেছেন তাঁরা এই ধরণের সং সাজানো ও তাদের মুখে সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ও প্রচলিত ব্যবস্থার কথা কী ভাবে বলা হত তা জানেন। দুঃখের বিষয় আজকাল সমাজের প্রতিটি নিন্দনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তার দোষ-গুণ সর্বসাধারণের সমক্ষে গানের মাধ্যমে নানা ঢং-এ প্রকাশ করা হয় না।

ঘেঁটুর গান ঃ গম্ভীরা প্রভৃতি গান যেমন উত্তরবঙ্গের বলে পরিচিত, ঘেঁটুর গান তেমনি দক্ষিণ-বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত। এই ধরণের গানগুলিকে গোষ্ঠি-সঙ্গীতের কোঠায় ফেলা হয়। পুরাকালে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক অসুর ছিলেন, তিনি কৃষ্ণনাম শুনবেন না বলে কানে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এই গান গড়ে উঠেছিল। দেশের নানা দুঃখ-কষ্টের কথা, রাজনীতির কথা, নানা উপদেশ, ঘরোয়-নীতিকথা ইত্যাদি এই গানের উপপাদ্য বিষয়। পূর্ববাংলার মাগন গানের মত ছেলেরা এই গান গেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে।

ঘাটুগান ঃ ময়মনসিং শ্রীহট্টে আর এক রকম গান শোনা যায় যাকে বলে ঘাটুগান। এই গান ঘেঁটুর গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ ঘাটুগানের বাণীও ঘেঁটুর মত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন আবেদনপূর্ণ ও শ্লীলতাহানিকর বাণীই শোনা যায় ঘাটুগানে। যদিও আসলে এটি কৃষ্ণ-বিষয়ক গান। যমুনার ঘাটকে উদ্দেশ্য করেই রচিত বলে অনেকে মনে করেন এই গানের জন্মস্থান যমুনার তীরে এবং ঘাটের গান বলেই একে ঘাটু বলা হয়।

ভাদুর গান ঃ মানভূম জেলার অন্তর্গত আদ্রা স্টেশনের কাছে কাশীপুরে, পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমনি সিং দেও বাহাদুরের আদরের সুন্দরী মেয়ে ভদ্রেশ্বরীর বিবাহের আগেই পানিপ্রার্থী বরের অকালমৃত্যুতে ও স্বেচ্ছায় বাগদত্ত পতির জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জনকে উদ্দেশ্য করেই ভাদুপূজা ও তার গান প্রচলিত হয়েছিল। মানভূম, সিংভূম, ধলভূমে ও বাংলার অন্যান্য দেশে আজও এই গান প্রচলিত রয়েছে। ভাদ্রমাসভোর ভাদুপূজা ও তার সঙ্গে ভাদুর গান চলতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে দুদলের বাদানুবাদ চলতে দেখা যায়। বিষয়বস্তু নানা ধরণের ঠাট্টা-তামাসা, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ, নানা সমস্যা প্রভৃতি। মানভূম জেলায় ভাদুর মত এক সুরেই আর এক রকম গান প্রচলিত আছে যাকে বলা হয় **টুসুর গান**। এই টুসুর গান টুসুর পূজাও ভাদুপূজার মতই কুমারীদের মনোমত স্বামী পাবার ব্রত ও পূজা।

ঝুমুর গান ঃ মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমে সাঁওতালদের এবং কোলভীলদের এক ধরণের গোষ্ঠীসঙ্গীত। সাঁওতালি ছেলেমেয়েরা বনফুলে সেজে মাদলের সাথে দল বেঁধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে থাকে। গানের ভাষায় ও নাচের ভঙ্গিমায় যথেষ্ট সুরুচির অভাব দেখা যায়। সুরগুলি একঘেয়ে, একই ছন্দে ও তালে চলতে থাকে।

তরজা গান ঃ কবির গান (কবির লড়াই) ঃ কবিগান ও তরজাগান একই শ্রেণীভুক্ত। কবিগানে দুটি দল থাকে। কোন বিষয়ে একদল একটি গান রচনা করে গাইলে, অন্যদল কবিতায় গানের সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর রচনা করে দেয়। পরে একদলের দলপতি অন্যদলের দলপতির সঙ্গে **চাপান** ও **উতোর** পাড়ে। অর্থাৎ আসরের মাঝে, কবিত্ব শক্তির বলে ভাষার চটকদারিতায় কোন পৌরাণিক, সামাজিক ও কোন তত্ত্ব বিষয়ে একজন অপরকে কাব্যছন্দে নাচের তালে তালে ঢোল ও কাঁসি বাজনার সহযোগিতায় চাপান দেন অর্থাৎ তাঁর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দিতে বলেন। অপরজন কবিতায়

তাঁর প্রশ্নের (উতোর) জবাব দিয়ে আবার একটি প্রশ্নের চাপান দেন। এই ভাবে দুজনের মাঝে আসরে কবিতা সৃষ্টি করে নানা ছন্দে সুর করে তালে তালে গান গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব কাটাকাটি চলে। এই বচসাকেই কবির লড়াই বলা হত। কবি বা তরজা গায়কদের প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির গল্প কণ্ঠস্থ থাকে ও বহু লৌকিক ও সামাজিক আচার প্রভৃতির জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়। সর্বোপরি তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকার বিশেষ প্রয়োজন। এসব গুণ না থাকলে কেউ কবিয়াল বা তরজাওলা গায়ক হতে পারে না।

পল্লীবাংলার নিজস্ব যে সব গানের কথা বলা হয়েছে সে সব ছাড়াও আরও অনেক রকমের গান রয়েছে যেমন আলকাফ গান, হাপুরগান, ঝুমানি বা গাড়োয়ালী গান, মা শীতলার গান, পটুয়াগানের মধ্যে মেছুনীদের গান, গোমঙ্গল গান, মুস্কিল আসানের অর্থাৎ সত্যপীরের গান, মেয়েদের ছড়াগান, ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় পালাগান, পাঁচালি, ভাটের গান, একক বা গোষ্ঠীসঙ্গীত যেগুলি বারব্রত পূজা বা নানা উৎসবের দিনে এই বাংলার ঘরে ঘরে একদিন প্রায় বারমাসই শোনা যেত তাদের সকলের বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হল না। এই সব পালপার্বনের গান কবে কে প্রচলিত করেছে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

কজরী বা কাজরী বা কজলী ঃ কজরী ভারতের উত্তর প্রদেশের লোক-সঙ্গীত। কজরীকে গোষ্ঠীসঙ্গীতের কোঠায় ফেলা যায় না। তবে এই গানের এক একটি দল থাকে। ঠিক আমাদের এখানের কালীকীর্তনের দলের মত। মূল গায়েন একটি পদ বলেন এবং কীর্তনের দোয়ারীর মত বাকী লোকেরা সমবেত কণ্ঠে দোয়ারকী করেন। কজরীর অনেক নামকরা দল আছে, এবং সেই দলের নামেই এঁরা পরিচিত হয়ে থাকেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই এই উৎসব বা কজরী ব্রত পালিত হয়। নানা রকমের গহনা ও নূতন শাড়ী পরে হাতে পায়ে মেহেদী পাতার রসে নকসা কেটে মেয়েরা কজলী দেবীর পূজা করেন, এবং ভাইদের হাতে বেঁধে দেন “জরঙ্গ” (অনেকে একে ‘জরব’ বলেন)। প্রধানতঃ এটি বেনারসেই চলে। গানগুলি অধিকাংশই শৃঙ্গার-রসাত্মক। উত্তরপ্রদেশে, রাজপুতানায় ও মারবাড়ে কজরীর মত আরও অনেক রকমের লোকসঙ্গীত চালু আছে, যেগুলির কথা আমরা এখানে বাদ দিয়ে গেলাম। এই উৎসবে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই কজলী দেবীর পূজায় যোগদান করেন ও সারা রাত ধরে এই উৎসবে মেতে থাকেন।

ডি. এল. রায়ের গান : কৃষ্ণনগরের কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের পুত্র দ্বীজেন্দ্রলাল রায় ইং ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। এই সঙ্গীতপ্রেমী একাধারে সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও সুরকার ছিলেন।

কিশোর বয়সেই তাঁর গান লেখা শুরু হয়। ১৮৮৩ সালে যখন এম. এ. পাশ করেননি তখনই তাঁর কবিতা "শ্মশান সঙ্গীত" ছাপার অক্ষরে "নব ভারত"-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিত্তা শিক্ষার জন্য বিলাত যান, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন। তাঁর লেখার সখ এত তীব্র ছিল যে এত কাজের মাঝেও তিনি মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নানা নাটক ও বহু কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর হাস্য-রসাত্মক গীতি রচনাগুলি অপূর্ব এবং আজও প্রসিদ্ধ।

তিনি সুগায়ক হলেও উস্তাদ ছিলেন না, তবে সুরকারীতে যথেষ্ট উস্তাদির পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান তখনকার দিনে বাংলাদেশে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' আজও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে শোনা যায়। তাঁর গানে ও সুর-সংযোজনায় আমরা বাংলা গানের হাস্যরস ও বীররসের আস্বাদন পাই নওহার বাণীর ধ্রুপদের চালে বা বিলাতী সুরের কায়দায়। রাগসঙ্গীতকে মান্য দিয়েই তিনি তাঁর গানের সুরে বীররসের ভাব সংযুক্ত করেছিলেন, তখনকার দিনের রাগসঙ্গীতে এটির অভাব ছিল। তাঁর হাসির গানগুলিও যথেষ্ট আনন্দদায়ক। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে তাঁর কোরাস (বহু কণ্ঠে একই সুরে গীত সমধ্বনি-সঙ্গীত) গানগুলিও ছিল অপূর্ব। বাংলা গানের সুর রচনায় নূতন ঢং এনে তাতে নবীন ভাবধারায় তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর নাট্যসঙ্গীতেও তিনি রাগসঙ্গীতকে স্বীকার করে তার উপর নির্ভর করেই রচনা করেছিলেন কোরাস সঙ্গীতগুলি। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রভৃতি তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলি কালের কবলে আজও বিলীন হয়ে যায় নি। তাঁর রচনা ও সুর-যোজনার মধ্যে একটি স্বকীয় ভাব ছিল যা থেকে তাঁর রচনাকে সহজেই চেনা যায়।

ভারতবর্ষ নামে তৎকালীন একটি প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভগবদ্ বিষয়ক গানও কবির রচনায় পাওয়া যায়, একটি উদাহরণ

দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। 'আমি প্রভাতের ফুলে সাঁঝের মেঘেতে হেরি তোমার রূপরাশি ; আমি চাঁদের আলোতে তারার হাসিতে নিরখি তোমার হাসি। ১৯১৩ সালের ১০ই মে বাংলার এই কৃতি সন্তান মরদেহ ত্যাগ করে স্বরলোকে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত : কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ঠাকুর-পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইং ১৮৬১ সালে ৭ই মে তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। কিশোর বয়সেই কবিগুরু ভাষা, স্বর, তাল, মান, ছন্দ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর প্রথম গীতি-কবিতা "সন্ধ্যাসঙ্গীত" প্রকাশ পায় .৮৮২ সালে। ইং ১৯১৩ সালে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হবার সম্মান পান তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের উপর নোবেল পুরস্কারে। সেই বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৪ সালে ইংরাজরাজ তাঁকে নাইট উপাধি দেন। ইংরাজের এই উপাধি তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে প্রবীণ কবি চিত্রাঙ্কনেও তাঁর নূতন প্রতিভার পরিচয় দেন। পৃথিবীর সবযুগের কবি-সমাজের অন্যতম প্রধান কবি, পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতির গৌরব তিনি। তিনি বাংলা ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি নিজস্ব ধারার এক সঙ্গীতে বাংলা সঙ্গীতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মাঝে "রবীন্দ্রসঙ্গীত" সৃষ্টি আর এক প্রতিভার পরিচয়। বাল্যকাল থেকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, যদুভট্টের মত শ্রুতিধর সঙ্গীত-পণ্ডিতকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে। প্রাচীন ধারার সঙ্গীতকে তিনি বিশেষভাবে বিচার করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে। বেদ উপনিষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের প্রকাশ ধারা ও তার পরিবর্তনশীল রাগরাগিণীর বিকাশ ধারা, তার বিভিন্ন শৈলীর উন্মেষ, তাঁর অন্তরে বিপ্লব ঘটায়। তাঁর সৃজনধর্মী মন পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় নি, সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সেই কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতি যা তখন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও দুরূহ ছিল তাকে সহজতর ও সুন্দর করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি এই সঙ্গীতকে নিজস্ব ভাবে এক বিশেষ ভাবধারায় প্রকাশ করতে চাইলেন। সহজ সরল ভাবে কী করে সঙ্গীতকে সাধারণের মাঝে আনা যায় এই

ছিল তাঁর চিন্তা। তিনি গানের ভাষা, সুর ও কবিতার ছন্দকে একই সঙ্গে অসীম নীলাকাশে ডানা মেলবার সুযোগ দিলেন। অসীমের এই গান দানা বাঁধলো সীমার মাঝে মানুষের কণ্ঠে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"। মানুষের মনকে অসীমের পরশ দিল এই গান। প্রাণময়ী ভাষাকে ভর করে সে গানের সুর ভেসে চললো। মানুষের অন্তরের ভাষা প্রকাশ পেল সুর ও কথার বাঁধুনিতে। হিন্দুস্থানী গানে কেবলমাত্র সুরবিহারই প্রধান ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগভঙ্গীমা বজায় রেখে সৃষ্টি করলেন নবীন ধারার কাব্যসঙ্গীত। অতীতের নানা গীতশৈলীর ছাপ থাকা সত্ত্বেও স্বকীয়তায় "রবীন্দ্রসঙ্গীত" স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। তাঁর গানে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সবল সরলতার সন্ধানও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও তিনি ভালভাবে বিচার করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পার প্রভৃত প্রয়োগের নজীর থাকলেও, সেই সুরারোপের মাঝে তানতরঙ্গ বা অলংকরণ রাখার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। তবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের শেষ অক্ষরে দমের কায়দার একটা আভাস সেখানে পাওয়া যায়। ধ্রুপদ খেয়ালের ঢং-এর প্রবণতা তাঁর গানে পাওয়া গেলেও তিনি খেয়ালের তানের ষ্টীম-রোলার ও ধ্রুপদের মীড় ও গমকের জাঁকজমক বর্জন করে গ্রহণ করেছিলেন সবল সরলতাকে। এটাই তাঁর গানের এক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বহু বলার থাকলেও, নানা খুঁটিনাটির কথা বোঝার থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকচি। এখানে আমরা কেবলমাত্র বলবো যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন এক নিজস্ব ধারা বহন করে যে সেই গানকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সহস্র সহস্র গান রচনা ছাড়াও, অজস্র কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখে গেছেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই মহান সাধক ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট মরদেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন।

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর গান: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে এই গীতিকার ও সুরকারের কথা আরম্ভ করি।

"দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ"।

রবীন্দ্র-স্নেহধন্য অতুলপ্রসাদ সেন ইং ২০শে অক্টোবর, ১৮৭১, ঢাকা সহরের

চিকিৎসক রামপ্রসাদ সেনের পুত্ররূপে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক লক্ষ্ণৌ সহরে থাকতেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার। এই দরদি কবি তাঁর সহৃদয় ব্যবহার ও সুললিত গান রচনার জন্ম আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে লক্ষ্ণৌ থাকতেন, তখন লক্ষ্ণৌতে খেয়াল, ঠুমরী, দাদরা, চৈতী, কজরী ও গজলের লীলা চলছে পুরাদমে। অতুল-প্রসাদ এই সুরে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর অন্তরে সাড়া জেগেছিল, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল লক্ষ্ণৌর এই সঙ্গীত ধারা। এই সময়ে তাঁর সব রচনার মধ্যে তাই লক্ষ্ণৌর ঢং পাওয়া যায়। তিনি কোন গান শোনার পর সেই গানের কায়দা প্রাণে গেঁথে রাখতেন, তারপর সেই কথা ও সেই সুরকে নিজস্ব চিন্তাধারায়, নিজের ভাষায় লিখতেন এবং সুর যোজনা করতেন। আবার বার বার নিজের রচনা তাঁর নিজেরই ভালো না লাগলে ছিঁড়ে ফেলতেন। এই ভাবে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা অনেক কমে যেত। অতুলপ্রসাদ ব্যারিষ্টারি ছাড়াও কংগ্রেসের কাজে এবং নানা অনুষ্ঠানে নিজেকে এত ব্যস্ত রাখতেন যে এই কর্মবীর শিল্পী সঙ্গীত চিন্তার নিরালা অবসর খুবই কম পেতেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও রাগ সঙ্গীতকে তাঁর অনুপম বিদগ্ধতায় কাব্য-সঙ্গীতে পরিবর্তিত করেছিলেন। "কি আর চাহিব বল," "ক্ষমিও হে শিব," "আমার পরাণ কোথা যায়," "নিদ নাহি আঁখিপাতে" প্রভৃতি গান তার উদাহরণ। কাজরীর কায়দায় বাংলা গান রচনা করলেন "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে," "কেন এলে মোর ঘরে" প্রভৃতি গানে। এছাড়া বাংলায় থাকার সময় বাংলা কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী গানের অনুসরণে তিনি কিছু গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তৎকালীন রচয়িতাদের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। লক্ষ্ণৌ-এর কায়দায় প্রভাবিত হলেও মনে প্রাণে তিনি রবীন্দ্র ভাবধারায় রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েই ছিলেন। তবে সুরের Composer হিসাবে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রাখতেন। উত্তরা পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁর "কয়েকটি গান" নামক বইটি উল্লেখযোগ্য। এই অমর সুরকার ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত ও তাঁর গান: বাংলা দেশে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র রূপে তিনি ইং ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই জন্মলাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে ও কবিতায় তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৮৯১ সালে বি. এল পাশ করার পর রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করতে থাকেন।

মধুর শান্ত রসাশ্রিত ভাষার তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু কবিতা ও গান লিখে গেছেন। "বাণী, কল্যাণী" প্রভৃতি কবিতা তাঁর রচনা শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাগ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের কোন বিশেষ পরিচয় আমাদের নজরে পড়ে নি। তাঁর গানের সুরে রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ রায়চৌধুরীর বাংলা গানের প্রভাব দেখা যায়। রজনী সেনের গান বলে কোন বিশিষ্ট ধারার গান তাঁর সুর রচনায় আমরা দেখতে পাই না, তবুও তাঁর গানের ভাষায় ও সুরের আবেদনে তাঁকে চিনতে খুব অসুবিধা হয় না। সুরের সাথে ছন্দের অঙ্গাঙ্গি মিলনে এক লীলায়িত ভঙ্গীর পরিচয় তাঁর গানের মাঝে পাওয়া যায়। তাঁর গানের সরল সুন্দর গতি ও স্নিগ্ধ ভাব লক্ষ্য করার মত। "তুমি নির্মল কর," "সেথা আমি কি গাহিব গান", "কে রে হৃদয়ে জাগে" ইত্যাদি গানের সমাহিত ভাব দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে অনন্ত হয়ে থাকবেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" প্রভৃতি বিখ্যাত গান লোকের প্রাণে অপূর্ব জাতীয়তা ভাবের সাড়া জাগিয়েছিল। এই সব রচনার স্রষ্টাকে বাঙ্গালী কোন দিন ভুলতে পারবে না। বাণীর এই সেবক ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর চিরকালের জন্য অমরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর গান: কবি কাজী নজরুল ইং ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকীর আহমেদ, মাতার নাম জাহীদা খাতুন। আট বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটে। এগারো বছর বয়সে এঁর কবিতা লেখা ও গান বাঁধা শুরু হয়, তখন লেটোর দলে গান বাজনা করতেন। গান খুব ভালই গাইতেন। একদিন আসানসোলের গার্ড সাহেব ওঁর গান শুনে নিজের কোয়াটারে নিয়ে যান। তখন সব সময়েই গান ছিল ওঁর সাথী। ১৯১৬।১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈনিকের কাজে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ঘোরার সুযোগ পান। এই সময়ে ভাল করে ফার্সী শেখেন, হাফিজের কবিতার অনুবাদ করেন। করাচীতে থাকা কালে যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই গান ও কবিতা লেখা বিশেষ ভাবে শুরু করেন। তখনকার প্রবাসীতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাই ওঁর লেখা ছাপিয়ে দেন। সৈনিক থেকে ক্রমে উনি হাবিলদার হন। যুদ্ধ শেষে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে যেতে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রাজরোষে পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় ও তাঁকে এক বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই সময়ে বিদ্রোহী নামে কবিতা

লেখায় বিদ্রোহী কবি নামে তাঁর নামডাক চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে ইনি প্রমিলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। হেমেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার পবিত্র গাঙ্গুলী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও গায়ক দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরা এঁর গানের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কবির গান গাইবার ক্ষমতায় ও নিজস্ব সুরারোপের বৈশিষ্ট্যে তাঁর নাম সহজেই গানের জগতে একটা বিশেষ স্থান লাভ করে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তাঁর খুব ভাল জ্ঞান থাকায়, গানের সুরযোজনায় তাঁর রাগবোধ ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নজরুলই প্রথম ফার্সী ও উর্দু ভাষার বিশিষ্ট রচনা বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

১৯৩৭ খৃঃ গ্রামোফোন কোং-র ট্রেনার হন। এই সময়ে তাঁর গান রচনা ও প্রচার খুব বেড়ে যায়; ইনি মুসলমান হয়েও শ্যামা মায়ের ভক্ত ছিলেন ও বহু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে শ্যামাসঙ্গীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ইনিই প্রথমে বাংলা ভাষায় গজল গান চালু করেন। ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে ইনি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন; এবং আজ পর্যন্ত সেই ব্যাধি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর রচনার মধ্যে উপন্যাসে—বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা, নাটকে—আলেয়া, ঝিলিমিলি, ছোট গল্পে—ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, কবিতায়—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, ছায়া নট ও গীতি গ্রন্থের মধ্যে—বুলবুল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে একজন স্রষ্টা কবি জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনা থেকে আমরা বঞ্চিত।

বাদ্যকাণ্ড

বহু প্রকার ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আকৃতি-বর্ণন এবং তৎসহ বেহালা, গীটার, হারমনিয়ম, ক্ল্যারিনেট প্রভৃতি অতি প্রচলিত কয়েকটি ভিন্নদেশাগত যন্ত্রের বিবরণ।

যন্ত্রবিভাগ

ভারতীয় বাদ্য যন্ত্র মূলতঃ চার ভাগে বিভক্ত।

"ততানদ্ধঞ্চ শুষিরং ঘনমিতি চতুর্বিধং"।

১। **তত:** বীণা, সেতার, এসরাজ, সারেঙ্গী প্রভৃতি তার ও তাঁত দিয়ে বাঁধা অর্থাৎ যে সব যন্ত্র বাজাতে তাঁত বা তার ব্যবহৃত হয়।

২। **আনদ্ধ:** (এ গুলিকে বিতত যন্ত্রও বলা হয়)—পাখোয়াজ, ঢোল কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র।

৩। **শুষির:** বাঁশী, সানাই, শঙ্খ, শিঙ্গা ইত্যাদি ফুঁ এর দ্বারা বাদিত যন্ত্রাদি।

৪। **ঘন:** ধাতুর তৈরী ঝাঁঝর, ঘণ্টাদি বাদ্যযন্ত্র।

তত, আনদ্ধ (বিতত), শুষির (সুষির) ও ঘন এই চার প্রকারের বাদ্য প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

(ক) **সভ্য:** (Drawing room Instruments) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ মিঠে ও দুবল ও যাদের ঘরের মধ্যে বাজান হয়, যেমন সেতার, এস্রাজ, তবলা প্রভৃতি।

(খ) **বাহির্দ্বারিক:** (Outdoor Instruments) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ জোরদার ও যাদের বাড়ীর বাহির দরজায় (ফটকে) বা রাস্তায় বাজান হয়। যথা: সানাই, ঢোল, রৌশন চৌকি, কলম-বাঁশী প্রভৃতি।

(গ) **সামরিক:** (Instruments used in war) তুরী, রণশৃঙ্গ, শিঙ্গা, জয়ঢাক ইত্যাদি।

(ঘ) **গ্রাম্য:** (Rural Instruments) গোমুখ, বেণু, তুবড়ী-বাঁশী, একতারা খঞ্জনীপ্রমুখ যন্ত্রাদি।

(ঙ) **মাঙ্গল্য:** (Pastoral Instruments) শঙ্খ, রামশিঙ্গা, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলিও এইরূপ ভাবেই বিভক্ত।

(i) **কর্ডোফোনস্:** (Chordophones) তার ও তাঁত ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ। সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি তার যন্ত্রদের Sweet String Instruments বলে।

(ii) **এয়ারোফোনস্:** (Aerophones) ফুঁ-এ বাজান নানা বাদ্যযন্ত্র।

(iii) **ইডিওফোনস্ :** (Idiophones) ধাতুর তৈরী যন্ত্রাদি (যেগুলি ঘা দিয়ে বাজান হয়)।

(iv) **মেমব্রোনোফোনস্ :** (Membronophones) সকল প্রকারের চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র।

(v) **ইলেক্‌ট্রোফোনস্ :** (Electrophones) তড়িৎবীণা, ইলেক্‌ট্রিক গীটার প্রভৃতি তড়িৎ-প্রবাহ চালিত বাদ্যযন্ত্র।

এবার ভারতীয় তত যন্ত্রদের বিশেষ বিশেষ বিভাগের কথা বলি—প্রথম : **ধনুস্তত** বা **ধনুর্যন্ত্র** অর্থাৎ যাদের ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়, যেমন এস্রাজ, সারেঙ্গী, সারিন্দা, দিলরুবা ইত্যাদি। দ্বিতীয় : **অঙ্গুলিত্রতত** বা **মিজরাব-যন্ত্র** অর্থাৎ যাদের মিজরাব অথবা জওয়ার সাহায্যে বাজান হয় যথা বীণা, রবাব, সুরবাহার, সেতার, শরোদ প্রভৃতি। এই ধনুর্যন্ত্র এবং মিজরাব যন্ত্রের আবার দুটি বিভাগ রয়েছে।

(১) **স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র :** (Soloperforming Instruments), অপরের সাহায্য ছাড়া যে সব যন্ত্র একক ভাবে বাজে, যথা : বীণা, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি।

(২) **অনুগতসিদ্ধ যন্ত্র :** (Accompanying Instruments), যারা পরাশ্রিত হয়ে বাজে বা কণ্ঠানুসরণ করে, যথা : সারেঙ্গী, তানপুরা, গোপীযন্ত্র ইত্যাদি।

তত যন্ত্রের কথা

সকল প্রকার তত জাতীয় যন্ত্রের আদিম উৎপত্তি স্থান এই ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় সঙ্গীত ঐতিহাসিকেরাও একথা অস্বীকার করতে পারেন নি। এই ভারতবর্ষের বহু বাদ্যযন্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে সেখান থেকে রূপান্তরিত হয়ে নামভেদে আবার এদেশে ফিরে এসেছে। আদিম তত জাতীয় যন্ত্রের ইতিহাস এত প্রাচীন যে এদের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে "পিনাক" যন্ত্রটি দেখে আমাদের ধনুস্তত যন্ত্রের প্রাচীনত্বের কথা সহজেই চিন্তা করতে পারি। ধনুর্যন্ত্র "রাভানা"-ও প্রমান করে যে ত্রেতাযুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে এই যন্ত্রের প্রচলন ছিল ভারতবর্ষেই। পিনাক-বীণা, রাভানা, অমৃতি প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রদের আকৃতি প্রমাণে ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিচারে এই যন্ত্রগুলি ভারতীয় হিন্দুদের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলে জানা যায়। আমাদের ঐতিহাসিক ও

প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গীত ইতিহাস সম্বন্ধে অকরুণ অবহেলায় সঙ্গীতের আদিম ইতিহাস অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সেদিনের ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই যেমন ছিল সমস্ত দেশের দিগদর্শক ও পথপ্রদর্শক, তেমনি সঙ্গীত এবং তার বাদ্যযন্ত্রাদির উদ্ভাবনায় ও উৎকৃষ্টতায়ও সে ছিল তুঙ্গে। এখন বর্ণানুক্রমিকভাবে তারযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি।

অচল ঠাট বীণা বা অচল বীণা : অচল বীণার অপর নাম ধ্রুববীণা। প্রচলিত **মহতীবীণাকে** অচলবীণা বলা যায়। কারণ এই বীণার পর্দা সরিয়ে কড়ি বা কোমল করার প্রয়োজন হয় না। উদারা সপ্তকের কড়ি মধ্যম থেকে কোমল ও কড়ি স্বর মিলিয়ে তারার গান্ধার পর্যন্ত বাইশটি পর্দাই এতে রাখা থাকে। মাত্র ১৬ খানি পর্দা সুতা দিয়ে বাঁধা সচল ঠাট বীণাকে অনেকে **চলবীণা** বলে থাকেন। সেতারেও অনুরূপ ২২ খানি পর্দা বাঁধা থাকলে অচল ঠাটের সেতার এবং ১৬ খানি পর্দা থাকলে সচল ঠাটের সেতার বলা হয়। ঠাটের আর এক নাম পর্দা, কারণ পর্দার হিসাব থেকেই ঠাটের সৃষ্টি। কোন যন্ত্রে কড়ি কোমল স্বর ব্যবহার কালে যন্ত্রের পর্দাগুলি প্রয়োজনমত স্বরে সাজিয়ে নিতে হলে তাদের চল বা সচল ঠাটের যন্ত্র বুঝতে হবে। ভরতের কালে দুইটি একই প্রকারের বীণাতে সাতটি করে তার বাঁধা হ'ত। এর একটিতে সাতটি শুদ্ধ স্বরে সাতটি তার বাঁধা হ'ত (যে তারগুলি চড়ান বা নামান হ'ত না) সেটিকে বলা হত অচলবীণা বা ধ্রুববীণা। অপরটির সাতটি তার নামিয়ে বা চড়িয়ে কড়ি কোমল স্বরের সঙ্গে মেলান হ'ত এবং এই দ্বিতীয়টিকে বলা হ'ত চল বীণা। বর্তমানে পর্দার অবস্থানকে কেন্দ্র করেই চলবীণা বা অচলবীণা নিরূপিত হয়ে থাকে।

অমৃতি : অতি প্রাচীন ধনুর্যন্ত্র বিশেষ। রাজা স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষ নামক পুস্তকে বলা হয়েছে—সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাস লেখক ফেটিস সাহেব বলেন "ভারতবর্ষই যাবতীয় ধনুর্যন্ত্রের জন্মস্থান। ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে ধনুর্যন্ত্র প্রচলিত হয়েছে। আমি যখন রাবণ ও অমৃতি এই দুই হিন্দু যন্ত্রের (হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্রের) সঙ্গে আরবীয় **'কেমানগে অগুজ'র** তুলনা করি তখন শেষোক্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অনুকৃতি মাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না।" আমাদের সংগ্রহে এই অমৃতি নামক বাদ্যযন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় এর সঠিক আকৃতি আপনাদের সামনে রাখতে পারছি না। এই যন্ত্রটি বহুদিন পূর্বেই ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে। যতদূর জানা যায়, এ যন্ত্রে পর্দা

রাখা হত। আন্দাজ আড়াই হাত লম্বা একটি ফাঁপা সরু গোল দান্ডির উপরে দিকে একটি তুম্ব রাখা হত এবং যন্ত্রটিতে একটি মাত্র লোহার তার ব্যবহৃত হত।

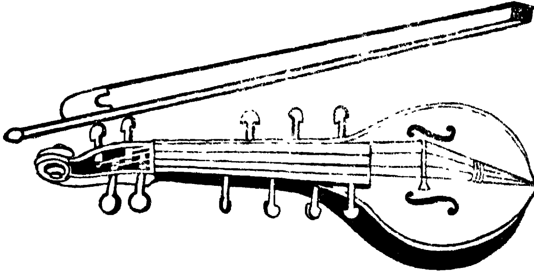
অলাবনী বীণা: আলাপিনীর কথায় আমরা বলেছি যে রত্নাকরে ও সঙ্গীত দামোদরে অলাবনীর বিষয় বিশদভাবে লেখা রয়েছে। হরিনায়কের মতে অলাবনী ও আলাপিনী একই বাদ্যযন্ত্র। শুভঙ্করের দামোদরে আমরা আলাপিনীর পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তিত অবস্থা দেখতে পাই। এখানে অলাবনীর দান্ডি ১০ মুষ্টি বলা হয়েছে। খয়ের কাঠ বা বেণুর তৈরী দান্ডির দৈর্ঘ্য ৪০ আঙ্গুল। পরিধির মাপ দুই কড়ে আঙ্গুল। দানডির ওপর দিকে ছত্রাবলী। দানডির নীচে করভ। মনে হয় করভ শব্দটি,[১] পন্থি বা লেজাড়ির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কুকুভ মানে অলাবু বা লাউ বলা হয় আবার ভিন্ন অর্থে বীণার শেষ প্রান্তের বেঁকান কাঠটিকেও বলা যায়। তাই প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন। দানডির ৯ আঙ্গুল নীচে তুম্ব থাকে, দানডির ফুটোর মাঝে আলগা কাঠের টুকরো দিয়ে চুম্বিকার সাহায্যে তুম্ব শক্ত করে আটকানো। আঁত (ছাগল বা ভেড়ার শুকনো নাড়ী), রেশম বা কাপাস তুলোর শক্ত পাকানো সুতাই তার বলে ব্যবহৃত হত। কতগুলি তার থাকতো তা জানা যায় না, তারগুলি করভের সঙ্গে আটকানো থাকতো। করভের পাচ আঙ্গুল ওপরে আর একটা ছোট লাউ থাকতো। এই যন্ত্রে পর্দা ব্যবহৃত হত জানা যায়, তবে গ্রন্থ থেকে সেটি সঠিক বোঝা যায় না।

ডান হাত ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বাজান হত। লাউটা বুকের কাছে ধরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তুম্বটিকে স্থির রেখে বাঁ হাতের চারটি আঙ্গুল ও ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল দিয়ে বিন্দু-বাদনের কায়দায় সাতটি স্বর প্রকাশ করা হত। ১০ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৈলাশনাথ স্বামী মন্দির এবং পুড়ুকোটের সরস্বতীর মন্দিরের দেবীর হাতের সারী বীণার সঙ্গে এই বীণার অনেকটা মিল দেখা যায়।

অলাবু সারেঙ্গী: কাঠের তৈরী এই যন্ত্রটি শতবর্ষপূর্ত্তির পূর্বেই পরলোকগমন করেছে। কোন বাদককেই এই যন্ত্র বর্তমানে বাজাতে দেখা যায় না। অধুনালুপ্ত এই বাদ্য যন্ত্রটি যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। মুসলমান উস্তাদগণ এই যন্ত্রটিকে **কামারচি** বলে থাকেন। যন্ত্রটি সারেঙ্গীর অনুকরণে গড়ে উঠলেও

(১) করভ=কব্জি থেকে কড়ে আঙ্গুলের গোড়া পর্য্যন্ত স্থান। এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

বাজাবার কায়দা অনেকটা বেহালার মত। সেই কারণে ইউরোপীয়েরা এটিকে **ভারতীয় বেহালা** বলে থাকেন। তরফের তার, সুর বাঁধার নিয়ম প্রভৃতি সারেঙ্গীর মত হলেও, হাঁড়ির শেষ প্রান্ত কাঁধে ঠেস দিয়ে ধরে, ছড় দিয়ে বাজান



অলাবু সারেঙ্গী

হয়। এর হাঁড়ি লাউয়ের খোলা বা কাঠ থেকে তৈরী। কখনও কখনও বড় নারিকেলের মালার তৈরী খোলও দেখা যেত। রাজা স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে যন্ত্রটির উল্লেখ আছে।

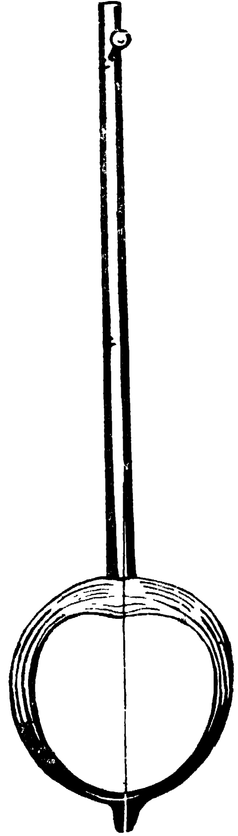
আদি বীণা বা আদ্যা বীণা: বর্তমানে লুপ্ত এই যন্ত্রটি আগে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই যন্ত্র কৈলাস, কপিলাস বা কপিলাসিকা নামেও পরিচিত ছিল। তিন চার ফুট লম্বা বাঁশের একটি গোলাকার দাণ্ডির মুক্ত প্রান্তে দুই তিনটি লাউয়ের তুম্ব থাকতো। দাণ্ডির নীচে তুম্বা অর্থাৎ ধ্বনিকোষটি তিত লাউয়ের খোলায় তৈরী হ'ত। হাঁড়িটি অনেকাংশে একতারার আকারের ও সম্ভবত একটি তন্ত্রীই জোয়ারীর উপর দিয়ে দাণ্ডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। তাই এটিকে একতন্ত্রী বীণাও বলা চলে।

আলাপিণী বীণা: এটি প্রাচীন সভ্য তার যন্ত্র। যন্ত্রটি মিজরাবের সাহায্যে বাজান হ'ত। আলাপিণী ও অলাবনী দুটি ভিন্ন যন্ত্র বলে অনেকে মনে করেন। সঙ্গীতরত্নাকরে আলাপিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা এটি নামভেদ মাত্র। সঙ্গীত দামোদরের অলাবনীর পরিচয়ের সঙ্গে আলাপিনীর যে সামান্য প্রভেদ দেখা যায় তাতে দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। (অলাবনী দেখুন)।

একতন্ত্রীবীণা বা একতারা: শুদ্ধ ভাষায় একতারাকে একতন্ত্রীবীণা বলা হয়। একটি তার থাকে বলেই এর নাম একতারা। ভারতের অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটির জন্মতারিখ বা আবিষ্কারকের নাম আমাদের অজ্ঞাত। একতারা যন্ত্রটি

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত একতারার খোলের ও দানডির মাপের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে এটিকে অন্যান্য বীণার আবিষ্কারের বহু পূর্বে আবিষ্কৃত বলে মনে করে থাকেন। এর একটি তার থেকে কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশ পায়।

একটি গোল লাউয়ের সম্পূর্ণ খোলাটির একচতুর্থাংশ বাদ দিয়ে এর খোল অর্থে ধ্বনিকোষটি তৈরী করা হয়। খোলের মুক্ত স্থানে চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সেই তবলির (আচ্ছাদনের) ওপর সওয়ারী (অর্থে bridge) বসিয়ে তানপুরার কায়দায় ব্রীজের ওপর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়া হয়। খোলের সঙ্গে একটি সরু দানডি খোলটিকে আরপার ছিদ্র করে তার মাঝে যুক্ত করা হয়। এই দানডির মুক্ত প্রান্তে রাখা একটি কীলকের (অর্থে কানের) সঙ্গে একগাছি তারের গোড়া বাঁধা হয় ও হাঁড়ির শেষ প্রান্তে রাখা পনথির সঙ্গে সেই তারের গোড়া বাঁধা হয়। লোহার বা পেতলের তারই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজিয়ের ইচ্ছামত তার চড়িয়ে নিজ নিজ কণ্ঠস্বরের ওজনে স্বগ্রামে ষড়জের সঙ্গে স্বর মেলান হয়। দানডিটা ডান কাঁধের ওপর হেলান দিয়ে রেখে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে স্বরধ্বনি প্রকাশ করা হয়। বাউল বৈরাগীরা বা ভিখারীরা এর সাহায্যে ভক্তিমূলক গান গেয়ে থাকেন। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন যে আমাদের আগের দিনের বীণাযন্ত্র বলতে একতন্ত্রীকেই বোঝাত।


একতন্ত্রীবীনা

আসামে ও মণিপুরে পেন্না বা পেনাক নামে একতারার আকারের এক প্রকারের একতারযুক্ত ধনুর্যন্ত্র দেখা যায়। এই যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজানো হয়। পেনাক নামের কথায় আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের সৃষ্ট প্রাচীন পিনাকী বীণার নাম মনে পড়ে যায়। এরূপ চিন্তা করা অসঙ্গত হবে না যে এই পেন্না বা পেনাক নামক যন্ত্রটি হয়ত আমাদের প্রাচীন পিনাকী বীণার ভিন্নরূপ। পিনাকী আজকের দিনের সারেঙ্গী, এস্রাজ প্রভৃতি নানা ধনুর্যন্ত্র আবিষ্কারের সহায়ক।

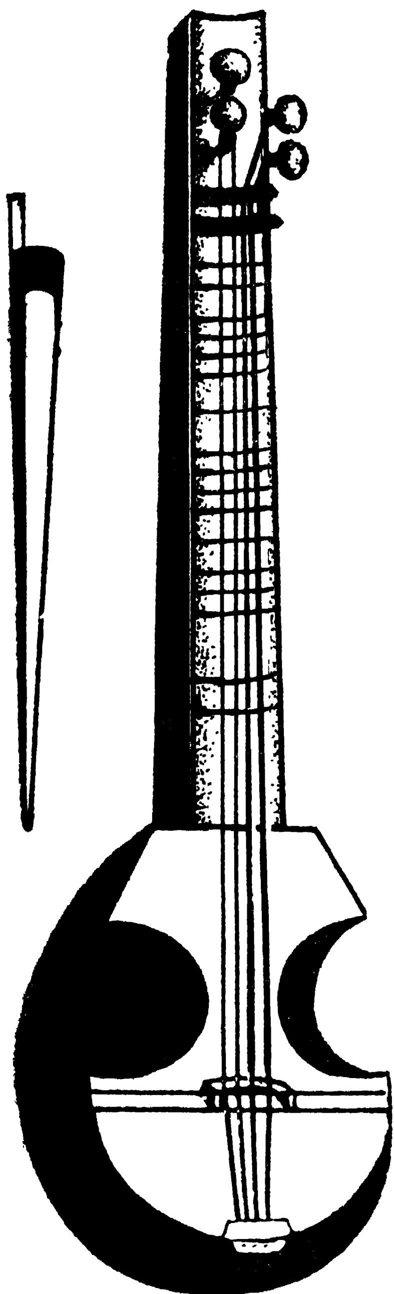
এসরাজ ও তার প্রকার ভেদ

এসরাজ : এসরাজ যন্ত্রটির জন্মকাল দেড়শো বছরও পার হয় নি বলে মনে করা হয়। অনেকে বলেন যে কাশীধামের সঙ্গীতপ্রেমী নবীবক্স নামে সারেঙ্গী বাদকই এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।[১] অন্যেরা আবার কাশীধামেরই সঙ্গীতসাধক ঈশ্বরীপ্রসাদজীকে এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন এই ঈশ্বরীপ্রসাদকে লোকে ঈশ্বরী মহারাজ বা ঈশ্বরীরাজ বলে ডাকতেন এবং তাঁদের ধারণা যে ঈশ্বরীরাজের নাম থেকেই তাঁর সৃষ্ট যন্ত্রটির নাম "ইসরাজ" রাখা হ'য়েছিল এবং এই ইসরাজ শব্দটিই পরবর্তিকালে এস্রাজ শব্দে পরিণত হয়েছে। এই ঈশ্বরী-প্রসাদ পাঞ্জাবের লোক ছিলেন। এরূপও শোনা যায় যে ঈশ্বরী দাসজীর শিষ্য বিহারিজী ও লক্ষ্মণদাসজী ইসরাজ আবিষ্কার করে তাঁদের গুরুর নামে যন্ত্রটি উৎসর্গ করেন।

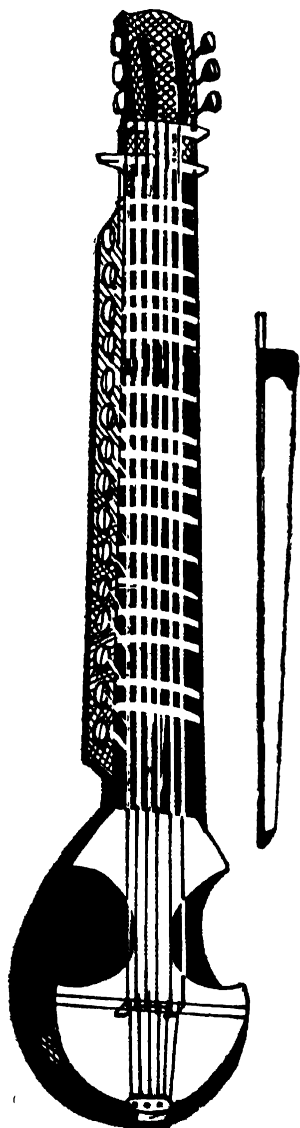
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারত কোষের ২য় খণ্ডে। [২] স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন, "কথিত আছে, সঙ্গীতবিরোধী হওয়ার পূর্বে সম্রাট আওরঙ্গজেব যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন"। সেই হিসাবে যন্ত্রটির জন্মকাল তিনশো বছর হয়ে যায়। এখানেও প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না। আকবর বাদশা বা তস্য প্রপৌত্র দারা অথবা সুজার নাম থাকলেও কথাটি কিছু বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। আওরঙ্গজেবের নামটি আমাদের কাছে খুব সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় না। আওরঙ্গজেবের সময় তার অন্তঃপুরে কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চার নমুনা অবশ্যই পাওয়া যায়। তার পুত্রদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গীতচর্চা করার নজীরও দেখা যায় কিন্তু তাঁর নিজের এ বিষয়ে আগ্রহের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। কাজেই সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় এরূপ কিংবদন্তীতে বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। সঙ্গীতবিদ্বেষী হওয়ার আগে সঙ্গীতসম্বন্ধে তাঁর বিশেষ চর্চা বা শ্রদ্ধার কোন নজীর আমরা পাই না বলেই কোন একটি নূতন বাদ্যযন্ত্র তাঁর পক্ষে উদ্ভাবন করার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তাছাড়া যদি এটি ঔরংজেবের সময়ে নির্মিত বা স্বয়ং বাদশার দ্বারা উদ্ভাবিত হত, তবে বাদশার সময়ে তাঁর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ফকিরুল্লা রচিত রাগদর্পনে এই যন্ত্রের উল্লেখ থাকতো।

(১) এসরাজ তরঙ্গ-রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) ভারতকোষ-২য় খণ্ড এসরাজ।



স্বরভাষ বা তাজ বা মন্দ্রবাহাব বা খাদস্বরী নাদেশ্বর



সাধারণ এস্রাজ

রাগদর্পনের পঞ্চম অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের তালিকার মধ্যে এস্রাজ যন্ত্রের নাম পাওয়া- যায় না।

মুসলমান উস্তাদেরা অনেকে বলেন যে এসরাজ শব্দটি এসেছে "আয়েন-সিন্-রে-আয়েন-জিম্" কথাটি থেকে। প্রথম আয়েন থেকে 'এ', সিন থেকে স, রে থেকে র, দ্বিতীয় আয়েন থেকে 'া' এবং জিম থেকে 'জ'। এইভাবে এ-স-র-া-জ অর্থাৎ এস্রাজ শব্দটি এসেছে। 'আয়েন সিন রে, আয়েন জিম্' শব্দটির অর্থ হল 'রোশনাই পয়দা করা' অর্থে 'দীপ জ্বালা বা আগুন জ্বালা'। তাঁরা বলেন যে এই যন্ত্রের মধুর আওয়াজ মনের মাঝে আগুন জ্বালায়, তাই এর নাম এসরাজ বা এস্রাজ। কবির ভাষায়—"তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে" : অনেকে বলেন "সিরাজ" এই উর্দু শব্দটি থেকে "এস্রাজ" এসেছে। এই সিরাজ শব্দটির অর্থও দীপ। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই যন্ত্রটির নাম রেখেছিলেন "আশুরঞ্জনী"।[১] এই শব্দটির অর্থ প্রমাণ করে যে যন্ত্রটির মধুর আওয়াজ শীঘ্রই সকলের মনোরঞ্জন করে। আশুতোষ অর্থে শিবকে বুঝায়, এইভাবে আশুরঞ্জনী অর্থে মহাদেবের আনন্দদায়ক এরূপ অর্থও করা হয়।

অনেকের ধারণা যে এই যন্ত্রটি এরেবিয়া থেকে এসেছে।[২]

এ সম্বন্ধে এরেবিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থলেখক হুসেন ইবন্ জাইলা লিখিত "কিতাব-অল-কাফীফল-মিউজিক" গ্রন্থে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের নাম পাই এবং আসিয়া থেকে নানা দেশে যে সমস্ত বাজনা তখনকার দিনে রপ্তানি করা হ'ত, তাদের নামের তালিকার মধ্যে আমরা এসরার, এস্রাজ, বা ইসরাজ নামের কোন বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান পাই না। তাছাড়া এটি যদি পারস্য থেকে আমদানি করা হ'ত তবে এস্রাজ বা এস্রার শব্দটি কোন না কোন প্রাচীন পারসীক অভিধানে পাওয়া যেত। আমরা সম্ভবমত অনুসন্ধান করে এরূপ কোন বাজনার নাম পাই নি। খ্যাতনামা সঙ্গীতানুসন্ধিৎসু পরিব্রাজক আলমাসুদীও এইরূপ নামের কোন বাদ্য যন্ত্রের কথা লেখেন নি। সিনি (Sine) নামে যে ধনুর্যন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন সেটা আদৌ এস্রাজের অনুরূপ কোন যন্ত্র নয়। Dr. Snouick Hourgronje

(১) আশুরঞ্জনী তত্ত্ব-ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

(২) New oxford History of Music (volume I-1957 edition) chapter Ancient and Oriental Music. Edited by Egon Wells page no 225. "The Dilruba and Esraj are of persian origin".

তাঁর mecca নামক গ্রন্থে যে Kamanujar[১] কথা লিখেছেন, যেটি প্রথমে দুই তার এবং পরে চার তারবিশিষ্ট যন্ত্র বলে পরিচিত ছিল, সেই যন্ত্রের ছবি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেটি এস্রাজ নয়। এই কেমানোজে যন্ত্রটিও 'রাভানা' অর্থাৎ রাবনাস্ত্রমের অনুকরণ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আবার কেমানোজে যন্ত্রটি ভারতের অমৃত্তির অনুকরণে নির্মিত এরূপ ধারণাও করা হয়।[২]

সেতার ও সারেঙ্গীর যুগ্মমিশ্রণে এস্রাজের জন্ম। এর দান্ডি সেতারের মত। আর খোল (হাঁড়ি) অনেকটা সারেঙ্গীর মত চামড়ায় ঢাকা। বাজনাটি ছড় দিয়ে বাজান হয় বলে ধনুর্যন্ত্রের কোঠায় পড়ে। আজকের এস্রাজ রাভানা যন্ত্রগোষ্ঠীর নবীন সংস্করণ। এই যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধ ও সভ্যযন্ত্ররূপেই বেজে থাকে, তবে অনেক সময় অনুগতসিদ্ধ যন্ত্ররূপে গানের সঙ্গতেও একে দেখা যায়। যন্ত্র সৃষ্টির প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিচার করে এবং যুগ্ম যন্ত্রের মিলনে জন্ম হওয়ার ফলে অসবর্ণের কোঠায় ফেলে একে আমরা অপাংক্তেয় করে রেখেছি। কোন সঙ্গীতাসরে সভাযন্ত্ররূপে একে স্থান দিতে তাই আমরা দ্বিধা করি। একথা অনস্বীকার্য্য যে বর্তমানে এই যন্ত্রে কুশলী বাদকের সংখ্যা খুব অল্প। ভাল (quality-র) এস্রাজে যথাযথ ভাবে সাইজমত তার লাগিয়ে যন্ত্রোপযুক্ত পীচে (pitch) বেঁধে সুরেলা তৈরী হাতে যদি বাজান হয়, তবে তত গোষ্ঠীর কোন বংশধরের পক্ষ নিয়ে তুলনামূলকভাবে এর বিরুদ্ধে সঙ্গীতকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে না। একমাত্র ঝালার কয়েকটি বিশেষ কাজ ছাড়া এতে আলাপচারীর কাজ এত সুন্দর হয় যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যাঁরা ভাল বাজিয়ের হাতে এই যন্ত্রের বাজনা শুনেছেন তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন। এটিকে আলাপচারীর অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

যন্ত্রটির জন্ম বেনারসে বা দিল্লীতে অথবা যেখানেই হোক, গয়ার কয়েকজন গয়ালীই (গয়ার তীর্থগুরু অর্থে পাণ্ডাদের গয়ালী বলা হয়) এতে বিশেষ

(১) আরবদের কেমানজে নামক আদি ছড়ের যন্ত্রের সম্বন্ধে Grove's Dictionary of Music and Musicians (2nd Editon 1952) IV volumeএ লেখা আছে. "It is undoutedly one of the earliest of all bowed insiruments, claiming identity with or descent from the somewhat mythical Ravanastarm of India from which the Urheen (Erhsien) of the Chinese is also supposed to have sprung."

(২) সঙ্গীতসার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (২য় সংস্করণ ১২৮৬ সাল পাতা ৬৫-৬৬)

সুনাম অর্জন করেন ও কলকাতায় যন্ত্রটি প্রচলনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরে এর প্রচলন ছিল এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার উস্তাদদের চেষ্টাতেও এটি কলকাতায় প্রচলিত হয়। নামকরা বাজিয়েদের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন বাদক এই যন্ত্রে দক্ষ ছিলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি। আজও বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে এর ব্যবহার আছে।[১]

যন্ত্রটির সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ ভালজাতের (Special quality-র অর্থে মধুর জোরদার গম্ভীর আওয়াজ বিশিষ্ট) যন্ত্রের অভাব। গমক, ফান্দা, জলদ তান, গীটকারী প্রভৃতি অলংকারগুলি এতে বাজান বিশেষ অনুশীলনসাপেক্ষ।

বহুদিনের নিয়মিত একাগ্র সাধনায় এই যন্ত্রে দক্ষতা লাভ করা যায়। হাঁড়িতে চামড়ার আচ্ছাদন থাকায় আবহাওয়ার তারতম্যে চামড়াটি টেনে বা নরম হ'য়ে গেলে স্বর ও পর্দার অবস্থানের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নতুন করে স্বর বাঁধতে ও ভাল আওয়াজ ফিরে পেতে দীর্ঘ সময়ের ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। এইসব কারণে শ্রোতারাও অনেক সময় বিরক্ত হ'য়ে পড়েন। সারেঙ্গী বাজিয়েরা বাঈজীর গানের অনুসরণ করতেন বলে সারেঙ্গী বাদকদের ও সারেঙ্গীর মান নীচু ছিল। এসরাজের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এতে সহজে সুন্দর করে যন্ত্র ও গানের সব কাজ ভালভাবে আদায় করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতে পারেন অথচ মর্য্যাদা হানি না হয়। অনেক শিক্ষিত ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে গত্‌তোড়া বাজানো পছন্দ করেন এবং গানের সঙ্গে সঙ্গত করাকে এড়িয়ে চলেন। অনেকে আবার হারমোনিয়ামের বদলে এই যন্ত্রের সাহায্যে গান বা সঙ্গত করাকেই শ্রেয় মনে করেন। বলা হয় এস্রাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাজে কিন্তু তাছাড়াও যে এতে উচ্চাঙ্গ (classical) সঙ্গীতও বাজে, কোন উপযুক্ত গুণীর বাজনা শুনলে সেটি বোঝা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতও সহজসাধ্য বস্তু নয় এবং তাতেও কিছু এমন কঠিন কাজ থাকে যা আদায় করতে গেলে classical সঙ্গীতে জ্ঞান ও দখল থাকা প্রয়োজন।

এখন এসরাজের অপর নাম "এসরার" শব্দের কথায় আসছি। খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীজীর "আশুরঞ্জনীতত্ত্ব" নামক পুস্তকেই

(১) The Music of India by Rev. Popley. The Esraj is the Bengal variety of Sarangi......This is the common instrument that one finds in the house of cultured people of Bengal".

আমরা এই 'এসরার' শব্দটি প্রথমে পাই। এই শব্দটি বিষ্ণুপুর ঘরানার স্বনামধন্য সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর "এসরার তরঙ্গ" নামক পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। সেই ঘরাণার ধারক ও বাহক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "এসরার মুকুল" নামক পুস্তিকায়ও এই নাম দেখা যায়। আধুনিক বাংলা অভিধানে এস্রাজের অর্থ যন্ত্রবিশেষ বলে লেখা হয়েছে। এসরার শব্দের অর্থ বিষয়ে আমরা খ্যাতনামা প্রবীণ যন্ত্রনির্মাতা ও শিল্পী স্বর্গীয় নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয়ের মারফত তাঁর সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুপুরের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে বিষ্ণুপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় 'এস' মানে সুমিষ্ট ও 'রার' মানে ধ্বনি লেখা আছে। অতএব আসলে মানেটি দাঁড়ায়—এসরার একটি সুমিষ্ট ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র। সুরেনবাবুর ধারণা যে এসরার শব্দটি হয়ত ফার্সী শব্দ হতে পারে, কিন্তু আমরা এস বা রার এই দুটি শব্দ পার্সিয়ান বা এরাবিক অভিধানে পাই নি। এস্রাজ বা এসরার অথবা 'এস' বা 'রার' প্রভৃতি শব্দচতুষ্টয়ের অর্থ সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের উর্দুর প্রফেসার মিঃ সিদ্দিক ও মিঃ তাইয়াব. এম, এ মহোদয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তাঁরাও জানিয়েছেন যে এরূপ কোন শব্দ ঐসব ভাষার অভিধানে পাওয়া যায় না তবে ইসরার নামে চলতি একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ হচ্ছে রহস্য (mystery)। তথাপি বিষ্ণুপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় যখন এসরার শব্দটি লেখা আছে, এবং স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তকেও যখন এই নামটি দেখা যায় তখন আমাদের পুরাতন সংগ্রহ হিসাবে এসরার নামটিকে সম্মান দিতে হবে।

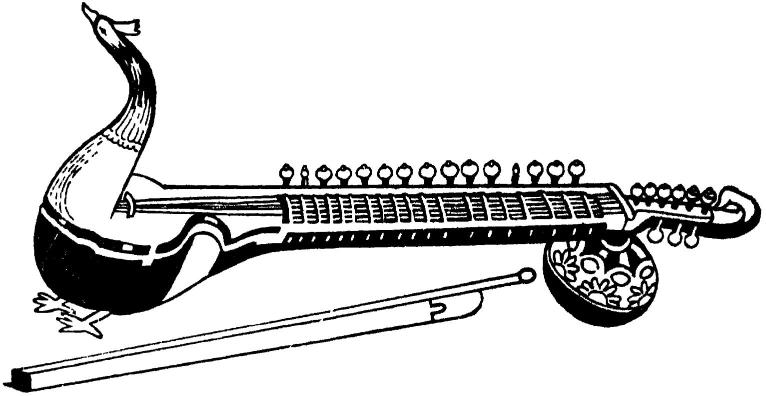
The Story of Indian Music by O. Goswami, chapter Indian Musical Instruments, page 305.

"Esraj and Dilruba are both muslim innovations from sarangi. During the muslim rule when the women in the harem took to singing, they could not be accopanied by the sarangi players who were mostly men. Women could not take to the Sarangi as it was not only a difficult instrument but also spoilt the beauty of the nails. So the upper portion of the Sarangi was lengthened to some extent and frets were fixed on it numbering 15 to 17 according to their size."

এ উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য: গান বাজনা শেখানোর কারণে গাইয়ে ও বাজিয়েরা হারেমে পাহারাধীনে যেতে পারতেন তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়,

কাজেই আমরা উপরোক্ত যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম। আমরা এসরাজ নামে কোন বাদ্যযন্ত্রের নাম তখনকার কোন মুস্লীম সঙ্গীত গ্রন্থেও দেখতে পাই না, অতএব এটি লেখকের নিজস্ব অভিমত বলেই আমাদের ধারণা। এসরাজ যন্ত্রটির ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। প্রামাণ্য এমন কিছু পাই না যা আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি।

মায়ূরী : এসরাজের হাঁড়িতে ময়ূরের মুখ জুড়ে আর একটি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা হয় '**মায়ূরী**' বা '**তাউস**'[১] এই তাউস শব্দটি ফার্সী শব্দ, এর অর্থ ময়ুর। মায়ূরী এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থও ময়ূর। নামের দিক থেকে আলাদা হলেও উভয়



মায়ূরী

যন্ত্রই আকৃতিতে এক। খ্রী: পূ: ৫০০ শত বৎসর পূর্বে চীনের রাজসভায় হিন্দু বাদ্যবৃন্দের মাঝে মায়ূরীর নাম পাওয়া যায়।[২] নাম থেকে যদিও আমরা প্রমাণ করতে পারি না যে সেটি বর্তমানে প্রচলিত মায়ূরীর অনুরূপ ছিল তবে আমরা ধারণা করতে পারি যে যখন হিন্দু বাদ্যবৃন্দের মধ্যে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র হিসাবে পরিচিত ছিল তখন হয়ত সেটিই আজকের 'মায়ূরী'। প্রাচীনকালে এটি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহার কমে যায়, যেমন আজ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র প্রায় অবলুপ্তির পথে।

মায়ূরীর প্রাচীনত্বের কথা চিন্তা করে একথাও ভাবা যেতে পারে যে মায়ূরীর হাঁড়ির (belly-র) ময়ূরের মুখটি বাদ দিয়ে এস্রাজ সৃষ্টি করা হয়েছিল! 'এরূপ

(১) কলিকাতার যাদুঘরে বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠে মায়ূরী নামক যন্ত্র রাখা আছে।

(২) The History of Musical Instruments by Curt Sach Edition 1940, chap. India, page 232.

ভাবলে যন্ত্রটি যে ভারতীয় সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তবে মায়ূরীকে আমরা কোনরকমেই দিলরুবা বলতে পারিনা, কারণ মায়ূরীতে দিলরুবার কায়দায় পটরীর তলদেশ দিয়ে কম্পনের তার নিয়ে যাওয়া হয় না এবং এর হাঁড়িটা দিলরুবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের মতে এই যন্ত্রটি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়েছে এবং বিষ্ণুপুর নিবাসী শিল্পী সেবারাম এই যন্ত্রের আবিষ্কারকর্তা।[১] কিছুদিন আগের সঙ্গীত গ্রন্থেও আমরা মায়ূরীবীণের নাম পেয়ে থাকি। যন্ত্রটি কত প্রাচীন তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীনকালে তারযন্ত্র মাত্রকেই বীণ বলা হত এবং সেই কারণেই মায়ূরীকে **"মায়ূরী-বীণ"** বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই মায়ূরী-বীণ **"তাসরম্বতী"** নামে পরিচিত। মায়ূরী ও মায়ূরী-বীণ একই আকৃতির যন্ত্রবিশেষ। [redacted] ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল পিনাকী বীণাকে এসরাজের পূর্বরূপ বলে এই বীণাকে এসরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পিনাকী আধুনিক এস্রাজের পূর্বরূপ হবে।"[২]

অতএব তাঁর কথায় এস্রাজ ভারতের নিজস্ব একটি প্রাচীন যন্ত্রের ভিন্নরূপ বলেই প্রতীত হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বা তারও আগে এমন একটি যন্ত্র ছিল যাকে এস্রাজের পূর্বরূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মায়ূরী ও এস্রাজ একই যন্ত্র।

এস্রাজ যন্ত্রটির নাম, অর্থ, জন্মকাল ও আবিষ্কারক সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সমাধানে আসা সম্ভব নয় বলে আমরা বিভিন্ন মতামত আপনাদের সামনে রেখে ইতিহাস থেকে বিদায় নিলাম।

এস্রাজ যন্ত্রের আকার ও অবয়ব ভেদে আরও যে কটি নাম প্রচলিত আছে একে একে তাদের কথায় আসছি। খুব বড় আকারের এস্রাজ যা আগের দিনে সমবেত বাদ্যবৃন্দে ব্যবহৃত হত তার কথা বলছি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই প্রথম এই বৃহদাকারের এসরাজ তৈরী করান, দেশী যন্ত্রের অর্কেষ্ট্রায় (বাদ্যমণ্ডলীতে) বাজাবার জন্য। একে **মন্দ্রবাহার** বলা হয়।[৩] এগুলি এত বড় ছিল যে চেয়ারে বসে violincello-র কায়দায় বাজান হ'ত। কলকাতার যাদুঘরে **নাদতরঙ্গ** নামে এই যন্ত্র রাখা আছে। প্রাচীন যন্ত্রবিদদের মধ্যে অনেকেই এটিকে **'তাজ'**

---

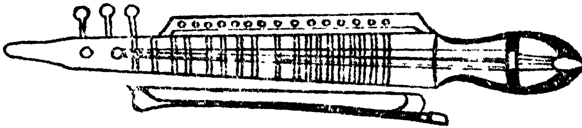
(১) যন্ত্রকোষ—রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর

(২) প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা—ডাঃ অমিয় নাথ সান্যাল (পরিচ্ছেদ আয়োজন পৃ. ৯)

(৩) Musical Instruments of India by S. Krishnaswamy, Page 59. "The Mandar Bahar" is very similar to the Esraj but the Finger Board and the Body are much bigger."

বা **সুরভাষ** বা **'ভাষ'** বলে থাকেন। তাজ বা ভাষ নামটি আমরাও পছন্দ করি। যন্ত্রকোষে এটি **খাদস্বরী নাদেশ্বর** নামে পরিচিত।

সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ ঃ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বিষ্ণুপুরের জনৈক শিল্পী সেবারাম দাস সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ নামের আর একটি বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করেন। এটি অবিকল এস্রাজের মতই, তরফহীন বলে এতে নিস্তির কাঠ থাকে না। বাজাবার কায়দা অবিকল এস্রাজের মতই। আজকাল এর প্রচলন নাই।



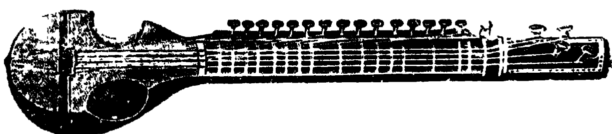
মীন সারেঙ্গী

মীন সারেঙ্গী ঃ মীন সারেঙ্গী এস্রাজের আর এক রূপ। এই যন্ত্রের দানডি ও হাঁড়ি একটি বড লম্বা লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হ'ত। যন্ত্রটির বাকি সব অংশই এস্রাজের মত। বাজাবার কলাকৌশলও অভিন্ন। যন্ত্রটি আকারে ছোট এবং হাঁডির কাছে কাঠের তৈরী একটি মাছের মুখ রাখা হত। মীনশব্দের অর্থ মাছ এবং সেই কারণেই এর নাম "মীন-সারেঙ্গী"।

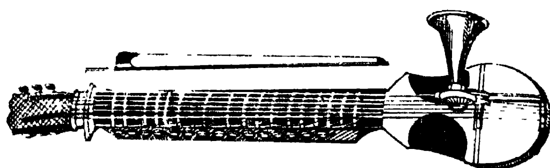
কোয়েল ঃ খুব ছোট আকারের এস্রাজকে 'কোয়েল' বা এস্রাজের ফার্স্ট পার্ট বলে। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কালে ছোট আকারের চড়া সুরে বাঁধা এস্রাজের নাম রাখেন **কোয়েল**।

তারশানাই ঃ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে এস্রাজ যন্ত্রে গ্রামোফোনের সাউণ্ডবক্স লাগিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে 'তারশানাই'। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন কর্তা। (যন্ত্রটির রেজিস্টার্ড নং ৭২৩ কলিকাতা)। স্বর্গীয় বেতারশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারশানাই যন্ত্রটি নির্মিত হয়। দাস মহাশয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। সঙ্গীতের ব্যবহারিক শাস্ত্রে ও ক্রিয়াত্মক অংশে তাঁর দখল ছিল। সমবেতবাদ্যে তিনিই তারশানাই প্রথম ব্যবহার করেন। এই তারশানায়ের ব্যবহার ও তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বাদ্য মণ্ডলীর মাঝে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। একক বাজনা তেমন সুন্দর হয় না।

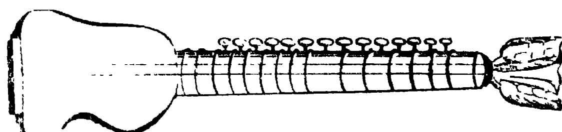
দিলরুবা ঃ এখন আমরা সারেঙ্গীর গর্ভে সেতারের ঔরসজাত তার দ্বিতীয় পুত্র "দিলরুবার" কথায় আসি। এর খোলটি সারেঙ্গীর অনুরূপ ও দানডটি



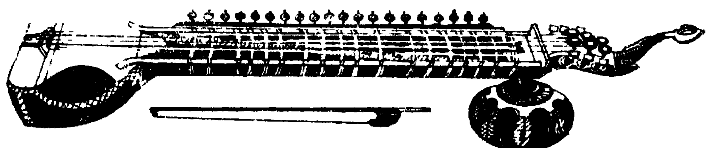
কোয়েল (এস্রাজের 1st Part)



তারশানাই



সাধারণ দিলরুবা



উন্নত ধরণের আধুনিক দিলরুবা

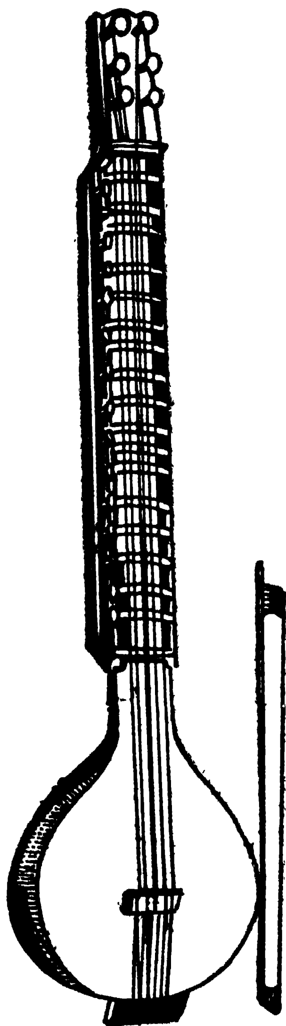
সেতারের সমরূপ। খোলের আকৃতির ঈষৎ প্রভেদ ব্যতিরেকে আর সবই এস্রাজের ন্যায়। পটরির কাঠের তলদেশ দিয়ে তরফের তারগুলি মিস্তির কাঠে রাখা ছোট ছোট কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে সারেঙ্গীর কায়দায় পটরির কাঠের ওপর দুপাশে দুটো ছোট সওয়ারী রাখা হয়, এবং তার ওপর দিয়ে ৭।৮ সাত আটটা তার টানা হয়। সওয়ারীদ্বয়ে জোয়ারী খোলার ফলে বাজাবার সময় এই তারের কম্পনে প্রতিটি বাদিত স্বরে বিশেষ জোয়ারীযুক্ত আওয়াজ প্রকাশ পায়, ফলে স্বরধ্বনিগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই দিলরুবা কথাটি উর্দু শব্দ এবং এর অর্থ হৃদয়কে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা বা টেনে নিয়ে যাওয়া, সুতরাং বাংলা ভাষায় আমরা এটিকে মনোরঞ্জনী নামে ডাকা পছন্দ করি। এস্রাজ **আশুরঞ্জনী**, তার ভাই দিলরুবা **মনোরঞ্জনী**।

বর্নী সাহেবের ইতিহাসে[১] (আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে) দিলরুবা নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম দেখা যায়। যন্ত্রটির আকৃতি বা বাদন প্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ জাগে যে সেটি আজকের দিনের প্রচলিত দিলরুবা কিনা। এস্রাজের মত এরও জন্মকাল এবং উদ্ভাবকের নামের কোনও হদিশ মেলে না। এই যন্ত্রটি বর্তমানে বোম্বাই অঞ্চলেই বেশী ব্যবহৃত ও নির্মিত হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা যন্ত্রটি পাঞ্জাব থেকে এসেছে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও এর কিছু ব্যবহার দেখা যায়। দিলরুবার ব্যবহার বাংলা দেশে অল্প।[২] খুব অল্প-সংখ্যক বাদকই এই যন্ত্রটি এককভাবে বাজিয়ে থাকেন। বৃহত্তর এশিয়ার নানা জাতির সহিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান থাকায় ও বহুদিন যাবৎ নানা জাতির শাসনাধীন থাকায় অতীতে ভারতীয় যন্ত্রের সহিত অন্য জাতির যন্ত্রের আদানপ্রদান ও মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণের ফলে অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় যন্ত্র অতীত নামটি হারিয়ে ফেলে। যন্ত্রের আসলরূপ ও বাদনপদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায়। অথচ কোন্ দেশের কোন্ যন্ত্রের সহিত মিশ্রণের ফলে অথবা কবে কোন্ দেশে চলে যাওয়ায় যন্ত্রটির আকারে রদবদল ঘটলো, তার ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্ভুল সমাধানে পৌছান তাই এত কঠিন, একথাটি আমাদের বার বার করে বলতে হচ্ছে। এখনও চীন জাপান ও এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশে বিশেষভাবে অনুসন্ধান

(১) History of Music by Burney Charles.

(২) Herbert A Popley সাহেব তাঁর The Music of India গ্রন্থে বলেছেন—"It is used in the Punjab & in the United Provinces." (ইং ১৯২১ সালে প্রকাশিত)

করলে হয়ত আমরা প্রাচীন ভারতের কিছু লুপ্ত বাদ্য যন্ত্রের সন্ধান পেতে পারি।



শতবর্ষ পূর্বেকার প্রাচীন এক-ধরণের এস্রাজ। এ সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে কিছু উদাসীন। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরাও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেননি। ফলে অন্যান্য দেশের কাছে আমাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রও আরব বা পারস্যদেশজাত বলেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। আমাদের জাতীয়সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের আরও সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এস্রাজ যন্ত্রে অতীতে যাঁরা বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ও বর্তমানে যাঁরা এই যন্ত্র বেতারে বা সঙ্গীতাসরে বাজিয়ে চলেছেন তাঁদের নাম লিখে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

অতীত: বেনারসের নবীবক্স্ সারেঙ্গী-ওয়ালা ও ঈশ্বরীপ্রসাদজী। গয়ার হনুমান-প্রসাদজী, কানাইলাল ঢেঁাড়জী, যোগীন ডাক্তারজী (ভেলুবাবু), চান্দ্রিকাপ্রসাদ দুবেজী। বিষ্ণুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিষ্ণুপুর ঘরানাদারেরা। বরিশালের বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শীতল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার হাবুদত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) ও তস্য পুত্রপ্রতিম শরৎ দত্ত (নন্তুবাবু), বীরেন মুখার্জী, দর্জ্জিপাড়ার সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী উপাধিপ্রাপ্তা যাদুমণি, কাঁসারী পাড়ার কালীদাস পাল, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অঙ্কবাদক শ্রীনিবাস, ভারতের খ্যাতনামা সেতারী বিলায়েত খাঁর পিতামহ ও অতীতের অদ্বিতীয় সেতারী এনায়েত খাঁর পিতা স্বর্গীয় সেতারী এমদাদ খাঁ সাহেব (এস্রাজে

অতি সুন্দর ঠুংরী বাজাতেন, তবে তিনি কোন সভায় এ যন্ত্রটি বাজাতেন না), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এস্রাজ বাজাতে ভালবাসতেন ও ভালভাবে বাজাতে পারতেন। **বর্ত্তমান** বাজিয়েদের মধ্যে সর্বশ্রী দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দোপাধ্যায়, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, রনধীর রায়, নিমাই মল্লিক, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর পাল, সুনীল ভট্টাচার্য, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ দাস, কেয়া মিত্র, বিজলীকুমার সেন, রাধারাণী কুণ্ড, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসু মহাশয়ও এই যন্ত্রটি বিশেষ পছন্দ করতেন এবং নিজে বাজাতেন।

যন্ত্রগুলির প্রধান অঙ্গঃ (খোলের ছাঁউনি ছাড়া আগাগোড়া কাঠের তৈরী)।

১। **হাঁড়ি বা খোলঃ** শুদ্ধ ভাষায় হাঁড়িকে **খর্পর** বা **ধ্বনিকোষ** বলা হয়। হিন্দীতে **তুম্বা** এবং ইংরাজিতে **বেলি (Belly)** বা **ড্রাম (Drum)** বলা হয়। হাঁড়ির দু পাশের খালকে **ছালোর** বলে। হাঁড়ির সামনের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, এটিকে **খোলের ছাঁউনি** বলে। শুদ্ধ ভাষায় এটি **ধ্বনিপট্টক** নামে পরিচিত। হাঁড়ির পিছন দিকে দান্ডির জোড়ের জায়গায় অনেক যন্ত্রে খাঁজ থাকে। এই জোড়ের জায়গাটিকে **কোমর** বলা হয়, অনেকে **ঘাড়**ও বলে থাকেন। খোলের ও দান্ডির মাঝে **ঠেস** থাকে, আচ্ছাদনের ভেতর রাখা এই সরু কাঠের ঠেসটিকে ইংরাজীতে **বেসবার (Base Bar)** বা **সাউণ্ডপোস্ট (Sound Post)** বলা হয়। হাঁড়ির বাইরে মাঝখানে একটি তিনকোনা বস্তু থাকে। এটিকে **পন্থী** বা **মোগরা** বলে। সমস্ত তারের গোড়া এই পন্থীর খাঁজে খাঁজে বাধা থাকে। পন্থীকে শুদ্ধ ভাষায় **শালায়নী** বলে। হিন্দীতে **তারদান** বা **লংগোট** বলা হয়। ইংরাজীতে এটি **টেলপিস্** নামে পরিচিত।

২। **দান্ডিঃ** হাঁড়ির মতন দান্ডিও এই যন্ত্রগুলির এক প্রধান অংশ। হাঁড়ির মত দান্ডিও ধ্বনি-নিয়ামক। দান্ডির দুটি ভাগঃ প্রথমটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ফাঁপা, পিছনের অংশ নৌকার খোলের মত। দ্বিতীয়টি দান্ডির ওপরের কাঠের ঢাকা। এই ঢাকাটিকে **পটরি** বলা হয়। পটরিকে শুদ্ধ ভাষায় **অঙ্গুলিপট্টক** বা সারিকাস্থান বলা হয়। ইংরাজীতে এটিকে **ফিংগার বোর্ড (Finger-board)**

বলে। দান্ডিকে হিন্দীতে **দান্ড্** বলা হয়। দান্ডিও খোলের সংযোগ স্থলকে কোমর বলা হলেও কারিগরেরা **গুলু** বা **গলা** বলে থাকেন। দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান রাখার জায়গার ঠিক নীচে পরপর দুটি সাদা ফলক থাকে এগুলিকে **আড়ি** অথবা **ঘাড়ি** বলা হয়। শুদ্ধ ভাষায় আড়িকে **তার-গহন** বা **সেতু** বলা হয়। এই সেতুকে সংস্কৃতে **মেরু** বলা হয়। অনেকে আড়িকে **সরস্বতী** বলে থাকেন। হিন্দীতে আড়িকে **অটি** বা **তার-দান** বলে এবং ইংরাজীতে বলে **নেক-ব্রীজ** (**Neck Bridge**)। এগুলি হরিণের সিং, হাতীর দাঁত বা অন্য কোন ঘন পদার্থে তৈরী হয়।

নিস্তীর কাঠঃ এস্রাজ দিলরুবা প্রভৃতি যন্ত্রে তরফের কান রাখার কারণে দান্ডির পাশে একটি সরু কাঠ রাখা থাকে। তার মাঝের ছিদ্রগুলিতে তরফের কান রাখা থাকে।

কানঃ কানকে শুদ্ধ ভাষায় **কীলক** বলা হয়। হিন্দীতে একে **খোঁটি** এবং ইংরাজীতে একে **পেগ** (**Peg**) বা **কী** (**Key**) বলা হয়। সাধারণ এস্রাজে দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে চার (৪) বা ছয়টি (৬) প্রধান কান ও নিস্তীর কাঠে পনেরটি (১৫) তরফের কান রাখা হয়। যন্ত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

পর্দাঃ দান্ডির গায়ে চুড়ির মত গোলাকার কিছু সংখ্যক পর্দা রাখা হয়। এগুলি স্বর-স্থান নির্দেশক। দান্ডির সঙ্গে রেশমের সুতা দিয়ে এগুলি বাঁধা থাকে। পর্দাকে শুদ্ধ ভাষায় **সারিকা** বলা হয়। হিন্দীতে পর্দাকে **সুন্দরীয়া** বা **পরদে** ও ইংরাজীতে **ফ্রেট** (**Fret**) বলা হয়। অনেকে একে **ঘাঁট** বা **ঘাট** বলে থাকেন। বৈদিক **আঘাট** শব্দ থেকেই এই **ঘাট** শব্দের উৎপত্তি। সচল ঠাটের যন্ত্রে ষোলটি (১৬) ও অচল ঠাটের যন্ত্রে উনিশ থেকে চব্বিশটি (১৯-২৪) পর্য্যন্ত পর্দা রাখা হয়।

সওয়ারীঃ শুদ্ধ ভাষায় সওয়ারী **তন্ত্রাসন** নামে পরিচিত। হিন্দীতে একে **ঘোড়ী** বা **ঘুরচ** অথবা **গুরজ** বলা হয়। ইংরাজীতে এটি **ব্রীজ** (**Bridge**) নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এটিকেও **মেরু** বলে। সওয়ারীর উপর এবং ভিতরের ছিদ্র দিয়ে পনথীতে বাঁধা সকল তার দান্ডির মুক্ত প্রান্তে নিস্তীতে রাখা কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রকিশোর এই যন্ত্রটির বিশেষ ভক্তছিলেন। তাঁর অভিমত এই

যে যন্ত্রটিতে গান বাজানও চলে, আবার যন্ত্রসঙ্গীতের সকল প্রকার অলংকারও প্রকাশ করা যায়।

তার ঃ—বাজিয়ের খুশীমত এতে তার বাঁধার ওজন ও সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণভাবে চারটি (৪) প্রধান ও পনেরটি (১৫) তরফের তার থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখার ইচ্ছা থাকলেও কাগজের দুর্মূল্যতা ও অনটনের কারণে লেখা সম্ভব হল না। আসন ধারণ ও ছড়ের বিষয় সেই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আমরা এস্রাজের বিশেষ পুস্তকে সেগুলি প্রকাশ করার আশা রাখি।

এস্রাজের ঘরাণা ঃ (১) **প্রথম বনারস ঘরাণা** ঃ নবীবক্স সারেঙ্গী-বাদকএর প্রতিষ্ঠাতা। বনারস ঘরাণার ধারক ও বাহক হিসাবে আজ আর কোন এস্রাজীর নাম পাওয়া যায় না। **দ্বিতীয় বনারস ঘরাণা** পঞ্জাব ঘরাণার ঈশ্বরীপ্রসাদজী থেকে আরম্ভ। ঘরাণাদার হিসাবে আজ কোন এস্রাজ বাজিয়ের নাম পাওয়া যায় না।

(২) **গয়া ঘরাণা** ঃ হনুমানদাস সিংজী এই ঘরাণার প্রবর্তক। কানাইলাল ঢেঁড়ীজী এই ঘরের বিশিষ্ট বাদক ছিলেন। হনুমানদাসের বাজের চাল থেকে এঁর চাল কিছু পৃথক ছিল। চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবে গয়া ঘরাণার নামী এস্রাজী ছিলেন। কানাই ঢেঁড়ী থেকে বাঙ্গলায় হাবু দত্তের প্রচেষ্টায় এস্রাজঘর জমে ওঠে। শরৎদত্তের নামের সঙ্গেই কানাই ঢেঁড়ীর বাজ প্রায় শেষ হয়ে যায়। হাবু দত্তের বাজের মাঝে রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁ সাহেবের চাল যুক্ত ছিল। গয়া ঘরের খ্যালগায়ক ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, হারমোনিয়ম-বাদক মোহিনী সিং, মুনেশ্বরদয়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এস্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায়ও এই ঘরের এস্রাজবাদক হিসাবে নাম করেন। গয়ার যোগিন ডাক্তারজী (ভেলুবাবু), গৌরীপুরের আচার্য্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতিও গয়া ঘরের এস্রাজী ছিলেন। (২) স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এই ঘরাণার এস্রাজী হলেও তাঁর চালে গৌরীপুরের আচার্যের মত ইমদাদখানি চালের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এই বাজ এখনও দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রভৃতির হাতে শোনা যায়।

(৩) **করামৎ কুতুব খাঁর ঘরাণা** ঃ—এই ঘরের স্বর্গীয় কালীদাস পালই এস্রাজ ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর নামের সঙ্গেই প্রায় এই ঘরাণা শেষ। যে দু একজন গুণী এই ঘরাণায় আছেন তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) **ইমদাদখানী ঘরাণা** ঃ এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন ইমদাদ খাঁ।

এই ঘরে ডাঃ প্রকাশচন্দ্র সেন ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রকিশোর (গৌরীপুর) এস্রাজ শেখেন। এই ঘরাণায় নাম করেন অন্ধবাদক শ্রীনিবাস। বর্তমানে অনেকেই এই ঘরাণার চালে এস্রাজ বাজিয়ে থাকেন, যদিও চালের বাজে অন্য ঘরের মিশ্রণ দেখা যায়।

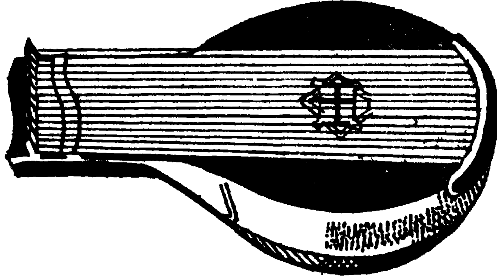
(৫) **বিষ্ণুপুর ঘরাণা :** রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য থেকে এস্রাজের ঘর শুরু হয়। পরে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাম করা গুণীরা এস্রাজের এক বিশিষ্ট বাজ প্রচলন করেন। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরের গুণী এস্রাজ বাদক ; এঁর ছাত্র রণধীর রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

ঔডুম্বরী বীণা : সঙ্গীত রত্নাকর ও বাদ্যরত্ন কোষ প্রভৃতিতে এই বীণার নাম দেখা যায়। যজ্ঞডুমুরের কাঠে এই বীণার দান্ডি তৈরী করা হত। এই বীণাকে কোন কোন স্থানে পিচ্ছোলা বীণা বলা হয়েছে। আর কোন পরিচয় বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। (শাঙ্খায়ন শ্রৌত সূত্র)

কচ্ছপী বীণা (কেচুয়া সেতার) : কচ্ছপী বীণা বর্তমানে কেচুয়া সেতার নামে প্রচলিত। এই বীণার খোল (হাঁড়ি) বা ধ্বনিকোষটি কচ্ছপের পিঠের মত চ্যাপ্টা, এই কারণেই একে কচ্ছপী বীণা বলা হয়। হাঁড়িটি তিত লাউয়ের শুকনো খোলা থেকে ও দান্ডিটি কাঠ থেকে তৈরী হয়। ভারতীয় সেতার বলতে কচ্ছপীকেই বোঝায় কারণ প্রাচীনকালে কচ্ছপী ও ত্রিতন্ত্রী এই উভয় বীণাতেই তিনটি করে তার রাখা হত। কচ্ছপী বীণা অতি প্রাচীন। তদানীন্তন সংগীতপণ্ডিত রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর "যন্ত্রকোষ" পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে গীটার জিতার, লায়ার, টেসটিডো প্রভৃতি যন্ত্র কচ্ছপী বীণার অনুসরণ। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-অনুসন্ধানী বহু পণ্ডিতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে এই কচ্ছপী পাশ্চাত্য দেশের বহুবিধ তত যন্ত্রের আদিপুরুষ। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বইটি পড়ার অনুরোধ জানাই।

কলিকাতার যাদুঘরে একটি অতিবৃহৎ কচ্ছপী বীণা রাখা আছে। এটি রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে মিউজিয়ামকে দান করা হয়েছিল। কচ্ছপী বীণাকে অনেকে কুর্ম্মী বীণা বলে থাকেন, কিন্তু আমরা সঙ্গীত গ্রন্থে কুর্ম্মী বীণা নামে একটি পৃথক যন্ত্র পাই বলেই কচ্ছপীকে কুর্ম্মী বলতে পারি না।

কচ্ছপীর বাদনপ্রণালী সেতারের মত, অর্থাৎ মিজরাব দিয়ে তারে ঘা মেরে বাজান হয়ে থাকে। ষোলটি পর্দা এবং ক্ষেত্র বিশেষে চব্বিশটি পর্দা দান্ডিতে তাঁত দিয়ে বাঁধা থাকে। হাঁড়ির আকৃতিভেদ ব্যতিরেকে সকল বিষয়ই সেতারের সমরূপ, তাই পৃথক ছবি দেওয়া হল না।

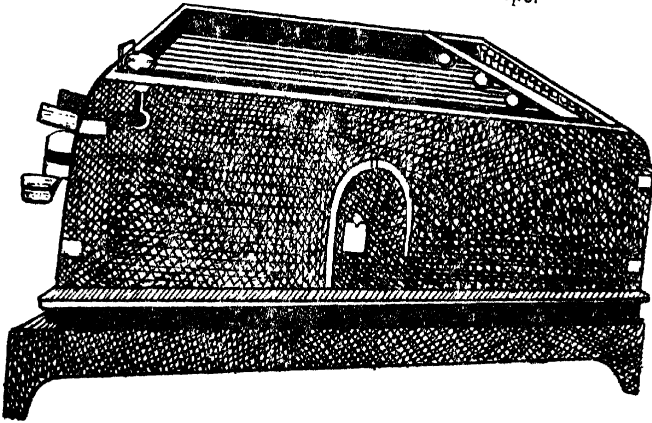


কাত্যায়নী বীণা (প্রাচীন প্রকার)

কাত্যায়ণী বীণা বা কানন অথবা কান্নুন: ঋক্‌বেদে যে বাণ জাতীয় বীণার উল্লেখ দেখা যায় সেই শততন্ত্রীযুক্ত বাণ বীণাই আকার পরিবর্তনে ও নামভেদে কান্নুন বা কানন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অনেকের ধারণা খৃঃ জন্মের চারশো বছর আগে পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) নন্দরাজার রাজত্বকালে যে কাত্যায়নের নাম শোনা যায় তিনিই এই যন্ত্রের স্রষ্টা কিন্তু আমাদের ধারণা যে শততন্ত্রী যন্ত্রের স্রষ্টা কাত্যায়ন নন্দরাজার আমলের লোক নন। ইনি শ্রৌতসূত্রের কাত্যায়ন। Rev. Popley সাহেব "The Music of India" পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "Katyayani vina was invented by Rishi Katyayana and was also called the Sata-tantri vina, because it had originally a hundred strings." অতএব প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঋক্‌বেদ-বর্ণিত বাণ জাতীয় বীণাই কাত্যায়ণী বীণা। শততন্ত্রী বীণায় একশত তার থাকতো, একথাও এখানে বলা হয়েছে এবং সেই কারণেই এর নাম শততন্ত্রী রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে" শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মুঞ্জা ঘাসে বা দূর্বা ঘাসে তৈরী একশতটি তার এতে রাখা হ'ত। ফরাসী সংগীত-ইতিহাসলেখক ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ভিলেটি (Mr. Velleteau) স্বীকার করে গেছেন যে মিশরীয়েরা ভারত থেকে কাত্যায়ন বীণা মিশরে নিয়ে গিয়ে তার অনুকরণে তাদের **কাত্তুন** যন্ত্র নির্মাণ করেন।

আরবেরা এই কাত্তুন যন্ত্র নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে এর নাম দেয় **কানুন**।* অতএব আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি যে বর্তমানের কানুন বা কানন বা সন্তুর প্রভৃতি যন্ত্রসকল আমাদের শততন্ত্রীর অনুকরণেই গড়ে উঠেছে। (মোগলদের আমলে এই কাননে মাত্র চল্লিশটি তার রাখা হত।)

আরবীয়েরা ও পারশীকেরা উভয়েই দাবী করেন যে যন্ত্রটি তাঁদের উদ্ভাবন। Harvard Dictionery of Music 1956 Edition. page 385-এ লেখা হয়েছে" An Arabic Psaltery with 26 gut strings, the name of which is derived from the Greek word 'Canon' i, e monochord, occurs as early as in the tenth century in a story of the Arabian nights. In the later middle ages (12th century,) the instrument was imported into Europe.

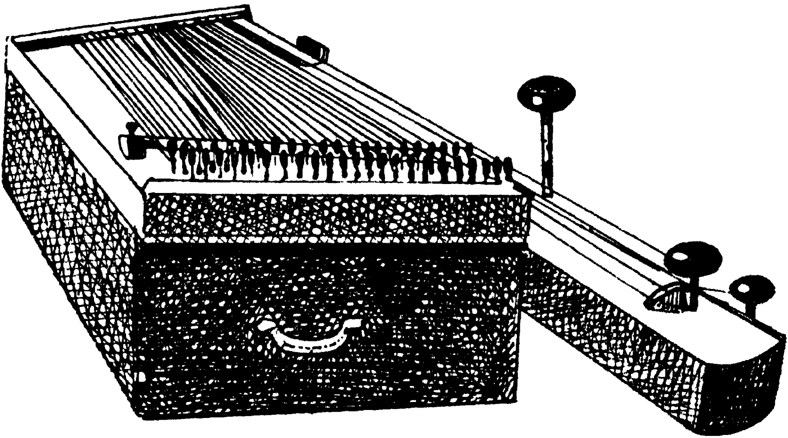


বর্তমান কানন

এখানে আরব দেশের নাম পাই। আবার Mr. Henry George Farmer তাঁর লেখা "Studies in Oriental Musical Instruments" নামক পুস্তকে নবম পৃষ্ঠায় লিখেছেন "It is stated that the Instrument called the Quanun was Al-Farabi's invention and he was the first who mounted it in its present form. এখানেও আরব দেশের আল্‌ফারাবির

*যন্ত্রকোষ...রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

নাম পাওয়া যায়। History of Arab Music by Salvader Daniel পুস্তকটির ২২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে The instrument had seventy five strings এবং whilst the instrument came from the Greeks, I am not sure whether it is derived from trigonon or kynnari. এই পুস্তকে আরও বলা হয়েছে যে Egypt এবং Asia-তে যে ধরণের কানুন ব্যবহৃত হয় সেগুলি (Santur) সন্তুর যন্ত্রের মত।



মিজরাব বাদিত কানুন (স্বরমণ্ডলও বলা হয়)

এই সব পুস্তক পাঠে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এটি প্রাচীন গ্রীকদের বা আরব অথবা মিশরীয়দের উদ্ভাবিত যন্ত্র নয়। আমাদের "কাত্যায়নী"ই তারসংখ্যার পরিবর্তনে ও আকারভেদে ভিন্ন দেশে গিয়ে নামান্তর গ্রহণ করেছিল এবং পরে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আবার আমাদের দেশে ফিরে এসেছে **'কানুন'** নামে। এই কানুন নামটি আরবীয়েরা পেয়েছে গ্রীকদের কাছ থেকে। (The Canon or rule of Greeks) Farmer সাহেবের পুস্তকে দশম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে "The name Kanun was clearly derived from the Greeks. By the tenth century, owing to Arabic translation from Greek, Syriac and Persian a considerable foreign nomenclature had been adopted by the Arabs in their science & arts."

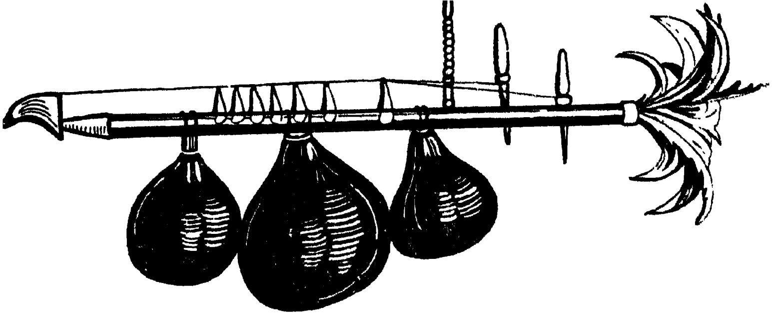
এখানে জানা যায় যে কানুন নামটি পর্য্যন্ত আরবীয়দের নিজের নাম নয়,

তা ছাড়া অনেকেরই ধারণা যে প্রাচীন কাত্যায়নী বীণার কাত্যায়নী শব্দটি মিশরে গিয়ে কাতুন শব্দে পরিণত হয়। কাতুন নামটি গ্রীসে গিয়ে হয়ে যায় কানুন। সেই নামেই আজ পর্য্যন্ত এটি পরিচিত।

বর্তমানে কানুন যন্ত্রটি প্রায় অপ্রচলিত। এখন কানুনের পরিবর্তে সন্তুর যন্ত্রটি কানুনের কায়দায় বাজাতে শোনা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন ইউরোপীয় পিয়ানো শততন্ত্রী অর্থে কাত্যায়নীর অনুকরণেই নির্ম্মিত। আমরা কাননের ক্ষুদ্র সংস্করণ স্বরমণ্ডলের কথায় Rev. Popley সাহেবের উক্তি থেকে এটির প্রমাণ দিয়েছি। 'The Indian Music' পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন "This instrument is the forefather of Modern Piano which is nothing more than an enlarged Swaramondal". অতএব বোঝা যায় যে বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য দেশের পিয়ানো জাতীয় যন্ত্রগুলিও কাত্যায়নীর অনুকরণেই গড়ে উঠেছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ১ম ভাগে ৫০ পৃঃ লিখেছেন "বৈদিক শততন্ত্রী বীণার মতন 'সন্তুর' নামে একটি বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এখনো কাশ্মীরে প্রচলিত আছে। কাশ্মিরী বীণাটিতে আটটি করে তন্ত্রী প্রত্যেক স্বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ৭টি শুদ্ধ ও ৫টি কোমল মোট ১২টি স্বরের জন্য ১২ × ৮=৯৬টি তন্ত্রী এবং চারটি প্রধান তন্ত্রী বীণাকাণ্ডে সংযোজিত, মোট একশটি (১০০) তন্ত্রী বা তারের সমাবেশ কাশ্মীরী বীণাটিতে দেখা যায়। দুটি ছোট কাঠি দিয়ে যন্ত্রটি বাজান হয়। বৈদিক শততন্ত্রী বীণাই ভূস্বর্গবাসী কাশ্মিরীদের ভিতর এখনো পূর্বরূপ কিছু পরিবর্তিত করে নিজেকে বজায় রেখেছে কিনা ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে"। এই থেকে প্রমাণ হয় যে বর্তমানে প্রচলিত কানন যন্ত্রটি নামভেদে শততন্ত্রী বীণারই পরিবর্তিত আকার মাত্র। এটি বিদেশজাত যন্ত্র নয়।

কাণ্ড বীণা : সায়ণ মতে এই বীণাকে আঘাটি বলা হত ও দ্রাহ্যায়ণ মতে এর নাম ছিল বেণু। বীণাটি শর দিয়ে তৈরী হত। অনেকের মতে পর্বহীন বাঁশ থেকে তৈরী হত এবং তাই এর নাম বেণু রাখা হয়েছিল। ডাঃ কালাণ্ডের লেখা "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ"-এ এই বীণার কথা লেখা হয়েছে এবং এখানে কাণ্ড বীণাকে "Flute of bamboo" অর্থে বাঁশের বাঁশী বলা হয়েছে। বীণা প্রপাঠকে (পরমেশ্বর লিখিত) বীণালক্ষণ অধ্যায়ে ১৯ নং শ্লোকে আছে যে এই বীণা চারটি আঙ্গুল দিয়ে বাজান হত। আর কোন পরিচয় আমরা পাই না।



কিন্নরী বীণা (১ম প্রকার)

কিন্নরী বীণাঃ দেবলোকের এক জাতিকে কিন্নর বলা হয়, সেই কিন্নরদের হাতের বাদ্যযন্ত্র বা কিন্নরদের আবিষ্কৃত বলেই যন্ত্রের নাম কিন্নরীবীণা বলা হয় এরূপ কিংবদন্তি আছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থে কিন্নরী বীণার নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি যে অতিপ্রাচীন ভারতীয় যন্ত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পের মাঝে এর আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালোরে বাসবাঙ্গুদির মন্দিরে কিন্নরীবীণা-বাদনরত মূর্তি আছে। এমন কি বাইবেল ধর্মগ্রন্থের (II Chronicles XX 28) অধ্যায়েও কিন্নর যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশে এখনও এই যন্ত্রটি বিদ্যমান। বাঁশের দান্ডির ওপর বারটি পর্দ্দা মোম দিয়ে জমান থাকে। দণ্ডটি তিনটি লাউয়ের ওপর বসান থাকে, মাঝের লাউটি অপেক্ষাকৃত বড়। যন্ত্রটিতে তিনটি তার থাকে তার মধ্যে একটি তার পর্দ্দার ওপর দিয়ে যায় ও বাকি দুটি তার পাশে রাখা থাকে, ছেড়ের কাজের জন্য। (প্রোঃ রামকৃষ্ণ কবির মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সঙ্গীতপণ্ডিত মতঙ্গ মুনি দ্বারা কিন্নরীবীণা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বীণার উপর সারিকা স্থাপন এঁর দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। মতঙ্গের কিন্নরীতে ১৪।১৮টি পর্দা রাখা হত। তিনটি তার থাকতো একটি বাজের ও দুটি চিকারীর)। রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে লেখা আছে যে এটি ছোট আকারের সেতার, এতে কচ্ছপীর মত চিকারীর তার ছাড়া পাঁচটি তার ব্যবহার করা হত। দান্ডি কাঠের হাঁড়িটি (ধ্বনিকোষ) কাঠ বা লাউয়ের বদলে নারিকেলের মালা থেকে বা উটপাখি জাতীয় কোন বড় জাতের পাখির ডিমের খোলা থেকে তৈরী করা হত। ধনী লোকেরা রূপা দিয়েও হাঁড়ি তৈরী করতেন। যন্ত্রটি খুব ছোট হওয়ায়

আওয়াজ ক্ষীণ। সেই কারণেই এই জাতীয় কিন্নরী বীণা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। লঘুকিন্নরী বীণার সঙ্গে রাজা ঠাকুরের আকার ব্যাখ্যার কিছুটা মিল পাওয়া যায় কিন্তু বৃহতীকিন্নরীর সঙ্গে এই আকার মেলে না। আমরা এখানে দুই রকমের কিন্নরীর ব্যাখ্যাই দিলাম ও দু রকম ছবিও আমাদের সংগ্রহ থেকে দিয়েছি। সঙ্গীত রত্নাকরে তিন প্রকার কিন্নরীর উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর



লঘু কিন্নরী বীণা (২য় প্রকার)

মিত্র মহাশয় তাঁর "মুঘল ভারতে সঙ্গীতচিন্তা" নামক পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় কিন্নরী বীণা সম্বন্ধে লিখেছেন—"সঙ্গীত শাস্ত্রে দেখা যায়, যন্ত্রটি বীণার মত, দণ্ডটি ঈষৎ বেশী লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকে। মুসলিম সমাজে যন্ত্রটি **কিঙ্গিরা** নামে পরিচিত ছিল। সঙ্গীত রত্নাকরে বর্ণিত তিন প্রকারের কিন্নরীর সঙ্গে প্রচলিত কিন্নরীর মিল দেখা যায় না। আমাদের ছবি দুটি পরে লেখা কিন্নরীর ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে। গ্রীস দেশে এটি **শম্বুকা** নামে খ্যাত। ইহুদিরা একে কিন্নর বলে থাকেন। এই কিন্নরী বীণার অনুকরণে চীন দেশে কীন্ যন্ত্রটি জন্ম নিয়েছে এরূপ শোনা যায়। চীনারা কীন্ যন্ত্রটি খালি হাতে বাজিয়ে থাকেন।

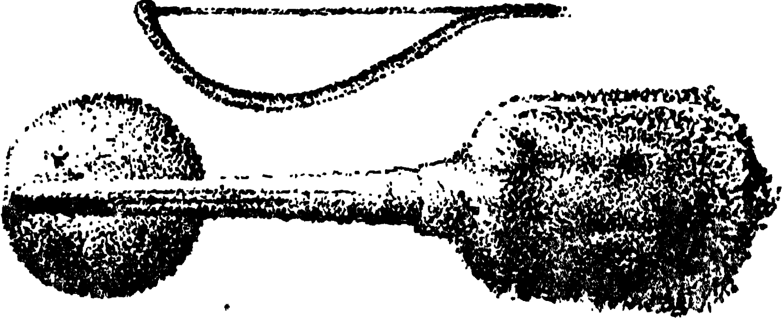


কিরাত বীণা

কিরাত বীণাঃ প্রাচীন কিরাতজাতীয়দের মধ্যে এই বীণা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়; চারটি কানে চারটি তার বাঁধা থাকতো। জওয়ার সাহায্যে বাজান হত। বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

কুর্মী বীণা বা কুর্ম বীণাঃ দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত তিরুমাকুদালুর মন্দির গাত্রে খোদিত ভাস্কর্যের মাঝে আমরা কুর্মী বীণার সন্ধান পাই। সঙ্গীত মকরন্দেও কুর্মী বীণার নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি ধনুস্তত যন্ত্র। এই প্রাচীন যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজান হয়। তিনটি তাঁতের তার থাকে। দেখতে

অনেকটা সারিন্দার মত। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত গ্রন্থেও কূর্মী বীণাকে ধনুর্যন্ত্র বলে প্রমাণ করা হয়েছে। রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে কচ্ছপী বীণার



কূর্মী বীণা বা কূর্ম বীণা

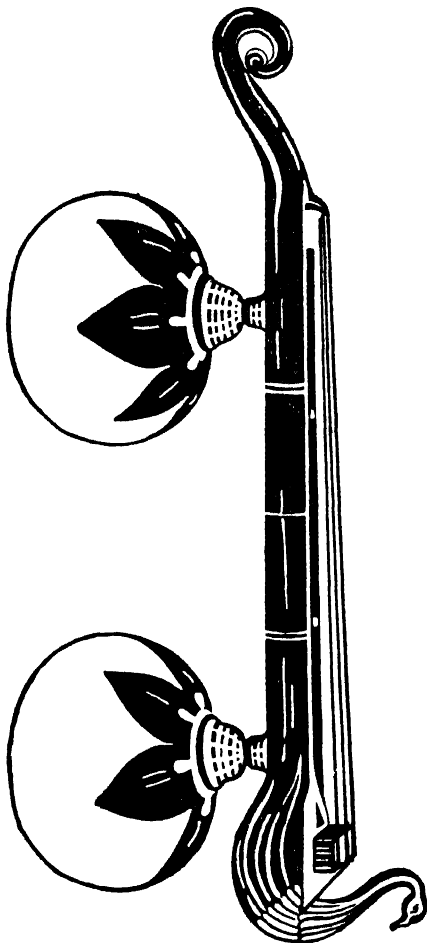
অনুরূপ বলা হলেও আমরা প্রাচীন গ্রন্থে কচ্ছপী ও কূর্মী নামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বীণার নাম দেখতে পাই। আমাদের কাছে কূর্মী বীণা ধনুস্তত গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র বলেই পরিচিত।

ক্ষোণী-বীণা : ঋক্ সংহিতায় এই বীণার নাম পাওয়া যায়। ঋক্ বেদের স্তোত্র গানের সময় ব্যবহৃত হত। আর কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

গতুবাদ্যম্ বা গটুবাদ্যম্ (মহানাটক বীণা)—দক্ষিণ ভারতেই গটুবাদ্যমের জন্ম ও প্রচলন। গটুবাদ্যম্ শব্দটি তামিল ভাষার একটি শব্দ। কড়ু বলে একটি তামিল শব্দ আছে যার অর্থ কাঠি। এই কড়ু শব্দটির সাথে বাদ্যম শব্দটি মিলে কড়ু-বাদ্যম্ শব্দ থেকেই কটুবাদ্যম ও পরে গটুবাদ্যম্ শব্দটি আসে বলে তামিল ব্যাকরণে লেখা আছে। মনে হয় যন্ত্রটি প্রথম আবিষ্কারের সময় কেবলমাত্র কাঠি দিয়েই বাজান হ'ত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে কোথাও আমরা গটুবাদ্যম্ যন্ত্রটির নাম শুনতে পাই না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বাজনাটি গতি-বাদ্যম্ নামে দেখতে পাই। তাঞ্জোরের পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক দ্বারা ১৭শ শতাব্দীতে লেখা "শৃঙ্গার সাবিত্রী" নামক পুস্তকে লেখা আছে যে তম্বুর মুনি গতিবাদ্যম্ যন্ত্রটির স্রষ্টিকর্তা এবং তিনি এটি ব্রহ্মার সভায় বাজাতেন। আমাদের ধারণা উত্তরভারতের বীণার অনুকরণে এটি জন্ম নেয়, তবে বিচিত্র বীণা বা বাট্টা বীণের বাজটি উত্তরভারতে কতদিন

চালু হয়েছে সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না। আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীনিবাস রাও গটুবাদ্যম্ যন্ত্রটি প্রচলিত করেন। তাঁর পুত্র সখারাম রাও মহাশয়ও এই যন্ত্রটিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। কাবেরী নদীর ধারে তিরুভিদাই-মারুতুর গ্রামে এঁদের বাস ছিল। অনেকের ধারণা যে রাও বংশই এটির আবিষ্কারক। আমাদের ধারণা তাঁরা এই যন্ত্রের সুবাদক ও প্রচারক ছিলেন মাত্র। প্রথম আবিষ্কারকের নাম আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। মহীশূর রাজ্যের সভাবাদক নারায়ণ আয়েঙ্গার স্বামী এই যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ও এটিকে তিনিই বেশী জনপ্রিয় করে তোলেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গারই প্রথমে এই যন্ত্রটির নাম **মহানাটক বীণা** রাখেন বলে জানা যায়। যন্ত্রটির ধ্বনি আমাদের বিচিত্রবীণার থেকেও গম্ভীর ও সুডৌল।

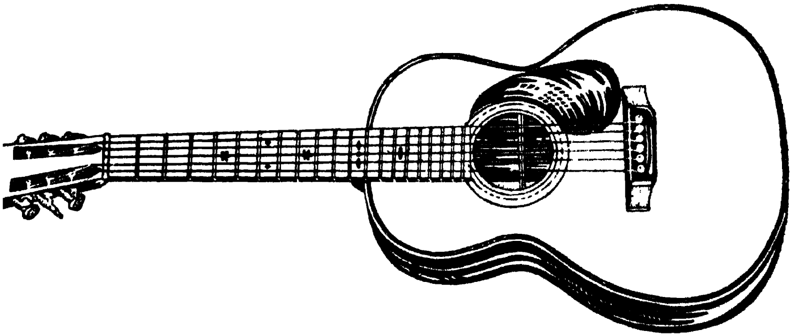


গটু-বাদ্যম্

এই বীণার পটরীতে কোন পর্দা থাকে না। অন্যান্য বীণার থেকে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি পর্দাবিহীন। এতে ছয়গাছা প্রধান তার থাকে এবং তরফদার সেতারের কায়দায় প্রধান ধ্বনিসেতুর নীচে রাখা একটি পাতলা ছোট সেতুর ওপর দিয়ে ক'এক গাছা তরফের তার রাখা হয়। একটি শিং বা কাঠের টুকরা বাঁহাতে ধরে (বাট্টা বীণ অথবা গীটারের কায়দায়) তারের ওপর ঘষে এবং ডানহাতে মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করে স্বর প্রকাশ করা হয় এবং এই ভাবেই

সমস্ত সময় বাজান হয়ে থাকে। অন্যান্য দক্ষিণী বীণাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সমস্ত অলংকার, আলাপ ও তান ইত্যাদি প্রকাশ করা যায় সে সমস্তই এতে প্রকাশিত হয়। দ্রুত লয়ের সরগম, কোন গৎ তোড়া বা তান এতে বাজান কঠিন, তাই যন্ত্রীরা এসব এড়িয়ে চলেন। এই যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত বাদক প্রায় দেখা যায় না। সমগ্র যন্ত্রটি যখন আগাগোড়া একটি কাঠে তৈরী করা হয়, তখন এই যন্ত্রকে **"একপাদ গটুবাদ্যম্"** বলা হয়। সাধারণত এই যন্ত্রের মাথা, হাঁড়ি ও দান্ডি ভিন্ন ভিন্ন কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। যন্ত্রটি সামনে শুইয়ে রেখে ডান হাতে মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করার সাথে সাথে বাঁ হাতে ধরা কাঠের গোল টুকরা দিয়ে তারের ওপর ঘষে বাজান হয়ে থাকে। যে কাঠটি দিয়ে ঘষে বাজান হয় তামিল ভাষায় সেটিকে কত্তাই, উরুতাই বা কুঝভি বলা হয়। ইংরাজীতে এটিকে স্লাইডার ও বাংলাতে স্বর-চালক বলা হয়। প্রাচীন **পিচোলা বীণার** অনুকরণ বলে মনে করা হয়।

গাত্রবীণা—এই বীণা আসলে কোন বাদ্যযন্ত্র নয়। এটি শরীরজ। কণ্ঠনিঃসৃত স্বরধ্বনি-প্রকাশক দেহ-যন্ত্রকেই গাত্রবীণা বলা হয়।



গীটার

গীটার (হাওয়াইয়ান)—ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণাই গীটারের আদিপুরুষ। ডক্টর বর্ণী সাহেবের ইতিহাসে লেখা আছে যে 'গীটার' এই নামটি প্রথম আরব দেশেই পাওয়া যায়। ভারতের ত্রিতন্ত্রী বীণা পারস্যে সেতার নাম ধারণ করে, সেই সেতার আরবদেশে কিঞ্চিত অবয়ব ভেদে গীটার নাম পায়। মুর জাতিরা যখন স্পেন অধিকার করে সেই সময় থেকেই গীটার স্পেনে চালু হয় এবং স্পেন

থেকে Spanish Guitar বা Regular Guitar নামে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। Encyclopeadia Americana. International Edition Vol. 13, 1966—"Probably derived from Kithara, it was introduced by the Moors about 1300. Earliest Guitar was of 4 Strings. In 1554 a fifth string was added and this instrument was known as Spanish Guitar."

ওপরের লেখাটিতে আমরা দেখতে পাই যে আদিতে গীটার কিথারার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল এবং এতে চারটি তার ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা আছে যে স্প্যানিশ শিল্পী এণ্টোনিও টরেস ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান আকারের গীটার চালু করেন—অবশ্য এ উক্তি স্প্যানিশ গীটার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। "The Guitar in its modern form was introduced by the Spanish maker Antonio Torres in the mid 19th Century —Encyclopeadia Britanica Vol. 10. 1966 edition."

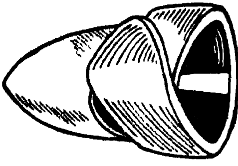
তেরশো শতাব্দির আগে ইউরোপে গীটার নামের কোন বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৭০০ শতাব্দী থেকে এটি স্পেনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ইটালি ও স্পেন থেকে এটি ব্রিটেন ও পরে আমেরিকাতে প্রচলিত হয়। Antonio Torres-এর আগে ১৫৫১-১৬৬৪ খৃঃ নাগাদ আমরা Vincente Espinel নামে একজন স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাচ্ছি। গীটারে পঞ্চম তারটি তিনিই প্রথমে যুক্ত করে একে জনপ্রিয় করেন ও স্পেনের জাতীয় যন্ত্রের মর্য্যাদায় এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। "The International Cyclopeadia of Music & Musicians, Ninth Edition, 1964, page 858—According to Lope-de-Vega and other Spanish writers—The Musician and Novelist Vincente Espinel 16th century added a fifth string to the guitar thus transforming it into spanish Guitar." এনসাইক্লোপিডিয়া এমেরিকানাতেও আমরা পাচ্ছি যে ১৫৫৪ খৃঃ চার তারের গীটারে আর একটি তার যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোন নাম লেখা নাই।

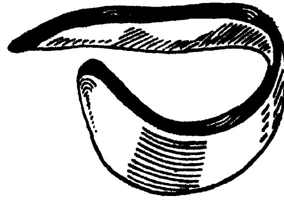
এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে ভারতের ত্রিতন্ত্রী পারস্যে গিয়ে চারতারের যন্ত্র হয়েছিল, সেখান থেকে স্পেনে গিয়ে পাঁচতারের যন্ত্র হয়েছিল এবং বর্তমানে সে ছয়তারবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য

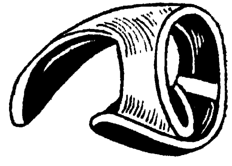
বিষয়টি হল হাওয়াইয়ান গীটার। স্প্যানিশ গীটার থেকেই এর উৎপত্তি। হাওয়াই দ্বীপে এর প্রথম প্রচলন শুরু হয় বলেই এটির নাম হাওয়াইয়ান গীটার। এই হাওয়াইয়ান গীটারকে ষ্টীল-গীটারও (Steel Guitar) বলা হয়।

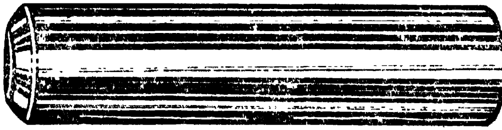
The World Book Encyclopeadia, Vol. 9, Chapter Hawaii Page 98 B (50th Aniversary edition 1966)—"The Hawaiian Steel Guitar was invented by **Joseph Kekuku** a Hawaiian Musician about 1895" আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৮৯৫ খৃঃ নাগাদ হাওয়াইয়ান গীটার হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ **জোসেফ কেকূকূ** নামক ব্যক্তিই উদ্ভাবন করেন। সুতরাং যন্ত্রটির বয়ঃক্রম মাত্র ৭৯।৮০ বৎসর হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যন্ত্রটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা হাল্কা ধরণের বাংলা গান এতে বেশ সুন্দর শোনায়। এই যন্ত্রে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের নানা অলঙ্কার প্রকাশ করা খুব কঠিন হওয়ায় সাধারণত রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাজাতে শোনা যায়। অনেকে এতে গৎকারীর কাজ করার চেষ্টাও করেন। সেতার সরোদের ঢিমা বা মধ্যলয়ের গৎগুলি এতে ভালই শোনায়, বোলের কাজ সুন্দরভাবে প্রকাশ করা খুব কঠিন, অধিকাংশ সময়েই রুক্ষ শোনায় এবং গীটারের স্বাভাবিক স্বরমাধুর্য্য নষ্ট হয়। স্বরকম্পন ও মীড়ের কাজ এতে অপূর্ব শোনায় এবং এইটি এই যন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রটি উপযুক্তভাবে নিজের দখলে আনতে হলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে (Western method বা Process) হাত তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। হাওয়াইয়ান কায়দা (Hawaiian Technique) শেখা এবং কর্ড, হারমণি প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ, তবেই গীটারে গান বাজান সহজ ও মধুর হবে এবং যন্ত্রটি ভালভাবে দখলে আসবে।

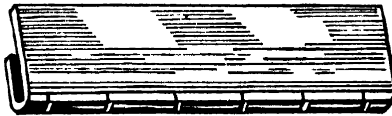
গীটারের বিভিন্ন অঙ্গ : (১) **হাঁড়ি (Belly** বা **Drum)** শুদ্ধ ভাষায় একে ধ্বনিকোষ বলা হয়। (২) **দাণ্ডি Finger Board or Neck** বাংলায় এর নাম অঙ্গুলি-পট্টক বা সারিকা স্থান। (৩) ড্রাম বা বেলির চার পাশের **রিবস্** বা **সাইডস্ (Ribs or Sides)**। ফাঁপা হাঁড়ির তলার ও উপরের তবলির কাঠের সঙ্গে রিবস্ জোড়া থাকে। হাঁড়ির চার ধারের পাতলা কাঠকেই রিবস বলা হয়। (৪) **ব্রীজ (Bridge)** বাংলায় একে **ধ্বনিসেতু** বলা হয়। সেতুর শেষ প্রান্তে রাখা বোতামগুলিতে সমস্ত তারের গোড়া বাঁধা থাকে। (৫) **গার্ড-প্লেট (Guard Plate)** তবলির উপর এই কাঠের 'রক্ষণ-পটি' তবলির কাঠের অবক্ষয় রোধ করে। (৬) **সাউণ্ড-হোল (Sound-**


ফিঙ্গার পিক


থাম্ব পিক


ফিঙ্গার পিক


ষ্টীল বা রোলার বার (স্বর-চালক)


এক্সটেনসন্ নাট্

Hole) হাঁড়ি ও দানডির সংযোগস্থলের কাছে গোলাকার বড় ছিদ্রটিকে সাউণ্ডহোল বলে, এটিকে আমরা ধ্বনিছিদ্র বলি। এটি বায়ু-তরঙ্গে ধ্বনি-প্রসারণে সাহায্য করে। (৭) **ফ্রেট (Fret)** দান্ডির উপর কুড়িটি পিতল ব্রোঞ্জ বা সিলভাবের সরু লাইন কিছু পর পর গাঁথা থাকে, সেগুলিকে ইংরাজীতে ফ্রেট ও বাংলায় পর্দা বলা হয়। (৮) **পজিসন মার্ক্স (Position Marks)** দান্ডিতে ছোট ছোট বোতামের আকারে ঝিনুকের স্থান-চিহ্নগুলিকে পজিসন মার্কস বলা হয়। (৯) **পেগ বক্স (Peg Box)** দান্ডির মুক্ত-প্রান্তস্থিত চ্যাপ্টা জায়গাটিতে Peg box অর্থাৎ চাবী-ঘর থাকে। চাবি ঘরের দু পাশে সমস্ত চাবি রাখা থাকে। (১০) **মেটাল বা রেস্‌ড্ নাট (Metal বা Raised Nut)** চাবির নীচে এর যে পদার্থটির উপর দিয়া চাবিতে জড়ান তারগুলি ব্রাজের দিকে যায় সেই পদার্থটিকে Raised Nut বলে, আমরা চলতি ভাষায় এটিকে আড়ি বলি। (১১) **ষ্ট্রীংস্ (Strings)**

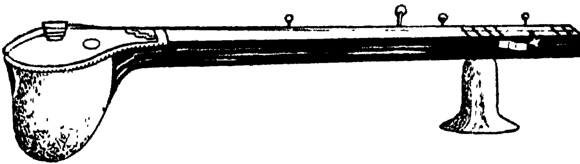
তার ঃ চাবিঘরে যে ছটি কান রাখা থাকে সেই কানের সঙ্গে ছটি তার বাঁধা থাকে। নীচে তারগুলির নাম ও কোনটি কোন স্বরের সহিত মিলান হয় দেখুন ঃ

বাঁ দিক থেকে প্রথম তার 1st String 'ই', 'E' স্বরের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

	"	দ্বিতীয়	"	2nd	"	'সি', C♯	"	"	"	"
	"	তৃতীয়	"	3rd	"	'এ', A	"	"	"	"
"	"	চতুর্থ	"	4th	"	'ই', E	"	"	"	"
"	"	পঞ্চম	"	5th	"	এ, A	"	"	"	"
"	"	ষষ্ঠ	"	6th	"	'ই', E	"	"	"	"

(১২) **স্লাইডার (Slider)** বিশুদ্ধ লোহায় নির্মিত স্বর-চালককে ইংরাজীতে স্লাইডার বলা হয়। বাঁ হাতে slider তারের উপর স্বল্প চাপ দিয়ে ধরে এবং তারের উপর ঘসে ডান হাতের আঙ্গুলে পরা **Pick** অর্থাৎ অঙ্গুলিত্রের আঘাতে যন্ত্রটি বাজান হয়।

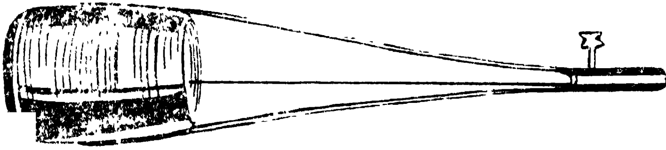
(১৩) **এক্সটেনসন্ নাট্ (Extension Nut) :** এই নাট্‌কে হাওয়াইয়ান নাট্ বা এডাপ্টার (Adaptor) বলা হয়। স্প্যানিস গীটারকে হাওয়াইয়ান গীটারে রূপান্তরিত করতে এই নাট্ সাহায্য করে।



গেটু-বাদ্যম্

গেটুবাদ্যম্ বা গেতুবাদ্যম্ ঃ দক্ষিণ ভারতের এক অভিনব বাদ্যযন্ত্র। এটি দু'ফুট লম্বা সাধারণ তানপুরার আকারের একপ্রকার তত যন্ত্র। যন্ত্রটিকে বাজিয়ের সামনে শুইয়ে বাজান হয়। যন্ত্রটি সমানভাবে শুইয়ে রাখার কারণে দানডির মুক্ত প্রান্তের পেছন দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের দিকে একটি ঠেকনা

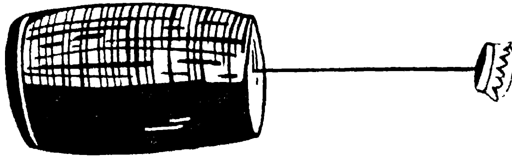
থাকে। এই সভ্য যন্ত্রটি অনুগতসিদ্ধ। যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য তারে বাঁধা যন্ত্র হয়েও এটি গানের সঙ্গতে তাল দেওয়ার জন্ম ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি দুহাতে দুটি বাঁশের হালকা (পাতলা) কাঠি দিয়ে বাজান হয়। ক্বচিৎ একে মৃদঙ্গের সঙ্গে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে এককভাবেও বাজতে দেখা যায়। একক বাদনের সময়ে বাঁ হাতের কাঠিতে তালে তালে ঘা দিয়ে ডান হাতের কাঠিতে মৃদঙ্গের অনুকরণে বোলের কাজ দেখান হয়। যন্ত্রটি শ্রুতিমধুর, এতে চারগাছা স্টীলের তার থাকে এবং বাজাবার সময় মাঝে মাঝে চারটি তারে একসঙ্গে আঘাত করা হয়।



গোপীযন্ত্র

গোপীযন্ত্র ঃ এই তারযন্ত্রটি আঙুলের ঘায়ে বাজান হয়। এটি গ্রাম্য যন্ত্রবিশেষ। বাউল ও ভিখারীরা এই যন্ত্র তাঁদের গানের সঙ্গে বাজান। একতারা, আনন্দলহরী, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি সরল ও সাধারণ। প্রাচীন কালে সাধারণ লোকের প্রয়োজনে এই যন্ত্রগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে কবে কোন মহাজন কোন যন্ত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তার সঠিক হদিস পাওয়া যায় না। আনন্দলহরীর মত এটিও ঢোলাকৃতির। কাঠের বদলে লাউয়ের খোলাতে হাঁড়ি (অর্থে ধ্বনিকোষটি) তৈরী হয়। শুকনো লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হয় বলে অনেকে এই যন্ত্রটিকে **লাউ** বলে থাকেন। একই গোপীযন্ত্রকে দুই তিন আকারে দেখা যায়। **লাউ**-গুলির হাঁড়ির পেট (মধ্যস্থল) বেশী গোলাকার ও হাঁড়ির খাড়াই কম থাকে। কোনও কোনও লাউযন্ত্রের তলদেশ চামড়া দিয়ে ছাওয়া থাকে না, গোলাকার লাউটির তলদেশে একটি ছিদ্র করে সেটির মাঝখান দিয়ে তার নিয়ে এসে মুক্তপ্রান্তে রাখা দান্ডির কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। লাউ বা গোপীযন্ত্র, উভয় যন্ত্রের দান্ডিই একটি সরু বংশদণ্ড অর্থে কন্‌চির মুক্তপ্রান্তের ছ-সাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে চার ভাগ ক'রে চিরে তার দুভাগের দুটি পাশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকি দুভাগের শেষ প্রান্ত

দুটি খোলের দুপাশে যুক্ত করা হয়। গোপীযন্ত্রের খোলের তলদেশ চামড়ায় ঢাকা থাকে এবং উর্ধ্বমুখটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে। তলদেশের চামড়ার ঢাকার মধ্যস্থলে ছিদ্রের সাহায্যে বাদিত তারের গোড়াটি চামড়ার ঢাকার মুক্তপ্রান্তে একটি কাঠের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা থাকে। এই তারের আগাটি দান্ডির মুক্তপ্রান্তের অখণ্ড অংশে একটি কাণের সাহায্যে বাঁধা থাকে। একতারার মত এটিতেও একটিমাত্র তার থাকে। অনেকে এই যন্ত্রকে **গোপীচান্দ** বা **খমক** বলে থাকেন।



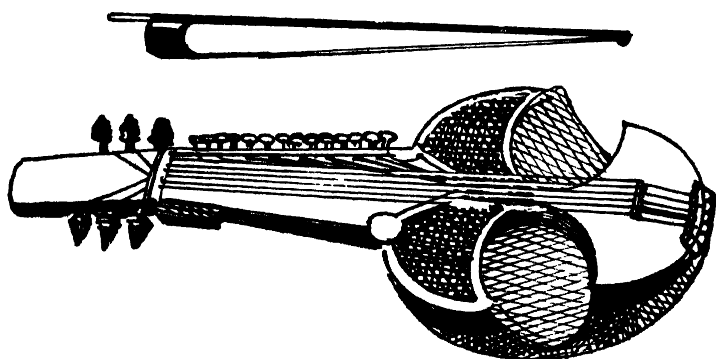
গুবগুবি বা আনন্দ লহরী

গুবগুবি বা আনন্দ লহরীঃ চল্‌তি নামের গাবগুবাগুব বা গুবগুবি আনন্দ লহরী বলেই পরিচিত। এটি গ্রাম্য যন্ত্র। সারি জারি প্রভৃতি গ্রাম্য গান ও ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে সঙ্গতে একে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে এই যন্ত্রটিকেও অনেকে **খমক** বলে থাকেন। অনেকে গোপী যন্ত্রকেও গমক বলেন একথা গোপী যন্ত্রের কথায় লিখেছি। অন্ধ্র প্রদেশের **জামিদাইক।** উত্তর প্রদেশের **ধুন-ধুনাওয়া,** মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার **চৌধকী** প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রগুলিও আনন্দ লহরীর সমজাতীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশজাত একই ধরণের যন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ সামঞ্জস্য থাকলেও আকারে সামান্য সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। ধ্বনিমাধুর্যে এবং ধরবার ও বাজাবার কায়দায় কোন প্রভেদ নাই। আনন্দ লহরীর ধ্বনিকোষটি (হাঁড়িটি বা খোলটি) আধহাত লম্বা একটি শূন্যগর্ভ কাঠের বা মাটির খোলের (প্রায় ছোট একটি ঢোলের আকারের) এক দিকের শূন্যমুখটি চামড়া দিয়ে ঢাকা হয় ও অপর দিকটি উন্মুক্ত অর্থাৎ খোলা বা ফাঁকা থাকে। এই খোলামুখটি উপর দিকে রাখা হয়। তলদেশের চামড়ার বাহির পিঠে ফুটো করে তার মাঝ দিয়ে তার নিয়ে আসা হয়। তারের গোড়াটি ফুটোর পিছনে একটি কাঠের টুকরার সঙ্গে, বাঁধা থাকে। ওপরের খোলা মুখের কিছু উঁচুতে ঐ তারের আগাটি একটি কাঠের ভাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। হাঁড়িটি বাঁহাতের বগলে চেপে ধরে বাঁহাত দিয়েই মুক্ত প্রান্তে রাখা কাঠের ভাণ্ডটিকে জোরে টেনে ধরে, ডানহাতে শলাকা দিয়ে

আঘাত করে স্বর প্রকাশ করা হয়। বাঁহাতের টানের কমবেশীতে প্রকাশিত স্বরের বিচিত্রতা ঘটান হয়। বলা বাহুল্য যে এই যন্ত্রে কেবল একটি মাত্র তারই রাখা হয়।

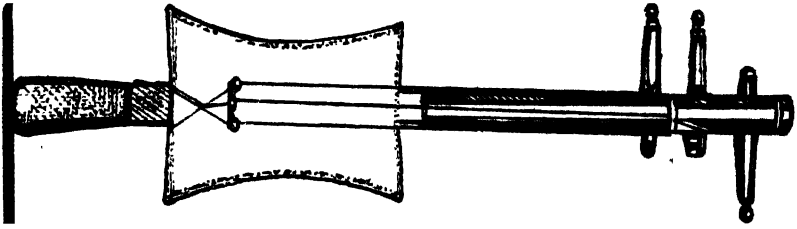
ঘীচক ঃ একপ্রকার প্রাচীন ধনুর্যন্ত্র বিশেষ। বর্তমানে লুপ্ত। সঠিক আকারের বিবরণ পাওয়া যায় না।

ঘোষবতী বীণা ঃ ১৭৮৭ খৃঃ প্রকাশিত 'বাদ্যপ্রকাশ'-এর মতে এই বীণায় ৯টি তার থাকতো। ঘোষবতী সঙ্গীত মকরন্দে ও যামলতন্ত্রে ঘোষাবতী নামে পরিচিত। সঙ্গীত রত্নাকরে কিন্তু একে ঘোষবতীই বলা হয়েছে। কোনখানেই নাম ছাড়া আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

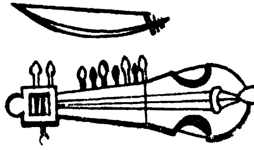


চন্দ্র সারঙ্গ

চন্দ্র সারঙ্গ ঃ চলতি ভাষায় এটিকে **"চাঁদ সারেঙ্গ"** বলে। সব বিষয়েই এটি সারিন্দার অনুরূপ। প্রসিদ্ধ সরোদবাদক উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ হায়াত আলি খাঁ এই যন্ত্রটি আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নির্দেশমত তৈরী করেছিলেন। পূর্বে সারিন্দায় কেবলমাত্র তাঁতের তার ব্যবহার করা হত। কিন্তু চাঁদ সারেঙ্গ-এ চারটি তারের ক্ষেত্রেই ধাতুনির্মিত তার ব্যবহার করা হয় ও কোন কোন যন্ত্রে তরফের তারও দেওয়া হয়। বাজের কায়দা অবিকল সারিন্দার মত। যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজান হয়। গানের সঙ্গতেই এর ব্যবহার বেশী। এটি অনুগতসিদ্ধ ধনুস্তত যন্ত্র; ক্বচিৎ একে স্বতঃসিদ্ধ সভ্য যন্ত্ররূপে এককভাবেও বাজতে শোনা যায়।



চিকারা (১ম প্রকার)



চিকারা (২য় প্রকার)

চিকারাঃ তত জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। ছড় দিয়ে বাজান হয়। এই যন্ত্রে যে তিনটি তার খাটান হয় সেগুলি ঘোড়ার লেজের চুল থেকে (বালামচি পাকিয়ে) তৈরী। সাধারণত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকে। দুরকমের চিকারা দেখা যায়, তবে বর্তমানে এই যন্ত্র প্রায় লুপ্ত।

চৌতারাঃ তত জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। দোতারার মত এতেও চারটি তার থাকে। জওয়া দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত। অনেকে বর্তমানে প্রচলিত দোতারার সঙ্গে তুলনা করে উভয় যন্ত্রই এক এরূপ বলে থাকেন।

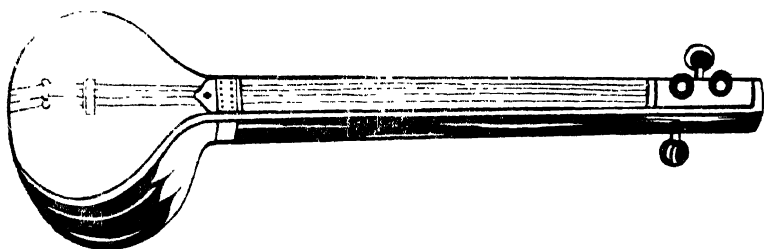


ঠুনঠুনে

ঠুনঠুনেঃ এই যন্ত্রটিকে অনেকে দোতারা বলে থাকেন, কারণ এটিতে দুটি তার থাকে। ঠুনঠুনায় দুটি তার থাকলেও দোতারার সঙ্গে এর আকারে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। **'তন্তুনা'** এই সংস্কৃত শব্দ থেকেই **টুনটুনা**, ঠনঠনা, ঠুনঠুনা প্রভৃতি শব্দ জন্ম নিয়েছে। এর খোল লাউয়ের বদলে কাঠে তৈরী হয়। এতে দুটি কাণ থাকে এবং একই স্বরে দুটি তার দুটি কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

মহারাষ্ট্রেও এটি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে এর নাম **টুনটুনে**। বাংলাদেশেও একে অনেকে টুনটুনে বলেন। মাদ্রাজে এটি **ঠনঠনা** বলে প্রচলিত। এইসব দেশে সাধারণত ভিক্ষুকেরাই এই যন্ত্রের সাহায্যে গান গেয়ে ভিক্ষা করে থাকে। দক্ষিণভারতে অনেকে এটিকে **তুনতিনা** বলে থাকেন। মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে তুনতিনাতে কেবলমাত্র একটি তার রাখা হয়।[১] আকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

তুম্বরী : প্রাচীন তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তানপুরার মতই। যন্ত্রটি খয়ের কাঠের তৈরী। এতে আট মুষ্টি লম্বা দানডি রাখা হত। সওয়ারী আধ আঙ্গুল উঁচু, যেটি দানডির নীচের দিকের এক আঙ্গুল মাপের ফুটোর সঙ্গে, চার আঙ্গুল বেড় দিয়ে জড়িয়ে দানডির সঙ্গে বাঁধা থাকতো। এই বেড়কে শক্ত করার জন্যে, রূপার আংটা দেওয়া হত। দানডির নীচের দিকে ছ' আঙ্গুল ওপরে একটি তুম্ব রাখা হত। দানডির ছাব্বিশ আঙ্গুল ওপরে আর একটি তুম্ব মুক্ত প্রান্তের দিকে রাখা হত। লেজাডির সঙ্গে তিনটি তার বাঁধা হত। একটি তাঁতের তার (ছাগ অন্ত্রের) ও বাকী দুটি রেশমের সুতার তার। আজকের তানপুরা এই তুম্বরী থেকে এসেছে বলে আমাদের ধারণা।[২]



তুম্বুরু বীণা বনাম তানপুরা

তুম্বুরু বীণা বনাম তানপুরা : অতি প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের নামের তালিকার মধ্যে আমরা তুম্বুরু নামে খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নাম দেখতে পাই। তানপুরা উক্ত তুম্বুরু নামক গন্ধর্বের আবিষ্কার, এরূপ কিংবদন্তি আছে। স্যার গার্ডনার উইলকিন্‌সন্ প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা যে যন্ত্রটির উৎপত্তি মিশর দেশে। মিশরের হাইরোগ্লিফিক কায়দায় লেখার ছবি থেকে তাঁরা প্রমাণ করতে

১. Sruti Vadyas—By P. Sambomoorthy B. A., Page 23.
২. হরিনারায়ণ কৃত—সঙ্গীতসার

চেয়েছেন যে খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বচর আগে মিশরে এই যন্ত্রটির প্রকাশ ঘটে। কেবল মাত্র একধরণের ইজিপ্সিয়ান কঠিন ছবি-লেখ থেকেই প্রমাণ করা যায় না যে যন্ত্রটি সেই দেশেই ছিল এবং সেটি অন্য কোন দেশে তার আগে ছিল না বা অন্যদেশ থেকে এরূপ যন্ত্র সে দেশে আনা হয় নি। আদিম মিশরীয়েরা কেউ এই যন্ত্র ব্যবহার করেন না। মিশরে বসবাসকারী গ্রীক, আর্মেনিয়ান, তুর্কি প্রভৃতি দেশের লোকেদের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। পার্সিয়া, টার্কি, এরেবিয়া প্রভৃতি দেশে তুম্বুরার প্রচলন রয়েছে। এইসব তানপুরায় পর্দা ও বেশীসংখ্যক তারের ব্যবহার দেখা যায়। এইসব তানপুরায় ছয় থেকে দশগাছা তারের ব্যবহার এবং দানডির পটরির উপর পচিশ থেকে পঞ্চাশখানি পর্যন্ত পর্দা ব্যবহার লক্ষ্যে পড়ে। এরেবিয়ার প্রাচীন গ্রন্থেও তম্বুর নাম পাওয়া যায়। সুতরাং যন্ত্রটির আদি উৎপত্তিস্থল মিশরদেশে একথা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অতীতে এই ভারত বহুপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। আমাদের ধারণা যে এই যন্ত্রটি ভারত থেকেই মিশরে, গ্রীসে ও রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রোমে হাড্রিয়ানের সময়ে দুই ও তিন তার বিশিষ্ট তুম্বুরার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[১] এই তুম্বুরা জওয়া (Plectrum) দিয়ে বাজান হত। এই ধরনের বহুপ্রকারের লম্বগ্রীব বাদ্যযন্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল। হয়ত কালের প্রভাবে এর আকারে কিছু রদবদল ঘটেছে। পণ্ডিতদের অনেকের ধারণা যে আমাদের প্রাচীন বল্লকী বীণাই তানপুরার আদি জননী। আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি না যে বল্লকী বীণাই তানপুরা ছিল। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষ নামক গ্রন্থটিতে এরূপ লিখিত হয়েছে যে রাশিয়ার ত্রেকোণা হাঁড়ির লম্বগ্রীব 'ব্যালালাইকা' যন্ত্রটি তানপুরার অনুকরণেই নির্মিত।[২]

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ) ১ম সংস্করণ, ৩৭৩ পৃঃ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেছেন তুম্বুরু নামক গন্ধর্বের নাম তানপুরার সঙ্গে জড়ান থাকলেও তুম্বুরুর অভ্যুদয় কাল ২য় থেকে ৭ম শতাব্দির মধ্যে বলে মনে হয়। তুম্বীবীণার উল্লেখ (খৃঃ পূঃ ৩০০—২০০) অর্থাৎ মহাভারত-হরিবংশের সময়েও পাওয়া যায়। অতএব তানপুরা

১. Music Through The Ages—Edited by Elizabeth E. Rogers E. D. P. Third edition. Newyork, 1946. Chapter, Music of the Greeks & Romans. Page 95. "......... there was in Hadrian's time a Tamboura. the plucked lute of two or three strings."

২. "The three Cornered Balalika of Russia is also related with Tambura"—International Cyclopeadia of Music & Musicians.

তুম্বুরু মুনির অভ্যুদয় কালেরও আগে ছিল। অনেকের অভিমত খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে (খৃষ্টীয় ২য়-৫ম-৭ম শতাব্দী) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্ত্রী তুম্বুরুর নামের সঙ্গে তুম্বী বীণাটিকে সম্পর্কিত করে তুম্বুরু বীণা তথা তানপুরার নাম ভারতীয় সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতের স্বপক্ষে এখনও কোন ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি।

আগের দিনে এই তুম্বুরুকে কিন্নর বলা হত।[১] এরেবিয়াতে একে **পাণ্ডোরা** বলা হত। প্রাচীন-বীণাদের ছবি বা সঠিক রূপবর্ণনা না থাকায় আমরা অতীতের সকল বীণার যথাযথ রূপ দিতে পারছি না। আমাদের তানপুরা চাঙ্গুরা (changura), তামপুর (Tumpur) এবং তানবুর (Tanbur) নামেও প্রচলিত।[২]

দক্ষিণ ভারতে পুদুকোটে শহরে প্রাচীন তিরুমায়াম মন্দিরে তুম্বুরার নিদর্শন মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে এই তুম্বুরার আর একটি নাম **কলাবতী**। কলাবতী নামটি তুম্বুরার শাস্ত্রীয় (classical) নাম।

এই তম্বুরা নামটি অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ইটালিয়ান Side Drum এবং Bass Drum-কে **তাম্বুরো** (Tamburo) বলা হয়। পাশ্চাত্যে আর এক ধরণের Drum-কে **তাম্বুরিন** (Tamburin) বলা হয়। ককেশাসে **তামপুর** নামে তিনতারযুক্ত এক প্রাচীন চর্মযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। এইভাবে তুম্বুরার নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে এটা তানপুরা নামেই প্রচলিত। হিন্দিতে একে **তাম্বুরে, তম্বুরা** অথবা **তম্বূরা** বলা হয়।

এবার তম্বুরার ব্যবহারিক বিষয়ে বলবো। গান বা বাজনার সময় স্বর-বিশ্রাম না হয়ে যাতে সব সময় সুরের গোলভাব অর্থাৎ জমাট ভাব বজায় থাকে ও মূল গ্রামিক স্বরটির সাহায্য পাওয়া যায় সেইজন্য গান বা বাজনার পশ্চাতে সুরের স্থায়ী জমি (Back ground) তৈরী রাখার জন্য এর ব্যবহার। তানপুরা বাজালে গায়কের স্বরবিচ্যুতির আশংকা কম। এটি অনুগতসিদ্ধ ও সভ্য যন্ত্ররূপে পরিচিত।

১. Studies in Oriental Musical Instruments [1st Series] 1031, Page no. 10. by Henry George Fermer.

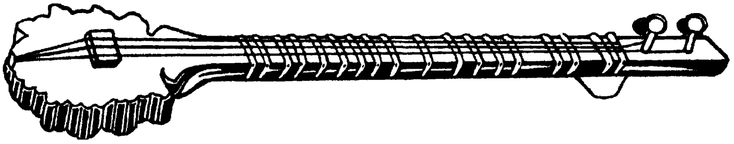
২. The International Cyclopedia of Music & Musicians Oscar Thompson, 9th Edition, Newyork, 1964.

তানপুরার হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ বা খোল) তিতলাউয়ের শুকনো খোলায় এবং দান্ডি, পটরি, তবলি প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। সেগুন, তুঁত, গাম্ভার কাঠই প্রশস্ত, কাঁঠাল আম বা পিয়ারশাল কাঠেও তৈরী হয়ে থাকে। তবলির ওপর একটি তন্ত্রাসন—অর্থে সওয়ারী (Bridge) থাকে এবং হাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝে তার বাঁধার জন্য একটি তেকোণা ফলক—অর্থে পন্‌থি থাকে। দান্‌ডির মুক্ত প্রান্তে চারটি কাঠের তৈরী কীলক—অর্থে কান থাকে। এই চারটি কানে চারটি তার বাঁধা থাকে। জানা যায় যে উচ্চ, গম্ভীর ও স্নিগ্ধ এই তিন পৃথক ধ্বনির কারণে তানপুরায় আদিতে তিনটি তার রাখা হত।[১] অনেকে বলেন তুম্বুরা স্রষ্টা তুম্বুরুর চারটি মুখ ছিল এবং সেই কারণে আদিতেই এতে চারটি তার রাখা হত। তুম্বুরুর চারটি মুখ ছিল সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এটি উচিত বিবেচিত হয় না। জানা যায়, তুম্বুরুর আবির্ভাবের আগে থেকে তানপুরা প্রচলিত ছিল।

অনেকে ছয়তার যুক্ত ছয় কাণের তানপুরাও ব্যবহার করেন। তানপুরার তারগুলি লেজাড়ির ফাঁসে পন্‌থির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রীজের ওপর দিয়ে দান্‌ডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা থাকে। চার তারের তানপুরার ২নং ও ৩নং তার দুটি লোহার তার। এই দুটি নিজের কণ্ঠস্বরের উচ্চতার পরিমাপে খুশিমত (scale) স্কেলে মুদারার ষড়্‌জের সঙ্গে মেলান হয়। ১নং পিতলের তারটি উদারার পঞ্চমে বা মধ্যমে ও ৪নং পিতলের বা ব্রোঞ্জের তারটি উদারার ষড়জের সঙ্গে মেলান হয়। যন্ত্রের আকার ও স্বরের উচ্চতা বা নিম্নতানুযায়ী (according to pitch) উপযুক্তমত (gauge) গেজ-এর অর্থাৎ স্থূলতার তার ব্যবহার করা হয়। চারটি তারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ সওয়ারীর পশ্চাতে ও পন্‌থির মাঝে চারটি গোল হাড়ের বা কাঁচের পুঁতি বা বাহারি হাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে মান্‌কা বলে। নিখুঁত ভাবে সুর মেলাতে এগুলি সাহায্য করে। সওয়ারীর ওপর চারটি তারের চাপের ফাঁকে সুতা দিয়ে তানপুরার জোয়ারী খোলার ব্যবস্থা করা হয়। জোয়ারীদার আওয়াজ (zaring note) ভারতীয় তানপুরার স্বরধ্বনির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তানপুরার মধ্যে যেগুলি বৃহদাকারের হয়, সেগুলিকে মহাতানপুরা বলা হয়। উত্তর ভারতের মিরাজে উৎকৃষ্ট তানপুরা তৈরী হয়ে থাকে।

---

১. তুম্বরী দেখুন।



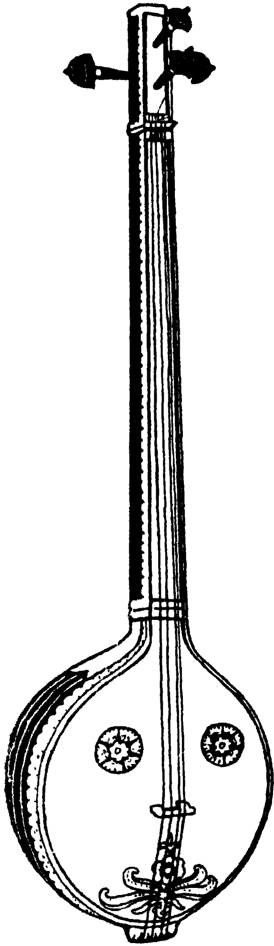
ত্রিতন্ত্রী বীণা

ত্রিতন্ত্রী বীণা : বীণাটি কচ্ছপীর মত দেখতে হলেও এর হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ) লাউয়ের গোলার বদলে কাঠের তৈরী হয়ে থাকে। কচ্ছপীর থেকে আকারে কিছু ছোট। তার বাঁধা ও বাজাবার কায়দা অবিকল কেচুয়া সেতারের মতই। তিনটি তার থাকার কারণেই এটি ত্রিতন্ত্রী নামে প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী বীণাই বহুবিধ পাশ্চাত্য তত যন্ত্রের ও বর্তমানে প্রচলিত সেতারের আদি পুরুষ। সেতারের ইতিহাস লেখার সময় আমরা একথা বলেছি। সেই কারণে ত্রিতন্ত্রীর বিশদ ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকছি। মুসলিম আমলে এই বীণার অনুকরণে আর এক প্রকার উন্নত ধরণের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল—সেটি কেবলমাত্র **"যন্ত্র"** নামেই পরিচিত ছিল। এই "যন্ত্র" নামক বাদ্যযন্ত্রে লোহার তার থাকতো এবং দান্ডির দুদিকে দুটি গোলাকার আধখানা করা লাউয়ের তুম্বা রাখা হত আর তিনটি লোহার তার থাকতো। আইন-ই-আকবরীতে এই 'যন্ত্র' নামক বীণার উল্লেখ আছে। এটিই মোঘল যুগে বীণ-সেতার নামে পরিচিত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে এটি প্রাচীন ত্রিতন্ত্রার আকারভেদ মাত্র।

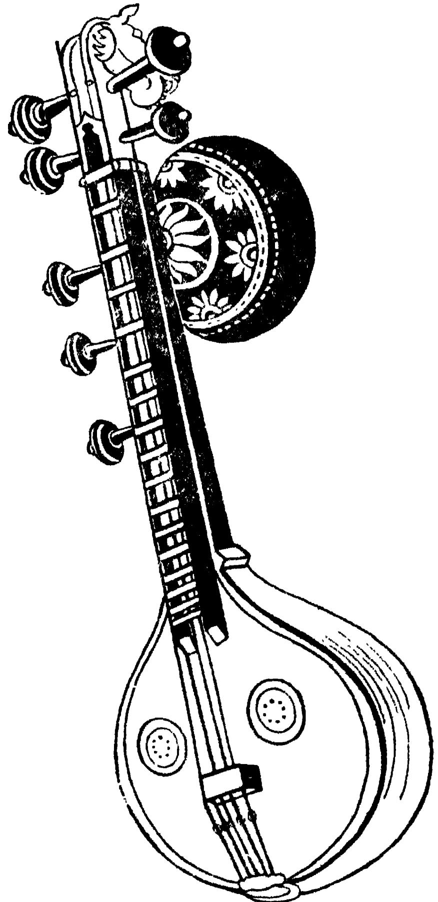
দক্ষিণী-তানপুরা ঃ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও উত্তরের মত একই প্রকারের তানপুরার ব্যবহার দেখা যায় এবং গানের অনুষঙ্গ হিসাবে এর ব্যবহার। আকৃতিগত মিলও রয়েছে। আজকাল দক্ষিণে ছয়তার ও সাততার যুক্ত বড় উত্তরী আকারের তানপুরার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যুতচালিত স্বয়ংক্রিয় তানপুরার প্রচলন হয়েছে। আমরা এর নাম **তড়িৎ-তম্বুরা** রাখছি। দক্ষিণে এটিকে **স্ববাদিত-তাম্বুরা** বলা হয়। এতে গায়কের নিজের হাতে তানপুরা ছাড়ার প্রয়োজন হয় না, বা সুর ছাড়ার জন্য অন্য কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। ইলেক্ট্রিক প্লাগ লাগালেই সেটি আপনি আপনি বাজতে থাকে। বলাবাহুল্য তাম্বুরাটি বাজাবার আগে নিখুঁতভাবে সুর বাঁধার প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভারতে আর এক প্রকার **চল-সেতু** যুক্ত তুম্বুরা আবিষ্কার করা হয়েছে। এই তুম্বুরার স্থির সেতুটি তবলির উপরে নিয়মিত স্থানে স্থির ভাবে রাখা

হয়। তুম্বুরার দান্‌ডির ওপরে আর একটি **চলমান সেতু** রাখা হয়, এটি ওপর দিকে বা নিচের দিকে নাবালে তানপুরার স্বর বদলে প্রয়োজন মাফিক স্বর পাওয়া যায়। পিচ্‌ পরিবর্তনের সুবিধার জন্য সেতুর ভেতর দিয়েও তিনটি তার রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও তাঞ্জোর এই দুই স্থান তানপুরা নির্মাণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও তানপুরা নির্মিত হয়।



দক্ষিণী-তানপুরা



দক্ষিণী বীণা

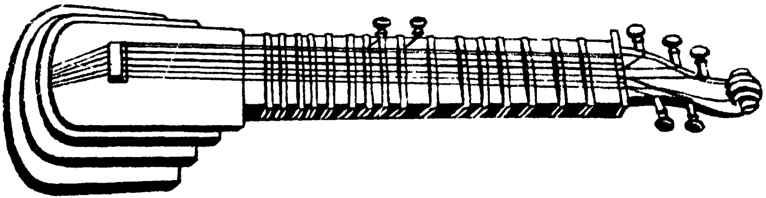
দক্ষিণী বীণা ঃ দক্ষিণ-ভারতের সংগীতপণ্ডিতেরা অনেকে দক্ষিণী বীণাকে **সরস্বতী বীণা** বলে থাকেন। উত্তর ভারতের নারদীয় বীণাকেও সরস্বতী বীণা বলা হয়। ভারতীয় ধারার বিভিন্ন অলঙ্কার যুক্ত রাগ পরিবেশনে এই বীণাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। বীণার কথা বলার সময় Rev Popley তাঁর Music of India বইটিতে বলেছেন "The vina occupies the first place amongst the most honourable instruments of India" দক্ষিণী উচ্চারণ ভঙ্গীমায় এই বীণাকে ওঁরা 'ভীনা' বলে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর ও মহীশূর প্রদেশ এই বীণা নির্মাণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাড়, হরিণের সিং বা হাতির দাঁতের তৈরী নানা নক্সা দিয়ে যন্ত্রটি শ্রীমণ্ডিত করা হয়। যন্ত্রের দান্ডির মুক্তপ্রান্তে ময়ূর, হরিণ বা ড্রাগন প্রভৃতির মুখ খোদাই করা হয় বা হস্তিদন্তনির্মিত মুখ বসান হয়। এইভাবে যন্ত্রটিকে সুদৃশ্য ও সুশোভিত করা হয়।

উত্তরভারতের বীণ ও এই বীণার আকারে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। এই বীণা উত্তরভারতের রুদ্র বীণার আকারের সঙ্গে কিছুটা মেলে। বীণার হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষটি একটি গোলাকার বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়, দানডিটি আর একটি লম্বা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয় এবং মাঝখানটি কুঁদে খাল করা হয়। সেতারের মত দানডিটি খোলের সঙ্গে জোড়া হয়। কখনো কখনো সমগ্র যন্ত্রটিই একটি বিরাট বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়। দানডির মুক্তপ্রান্তটি নিচের দিকে বাঁকান থাকে ও এই বাঁকান মুখটিতে জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করে বাহারি করা থাকে। সাধারণত এই যন্ত্রটি নির্মাণে কাঁঠাল কাঠ ও কৃষ্ণ কাঠ ব্যবহার করা হয়, বীণার দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে সেতারের কায়দায় একটি পৃথক লাউ লাগান হয়, প্রয়োজন মাফিক এটি খোলা বা সরান যায়। এই বীণা মিজরাব বা নখের আঘাতে বাজান হয়। ডানহাতে তার টেনে বা পর্দ্দার উপর দিয়ে চালনা করে বাঁ হাতে মিজরাবের বা নখের ঘা দিয়েই বাজান হয়।

দানডিতে ২৪টি পর্দ্দা মোম বা গালা দিয়ে জমান থাকে। প্রয়োজনে অল্প তাপ দিয়ে মোম নরম করে পর্দ্দা সরান হয়। ধনী লোকেরা অনেকে রূপার পর্দ্দাও লাগিয়ে থাকেন। দানডির মুক্ত প্রান্তের দুপাশে দুটি করে কান রাখা হয়। এইভাবে রাখা চারটি কাণের সঙ্গে চারটি প্রধান তার বাঁধা হয়। দানডির পাশে রাখা বাকি তিনটি কাণের সঙ্গে ঝালার তিনটি তার বাঁধা থাকে।

হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সোওয়ারীর উপর দিয়েই চারটি প্রধান তার কান থেকে নিয়ে পনথির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই চারটি তারের নাম যথাক্রমে (১) সারণী (২) পঞ্চম, (৩) মন্দারম্ (৪) অনুমন্দারম্। পাশে রাখা তিনটি চিকারীর নাম যথাক্রমে (১) পাক্কাসারণী (২) পাক্কাপঞ্চমম্ এবং (৩) হেচ্চুসারণী। যন্ত্রের প্রধান তার দুটি পিতলের রাখা হয়, অনেকে রূপার তারও ব্যবহার করেন। বর্তমানে ষ্টীলের তার ব্যবহার করা হয়। প্রধান তার দুটিই বিশেষভাবে বাজান হয়। দক্ষ বাজিয়েরা চারটি তারেই নানারকম ছন্দ ও মীড়ের কাজ দেখিয়ে থাকেন। পাশের তিনটি ষ্টীলের তার ছেড়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

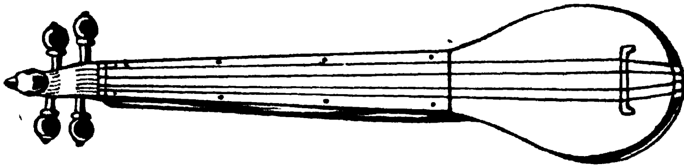
বাদকেরা নিজের খুশিমত স্বরে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এই যন্ত্রে সুর মেলান। সাধারণত তাঁরা প্রধান চারটি তার বাহির দিক থেকে যথাক্রমে স, প, স, স বা প, স, প, প অথবা ম, স, প, স এবং চিকারীর তারগুলি যথাক্রমে প, স, প বা স, প, স অথবা স, স, প স্বরের সহিত মেলান। এই বীণা তত গোষ্ঠীর সভ্য স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে পরিচিত। দক্ষিণে অনেকে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতেও একে ব্যবহার করেন। সঙ্গীতরসিক শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় তাঁর "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" মহীশূরের রাজসভা-বীণকার শেষণের সম্বন্ধে লিখেছেন "দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার"····"গানের দরদ যাঁর কাছে মূল্যবান, মিষ্টত্বে যিনি উদাসীন নন ও সুরের মোচড়ের দাম যিনি জানেন, শেষণের মূল্য তিনিই বুঝবেন।" দক্ষিণের বীণার কথায় আমরা শেষণের নাম না উল্লেখ করে পারি না। বর্তমানে ইনি স্বর্গলোকে প্রয়াণ করেছেন।



দারবী বীণা বা দারুবীণা

দারবী বীণা বা দারুবীণা: প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এর নাম পাওয়া যায়। এই বীণার দান্ডী, তুম্ব (অর্থে ধ্বনিকোষ), তবলী সবই দারুময় অর্থে কাঠের তৈরী। সেই কারণেই এর নাম দারুবীণা। তুম্বটি একটি বড় কাঠের উপর তার চেয়ে ছোট পরে আরও ছোট কাঠ দিয়ে তবকে তবকে সাজান থাকে। সেতারের

মত সাতটি কাঠের কাণ থাকে। তবলীর ওপর সেতারের কায়দাতেই একটি তন্ত্রাসন থাকে। মোটা তারের জন্য আওয়াজ কিছু গম্ভীর হয়, মিজরাবের সাহায্যে বাজে। প্রাচীন দারুবীণা বা দারবী বীণার চিত্র বা আকৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমরা দারবী বীণার এই আকৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি। বর্তমানের এই বীণাটিকে শতবর্ষের অধিক আয়ুযুক্ত বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র দারুময় (অর্থাৎ হাঁড়ি বা ধ্বনিকোষ, দান্ডি ও সমস্ত অবয়বই কাঠের তৈরী) বলেই আমরা এর নাম দারুবীণা বলেছি। প্রাচীনকালে বীণাকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—প্রথম: গাত্রবীণা অর্থাৎ শরীরজ বীণা যাকে দেহ-বীণা বলা হত, দ্বিতীয়: যে কোন কাষ্ঠ নির্ম্মিত বীণাকেই বলা হত দারুবীণা।

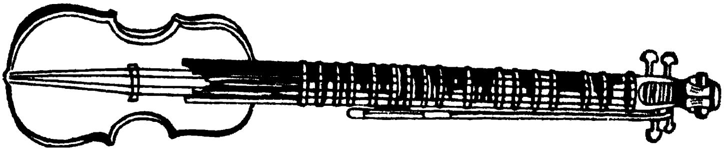


দোতারা

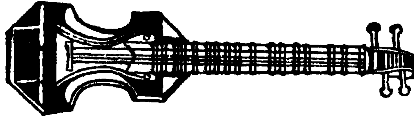
দোতারা: তত গোষ্ঠীর এক প্রকারের গ্রাম্য যন্ত্র। নামটি দোতারা হলেও চার পাঁচটি তার এতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্বচিৎ দুতার যুক্ত দোতারাও নজরে পড়ে। পণ্ডিতেরা বলেন যে পূর্বে এই যন্ত্রে দুটি তারই ব্যবহৃত হত। সেই কারণেই এর নাম দোতারা রাখা হয়েছিল। কালের পরিবর্তনে তার-সন্নিবেশ এবং পটরিরও পরিবর্তন ঘটেছে, দানডির পাশে নিস্তির কাঠ দিয়ে তরফের তারও রাখা হচ্ছে। বর্তমানে সরোদ যন্ত্রের মত এর পটরির উপর ষ্টীলের পাত মোড়া হয়। দোতারার আকারটি প্রায় সরোদ বা রবাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রাচীন ভারতে দুই তার যুক্ত আর একপ্রকার বীণা ছিল। তার নাম **নকুল বীণা**। এই নকুলবীণাতেও কেবলমাত্র দুইটি তারই থাকতো। এটি দোতারার আদিপুরুষ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে দোতারাকে অদ্গতসিদ্ধ যন্ত্ররূপে গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নানাদেশে অল্পবিস্তর আকৃতিভেদে আরও কয়েকপ্রকার দোতারা দেখা যায়। বাংলাদেশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপে এর প্রচলন বেশী। দোতারার আর একটি নাম **স্বরাজ**। **সুরসংগ্রহ** নামেও দোতারা পরিচিত। দুই তার যুক্ত দোতারা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত, সেটিতে দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা দুটি কাণের সঙ্গে

দুটি তার বাঁধা থাকে। **দক্ষিণী দোতারা** উত্তর ভারতের দোতারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, একতারার আকৃতির। এই দোতারায় তারদুটি লাউয়ের উপরে রাখা ব্রীজের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক আমাদের একতারার কায়দায়।

ধ্রুববীণা ঃ শারঙ্গদেবের কালে এই বীণায় বাইশটি তার রাখা হত। বাইশ শ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাইশটি তার বাঁধা হত। এটিকেও অচল বীণা বলা হত। ভরতের কালে ধ্রুববীণাতে সাতটি মাত্র তার রাখা হত। (অচলবীণা দেখুন)



নাদেশ্বর বীণা (১ম প্রকার)



নাদেশ্বর বীণা (২য় প্রকার)

নাদেশ্বর বীণা ঃ ধনুস্তত যন্ত্রগোষ্ঠীর এক অভিনব সংস্করণ, ১০৮০ বছর আগে এটি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এটি সেই সময়েই আবিস্কৃত। যন্ত্রটি এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত। রাজা ট্যাগোর কৃত যন্ত্রকোষে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার যাদুঘরে দুই প্রকারের দুটি নাদেশ্বর রাখা আছে। একটিতে চামড়ার তবলী ও অপরটিতে কাঠের তবলী। যন্ত্রটি অবিকল বেহালার মত দেখতে, তবে দণ্ডটি দীর্ঘ। বেহালা ও সেতারের মিশ্রণে এর জন্ম, সেই কারণে এর খোল (ধ্বনিকোষ) বেহালার মতন এবং দানডিটি সেতারের মত। বেহালার মত এটি ছড় দিয়ে বাজান হলেও হাঁড়িটি বাদকের সামনে মেঝেতে রেখে দানডিটি এস্রাজের মত কাঁধে হেলান দিয়ে অথবা সমান ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত তারের সংখ্যা, স্বর বাঁধার রীতি, পর্দাবিন্যাস ইত্যাদি সবই সেতারের মত। উইলার্ড সাহেবের পুস্তকে বড় কাঠের তবলির নাদেশ্বর বীণাটিকে সুরসঙ্গ বলা হয়েছে।

রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে নাদেশ্বর বীণা বলা হয়েছে। তাঁর ইংরাজী পুস্তকেও (Short Notices of Hindu Musical Instruments-এ Page 25/26) বলা হয়েছে "Nadeshvara Vina—a drawing room instrument played with the bow ; a very modern instrument formed out of the Violin and the Kachhapi Vina."

নিঃশঙ্ক বীণা ঃ অবয়বের ব্যাখ্যায় সঙ্গীত রত্নাকরে দানাডর কথা কিছু বলা নেই। কেবলমাত্র বলা হয়েছে যে ওপরে একটা কাঠের টুকরো ও নীচে একটি কাঠের টুকরো থাকে। নীচের কাঠটা আধ হাত লম্বা ও দু আঙ্গুল মোটা। চার হাত লম্বা তার (তন্ত্রী) ওপরের ও নীচের কাঠের টুকরোর আগার দিকের দু' আঙ্গুল দূরে বাঁধা থাকে। তুম্বের কথায় বলা হয়েছে যে সেটি তন্ত্রী-বন্ধনের নীচের দিকে যুক্ত থাকতো। সম্ভবত তারের গোড়া এই তুম্বে বাঁধা থাকতো। বাজাবার কায়দার কথায় বলা হয়েছে বাঁ হাতে তুম্ব চালনায় কিম্বা শুকনো মোটা চামড়া তারের উপর ঘষে স্বর বার করা হত ও ডান হাতে পিণাকী বীণার মত ছড় ধরে বাজান হত।

পদ্মবীণা ঃ মহারাণা কুম্ভ লিখিত বাদ্যযন্ত্রকোষে এই বীণার নাম পাওয়া যায়। এই বীণার সাবশেষ পরিচয় আর কোন গ্রন্থে না পাওয়ায় আমাদের পক্ষে এই বীণার আকারাদি সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হল না।

পরিবাদিনা বীণা ঃ পণ্ডিতেরা বলেন বর্তমানের সেতার প্রাচীনকালে পরিবাদিনী নামে পরিচিত ছিল। এই বীণায় সাতটি তার থাকতো ও মিজরাব দিয়ে বাজান হত। এই পরিবাদিনী বীণা দুই প্রকারের ছিল। (সেতার দেখুন)

পিচোলা বীণা বা পিচ্ছোরা বীণা ঃ প্রাচীনকালে বাঁশীর (কাণ্ডবীণার) সঙ্গে এই বীণা জওয়ার সাহায্যে বাজান হত। এটি গীটার জাতীয় বীণা ছিল বলা হয়। সম্ভবতঃ এই বীণার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিচিত্রবীণা ও দক্ষিণের গটুবাদ্যমের জন্ম। ডাঃ কালাণ্ডে লিখিত পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে এই বীণার উল্লেখ আছে।

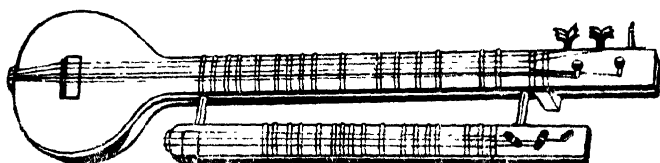
পিনাক বীণা ঃ অতি প্রাচীন ধনুস্তত যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতেও ধনুকাকার। দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে এই বীণা দেখা যেত বলে তাঁর আর এক নাম পিণাকপাণি। এই ধনুযন্ত্রই সমস্ত ধনুস্তত বা ধনুর্যন্ত্রের আদি বলে পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। পিনাক বীণা সম্বন্ধে রাজা স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে বলা

হয়েছে—"যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সমুদায় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিনাকযন্ত্র। এই যন্ত্র দেখিতে ধনুকের ন্যায়। একটি স্থিতিস্থাপক গুনোপেত যষ্টি, তাহার দুই সীমা একটি তন্তু দ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। ধনুকের ন্যায় ইহার আকার বলিয়া মহাদেব যুদ্ধকালেও ইহার ব্যবহার করিতেন।"

শ্রীযুত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর 'উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত' নামক পুস্তকে পিনাকীর বর্ণনায় লিখেছেন, "পিনাকী বীণা ধনুকের আকৃতিবিশিষ্ট। এতে তাঁতের একটি তার থাকতো। এর দুদিকে দুটি কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালার মত পাত্র উল্টোভাবে বসান থাকতো। এটি ছড়ি দিয়ে বাজান হত কিম্বা একটি ক্ষুদ্র লাউ তারের ওপর ঘষে ঘষে আওয়াজ উৎপন্ন করা হত।"

বর্তমানে এটি লুপ্ত এবং এই যন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি আমরা পাইনি। আসাম, মণিপুর অঞ্চলে **পেন্না** বা **পেনাক** নামে একতারার আকারের এক প্রকার ধনুযন্ত্র দেখা যায়। এটি পিনাকীর ভিন্ন নাম ও রূপভেদও হতে পারে।

পরমেশ্বর লিখিত বীণা প্রপাঠকে বাদ্যাধ্যায়ের ১২।২৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে: পিনাকী একটি তুম্বযুক্ত ধনুর্যন্ত্র বিশেষ, অশ্বপুচ্ছযুক্ত ছড় দিয়ে এটি বাজান হত। এটি একতারযুক্ত ততযন্ত্র। সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে লেখা হয়েছে, বীণাটি ৭১ আঙ্গুল লম্বা হত, দু পায়ের মাঝে হাঁড়ি ধরে, দানডি কাঁধে রেখে ও ডান হাতে ছড় ধরে বাজান হত। ছড়ে ঘোড়ার লেজের চুল থাকতো। তাই অনেকে একে এস্রাজের আদিম সংস্করণ বলে থাকেন।



প্রসারণী বীণা

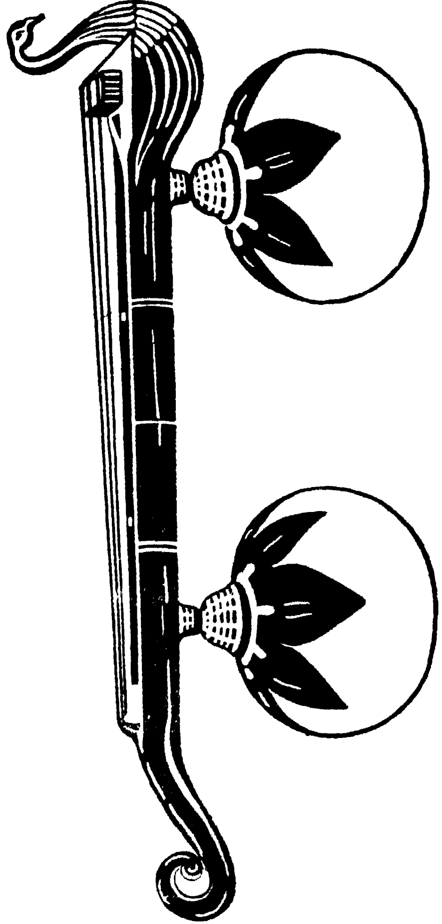
প্রসারণী বীণাঃ কেচুয়া সেতারের মত দেখতে হলেও মূল যন্ত্রটির সঙ্গে ১৬টি পর্দাযুক্ত আর একটি সেতারের দানডি যুক্ত থাকে। প্রধান যন্ত্রটিতে পাঁচটি তার সেতারের কায়দায় পাঁচটি কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে এবং সংলগ্ন ছোট দানডিতে

একসপ্তক চড়ায় তিনটি তার বাঁধা থাকে। মুখ্য যন্ত্রটির হাঁড়ির ঢাকা তবলির উপর ও সংলগ্ন দানডিটির শেষ প্রান্তে ব্রীজ রাখা হয়। তারগুলি ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়। যন্ত্রের বড এবং ছোট দুটি দানডিতেই ১৬টি করে পর্দা রাখা থাকে। এতে চিকারীর কোন তার থাকে না। যন্ত্রটি কোলের ওপর বা সামনে শুইয়ে রেখে পর্দার ওপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ঘষে ও ডান হাতে রাখা কাঠের কাঠি দিয়ে বাজান হয়। এই লুপ্ত বীণাটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখা আছে। আমাদের ধারণা আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। যন্ত্রকোষে এই বীণার উল্লেখ আছে।

বল্লকী বীণা : বাদ্য প্রকাশে এটি সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। নান্যদেব বলেছেন সড়গুণা তন্ত্রী। এই ষড়গুণাতন্ত্রী কথার মানে আমরা বুঝতে পারিনি (এটির অর্থ কী ছয়তারযুক্ত বীণা ?)। দক্ষিণী সংগীতপণ্ডিত শ্রীশাম্বমূর্তি এটিকে 'যাজ' জাতীয় বাজনা বলেছেন (A kind of yazh)। অমর কোষে আমরা বল্লকী বীণার নাম পাই। হিন্দুদের এই প্রাচীন তারযন্ত্রটি বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত। অনেকে মনে করেন পুরাকালে তানপুরা বল্লকী নামে প্রচলিত ছিল। যন্ত্রটি মিজরাব সাহায্যে বাজান হত। রাশিয়ার ব্যালালাইকাকে বল্লকী বীণার অনুকরণ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

বাণবীণা : আচার্য সায়ণ বাণবীণাকে শততন্ত্রী বলেছেন। "মরুতঃ বাণঃ শত সংখ্যাভিস্তন্ত্রীভির্যুক্তং বীণা বিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্ত"। ঋগ্বেদে বাণবীণার কথায় দেখা যায় (১।৮৫।১০) মরুদগণ সোমপান করার পর যখন তরংগে আসতেন তখন বাণ বাজাতেন। এখানে বাণে শততার থাকতো বলা হয়েছে। দশটি খুঁটি থাকতো ও অঙ্গুলিয়ক অর্থে মিজরাব দিয়ে বাজান হত। (শ্রৌত সূত্রের যুগে একে মহতী বীণাও বলা হত।) এই বীণাতে একশোটি তার থাকতো ও তারগুলি মুঞ্জা ঘাসে তৈরী হত। বীণাটি যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ থেকে তৈরী হত। দানডির মাপ পাওয়া যায় না, নিচের দিকটা অর্থাৎ সুনা পলাশ কাঠে তৈরী হত। এই সুনা ষাঁড়ের চামড়ায় ছাওয়া হত। চামড়ার ছাউনিতে দশটি ফুটো থাকতো এবং প্রতিটি ফুটোর মাঝখান দিয়ে দশ গাছা তার ঢুকিয়ে নীচে বাঁধা হত। শাণ্ডিল্য এতে তিনটি খুঁটি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এখানে আমরা শততন্ত্রী বীণার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য দেখতে পাই। এই মতে ছাউনিতে তিনটি ফুটো রাখা হত এবং তিনটি ছিদ্রে যথাক্রমে ৩৩, ৩৪ ও ৩৩ গাছা তার রাখা হত। যন্ত্রটি বেতের কাঠি দিয়ে বাজান হত। (বিভিন্ন শ্রৌত সূত্র)

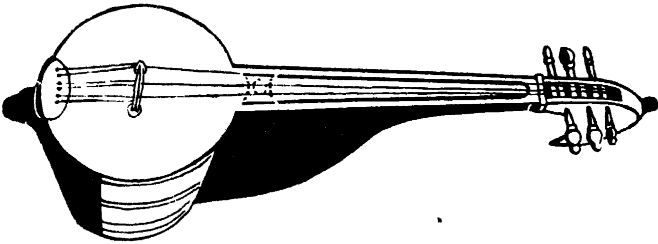
বিচিত্রবীণা ঃ এই বীণা মাত্র ৪০।৫০ বছর আগে উস্তাদ আবদুল আজিজ খাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত বলা হয়। এই যন্ত্রের প্রবর্তক ও বাদক ছিলেন তিনি নিজেই। এই বীণার আর এক নাম **বাট্টাবীণ**। প্রাচীন গ্রন্থে পিচোলাবীণার নাম পাওয়া যায়। বিচিত্রবীণা সেই পিচোলাবীণার পরিবর্তিত সংস্করণ হতে পারে। অনেকের মতে এটি দক্ষিণী গটুবাদ্যমের অনুসরণ। আকৃতিতে মহতী-বীণার মত দেখতে হলেও এর দানডিতে কোন পর্দা থাকে না এবং দানডির উপরিভাগ সমতল তবে ঈষৎ অবতল। দানডির নীচের অংশ গোলাকার। কাঠের ফাঁপা দানডিটি প্রায় তিনফুট লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়। মহতীর মত দানডির গোলাকার অংশের অর্থে তলদেশের দু'প্রান্তে দুটি বৃহদাকারের তিত লাউয়ের তুম্বা থাকে। মহতীর মত কাঁধে তুলে এটি বাজান হয় না। বাজিয়ের সামনে বীণাটি শুইয়ে রেখে বাঁ হাতে কাঁচের গোলাকার ভারী একটি স্বর-চালক (slider) তারের উপর রেখে বা ঘষে ডান হাতে তারের উপর মিজরাবের ঘা দিয়ে বাজান হয়। এই বীণায় ছয়টি প্রধান তার ও দশ-বারটি তরফের তার থাকে। দানডির ডান-দিকে দানডির চওড়ার সম-মাপের একটি সওয়ারি (Bridge) থাকে। দানডির অপর প্রান্তে কানের দিকে একখানি আড়ি থাকে। এই কানে আটকানো



বিচিত্রবীণা

তারগুলি আড়ির উপর দিয়ে সওয়ারীর উপর চেপে শেষ প্রান্তে রাখা লেঙ্গাড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

ইং ১৯৩৮ সালে লেখক যখন দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন, তিনি আজিজ খাঁ সাহেবের হাতে এই বাজনা কয়েকবার শুনেছিলেন। এই যন্ত্রে বোলদার গত্ তোড়া বাজান খুব কঠিন, তবে আলাপ, ঢিমাগৎ ও গানের কায়দায় গায়কীর কাজ খুব ভাল শোনায়। বর্তমানে বাজনাটি খুব কম শোনা যায়।

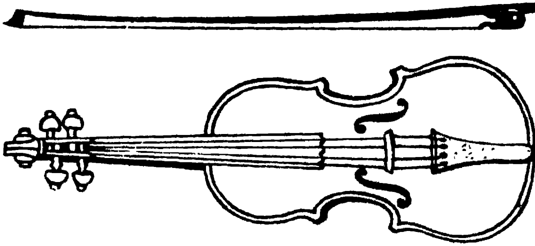


বিপঞ্চী বীণা

বিপঞ্চী বীণা : ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিপঞ্চী বীণার নাম দেখা যায়। তিনি বলেছেন "বিপঞ্চী নব তন্ত্রিকা"— অন্য মতেও "বিপঞ্চী নবভির্মতা"। বিপঞ্চীতে নয়টি তার থাকে। আরও বলেছেন—"বিপঞ্চী কোন বাদ্যা স্যাং"—বিপঞ্চী কোনস অর্থে জওয়া (plectrum) দিয়ে বাজান হত। বহুদিন আগেই বিপঞ্চীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কলিকাতার যাদুঘরে এই যন্ত্রের একটি নিদর্শন রাখা আছে। এতে আমরা পাচটি তার দেখতে পাই। অনেকের ধারণা, বিপঞ্চী কিন্নরীর আকৃতিতে দেখা যেত। শ্রীযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর "উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত" গ্রন্থে ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—বিপঞ্চীকে তৎকালীন প্রচলিত বীণার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বীণা বলা হত এবং এটি কোন্ বা মিজরাব দিয়ে বাজান হত। আমাদের ধারণা, শরোদ যন্ত্র প্রচলিত হবার আগে এই যন্ত্রটি শরোদের মতই ভারতে বাজতো। এর যে আকৃতিটি আমরা পাচ্ছি তাতে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হয়। মুসলমান রাজত্বকালে শরোদের প্রাধান্য লাভের পর এর ব্যবহার কমে আসে এবং এটি লুপ্ত হয়ে যায়। এর আকৃতি ও তার সন্নিবেশে যে বিভেদ দেখা যায় সেটি সম্ভবত পরবর্তিকালে ঘটেছে, কারণ যন্ত্রটি যে অতি

প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে লেখা হয়েছে, "পুরাকালে বিপঞ্চী বীণাতে সাতটি তার সংযোজিত হত কিন্তু এক্ষণে পাঁচটির অধিক তার ব্যবহৃত হয় না। আরও লেখা হয়েছে, "বিপঞ্চীর পরিমাপ, তার-সংখ্যা, সারিকাবিন্যাস, স্বরবন্ধন, ধ্বনিমাধুর্য, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম এতৎসমুদায়ই কিন্নরীসদৃশ।" স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রথম ভাগে ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে বিপঞ্চী সম্ভবতঃ আমাদের স্বর-শৃঙ্গার। বর্তমানে বিপঞ্চীর যে আকার আমরা দেখতে পাই, তাতে একে স্বর-শৃঙ্গার বলা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না।

অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটির আকার ও তারসন্নিবেশ সম্পর্কে নিঃসন্দেহভাবে কিছু বলা কঠিন। বর্তমানে বিপঞ্চী নামে যে যন্ত্রটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখা আছে সেই পাঁচতার বিশিষ্ট বিপঞ্চীকেই আমরা বিপঞ্চীবীণা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। এই বিপঞ্চীতে কোন সারিকা (পর্দা) নেই। যন্ত্রটি শরোদের মত দানভিতে বাঁ হাতের আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ও ডান হাতে জওয়ার আঘাতে বাজান হত।



বেহালা

বেহালা (Violin = বাহুলীন বীণা) : শত-শত বছরের চেষ্টায় সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত গবেষণার ফলে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের মাঝে যন্ত্রটি নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়ে তার বর্তমান আকার পেয়েছে। আমরা বিস্তৃত ভাবে সেই ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনের পিছনে ভারতের যে দান রয়েছে সেটির সম্বন্ধেই লিখছি। ইংরাজি ভাষায় বেহালার জন্মবিষয়ে অনেক বই আছে সেখানে আপনারা যন্ত্রটির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পাবেন।

খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কোন ইতিহাসেই ভায়লিনের নাম পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে আরবীয় রিবেক যন্ত্রের অনুকরণে ইটালিতে ভায়লিনের আদি পুরুষ "ভিয়ল" যন্ত্রটি প্রথমে তৈরী করা হয় এবং সমস্ত ইউরোপে প্রচলিত হয়। আরবের এই রিবেক যন্ত্রটি পারস্যের কেমানজে যন্ত্রের অনুকরণে তৈরী করা হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কেমানজে যন্ত্রটি ভারতীয় অমৃতি যন্ত্রের অনুকরণ। কেমানজে যন্ত্রটি ভারতীয় রাভাণা বা রাবণাস্ত্রম থেকে জন্ম নিয়েছে বলা হয়। এ সম্বন্ধে Groves' Dictionary of Music & Musicians, 3rd Ed. Vol III, Page no. 13-এ লেখা আছে— "Kemangeh......It is undoubtedly one of the earliest of all bowed instruments, claiming its identity or descent from somewhat mythical Ravanastram of India."

সংগীতজ্ঞানী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত "সঙ্গীত সার" নামক বইটিতেও প্রমাণ করা হয়েছে যে বেহালা যন্ত্রটি ভারতের 'অমৃতি' যন্ত্রের অনুকরণে নির্মিত। আরও অনেক প্রমাণ ঐ পুস্তকটিতে রয়েছে যা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে এটি ভারতীয় যন্ত্রের অনুকরণ। প্রমাণসাপেক্ষে ভারতীয় কোন বাদ্যযন্ত্র এর আদি পুরুষ হয়ে থাকলেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে বেহালার বর্তমান আকার, তার ধ্বনিমাধুর্য প্রভৃতির উৎকর্ষতার জন্যে ইউরোপই তার আবিষ্কারক ও প্রবর্তক বলে গর্ব অনুভব করতে পারে। চারশো বছর ধরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তাভাবনা ও চেষ্টায় তাঁরা এই যন্ত্রের উৎকর্ষতায় যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন তার প্রশংসা করা আমাদের উচিৎ।

বর্তমানের বেহালা ধনুস্তত যন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্রের আসন পাবার যোগ্য। একক বাদনে, বৃন্দ বাদনে বা অনুগতসিদ্ধতায় তার বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করবেন। যে "ভিয়ল" থেকে ভায়লিন পরিবর্তিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে, বেহালার আগে পর্যন্ত ইউরোপে তার একাধিপত্য ছিল। এমন কি, ভায়লিন আবিষ্কারের পরও প্রায় ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভিয়লকে ভায়লিনের পাশে পাশে চলতে দেখা গেছলো।

ষোড়শ শতাব্দীতে লম্বার্ডি প্রদেশের সাল নগরের শিল্পী গাসপড়ির তৈরী বেহালা বা ঐ একই সময়ে ফ্রান্সে নবম চার্লসের রাজত্বকালে শিল্পী আমিটির তৈরী বেহালা থেকে আজকের বেহালার আকৃতি ও নির্মাণে বেশ কিছু রদ বদল ঘটেছে, যেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করলে ধরা পড়ে না। তবে আমিটির

তৈরী বেহালা গাসপাডির চেয়ে কিছু ভাল। এরপরে আমরা এন্টনি ও ষ্ট্রাডিভারিকে পাচ্ছি, যিনি এর বর্তমান রূপের প্রবর্তক। ইনি আরও সামান্য কিছু অদলবদল করে যন্ত্রটির স্বরধ্বনিকে আগের থেকে মধুরতর করে তোলেন। এই ধনু-প্রাণ যন্ত্রটি আরও উন্নত হল ১৮৩৫ সালে যখন প্যারিসের ফ্রন্‌কেসটর্টি-এর জন্যে নতুন ধরণের ছড় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। আগের দিনে ছড়ের যন্ত্রের ছড় মাত্রই ছিল convex অর্থাৎ উত্তল (বৃত্তের মত ক্রমোন্নত তল-বিশিষ্ট) এবং বেহালাতেও সেই কন্‌ভেক্স টাইপের ছড়ই ব্যবহৃত হত। টর্টি সাহেব নিয়ে এলেন (concave type bow) কনকেভ (অর্থে অবতল, ভিতরের দিকে বাঁকান ধনুকের মত) টাইপের ছড। এই ছড়ের বৈশিষ্ট্যে বাজিয়েরা বিশেষ খুশী হলেন। অনেক কাজ, যা তাঁরা আগের ছড়ে করতে পারতেন না, এতে তা সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এখনও এঁদের দেশে চলছে গবেষণা আরও কি উপায়ে এটিকে অধিকতর শ্রুতিমধুর করা যায়, এর নির্মাণে আরও কী বৈচিত্র্য ঘটান সম্ভব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে আমাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই ধরণের গবেষণার বিশেষ চেষ্টা হয় না। আমাদের গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে উদাসীন। বেহালার জন্মকথা ও নির্মাণকৌশল বিষয়ে নানা বিদেশী গ্রন্থ রয়েছে, তাই আমরা এর বিষয়ে বিশেষ লিখছি না।

বেহালার অঙ্গ ঃ বেহালা যন্ত্রটি আগাগোড়া সীজন করা কাঠে তৈরী। এর দুটি প্রধান বিভাগ ঃ (১) **বেলী বা ড্রাম (Belly or Drum) ঃ** আমরা এটিকে ধ্বনিকোষ বলি। (২) **ফিঙ্গার বোর্ড (Finger Board) ঃ** যাকে আমরা অঙ্গুলি-পট্টক বলি, চলতি কথায় এটিকে দানাড বলা হয়। এর উপরের অংশে তার আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে বাজান হয়। ফিঙ্গার বোর্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত। নীচের গোল অংশটিকে বলা হয় দাড়ি ও উপরের ফ্ল্যাট সমতল অংশটিকে বলা হয় অঙ্গুলিস্থান। এই অঙ্গুলিস্থানটি ঈষৎ উত্তল থাকে। বেলির পশ্চাদ ভাগের কাঠকে (Back of the Belly) বলা হয় তলি। উপরি ভাগের কাঠকে (Upper portion of the Belly) বলে তবলি বা চাপা। **রিবস্ অথবা সাইডস্ (Ribs or sides) ঃ** ফাঁপা বেলীর চার দিকের পাতলা কাঠের অংশগুলি অর্থাৎ যেগুলি বেলির উপরের চাপা ও তলদেশের তলির কাঠকে যুক্ত করে রাখে। **নেক (Neck) ঃ** ফিঙ্গার বোর্ডের যে অংশ (দানডির তলদেশ) হাঁড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে। **সাউণ্ড হোলস ঃ** (Sound Holes) বেলীর তবলির দুই পাশে এফ্ অক্ষরের আকারে যে দুটি ছিদ্র থাকে।

ব্রীজ (Bridge) ঃ ব্রীজকে সওয়ারী বলা হয়। তবলির উপর হাঁড়ির প্রায় মাঝামাঝি একটি তন্ত্রাসন অর্থে সওয়ারী বা ব্রীজ রাখা হয়। এই ব্রীজ পাতলা শক্ত কাঠের তৈরী হয়। এর উপর দিয়ে বেহালার চারগাছি প্রধান তার দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সাউণ্ডপোষ্ট ঃ (Sound Post) ব্রীজের নীচে তবলির তলায় ঠেক্‌নোর মত একটি গোল কাঠের টুকরো থাকে। এতে ধ্বনিটি সমস্ত ধ্বনিকোষকে গুঞ্জিত করে তোলায় সাহায্য করে। তবলিটি যাতে তারের চাপে নীচের দিকে দেবে না যায় অর্থাৎ তারের টানের চাপে বসে না যায়, সেটিও সাউণ্ডপোষ্টের এক প্রধান কাজ।

টেলপিস ঃ (Tailpiece) বেহালার শেষ প্রান্তে একটি কাঠের ছোট টুকরা লাগান থাকে। এর সঙ্গে সমস্ত (৪টি) তারের গোড়া বাঁধা থাকে। চলতি কথায় এটিকে লেজাডি ও শুদ্ধ ভাষায় শালায়ণী বলা হয়।

এডজাস্টার ঃ (Adjuster) টেলপিসের বাঁধা তারের ঠিক উপরে যে চারটি স্ক্রু থাকে তাদের এডজাস্টার বলে। সামান্য কমবেশী অর্থে সূক্ষ্ম স্বর মেলাবার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

বাটন (Button) ঃ বেহালার শেষ প্রান্তে নীচের দিকে বোতামের মত একটি কাঠের গোঁজ থাকে যার সঙ্গে টেলপিস টানা থাকে, তাকে বাটন বলে।

চিনরেষ্ট (Chin Rest) ঃ ছোট কাল আবলুস কাঠের বা ইবোনাইটের একটি গোলাকার অবতল টুকরা বেহালার বডির শেষ প্রান্তে রাখা হয়। বাজাবার সময় বেহালাটিকে একভাবে ধরে রাখার জন্য এর উপর যেখানে থুতনি (chin) রাখা হয়, সেটিকে চিনরেষ্ট বলে। থুত্‌নির চাপে বেহালাটি ধরে থাকায় বাঁ হাতটি স্বচ্ছন্দে খেলান যায়। **স্ক্রল (Scroll) ঃ** বেহালার মাথা অর্থে যে দিকটিতে তার বাঁধার জন্য কাণ থাকে অর্থাৎ খুঁটির দিকের মুক্তপ্রান্তটিকে হেড বা স্ক্রল বলে। চলতি ভাষায় এটিকে বেহালার মাথা বলে। যদিও বাজাবার সময় মাথাটি নীচের দিকে অর্থে বাঁ দিকেই রাখা হয়।

পেগবক্স (Peg Box) ঃ বেহালার মাথার দিকে যেখানে চারটি পেগ (Peg) অর্থে কাণ থাকে, দানডির প্রায় শেষপ্রান্তের সেই অংশটিকে পেগ বক্স অর্থাৎ কর্ণাসন বলা হয়। এইখানে চারটে—কাণ রাখার জন্য চারটে ফুটো থাকে।

পেগ (Peg) : কাঠের যে চাবি দিয়ে বেহালার তারকে টান দেওয়া অথবা আলগা (ঢিল) করা হয়, সেই কীলককে পেগ বলা হয়। বেহালার চারটে কাণ থাকে। পেগের যে গোলাকার সরু অংশটি দানডির ছিদ্রের মাঝে গলান থাকে তাকে **নাট (Nut)** বলা হয়। কাণের মাথাটি অথবা সমগ্র কাণটিকে key বলা হয়।

ষ্ট্রীং (String) : বেহালার চারটে কাণের সঙ্গে চারটে তার রাখা হয়। সকল তারের গোড়া টেলপিসে বাঁধা থাকে ও পরে ব্রীজের উপর দিয়ে এসে দানাডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই চারটে তার বিভিন্ন স্বরের সঙ্গে মেলান হয় এবং সেই স্বরের নামেই তারগুলির নাম। বাজাবার অবস্থায় ডানদিক থেকে প্রথম তারটির নাম ই E, দ্বিতীয়টি এ A, তৃতীয়টি ডি D, এবং চতুর্থটিকে জি G বলা হয়। অনেকে জি তারটিকে প্রথম ধরে G. D. A. E এরূপও বলে থাকেন। আজকাল প্রথম E. stringটি steel-এর হয় এবং বাকিগুলি Silver, Chromium Plated বা Aluminium Coated হয়। আগের দিনে এইগুলিতে তাঁতের তার ব্যবহৃত হত।

বো (Bow) : বেহালার তারে আঘাত দিয়ে বাজাবার জন্য কাঠের তৈরী পাতলা লম্বা সরু ছড় ব্যবহৃত হয় তাকে ইংরাজিতে ষ্টীক বা বো (stick or bow) এবং বাংলায় ছাড় বলা হয়। **বো-হেড (Bow Head) :** ছড়িটির যেখানটি ধরে বাজান হয় সেই স্থানটিকে ছড়ির মাথা বলা হয়। ছড়ির মাথার নীচে থাকে ফ্রক (Frock) ও স্ক্রু (Screw) : ছড়ের চুলগুলি আঁট ও ঢিলা করার জন্য ছড়ের মাথার শেষ প্রান্তে এই screw রাখা হয়।

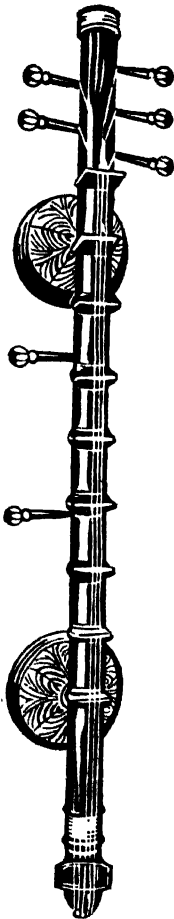
বো-হেয়ার (Bow-Hair) : ছড়ের তলদেশে ঘোড়ার লেজের এক গুচ্ছ চুল অথবা বালামচি থাকে, যা দিয়ে বেহালাটি বাজান হয়। এই চুলগুলি মাথার দিকের ফ্রক ও স্ক্রুর সঙ্গে এবং মুক্ত প্রান্তের নাটের (nut) সঙ্গে যুক্ত থাকে।



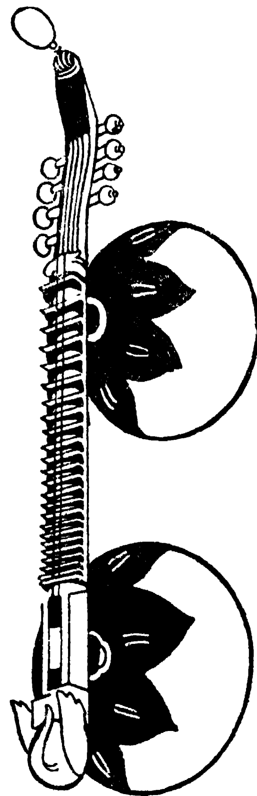
ভরত বীণা

ভরতবীণা : ভরতবীণা নামে একটি বীণার নাম আমরা 'যন্ত্রকোষ' বইটিতে দেখতে পাই। নাম দেখে আমরা এটিকে ভরতের কালের যন্ত্র বলে মনে

করি। কিন্তু এটি সেরূপ প্রচীন যন্ত্র নয়, আধুনিককালে মাত্র একশো বছর আগে এটি নির্মিত হয়েছিল। রবাব ও কেচুয়া সেতারের মিশ্রণেই যন্ত্রটির জন্ম। খোলটি রবাবের আকারের ও দানডিটি কেচুয়া সেতারের মত। দানডিতে কয়েকটি পেতলের তরফের তার থাকতো। যন্ত্রটির স্বরধ্বনি নীরস হওয়ার কারণে বর্তমানে এর প্রচলন লুপ্ত।



প্রাচীন মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা



বর্তমান মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা

মহতীবীণা বা নারদীয় বীণা : প্রাচীনকালে তারযন্ত্র মাত্রকেই বীণা বলা হত। আকার ও প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল।

বীণা বলতে তখন সাধারণত মত্তকোকিলা বীণাকেই বোঝাত। এর আকৃতি ছিল অনেকটা হার্পের মত। প্রাচীন গ্রন্থে পঞ্চাশ ষাট রকমের বীণার নাম আছে। তার মধ্যে নারদীয়, মত্তকোকিলা, পিনাকী, সারস্বত, রঞ্জনী, কূর্মী, কচ্ছপী, চিত্রা, বিপঞ্চী, আলাপিনী, স্বরবীণা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। উত্তরভারতে মহতীবীণার ব্যবহার বেশী ছিল। এই বীণাটি উত্তরে স্বরস্বতীবীণা ও নারদীয়বীণা নামে চলে আসছে। শারঙ্গদেবের সময়ের আগে এই বীণা প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য লাভ করেছিল। মহর্ষি নারদকে এই বীণার আবিষ্কারক বলা হয়। আমাদের দেহের সঙ্গে এই বীণার তুলনা করে বীণার দুটি তুম্বের সঙ্গে নাভি ও মস্তক এবং দণ্ডের সঙ্গে মেরুদণ্ডের তুলনা করা হয়। আমাদের শরীরে নাভি ও মস্তক যেমন প্রধান, বীণার এই দুটি তুম্বও তেমনি প্রধান স্বরস্থান। ঐ বীণার দণ্ডে ষোল বা উনিশ অথবা তেইশটি পর্দা গালা বা মোম দিয়ে জমান থাকে। পর্দাগুলি সরান যায় না, সেই কারণে এই বীণাকে অচলবীণা বা অচলঠাটের বীণাও বলা হয়। এর দানডিটি বাঁশের ও তুম্ব দুটি তিতলাউয়ের খোলা থেকে তৈরী। বর্তমানে পর্বহীন বাঁশের অভাবে দানডি কাঠেই তৈরী হয়। বীণার দানডি প্রায় ২" ইঞ্চি মোটা এবং আড়া থেকে সওয়ারী পর্যন্ত তিন ফুট আন্দাজ লম্বা হয়; গোলাকার লাউগুলি (তুম্বা) ১৪ ইঃ, ১৬ ইঃ, ২০ ইঃ বা আরও বড় মাপের রাখা হয়। বীণাতে তিনটি লোহার ও চারটি পিতলের তার থাকে। দানডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে তারের আগাগুলি বেঁধে সওয়ারীর উপর দিয়ে (মেরুর উপর দিয়ে) বীণার শেষপ্রান্তে রাখা পনথীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। বর্তমানে কাঠের দানডির বৃত্তের মাপ ২ ইঃ থেকে ৩ ইঃ পর্যন্ত রাখা হয়। মুঘল যুগে খ্যাতনামা বীণকার পিয়ার খাঁ ও জীবন শা তাঁদের বীণাতে ২টি লোহার ও ৪টি পিতলের তার ব্যবহার করতেন।* বর্তমানে ছ'টি তারের পরিবর্তে সাতটি অথবা আটটি তার ব্যবহার করা হয়।

এই বীণা কাঁধে রেখে বাঁ হাতে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে পর্দার ওপর তার চেপে বা টেনে এবং ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলিতে মিজরাব পরে প্রধান তারে ও অন্য তারে আঘাত দিয়ে বাজান হয়। এই মেজরাব পরার কায়দা সেতারের মেজরাব পরার কায়দা থেকে ভিন্ন। মাঝে মাঝে সুর যোগ দেওয়ার কারণে ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে ও বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলেও মিজরাব ব্যবহার করা

* Asiatic Researches (Vol. 5th Edition page 296)

হয়। বর্তমানে কাঠের তৈরী বীণার আওয়াজ বাঁশের তৈরী বীণা থেকে জোরদার, উন্নত, মধুর ও স্বরগুলির বেশ দীর্ঘস্থায়ী।

এই যন্ত্র বাজান কঠিন, তাই মহতীবীণায় পারদর্শী মাত্র কয়েকজনের নামই পাওয়া যায়। অতীত ভারতে এই বীণার প্রচলন বেশী থাকা সত্বেও সকলে এতে দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। আমরা জীবন শা, পিয়ার খাঁ, নির্মল শা, মহম্মদ খাঁ, নসির আহমেদ, স্বরযু খাঁ, গুলাব খাঁ, গুলাম রসুল, করিম খাঁ, ফিরোজ খাঁ, ন্যামত খাঁ, গুলাম হুসেন খাঁ, মেহেদি হুসেন খাঁ, ওয়ারিশ খাঁ লছমিপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির নাম ও পরবর্তিকালে উর্জীর খাঁ, আন্না ঘোরপোরে, মহম্মদ আলি খাঁ, অভয়চরণ মল্লিক প্রভৃতি বাজিয়েদের নাম পাই। বর্তমানে উস্তাদ সাদেক আলি, উস্তাদ দবীর খাঁ, উস্তাদ আসাদ আলি, ময়মনসিং গৌরীপুরের গুণী সঙ্গীতজ্ঞ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাগুর ঘরাণার জিয়া মহিউদ্দিন ডাগর, ইন্দোরের আবিদ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বীণার তার বাঁধার নিয়ম—

ডান দিক থেকে ১নং প্রধান তার অর্থে নায়কী তার (পাকা ষ্টীলের) স্বরের তারের মধ্যমে বাঁধা হয়। ২নং জুড়ির তার—পেতলের, নিজের ইচ্ছামত ষ্ট্যাণ্ডাড ধরে মুদারার 'স' স্বরে বাঁধা হয়।

৩নং জুড়ির তার—পেতলের বা ব্রোঞ্জের, উদারার পঞ্চমে মেলান হয়।

৪নং " " " " " " ষড়জে " "

৫নং তলার দিকে পেতলের জুড়ির তার মুদারার " " "

৬নং এবং ৭নং ষ্টীল তার ঝালার কাজে ব্যবহার করা হয়।

তারের গেজ নং এখানে দিলাম না, কারণ প্রতি ঘরাণার বাজিয়ে তাঁর নিজের সুবিধামত গেজের তার ব্যবহার করে থাকেন।

বীণকার ঘরাণাঃ (১) সেনী ঘরাণাঃ প্রথমে তানসেনের দৌহিত্র বংশ মিশ্রী সিংজী (নবাত খাঁ) বীণকার থেকে আমরা নাম পেয়ে থাকি। এই ঘরাণার খ্যাতনামা বাণকার আমীর খাঁর পুত্র উজীর খাঁ সাহেব (রামপুর ঘরাণা) পরে উস্তাদ দবীর খাঁ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্র কিশোর এই ঘরাণার ধারক।

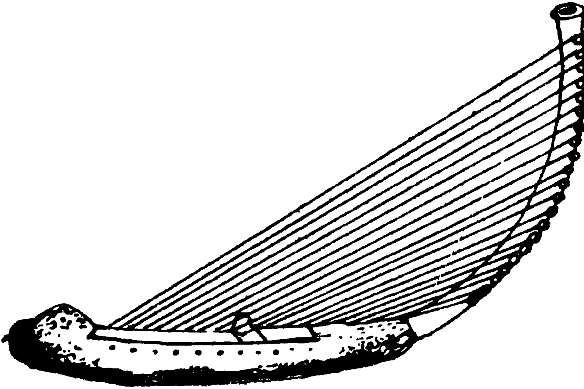
(২) ঘারপোরে ঘরাণাঃ আন্না ঘারপোরে বীণকার প্রবর্তক। স্বর্গীয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরাণার বাহক ছিলেন। এঁর জামাতা নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় ও ছাত্র ললিতমোহন পাল বর্তমান ধারক। কিন্তু এঁরা বীণকার নন।

(৩) জয়পুর ঘরাণা ঃ আলোয়ারের বীণকার মুশরফ্ খাঁর পুত্র সাদেক আলি তস্য পুত্র আসাদ আলি—এই ঘরাণার বর্তমান ধারক। ঘরাণার সূত্রপাত ঘটে রজব আলীর সময় থেকে। এই ঘরাণার অন্যান্য বীণকারদের মধ্যে আমীরুদ্দীন (জয়পুর) মুরাদ খাঁ (দেবাস) জমালুদ্দীন (বরোদা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) বনারস ঘরাণা ঃ মনোহরজী বীণকার থেকে শুরু তস্য পুত্র স্বর্গীয় লছমীপ্রসাদ মিশ্রই এই ঘরাণার শেষ ধারক ছিলেন ও তাঁর সঙ্গেই এই ঘরাণার বীণ শেষ।

(৫) ডাগুর বা উদয়পুর ঘরাণা ঃ এই ঘরাণার জীয়া মহীউদ্দীন ডাগুর বর্তমানে খ্যাতনামা বীণকার ও তাঁকেই এই ঘরণার প্রবর্তক বলা চলে।

(৬) কিরাণা ঘরাণা ঃ বন্দে আলি খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘরাণা শেষ।

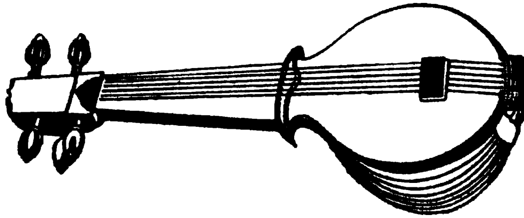


মত্তকোকিলাবীণা

মত্তকোকিলাবীণা ঃ সঙ্গীত রত্নাকরের ভাষ্যকার এই বীণাকে "সর্বাসাং বীণানাং মধ্যে মুখ্যা" বলেছেন। মহারাণা কুম্ভ তাঁর সঙ্গীতরাজ নামক পুস্তকে এই বীণাকে স্বরমণ্ডল বলেছেন। এই বীণাতে একুশটি তার রাখা হত। কোন কোন সঙ্গীতপণ্ডিত মনে করে থাকেন যে মত্তকোকিলাতে একশত তার রাখা হত, এবং এই বীণা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভরতের গ্রন্থে জানা যায় যে

মত্তকোকিলা বীণায় একুশটি তার রাখা হত।* একুশটি তার তিনসপ্তকে বাঁধা হত। ভরতের কালে কোন বীণাতেই পর্দা থাকত না। প্রত্যেক স্বরের জন্য আলাদা আলাদা তার রাখা হত। মহতীবীণার তারসংখ্যার ক্ষেত্রেও কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে মহতীতে একশোটি তার রাখা হত। প্রাচীন এই বীণা স্বরমণ্ডল বা পিয়ানোজাতীয় বিদেশী যন্ত্রগুলির আদি, একথা কানন ও স্বরমণ্ডলের কথায় লিখেছি। (স্বরমণ্ডল দেখুন)

মহাবীণা : সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে ও পরমেশ্বর লিখিত বীণা প্রপাঠক গ্রন্থে মহাবীণার নাম পাওয়া যায়। এটি প্রাচীন ততজাতীয় বীণা। ডান হাতের আঙুলে মিজরাবের আঘাতে ও বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে তার টেনে ও ঘষে যন্ত্রটি বাজান হত, এইটুকু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রেও এই বীণার নাম পাওয়া যায়।



রবাব

রবাব : এশিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির কয়েকটিতে রবাবের আকারের যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। ১৯১৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Mr. Shahinda-র লেখা Indian Music নামক পুস্তকটিতে রবাবকে **রুবেব** বলা হয়েছে এবং **সিকান্দার জুলকোয়ারনিন** এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা এরূপ লেখা আছে। "This is supposed to be the invention of Shikandar Julquarnin"—Page 86"

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে বলা হয়েছে যে এই যন্ত্রের আসল নাম রুবেব এবং আরব দেশের বাস্দ গ্রামের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ **আবদুল্লা খাঁ** সাহেবই এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা নানা প্রাচীন গ্রন্থে রুদ্রবীণা নামে যে যন্ত্রটি দেখতে পাই, পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সেটি

প্রেমং

মুখোং. * পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র দেব বৃহস্পতি মহাশয়ের মতে।

অনেকাংশে বর্তমানে প্রচলিত রবাবের মত এবং রবাব রুদ্রবীণারই অনুসরণ। রবাবের বাজের পদ্ধতিতেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। অনেকের ধারণা ভারতের রুদ্রবীণাই কিঞ্চিৎ আকারভেদে আরবে ও মিশরে **রুবেব** নামে চলতে থাকে এবং সেখান থেকে গ্রীসে আনা হয়, আর তখন এর নামটি রুবেব থেকে পরিবর্তিত হয়ে **রেবেক** নামে চলতে থাকে। ক্যাপটেন উইলার্ড সাহেব বলেছেন যে রুবেব পাঠানদের প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং স্প্যানিশ গীটার ও ম্যাণ্ডোলিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়।[১]

ভারতীয় রবাব, যেটি বর্তমানে ভারতে বাজান হয়ে থাকে, সেটি সংগীতসম্রাট **তানসেনজীর** আবিষ্কার।[২] বর্তমানের রবাব প্রাচীন ভারতের রুদ্রবীণা, কাবুলি রবাব, পারসীয়ার রেবেক প্রভৃতির মিশ্রনে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠেছিল বলে আমাদের ধারণা। তানসেনজী রবাব বাজাতেন ও তাঁর পুত্র বিলাস খাঁ রবাবের সংযোগিতায় গান করতেন এমত শোনা যায়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে **কাসিম উর্ফ কোহবর**-কে রবাবের মত একটি যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়েছে।

অনেক গ্রন্থকারই রবাবকে এরাবিক যন্ত্র বলেছেন, কিন্তু বর্তমানের রবাব সে পর্য্যায়ে পড়ে না কারণ এরাবিক ভাষায় যে কোন ছড় দিয়ে বাজান বাদ্যযন্ত্রকেই রবাব বলা হত।[৩] মিঃ ফারমারও একথা স্বীকার করেছেন। অতএব আজকের দিনের ভারতীয় রবাবকে আকৃতি-প্রকৃতির বিচারে আমরা আগের দিনের এরাবিক রবাবের সঙ্গে এক, একথা বলতে পারি না। আজকের রবাব রুদ্রবীণার অনুসরণ এবং এটি ভারতীয় আবিষ্কার বলেই আমাদের বিশ্বাস।

রবাবের খোল বা হাঁড়ি (ধ্বনিকোষ) সেগুন, গাম্ভার প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। রবাবের খোলের উন্মুক্ত মুখটি চামড়ায় ঢাকা থাকে। আগের দিনে এই তবলি (ধ্বনিপট্টক) গোধার চামড়ায় ছাঁওয়া হত, বর্তমানে ছাগল বা বাছুরের (গোবৎস) চামড়ায় অথবা হনুমানের চামড়ায় ছাঁওয়া হয়। এই চামড়ার ঢাকাকে অনেকে **খাল** বলেন।

১। Music of India—N. Augustus Willard.

২। রুবাব যন্ত্রের ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বীণকার, "তৌর্য্যত্রিক" বিশেষ শারদ সঙ্কলন—১৯৬৮।

৩। Studies in Oriental Musical Instrument By Henry Gorge Farmer. M. A, PhD. (1931 Dr. mus, Cats. London)

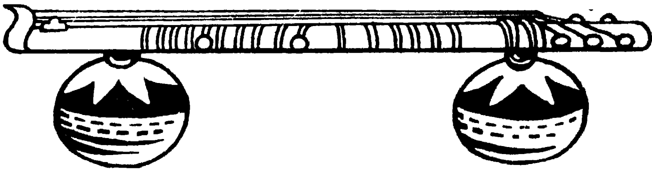
এই যন্ত্রে কোন ধাতুর তৈরী তার ব্যবহার করা হয় না। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে সাধারণ রবাবে ছয়টি তাঁতের তার রাখা হত এবং কোন কোন রবাবে ১২টি বা ১৮টি তারও রাখা হত। যে সব ক্ষেত্রে বেশী তার ব্যবহৃত হত সেক্ষেত্রে ধাতব (লোহা বা তামার) তার ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়। এই যন্ত্রের তবলির (চামড়ার ছাউনির) ওপর একটা সওয়ারী (তন্ত্রাসন) থাকে যার ওপর দিয়ে তাঁতের তারগুলি যন্ত্রের মুক্তপ্রান্তে রাখা ছটি বড় বড় কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে। তারের আগাগুলি যেমন কাণের সঙ্গে বাঁধা হয় তেমনি প্রতিটি তারের গোড়া খোলের শেষপ্রান্তে রাখা পনথির সঙ্গে বাঁধা থাকে। পনথি ধাতু, হাড় বা শিং-এ তৈরী হয়।

তাঁতের তারগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় **তান্তবতন্ত্রী** বলা হয়। যন্ত্রে রাখা ছয়টি তারের মধ্যে প্রধান তারটি অর্থাৎ ১নং তার যেটিকে রবাবীরা **জির** বলেন সেটি মুদারা সপ্তকের পঞ্চমে, ২নং তার যেটিকে **মিয়ান** বলা হয় সেটি মুদারা সপ্তকের ঋষভে, ৩নং **সুর** নামে ব্যবহৃত তারটি মুদারার ষড়জের সঙ্গে, ৪নং **মন্দ্র** নামক তারটি উদারার পঞ্চমের সঙ্গে, ঘোর নামে পরিচিত—৫নং তারটি উদারার গান্ধারের সঙ্গে এবং ৬নং **খরজ** নামের তারটি উদারার ষড়জের সঙ্গে মিলান হয়। রাগ বিশেষে উক্ত তারগুলির স্বর বাঁধার কিছু রদবদল হয়ে থাকে। রবাব কাঁধে তুলে দু পায়ের মাঝে ডাঁড়িটা রেখে বাঁ হাতের আঙ্গুলে নখের মত মাছের আঁশ বেঁধে অথবা আঙ্গুলে স্বাভাবিক নখ বড় রেখে সেই নখ দিয়ে দানডির পটরির ওপর তার দাবিয়ে ও ঘষে বাজান হয়। এর মীড়ের কাজও ঘষেই বার করা হয়। বাজাবার সময় ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল দিয়ে তেকোণা এক ফলক শক্ত করে ধরে তারে আঘাত করতে হয়। এই ফলকটিকে **জওয়া** বলা হয়। বাংলায় অনেকে এটিকে জবা বলেন, সেটি ঠিক নয়, জওয়া শব্দটি ফারসী শব্দ বলা হয়। এই জওয়া চন্দন কাঠ, নারিকেলের মালা অথবা বাঁশের টুকরা থেকে তৈরী হয়।

রবাবে ঘা দিয়ে বাজাবার বৈশিষ্ট্য এই যে জওয়ার ঘাগুলো কোলের দিকে না হয়ে বেশীর ভাগ বার দিকেই হয়। রবাবে গত্ তোড়া বাজানো কঠিন। এটি মধ্যলয়ের আলাপের যন্ত্র হিসাবেই খ্যাত। আলাপে মধ্ জোড়ের কাজ অতি সুন্দর হয়, আলাপের নানা ছন্দ ও লড়ির কাজই রবাবের বাজের বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো এর নিবদ্ধ ঝালায় পখাবজের সঙ্গত চলে। সঙ্গতের সময় এর তবলিতে চাঁটি দিয়ে চপক বোল বাজান হয়। আজকাল চপক বোল বাজাতে

শোনা যায় না। এতে ঝালার কোন বিশেষ তার থাকে না তাই সুরের তারে ঘা দিয়ে ঝালার কাজ চালানো হয়।

অতীতে নামকরা রবাবীদের মধ্যে উস্তাদ জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ প্রভৃতি গুণীরা রবাবী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আবার সুরশৃঙ্গারেও এঁরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরে সাদিক আলি, বাহাদুর হুসেন, বড়কু মিঞা ও মহম্মদ আলি প্রভৃতির নাম শোনা যায়। এর পরে নামকরা রবাবী হিসাবে আমরা উস্তাদ কাশেম আলি খাঁর নাম পাই। তার দ্রুত লড়ি ও জোড়ের কাজ অতুলনীয় ছিল। বর্তমানে কলিকাতায় মৈমনসিং গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রবাব বাজান। ইনি রবাবের আলাপের যথার্থ তালিম পেয়েছেন মহম্মদ আলি খাঁ প্রভৃতি গুণীদের কাছে। মহম্মদ আলির পৌত্রপ্রতিম সৌকত আলি খাঁও রবাব বাজাতেন। রবাবের বাদ্য আজ প্রায় লুপ্ত, যন্ত্রটিও অবহেলিত। যে দু একজন গুণী আজও রয়েছেন তাঁদের রবাব বাজনা রেকর্ড করে রাখা উচিৎ।



রঞ্জনী বীণা

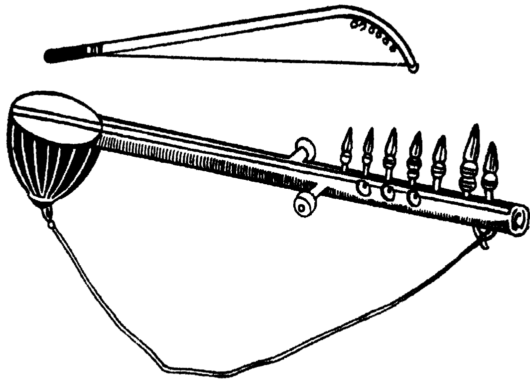
রঞ্জনী বীণাঃ রঞ্জনী আজ মনোরঞ্জনে অক্ষম ও লুপ্ত।—এটি অবিকল মহতী বীণার মত দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোট। মহতীর মতই এর দানডির দুপাশে দুটি লাউ থাকে। দানডি গোলাকার ও কাঠে তৈরী। মহতী বীণার কায়দায় এতে সাতটি তার রাখা হত এবং পদাগুলি মোমদিয়ে জমান থাকতো। যন্ত্রকোষে এর নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি বেশী দিনের প্রাচীন নয়।

রাভাণা বা রাবণাস্ত্রম ঃ অতি প্রাচীন ধনুযন্ত্র বিশেষ। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এর নাম পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ এই বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা। ঐতিহাসিকেরা রাবণের সময়কাল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। এ বিষয়ে যন্ত্রকোষে লেখা আছে—"রাবণাস্ত্রম নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি পুরাতন ধনুস্তত যন্ত্র আছে তাহা প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি

রাবণ নির্মাণ করিয়া স্বনামে প্রসিদ্ধ করেন। চীনের উর্‌হীন, জাপানের কোফিও হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব্য ও পারস্যের কেমানজে ও রবাব এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিরূপ যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা কতক সম্ভবপর।" এখন ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে ফেটিস সাহেবের যে উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি লিখছি।

"Hindoostan is the country whence we derive the most ancient monuments of a well developed language of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thoughts have their expression, of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensibility of natives find expression—Hindoostan has, it appears, been the birth place of the instruments played with bow and has made them known to other parts of Asia. This does not admit of a moments doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakable marks of their Indian origin. If we wish to find the instruments played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find in the Ravanastram, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed." Translated from—Antoine Stradivery Precede-de Rscherches histori-quest creliques sur L' Origine et les Transformation des instruments a Archet of M. Fetis.

ফেটিস সাহেবের এই উক্তি প্রমান করে যে ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল দেশের সকল প্রকার ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত ঐতিহাসিক মঁসিয়ে সনিরাট (M. Sounerat)-এর কথাও প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষই সমস্ত ধনুর্যন্ত্রের উৎপত্তির আদি উৎস। যন্ত্রকোষের উক্তি উদ্ধৃতির সময় একথা লেখা হয়েছে। রাবণহাতো যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা রাভানার বিষয় উল্লেখ করেছি।



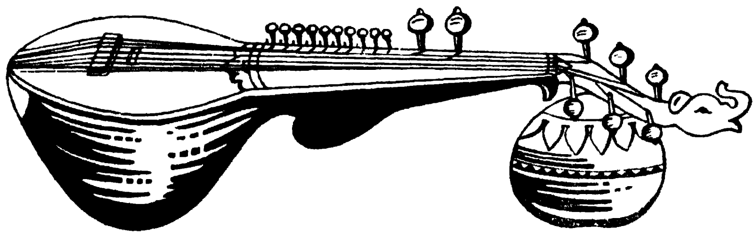
রাবণহাতো

রাবণহাতা বা রাবণহাতোঃ রাবণহাতা গুজরাটে ও রাজস্থানে সমধিক প্রচলিত। রাবণহাতা নামটি আমাদের মনে সন্দেহ জাগায় যে এই যন্ত্রই হয়ত অতীত রাভানার অনুকরণ। বিচারের ভার প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের হাতে ছেড়ে আমরা এর ব্যবহারিক বিষয়ের কথা বলি।

* রাবণহাতা যন্ত্রটির ধ্বনিকোষ অর্থাৎ হাঁড়ি বা খোলটি আধখানা শুকনো শাসহীন বড় নারিকেলের মালা থেকে তৈরী হয়। এই হাঁড়িতে লাল, পাটকিলে বা কাল রং-এর পালিশ করা থাকে। হাঁড়ির খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এই চামড়ার ঢাকা অর্থাৎ তবলিটি মজবুত সুতার টানা দিয়ে হাঁড়ির তলদেশে বাঁধা থাকে। দুফুট আন্দাজ বাঁশের সরু কঞ্চির তৈরী একটি দানডি হাঁড়ির সঙ্গে আটকানো থাকে। দানডির মুক্তপ্রান্তে দশ বারটি কান থাকে। এই কানগুলির সঙ্গে ১০।১২টি তরফের তার বাঁধা হয়। দুটি প্রধান তারও এই বাঁশের মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে; তারগুলির গোড়া হাঁড়ির নীচে পনথির সঙ্গে বাঁধা হয়। এর প্রধান তার দুটির মধ্যে প্রথমটি পাকা ষ্টীলের ও দ্বিতীয়টি বালামচির তৈরী। ছাতার হাতলের মত বেঁকান বাঁশের বা, সরু

* নারদ কৃত সঙ্গীত মকরন্দে রাবণীবীণার নাম পাওয়া যায়। 'উড্ডীশ মহাযন্ত্রোদয় তন্ত্রে যোলটি বাদ্যযন্ত্রের নামের মধ্যে রাবণ-হস্তক নামটি পাওয়া যায়। সেটি এই রাবণহাতা হতে পারে।

কাঠের তৈরী ছড় দিয়ে যন্ত্রটি বাজান হয়। ছড়টির সামনের দিকে বালামচি লাগান থাকে। ছড়ের হাতলের কাছে কয়েকটি ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকে। যন্ত্রটি বাজাবার সময় এই ঘুঙুর থেকে মৃদু ঝুমঝুম শব্দ প্রকাশ পায়। যন্ত্রের দানডি সামনের দিকে লম্বা করে, হাঁড়িটি চিং করে বাঁদিকের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ডান হাতে ছড় ধরে সেই ছড় দিয়ে বাজান হয়। চার পাঁচটি স্বরাশ্রিত দেশী গীত ছাড়া এতে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজতে শোনা যায় না। এটি এক প্রাচীন ধনুস্তত গোষ্ঠীর গ্রাম্য যন্ত্র।



রুদ্রবীণা

রুদ্রবীণা: অনেকে রবাব যন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে থাকেন। রাজা সাহেবের যন্ত্রকোষ গ্রন্থটিতে রবাবকে রুদ্রবীণা বলা হয়েছে। স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে যন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে বাজাতেন সেটি প্রচলিত রবাব থেকে ভিন্ন ধরণের। সঙ্গীত মকরন্দের ২২ পৃষ্ঠায় উনিশটি বীণার নামের মধ্যে আমরা রৌদ্রীবীণার নাম দেখতে পাই, রুদ্রবীণা সেটির নামান্তর বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর "উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত" নামক পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: এই বীণার বাদন দণ্ডটি ছিল লম্বায় ৪ ফুট। এতে দুটি তুম্বাযুক্ত হতো। মূলতন্ত্রী ছাড়া দুটি শ্রুতিতন্ত্রী থাকতো। এই বীণার জোয়ারী বা রণনের জন্য সওয়ারী এবং তন্ত্রীর মধ্যে পাকা বাঁশের খুব পাতলা একটি ছিলা দেওয়া থাকতো। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে এই বীণায় আঠারটি পর্দা ছিল। আমরা উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত রুদ্রবীণার আকারের সঠিক মিল দেখি না। বর্তমানে রুদ্রবীণার আকারে সুরশৃঙ্গারের কিছু ভাব দেখা যায়। রবাবের ও শরোদের আকার-ভাবও কিছু আছে। অতীতে এই রুদ্রবীণা হয়ত ঈষৎ আকারভেদে প্রচলিত ছিল এবং সুরশৃঙ্গার, রবাব, শরোদ প্রভৃতি

যন্ত্র এই যন্ত্রের অনুকরণেই গড়ে উঠেছিল। অনেকে এটিকে হস্তিশুণ্ড বীণা বলে থাকেন। এসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প শোনা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুর-বধের সময় অসুরের হস্তির মাথা কাটিয়া সেই মস্তক এবং অস্ত্রাদি দিয়া এই বীণা সৃষ্টি করেন। দেবতার রোষের সময় এই বীণার জন্ম বলেই এর নাম রুদ্রবীণা এবং হাতীর মাথা থেকে তৈরী হয় বলে এর নাম হস্তিশুণ্ডবীণা বলা হয়। রুদ্রবীণা যন্ত্রটি একখানা কাঠে তৈরী, হাঁড়ি ও দাণ্ডি সমস্তই এক কাঠের। হাঁড়ির ঢাকা (তবলি) পাতলা কাঠের তৈরী। দাণ্ডির ঢাকা কাঠের, তার উপর ষ্টীলের পাতলা পাত মোড়া থাকে। কলিকাতার যাদুঘরে তবলিতে চামড়ার ঢাকা দেওয়া একটি রবাব যন্ত্রের প্রকারান্তর রুদ্রবীণা নামে রাখা আছে। ডানহাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঠেকনোয় মিজরাব ধারণ করে তারে আঘাত দিয়ে এই যন্ত্র বাজানো হয়। ধারণের কায়দা: বাঁদিকের কাঁধে দাণ্ডির মুক্তপ্রান্ত রেখে হাঁড়িটি ডানদিকের কোলের নীচে কোলের ঠেস দিয়ে ধরা হয়। আমরা রুদ্রবীণার যে ছবিটি এখানে দিয়েছি সেইরূপ বীণাই শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রুদ্রবীণা নামে বাজাতেন। ভারতের বেতার প্রতিষ্ঠানও এই আকৃতি ও অবয়বযুক্ত বীণাকেই রুদ্রবীণা বলে অনুমোদন করেছেন।* উত্তর ঘরাণার জায়া মহিউদ্দীন ডাগর সরস্বতী বীণাকে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত মহতী বা নারদীয় বীণাকে রুদ্রবীণা বলে থাকেন। কিন্তু সেটি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না।

---

* RUDRAVEENA

79/1, Haris Chatterjee Street
Bhawanipur
Calcutta 7. 3. 1951

Dr. Pramathanath Banerjee
(Doctor of Music)

To speak of Rudraveena I must admit that I got the model design and teachings of it from my most regarded Ostad Late Wazir Khan Saheb Veenkar of Rampore State. The model and process of playing over it is quite different to the present Sursringer.

Pramathanath Banerjee
Chairman of the Music Advisory Committee
All Bengal Music Conference

পত্রটি শ্রীযুত ললিতমোহন পাল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। রুদ্রবীণার ছবিটির sketch তদীয় ছাত্র শ্রীমন্মথনাথ হালদারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত।

তার সন্নিবেশ ও সুর বাঁধার নিয়ম ঃ

১ নং তার—মুদারার 'প' অথবা 'ম' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।

২ নং „ —মুদারার 'র' অথবা 'গ'-এর সঙ্গে মিলান হয়।

৩ নং „ —মুদারার 'স' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।

৪ নং „ —উদারার 'প' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।

৫ নং „ —উদারার 'র' বা 'গ' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।

৬ নং „ —উদারার সুরে মিলান হয়। ('স' স্বরে)

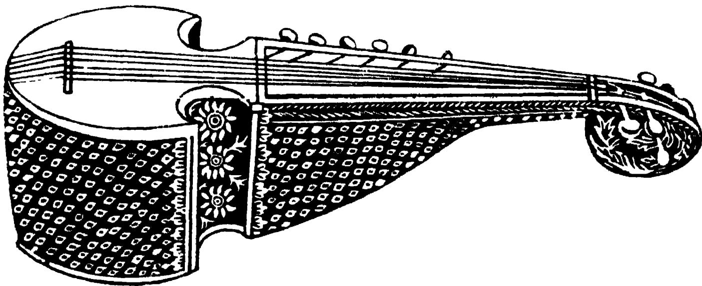
৭ নং „ —অতি উদারার 'প' অথবা 'গ' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়।

৮ নং-এ (তিনটি তার থাকে)—রাগ হিসাবে বাদী সম্বাদী ও জুড়িতে তিনটি তার মিলান হয়।

৯ নং (দুটি তার)—চিকারী মুদারা ও তারার 'স'-এর সঙ্গে দুটি তার মিলান হয়।

১০ নং (সাত বা আটটি তার)—এগুলি তরফের তার, রাগানুযায়ী স্বরে বাঁধার নিয়ম।

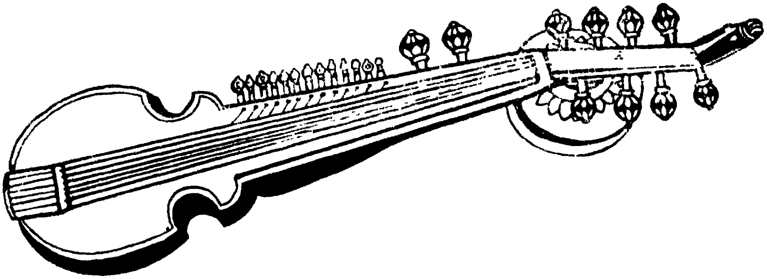
জানা যায় স্বর্গীয় প্রমথবাবু প্রমুখ বীণ-বাদকেরা এইভাবেই তার লাগাতেন ও উপরোক্ত স্বরে সেগুলি বাঁধতেন। অনেক সময়ে বাজিয়ের ইচ্ছামত রাগানুযায়ী স্বরে তারগুলি বাঁধা হয়।



পূর্বেকার শরোদ

শারদীয় বীণা অথবা শরোদ ঃ এই যন্ত্রকে আমরা স্বরোদ, সরোদ অথবা শরোদ নামে প্রচলিত দেখতে পাই। আফগানিস্থানে ও আরব দেশে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি "**যান্ত্রিক**

যন্ত্র”[১] নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজারা শিকারাভিযানে বা বিদেশ ভ্রমণে হাতি বা উটের পিঠে এই যন্ত্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখতেন। শরোদীরা অনেক সময় এই যন্ত্র বাজিয়ে সভায় গান করতেন। তখনকার দিনে এই যন্ত্রটি অনুগতসিদ্ধ যন্ত্ররূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে শরোদের পটরিতে প্লেট বসান হত না, কাঠের পটরির ওপরই তাঁতের তার দাবিয়ে বাজান হত (রবাবের অনুকরণে)। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি চালু হওয়ার পর থেকেই শরোদে লোহার প্লেট ও ধাতুর তার ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় শরোদবাদক উস্তাদ হাফেজ আলি বলতেন যে তাঁর প্রপিতামহ বঙ্গস গুলাম বন্দগী খাঁ হিন্দুস্থানে এটি প্রথম রবাবের আকারে নিয়ে আসেন[২]



বর্তমান শরোদ

এবং পরে এটিকে শরোদে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন যে গুলাম বন্দগী খাঁই গোয়ালিয়রের গোলামালি শরোদি। অনেকে বলেন যে আসাদ উল্লা খাঁ সাহেব[৩] উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে প্রথম এই যন্ত্র চালু করেন এবং সেই কারণে শরোদ প্রস্তুতে বাঙ্গলাদেশই পথিকৃৎ এবং বাঙ্গলাদেশেই এই যন্ত্রের প্রচলন বেশী।

মিশরদেশে এই যন্ত্রটি **গুস্যা** নামে প্রচলিত। কাবুলে এখনও এই যন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। সেখানে এটিকে **শারুদ** বলা হয়।[৪] এই শরোদ বা শারুদ শব্দটি কাবুলি শব্দ। কাবুলি শরোদ আকারে একটু ছোট, কাবুলে

১। যন্ত্রকোষ—রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। “হিন্দুস্থানী বাদ্য শরোদ”—প্রোঃ চন্দ্রকান্তলাল দাস, হিন্দী “সঙ্গীত” মাসিক-পত্রিকার ১৯৬১ জুন মাসের সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। Music Instrumens of India By S. Krishnaswamy, page 48.

৪। “জনপ্রিয় যন্ত্র স্বরোদ”—মাসিক তৌর্যত্রিক—কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গৌরীপুর)।

এগুলি আখরোট কাঠে তৈরী হয়। শরোদ সীজন করা সেগুন কাঠে, (Burma Teak) তুঁত কাঠে অথবা গাম্ভার কাঠে তৈরী করা হয়। শরোদের হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষ (Belly or Drum) চামড়ায় ঢাকা থাকে। এই চামড়ার তবলির ওপর তন্ত্রাসন অর্থে সওয়ারী (Bridge) রাখা থাকে। বড় একখানা কাঠ থেকেই যন্ত্রটি (এক কাঠের) তৈরী করা হয়। বর্তমানে প্রমাণ সাইজের শরোদ তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা হয়। হাঁড়িটা এক ফুট মাপের অর্ধগোলাকার এবং পিছনের দিকটা চ্যাপ্টা থাকে। হাঁড়ির গলাটি সরু করে দানডির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। দানডির মুক্তপ্রান্তে প্রধান কাণগুলি রাখা থাকে। হাঁড়িতে খাল কেটে ফাঁপা করা হয়, দানডির বাজাবার জায়গায় ষ্টীলের পাত বসান হয়। আজকাল দানডির মুক্তপ্রান্তের পশ্চাৎ দিকে একটি তুম্বও রাখা হয়, এগুলি লাউয়ের খোলা বা কাঠে বা অন্য কোন ধাতুতে তৈরী করা হয়। হাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝখানে একটা ত্রিকোণ ফলক রাখা থাকে, যাকে বলা হয় পনথি। এই পনথিতে সমস্ত তারের গোড়া বাঁধা থাকে। তারগুলি ব্রিজের ওপর দিয়ে দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

রবাবের মত এটিও পর্দাবিহীন যন্ত্র। রবাবে কেবলমাত্র আলাপ বাজান হয় কিন্তু শরোদে প্রধানত গত্‌তোড়াই বাজে, তবে আজকাল এতে আলাপও বাজান হয়। বর্তমানে শরোদে তরফের তার রাখায় সুরের রেশ বাড়ে। আজকের দিনের শরোদ স্বতঃসিদ্ধ ততযন্ত্ররূপেই সঙ্গীতাসরে বেজে থাকে। রবাবের মত প্লেটের ওপর তার দাবিয়ে ধরে বা ঘষে বাজান হয়। এই জওয়াকে ইংরাজীতে Plectrum বলা হয়। শরোদে জওয়াটি ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল (তর্জনী) দিয়ে চেপে ধরে তারে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতে প্লেটের ওপর দিয়ে তার চেপে ধরে স্বর বার করা হয়। বর্তমানের শরোদে সেতারের মত দুটি চিকারীর তারও রাখা হয় এবং চিকারীর সাহায্যে গতের শেষে ঝালাও বাজান হয়। অনেকে এতে তারপরণও বাজিয়ে থাকেন। আবার রবাবের অনুকরণে হাঁড়ির চামড়ার ঢাকার ওপর চাঁটি দিয়ে "চপক" জাতীয় বোলও ক্বচিৎ বাজান হয়। মনে হয় শরোদ রবাবের অথবা রুদ্রবীণার উন্নত সংস্করণ। রবাব বা রুদ্রবীণাকেই এর আদি উৎস বলা যায়। শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্রের আবিষ্কৃত **মোহন বীণা সম্বন্ধে** দ্বিতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা রইলো।

অতীতে শরোদ যন্ত্রে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের

গোলাম আলি ও তাঁর পুত্র হুসেন খাঁ, মোরাদ আলি খাঁ, লক্ষ্ণৌ-এর নিয়ামতুল্লা, রামপুরের মজরু খাঁ, ফিদা হুসেন, এনায়েৎ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আবদুল্লা খাঁ ও তাঁর পুত্র আমির খাঁ (কলকাতা), করমতুল্লা ও আসাদউল্লা (কৌকভ খাঁ) প্রভৃতি। পরে উস্তাদ আলাউদ্দীন, উস্তাদ হাফিজ আলি প্রভৃতি। বর্তমানে উঃ আলি আকবর, উঃ ওমর খাঁ, উঃ আমজাদ আলি খাঁ, উঃ বাহাদুর খাঁ, শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীযুত শ্যাম গাঙ্গুলি, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত তিমিরবরণ ও স্ত্রীবাদিকাদের মধ্যে শরণরাণী মাথুর ও জারিণ দারুওয়ালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উদীয়মানদের মধ্যে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও আশীষ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

আসন—সাধারণত বাবু হয়ে বসাই শ্রেয়। আসন গুরুর উপদেশ মত হওয়া উচিৎ।

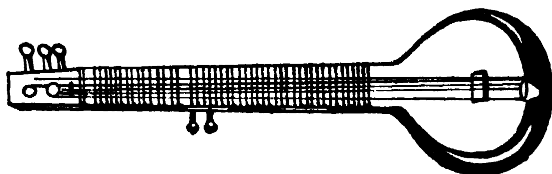
ধারণ—ডানদিকের উরুর ওপর কোলে হাঁড়ি রেখে তার ওপরে আলগাভাবে পেটের চাপ রাখতে হয় যাতে বাজনাটি না নড়ে। যন্ত্রের পেছনদিক বুকের দিকে রেখে দানডিটি বাঁহাতের দিকে নিচু করে ধরা হয়। বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুল পেছনে ঠেস হিসাবে আলগা রাখা হয়। পনথীর কাছে হাঁড়ির ওপর ডানহাত রেখে কব্‌জি চার পাঁচ আঙ্গুল বার করে রাখতে হয়।

তার সন্নিবেশ ও স্বর মিলান—শরোদের পাঁচটি প্রধান তারের মধ্যে প্রথম ও প্রধান অর্থে নায়কী তারটি ঈপ্সিত স্বরের মধ্যমে বাঁধা হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বরের তারের মধ্যমে বাঁধা হয়। দ্বিতীয় তার মুদারার সা এ অর্থাৎ সড়জের সহিত মেলান হয়, অর্থাৎ যে স্বরে আপনি বাজাতে চান সেই ষ্টার্ণ্ডাড স্বরে। তৃতীয় তার দ্বিতীয়ের খাদ পঞ্চমে অর্থাৎ উদারার প এ। চতুর্থ তার উদারার মধ্যমে অর্থাৎ খাদের ম এ এবং পঞ্চম তারটি উদারার ষড়জ অর্থে খাদের স স্বরের সহিত মেলান হয়। ঘরানা হিসাবে তার রাখা ও বাঁধার কায়দা অথবা তারের সাইজের কিছু রদবদল লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত প্রধান তারটি বাজার চলতি $\underline{00}$ নং তারে ও জি সার্পের স্বরে মেলান হয়। এছাড়া ৪ গাছা তরফের তার আলাদা সওয়ারী রেখে তাতে জোয়ারী খুলে "জোয়ারী তরফ" করা হয়। বাকী ২ গাছা চিকারীর তার ($\underline{000}$ ষ্টীলের তার) রাখা হয়। ১১ থেকে ১৩ গাছা তরফের তার রাখা হয়। এগুলি বাদক নিজের ইচ্ছামত রাগানুযায়ী স্বরের সহিত মিলিয়ে বাঁধেন। আজকাল অনেকে শরোদে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের জন্য ইলেকট্রোমেটাল তার ব্যবহার করেন।

বাদন ঃ আগেই বলা হ'য়েছে যে ডান হাতে জওয়া বা কোনস্ দিয়ে ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতের তর্জনী ও মধ্যমার নখ দিয়ে প্লেটের ওপর তার চেপে ধরে বা ঘষে স্বর বার করা হয়। ত্রিকোণ জওয়ার মাঝখানটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে শক্ত করে ধরে মুখের সরু কোণটি দিয়ে তারে আঘাত করা হয়। বাঁহাতের চারটি আঙ্গুলই বাজাবার সময় শরোদের তারের ওপর চালান হয়।

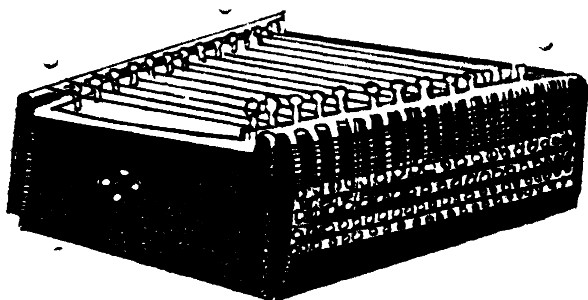
বোল ঃ সেতারের মত শরোদেও নানা কাল্পনিক বোলের ব্যবহার দেখা যায়। ডা, রা, দ্রেরে, ডারডা ইত্যাদি বোলের ব্যবহার রয়েছে। তবে সেতারে যেমন কোলের দিকে ডা ও বাইরের দিকে রা হয়, শরোদে ঠিক তার বিপরীত। শরোদে তারের ওপর থেকে বাইরের অর্থাৎ নীচের দিকে ঘা দিলে 'ডা' ও বাইরের দিক থেকে অর্থাৎ তারের নীচে থেকে ওপরের দিকে ঘা দিয়ে তুললে হয় 'রা'। যুক্ত বোলগুলিও ঠিক একই নিয়মে বার করা হয়। চিকারীর আঘাতকে 'রা' বলা হয় ঠিক সেতারের মতই।

জওয়া বা কোনস্ ঃ তারের ওপর ঘা দেওয়ার জন্য ডান হাতে যে বস্তুটি ধরে তারে আঘাত করা হয় সেটিকে জওয়া বলে। জওয়া শব্দটি ফারসী শব্দ বলে অনেকে বলে থাকেন। ইংরাজীতে এটিকে plectrum বলা হয়। এটি চন্দন কাঠের টুকরা, কাঠের টুকরা বা নারকেলের মালা থেকে তৈরী হয়। পাকা তারে বা মোটা প্লাষ্টিকেও জওয়া তৈরী হয়।



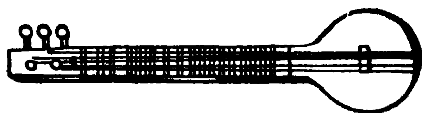
শ্রুতিবীণা

শ্রুতিবীণা ঃ প্রাচীনকালে একটি বীণাতে কীলকের সাহায্যে পরপর অনেকগুলি তার বাঁধা হত এবং প্রথম শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনি থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ স্বরে তারগুলি বাঁধা হত। এই ভাবে চব্বিশটি বা তদূর্দ্ধ তার দিয়ে শ্রুতিনির্ণয় করা হত। বর্তমানে পর্দা-সন্নিবেশে শ্রুতিনির্ণয় করা হয়। শ্রুতিনির্ণয়ে সাহায্য করে বলেই এর নাম শ্রুতিবীণা।



সন্তুর

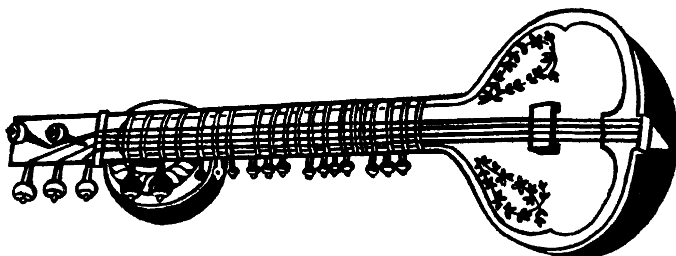
সন্তুর—সন্তুর সভ্যততযন্ত্র বলে পরিচিত। কাত্যায়নী বীণার অনুকরণ। আকারে কানুনের মতই। প্রতিটি স্বরের জন্য এক জোড়া করে তার রাখা হয় এবং আঙ্গুলের ঘা এর পরিবর্ত্তে কাঠির ঘা দিয়ে বাজান হয়। ভারতে কাশ্মীর অঞ্চলেই এর প্রচলন বেশী এবং সেখানে গানের সঙ্গতে যন্ত্রটিকে অনুগতসিদ্ধ যন্ত্ররূপেই বাজতে দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এর প্রচলন আছে। স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে তবলার সহযোগেও বাজাতে শোনা যায়। দ্রুত বাজনার সময় এর স্বর প্রায় জ্যাবড়া শোনায় কারণ এক আঘাতের অনুরণন মিলিয়ে যাবার আগেই অন্যস্বরে ঘা পড়ে তাই বিভিন্ন স্বরের একত্র অনুরণনে ভিন্ন ভিন্ন স্বরধ্বনি পরিষ্কার শোনা যায় না। কানন যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমরা সন্তুরের কথা বলেছি। কাশ্মীরী সন্তুরে একশতটি পর্য্যন্ত তার রাখা হয়।



সাধারণ সেতার

সেতার বা সপ্ততন্ত্রী বীণা—ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে তাঁর দরবারগায়ক সন্ত নিজামুদ্দিনের শিষ্য আমীর খসরুকে সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়। কারও কারও ধারণা যে সেতার যন্ত্রটি পারস্য দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। কিন্তু একাধিক সঙ্গীত গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে আমীর খসরু তানপুরা ও বীণার সংযোগে সেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

আমাদের ভারতবর্ষে নানাপ্রকার বীণা প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে ভারতের সঙ্গে পারস্যের বানিজ্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সময় বহুপ্রকার ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানি ও সেখানকার যন্ত্র ভারতে আমদানি করা হত। সেই সময় ভারতীয় বীণা পারস্যে সেতার নামে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। আমীর খস্রুর প্রবর্তিত এই সেতার ভারতীয় ত্রিতন্ত্রীর নামভেদ মাত্র। তিনি ত্রিতন্ত্রী নাম বদলে সেতার নাম রাখলেন।[১] পারসিক সহ শব্দের অর্থ তিন, এবং তার শব্দের অর্থ তন্ত্র অর্থাৎ ত্রিতন্ত্রীর পারসিয়ান নাম সেতার রাখা হ'ল। পরে সেতারে আরও চারটি তার সংযুক্ত হওয়া সত্বেও সেতার নামেই সে পরিচিত



তরফদার সেতার

রয়ে গেল। আমীর খস্রু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজদরবারের লোক, তা ছাড়া তিনি কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী ও রাজনীতিক ছিলেন; সুতরাং তাঁর দেওয়া নাম বেশী মর্যাদা পাবে এটা মোটেই অসঙ্গত নয়। বড়ই মজার কথা যে এই নাম রাখাকে কেন্দ্র করেই প্রচারিত হয়ে গেল যে আমীর খস্রু সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক, যেটি আমরা স্বীকার করি না। তিনি এই যন্ত্রের প্রচারক হলেও স্রষ্টা বা আবিষ্কারক নন।[২]

মৌর্য্যবংশের ও গুপ্তবংশের রাজত্বকালে ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং সে সময় ত্রিতন্ত্রীবীণা ভারতে প্রচলিত ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন অমর সিংহ দ্বারা রচিত "অমর কোষ" নামক

১ আমরা ত্রিতন্ত্রী বীণা লেখার সময় যে আকার দিয়েছি সেটিই যে আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্রী ছিল তা বলা যায় না। কারণ ত্রিতন্ত্রীর সঠিক আকার আমরা পাইনি। তাই প্রচলিত আকার দেওয়া হয়েছে।

২ অনেকের ধারণা হিন্দু রাজত্বকালে সেতার সেতার নামেই প্রচলিত ছিল। মোগল আমলে সেটি বীণ সেতার নাম পেয়েছিল।

প্রামাণিক গ্রন্থে সাততারযুক্ত **পরিবাদিনী** বীণার নাম পাওয়া যায়, এটিকেও পণ্ডিতেরা সেতার বলেন। সেতারের প্রাচীন আর এক নাম **মরুযন্ত্রী**। **সপ্ততন্ত্রী** নামেও সেতার প্রচলিত। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা নামক গ্রন্থে ফাকিরুল্লা লিখিত রাগ দর্পণের অনুবাদে গ্রন্থবিবরণের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "সেতার এক প্রকার বীণা। মুঘল যুগে একে বলা হ'ত বীণ-সেহতার।"

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁর "যন্ত্রকোষ" নামক বইটিতেও নানা তথ্য লিখে প্রমাণ করেছেন যে কচ্ছপী বীণা ও সাততারযুক্ত সেতার একই যন্ত্র এবং এই ভারতীয় যন্ত্রটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা যে গ্রীস ও আরবদেশীয় নানা যন্ত্রের মিশ্রণে এই যন্ত্রটির জন্ম কিন্তু সেটি ঠিক নয়। সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের "সঙ্গীত-সার"-এ লেখা হয়েছে "পুরাবৃত্ত বিষয়ক অভিধানকর্তা উইলিয়াম স্মিথ সাহেব বলেন যে সেতার এবং লাইয়র এই উভয়বিধ তারযন্ত্রই এক রকমের দেখতে ছিল এবং বহু প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও আশিয়াস্থ দেশনিচয়ে এদের ব্যবহার ছিল।" সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থকার এফ্. জে. ফেটিস্ সাহেব বার বার স্বীকার করেছেন, "There is nothing in the west which has not come from the East." স্যালভেডর ড্যানিয়েল লিখিত Arab Music and Instruments বইটিতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে কউইত্রা (Kouitra) নামক যন্ত্রটিই পরে কিথারা নাম ধারণ করেছে এবং সেই কিথারা থেকেই গীটারের সৃষ্টি। আবার রীজ সাহেব তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ায় স্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন যে গীটারের আদি উৎপত্তি কচ্ছপী বীণা অর্থাৎ কেচুয়া সেতার থেকে। কাল গ্রেইঙ্গারের Musical Instruments নামক বই থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কিথারা যন্ত্রটিই পারস্যে সেতার নামে প্রচলিত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখেছেন যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চিত্রাবীণা নামে একটি বীণার উল্লেখ আছে। এটিতে সাতটি তার যুক্ত থাকতো। এই বীণায় কোন পর্দা ছিল না, এবং সাতটি তার সাতটি বিভিন্ন স্বরে বাঁধা হত। বৌদ্ধ জাতকে সাততারযুক্ত বীণার উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন যে চিত্রাবীণাটিই সেতার। সেতারকে আমরা কোনমতেই বিদেশজাত বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ভাবতে পারি না। চিত্রাবীণাটি সেতার ছিল অনুমান করে চিত্রা শব্দটি ভিন্নদেশে গিয়ে চিতারা ও কিথারায় পরিবর্তিত হয়েছিল বলা

যায়।*[১,২] এই সমস্ত প্রমাণে আমরা সেতার যন্ত্রটিকে প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারি।

তিনতার যুক্ত সেতার কবে থেকে সাততারের যন্ত্রে পরিবর্তিত হ'ল এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলেন। আকবর বাদ্‌শার সময় বীণ-সেতার বলে যে বাদ্য যন্ত্রটি বাজান হত সেটিই ছিল সেতার একথা আগেই বলেছি। বর্তমানে অনেকে বলেন যে বাদশা মহম্মদ শা ত্রীতন্ত্রীতে (সেতার) আরও তিনটি তার যুক্ত করে সেতারকে ছয়তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করেন। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ায় আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে অপারগ। এ সম্বন্ধে শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় "ভারতীয় সঙ্গীত কোষ" নামক পুস্তকে লিখেছেন—প্রাচীন জয়পুর ঘরাণার লোকের মুখে শোনা যায় যে অমৃত সেনই প্রথমে সেতারে পাঁচটি তার ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণা সেতারী মসিদ খাঁ সাহেবই প্রথমে তিনতারের সেতারে পাঁচ তারের ব্যবস্থা করেন। তখনও সেতারে চিকারীর দুটি তার জোড়া হয় নি। বিখ্যাত সুরবাহারী স্বর্গীয় উস্তাদ গুলাম মহম্মদ সুরবাহার যন্ত্রে চিকারীর তার যোগ করার পর থেকেই সেতারে চিকারীর তার ব্যবহৃত হতে থাকে। সেতারে চিকারীর বাজও সেই সময় থেকেই চলে। তাই অনেকের ধারণা সাততারযুক্ত সেতারের প্রচলন তখন থেকেই। লেখক দিল্লী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে জয়পুরের প্রসিদ্ধ সেতারী হাইদার হুসেনের মুখেও এরূপ কথাই শুনেছেন। হুসেন সাহেবের বাজের মধ্যে চিকারীর বাজ কমই ছিল, মিজরাবের ঘা-ও মৃদু ছিল কিন্তু তিনি অসম্ভব রকমের তৈরী নানা ছন্দের তান বাজাতেন।

আগের দিনে যে বীণাযন্ত্রের অনুকরণেই সেতারের সৃষ্টি হয়ে থাকুক, নামকরণ

* Introduction to the Study of Bharatiya Sangit Sastra by Sri H. Krishnamacharyya in the journal of the Music Academy, Madras Vol. I, January 1930. No. I. P. 12.

১. "The ancient Vina was called Saptatantri, as it had Seven Strings. The present Sitar is a corrupt form of Saptatara as it too has the same number of Chanting Strings. The Vina had some other names too, i, e. Chitra with Seven strings and Vipanchi with Nine Strings. The corrupt forms of Chitra are Citara, Sitara and then Sitar. Chitra became Sitara and Saptatara became Seta both meaning the same."

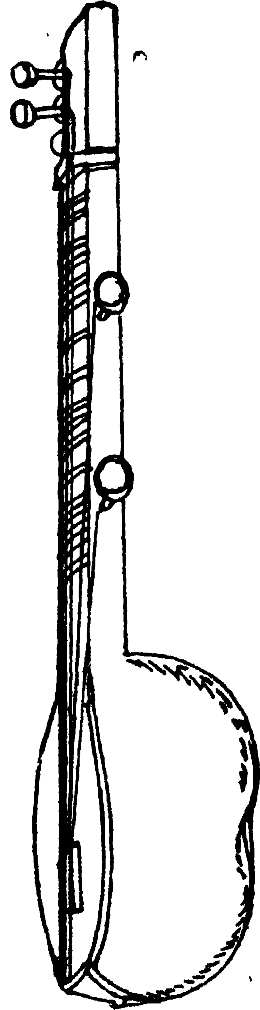
২ চিত্রা বীণাতে যদিও সাতটি তার ছিল তবুও আমাদের মনে হয় এটি ধ্রুব বীণার মতই ছিল এবং এতে কোন পর্দা রাখা হত না।

যিনিই করে থাকুন, সাতটি তারের এবং চিকারীর তারের ব্যবহার যার দ্বারাই প্রচলিত হয়ে থাকুক, একথা অনস্বীকার্য যে আজকের দিনের সেতার বাদন-ভঙ্গিমায় ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে আরও মধুর হয়েছে।

স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রগুলির মধ্যে আজ সে কেবল মাত্র ভারতেই নয় ভারতের বাইরে সুদূর আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এবং চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। ভারতীয় যন্ত্র যে কত মধুর, তার বাদনপদ্ধতি যে কত সুন্দর, তার রাগ বিকাশের ধারা যে কত গভীর, কত সুস্বরপূর্ণ, কত সুতানপূর্ণ, কত রকমের ছন্দবৈচিত্র্যেভরা, সে যে পিয়ানো, গীটার, হার্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলির থেকে অনেক উন্নত তা প্রমাণ করেছে এই সেতার। আনন্দের কথা ভারত থেকে বর্তমানে বহু সেতার আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

কেচুয়া সেতার: কচ্ছপী বীণা লেখার সময় আমরা কেচুয়া সেতারের বিষয় বলেছি। সাত-তারযুক্ত সাধারণ সেতারই খোলের (হাঁড়ির) আকৃতিভেদে কেচুয়া। তার সংখ্যা, বাজাবার কায়দা প্রভৃতি একই প্রকারের। কেচুয়া সেতার বনাম কচ্ছপীর ছবি ও ব্লক সংগ্রহে বিলম্বের কারণে আমরা কচ্ছপী-বীণা লেখার সময় ছবি দুটি দিতে না পারায় এখানে দিচ্ছি।

সেতারের অবয়ব: সমধিক প্রচলিত এই সেতারের অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন অল্প। তাই সাধারণভাবে কিছু বলা হয়েছে।

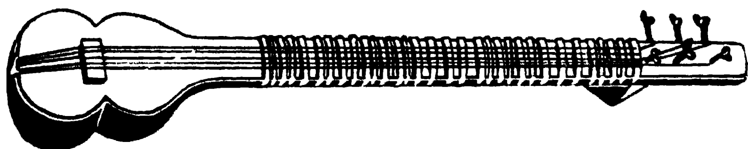


বড় কেচুয়া সেতার বা বৃহৎ কচ্ছপী বীণা (১ম প্রকার)*

* ভুল করে কেচুয়া সেতারের ছবিতে চিকারীর কান দুটি দানডির ডান পাশে রাখা হয়েছে। এ দুটি বাঁ পাশে হবে।

যন্ত্রটি তিন হাত আন্দাজ লম্বা। দুভাগ করলে তলাকার দিকে খোল ও উপরের দিকে দানাডিকে পাওয়া যায়।

দানডিঃ দানাডিকে ডাঁটি বা দাণ্ডা বলা হয়, সাধুভাষায় দণ্ড বলে এবং হিন্দিতে বলে দাণ্ড। দানডির দুটি অংশ। (ক) ফাঁপা পিছনের অর্ধগোলাকার অংশ (খ) পটরী—দানডির মাপের একটি পাতলা কাঠের ঢাকনা। এটিকে সাধুভাষায় বলা হয় **অঙ্গুলিপট্টক** বা **সারিকা স্থান**। পটরীর কাঠটি সমতল ও ঈষৎ



কেচুয়া সেতার বা **কচ্ছপী** বীণা (২য় প্রকার)

উত্তল। তরফদার সেতারে পটরীর ভিতর দিয়ে তরফের তার চালনার জন্য, পটরীর দুপাশ অল্প উঁচু রাখা হয়। তাই তরফদারের পটরী ঈষৎ অবতল (concave)। সেতারের দানাডি সচরাচর সিজন করা সেগুন, মেহগ্নী, তুঁত বা গাম্ভার কাঠে হয়।

খোলঃ দ্বিতীয় অংশটি সেতারের খোল বা হাঁড়ি। হাঁড়িকে হিন্দিতে তুম্বা ও বাংলায় তুম্ব বলে। শুদ্ধভাষায় **ধ্বনিকোষ** অথবা **খর্পর** বলে। খোল তিতলাউয়ের শুকনো খোলা থেকে তৈরী করা হয়। কেচুয়া সেতারের বেলায় খোলটি পেট থেকে আধাআধি করে কাটার ফলে চ্যাপ্টা ধরণের দেখায়। হাঁড়ির উপরের কাঠের ঢাকনাটিকে **তবলি** ও শুদ্ধ ভাষায় **ধ্বনিপট্টক** বলে। দানাড ও খোলের জোড়ের জায়গাটিকে কোমর বলা হয়। কোমরকে চলতি ভাষায় কারিগরেরা 'গুলু' বলে থাকেন।

পনথিঃ হাঁড়ি ও তবলির জোড়ের শেষ প্রান্তে থাকে পনথি। হিন্দিতে একে **লেঙ্গোট** বা **লাঙ্গোজাড়ি** বলা হয়। শুদ্ধ ভাষায় **শালায়নী** আর ইংরাজীতে **টেলপিস্** বলে। হাড়, শিং হাতির দাঁত বা কোন কঠিন ঘন পদার্থ থেকে এই পনথি তৈরী করা হয়। এগুলি লম্বা ত্রিকোন আকারের হয়। সেতারের সমস্ত তারের গোড়া পনথীর সঙ্গে বাঁধা থাকে।

সওয়ারী অথবা ব্রীজঃ তবলির মাঝখানে হাড়, শিং বা হাতির দাঁতের তৈরী পিঁড়ির মত যে সাদা পদার্থটি দেখা যায় সেটি **ব্রীজ**। ব্রীজ শব্দটি ইংরাজী, তাই আমরা একে **সওয়ারী** বলি। সওয়ারী শব্দটি হিন্দি। হিন্দিতে **অনেকে**

সওয়ারীকে **ঘোড়ী** বা **ঘুরচ**ও বলেন। শুদ্ধ ভাষায় এটিকে **তন্ত্রাসন** বা **মেরু** বলা হয়। এই তন্ত্রাসনের ওপরই সেতারের সমস্ত তার ন্যস্ত থাকে। তরফদার সেতারে দুটি সওয়ারী রাখা হয়। বড় সওয়ারীর ঠিক সামনে দানডির দিকে একটি ছোট অপেক্ষাকৃত নীচু সওয়ারী থাকে। এই ছোট সওয়ারীর উপর দিয়ে তরফের সমস্ত তার নিয়ে যাওয়া হয়।

মনকা ঃ তবলির মুক্ত প্রান্তের দিকে পনথীর কাছাকাছি কয়েকটি গোল পদার্থ তারের মাঝে গলান থাকে। এদের বলা হয় **মেনকা** বা **মনকা**। সুর বাঁধার সময় সূক্ষ্মভাবে সুর মেলাবার কারণে এদের ব্যবহার।

আড়ি ও ঘাড়ি ঃ দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান ও পর্দার মাঝে যে দুটি সাদা ফলক দেখা যায় সেদুটিকে আড়ি বলে। আড়ি হরিণের শিং, হাতির দাঁত বা হাড় থেকে তৈরী করা হয়। অনেকে পর্দার দিকের ফলকটিকে **আড়ি** বলেন ও কাণের দিকের ফলকটিকে **ঘাড়ি** বলেন। আড়িকে শুদ্ধ ভাষায় **সরস্বতী** বলা হয়। অনেকে একে **তারগহন** বলেন। আড়ির ওপর দিয়ে পাঁচটি তার যায়। এটা ঘাড়ির থেকে সামান্য উঁচু থাকে। তারকে সংযত করার কারণে ঘাড়িতে (অর্থাৎ ২নং আড়িতে) ছেঁদা করে ছেঁদার ভিতর দিয়ে তার গলিয়ে কাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শুদ্ধ ভাষায় আড়ি দুটিকেও **সেতু** বলা হয়।

পর্দা ঃ দানডির পটরির ওপর চুড়ির মত যে পদার্থগুলি দেখা যায় তাদের পর্দা বলে। পর্দাগুলি লোহা, পেতল, এলমুনিয়াম, জার্মান সিল্‌ভার প্রভৃতি ধাতুর তৈরী। পর্দাগুলি দানডির পিছনের সঙ্গে তাঁত বা মুগার সুতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তাঁতের সুতাকে শুদ্ধ ভাষায় **তান্তব সূত্র** ও রেশমের সুতাকে **পট্টসূত্র** বলা হয়।

সচল ঠাটের সেতারে ১৫ থেকে ১৭ খানি পর্যন্ত পর্দা ও অচল ঠাটের সেতারে ২১।২২ খানি পর্যন্ত পর্দা সাজানো থাকে। সচল ঠাটের কোমল ও কড়ি মিশ্রিত ১২টি স্বরের ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ পর্দা থাকে। বাজাবার সময় কোন পর্দা সরাতে হয় না। ঘরাণা হিসাবে এই পর্দার সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। পর্দাকে হিন্দীতে **সুন্দরীয়া** বা **পর্দে** এবং শুদ্ধ ভাষায় **সারিকা** বলা হয়।

কীলক বা কান ঃ দানডির মুক্ত প্রান্তের শেষের দিকে পাঁচটি কান থাকে সেগুলির সঙ্গে পাঁচটি বিশিষ্ট তার যুক্ত থাকে। কানগুলি কাঠের তৈরী। শিশু, মেহগ্নী ও আবলুস কাঠের কান ভাল হয়। কানকে শুদ্ধ ভাষায় কীলক বলে। আড়ির উপর অংশে দানডির পটরির মাঝামাঝি দুটি কান থাকে ও বাকি তিনটি

আড়ির উপর দিকে দানডির বাঁ পাশে লাগান থাকে। দানডি ছেঁদা করে কান লাগান হয়। এই পাঁচটি উপরের কান ছাড়া শেষ কান দুটি আড়ির খানিকটা নীচে দানডির বাঁ পাশে লাগান থাকে। এই দুটির সঙ্গে সেতারের ঝালার (চিকারীর) তার বাঁধা থাকে, তাই অনেকে এই কান দুটিকে চিকারীর কান বলেন। তরফদার সেতারে আরও ১১ থেকে ১৩।১৪টি পর্যন্ত অতিরিক্ত ছোট ছোট কান থাকে তরফের তারের জন্য।

সেতারের ধ্বনি সেতুর রহস্য: হাঁড়ির অর্থাৎ ধ্বনিকোষের (ঢাকনার) তবলীর ওপর যে সাদা আসনটি দেখা যায় তাকে সওয়ারী বলে। পনথীতে বাঁধা সমস্ত তারই এর ওপব দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সওয়ারীতে জোয়ারী খোলার ওপরই সেতারের স্পষ্ট মধুর আওয়াজ নির্ভর করে। সওয়ারী উকো (File) দিয়ে ঘষে এমন ভাবে পরিষ্কার করা হয় যে তারে ঘা দিলে তারটি থেকে সুন্দর খোলা আওয়াজ পাওয়া যায়। এইভাবে বিশিষ্ট আওয়াজ পাওয়ার জন্য সওয়ারীকে সাফ করার নামই জোয়ারী খোলা বা জোয়ারী সাফ করা। সওয়ারীর ওপর তার বসে গেলে, মরচে ধরলে বা ঠিক মত পরিষ্কার না হলে, সেতারের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। জোয়ারী খোলার কান সকল কারিগরের সমান থাকে না। কারিগরের অভিজ্ঞতা, শব্দজ্ঞান, সুরবোধের বৈশিষ্ট্যের উপরই জোয়ারীর কাযকারীতা ও সেতারের ধ্বনিমাধুর্য নির্ভর করে। জোয়ারী সাফ হলে সেতারে মীড় কেমন খাচ্ছে তা প্রতিটি পর্দা থেকে তিন চার পর্দার মীড় টেনে নিজে ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হয় এবং কোথায় কোথায় স্বরমাধুর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা কারিগরকে দেখিয়ে দিতে হয়। দক্ষ কারিগরেরা বাজিয়ের সুবিধামত জোয়ারীর আওয়াজ ভাল করে খোলার চেষ্টা করেন। সেতারের অতি সূক্ষ্ম কাজ এই জোয়ারী এবং সওয়ারীর তারের ঘাট ঠিক করার (Placing-এর) ওপর নির্ভর করে। কারিগরের সুরের কান ভাল হ'লে স্বভাবতই তাঁর কানে বাজিয়ের অসুবিধা ধরা পড়ে অর্থাৎ কোন জিনিষটি বাজিয়ে প্রকাশ করতে চাইছেন, মীড়ের কোন কাজটি জোয়ারীর অসুবিধার জন্য সম্যগভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না অথবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে সেটি তাঁর কানে লাগে। সুর ও শব্দের তারতম্য ধরার মত জ্ঞান খুব অল্পসংখ্যক কারিগরের থাকে তাই সকলে ভাল জোয়ারী খুলতে পারেন না। আমাদের জানা দরকার যে সেতারের মাপজোপ, তবলী, দানডি প্রভৃতির ঘনত্ব ইত্যাদির ওপর যেমন সেতারের ধ্বনিমাধুর্য নির্ভর করে, তেমনি ভাল জোয়ারীর ওপরও সেটি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

সেতারের তারসংখ্যা ও বাঁধার কায়দা : সেতারে দানডির মুক্তপ্রান্তে আড়ির উপর দিকে সামনে রাখা দুটি কান ও পাশে রাখা তিনটি কান, মোট পাঁচটি কানে পাঁচটি তার বাঁধা হয়। এইসব তারের গোড়া পনথী থেকে বাঁধা হয়ে সওয়ারীর ওপর দিয়ে আড়ির মাঝখানের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এসে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে। এর মধ্যে আড়ির কাছে যে কানটি প্রথম দেখা যায় সেটিই প্রধান তারের কান। এটিকে **নায়কীতার** বা **মেনতার** বলা হয়। হিন্দিতে এটিকে **বাজকা তার** বলে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে সেতারের অধিকাংশ বাজ এই তারের ওপরেই বাজান হয়। এই তারটি পাকা স্টীলের ভাল তার হওয়া দরকার। সাধারণ বড় সেতারে বা তরফদার সুরসেতারে ২নং তার ব্যবহার করা হয়। অনেকে ৩নং তারও ব্যবহার করে থাকেন। পাকাতার বলতে Piano steel তারকেই বোঝায়। গেজচার্টে তারের সঠিক মাপ দেখে নিন। Piano steel বলতে পিয়ানো যন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ temper যুক্ত তারকেই বোঝায়। এই তার সাধারণত হল্যাণ্ড, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করা হয়। বর্তমানে ভারতের বেরিলি প্রভৃতি স্থানে ভাল তার তৈরী করা হচ্ছে। ভাল তার বলতে বোঝায় যে তার সহজে কেটে যায় না বা টান থাকার সময় বেশী বাড়ে না, সহজে তারে ঘাট পড়ে না এবং আগাগোড়া একভাবে সুডৌল থাকে।

এই মেন তারটি মধ্যম অর্থে মা স্বরের সঙ্গে মেলান হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার দুটিতে ২৮নং এর পেতল বা ব্রোঞ্জের তার দেওয়া হয়। এদুটি তারই (স) ষড়জে মিলান হয়। দুটি তারই এক স্বরে বাঁধা হয় বলে এদের জুড়ির তার বলে। আজকাল অনেকে জুড়ির তারের একটিমাত্র অর্থাৎ ৩নং তারটি রাখেন ও ২নং তারটি খুলে ফেলেন। হিন্দিতে এই তার দুটিকে **জোড়েকা তার** বলা হয়। চতুর্থ তারটি খাদ পঞ্চমে (খাদের প-এ) বাঁধা হয়। এটিও পেতল বা ব্রোঞ্জের তার। অনেকে এটিকে খাদের সা স্বরের সঙ্গে মেলান তখন এটিকে খরজের তার বলা হয়। হিন্দিতে এটিকে লরজের তার বলে। এটিতে ২৬নং পেতলের তার ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ঘরাণায় এটিতে ১নং স্টীল তার ব্যবহার করা হয়, এবং এটিকে মধ্য সপ্তকের পঞ্চম স্বরে ('প' স্বরে) বাঁধা হয়। এরপর পঞ্চম তারটি অনেকে মধ্যসপ্তকের ('গ'-এর) গান্ধারের সঙ্গে বাঁধেন। যাঁরা গ-তে বাঁধেন তাঁরা এতে ২নং পাকা স্টীলের তার ব্যবহার করেন। আর এটিকে যাঁরা পঞ্চমে ('প'-তে) বাঁধেন তাঁরা ১নং স্টীলের তার লাগান।

প্রধান প্রধান পাঁচটি তারের কথা বলা হ'ল। এখন বাকি ষষ্ঠ ও সপ্তম তার দুটি। এ দুটিকে চিকারীর তার বলা হয়। এ দুটিতে পাতলা ০০নং এর ষ্টীলের তার ব্যবহার করা হয়। এ দুটিকে (তারার 'স') তার-ষড়জের সঙ্গে মিলিয়ে বাঁধা হয়। অনেকে একটিকে মধ্যসপ্তকের পঞ্চমে ও শেষটিকে তারার 'স'-র সঙ্গে বাঁধেন। অনেকে প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের 'স'-এর সঙ্গে ও শেষটিকে তারার 'স'-এর সঙ্গে বাঁধেন।

সবশেষে, তরফদার সেতারে তরফের তারসমূহের মধ্যে খাদের 'ন' স্বর থেকে বা মধ্যসপ্তকে 'স' স্বর থেকে রাগ অনুযায়ী বাদক তাঁর খুশীমত সমস্ত তরফের তার বেঁধে থাকেন। তড়পটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ অনুরণন। এই তারগুলিকে ইংরাজীতে Vibrator অর্থাৎ কম্পনের বা অনুরণনের তার বলা হয়।

শিক্ষার্থীর পক্ষে যন্ত্রে সুর বাঁধা খুব কঠিন। যতদিন পর্যন্ত সুরের কান অর্থে স্বরের জ্ঞান না জন্মায় ততদিন গুরুর কাছে সুর বাঁধা শিখতে হয়। পরে সুরের কান তৈরী হলে নিজেই বাঁধা যায়। যন্ত্রটি ভালভাবে সুরে বাঁধা হলে আওয়াজটি মধুর লাগে। যন্ত্র বাজাবার তালিম নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে সুর বাঁধতে শেখা একান্ত প্রয়োজন। যার সুরজ্ঞান যত সূক্ষ্ম তিনি তত নিখুঁত ভাবে সুর মেলাতে পারেন।

আসন : সেতার নিয়ে কীভাবে বসতে হয়, সেটা গুরুর কাছে শেখা দরকার। সেতার নিয়ে দীর্ঘসময় স্বাভাবিকভাবে বসে থাকতে পারা যায়, এমন একটি আসন বেছে নিতে হয়। নামকরা উস্তাদেরা ও অন্যান্য বাজিয়েরা কীভাবে বসেন তাই দেখে নিজের সুবিধামত একটি আসনে বসে বাজাতে বাজাতে **আসনসিদ্ধি** লাভ করা যায়। আসনটি যাতে দৃষ্টিকটু না হয় বা তাতে শরীরের কোন অংশের বিশেষ ক্ষতি না হয়, মেরুদণ্ডটি যথাসম্ভব সোজা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আসন বেছে নেওয়া উচিৎ।

ধারণ : সেতার ধরতে হলে প্রথমে লাউ অর্থাৎ খোলের পেছন দিকটা বাজিয়ের (অথবা শিক্ষার্থীর) সামনের দিকে ডান হাঁটুর পাশে রেখে ডান হাতের কনুয়ের সামনের অংশটি আলগাভাবে লাউয়ের ওপর চাপ রেখে ধরতে হয়। সেতারের দানডিটা বুকের সামনে বাঁ পাশে হেলিয়ে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দানডির পেছনে ঠেকা দিয়ে, প্রথম আঙ্গুল (তর্জ্জনী) পর্দার ওপর রেখে নায়কী তারকে পর্দার সঙ্গে টিপে ধরতে হয়। বাঁ হাত এমন আলগাভাবে রাখা দরকার, যাতে সহজেই হাতটি দানডির নিচের দিকে ও ওপর দিকে

সমস্ত পর্দার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চালান যেতে পারে। বই পড়ে জানার চেয়ে, এসব বিষয় গুরুর কাছে হাতে কলমে শেখা ভাল।

মিজরাব : লোহার পাকা তারে তৈরী বিশেষভাবে ভাজ করা একরকমের আংটির নাম মিজরাব। মিজরাব শব্দটি পার্সী শব্দ, মুসলমান আমল থেকে চলে আসছে। শুদ্ধ ভাষায় একে **অঙ্গুলিত্র** বলা হয়। হিন্দিতে একে **আঙুঠা** বা **নক্কী** বলা হয়। ইংরাজীতে একে (plectrum) প্লেকট্রাম বলে।

সেতার বাজাবার আগে ডানহাতের প্রথম আঙ্গুলে (তর্জ্জনীতে) মিজরাব পরতে হয়। মিজরাব তর্জ্জনীর প্রথম গাঁটের ওপর আঁট করে এমন ভাবে পরা উচিৎ যাতে তারে আঘাত করার সময় সেটি খুলে বা ঘুরে না যায়। অনেকে আঙ্গুলের প্রথম গাঁট পার করেও মিজরাব পরেন। কোন কোন ঘরাণায় (তর্জ্জনী ও মধ্যমা) প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি আঙ্গুলেই মিজরাব পরা হয়। চিকারীর কাজের সুবিধার জন্য অনেকে চতুর্থ আঙ্গুলেও (কণিষ্ঠাতে) মিজরাব পরেন, অনেকে চিকারীর তারে আঘাতের জন্য মিজরাবের বদলে চতুর্থ আঙ্গুলের নখটি বড় রাখেন ও নখ দিয়েই চিকারীর তারে আঘাৎ করেন।

অঙ্গুলিচালন : সেতারে স্বরের ঊর্দ্ধগতির বাজের সময় (অর্থাৎ যখন তারার স্বরের দিকে যাওয়া হয়) বাঁ হাতের প্রথম আঙ্গুল অর্থে তর্জ্জনী দিয়ে স র গ ম প ধ ন পর্য্যন্ত চালিয়ে সপ্তক শেষ করে তারার স স্বরটিতে পৌছালে স স্বরটির ওপর দ্বিতীয় অঙ্গুলি অর্থে মধ্যমা ব্যবহার করা হয়। আবার মুদারার সপ্তকে ফিরে আসার সময়, অর্থাৎ ন ধ প ম গ র স বাজাবার সময় (বিশেষ স্বরের নিম্নগতি ও হাতের ঊর্ধ্বগতির সময়) তার ও পর্দার ওপর তর্জনীর (১ম আঙ্গুলের) ব্যবহার হবে। বিভিন্ন ঘরে নানা ধরণের অঙ্গুলি চালনার নিয়ম দেখা যায়। অনেকে মধ্য সপ্তকের স থেকে গ পর্যন্ত বাজিয়ে 'ম'-তে আসার সময় মধ্যমা ব্যবহার করেন এবং এই ভাবে আবার তারার স পর্য্যন্ত মধ্যমা দিয়েই নামেন আবার ওই মধ্যমা দিয়েই ন ধ প ম বাজিয়ে তর্জনী দিয়ে গ র স-তে পৌছান। এভাবের বিভিন্ন ধরণে অঙ্গুলিচালনার নিয়ম দেখা যায়। পর্দার ওপর আঙ্গুলের টিপ রাখার সময়, আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পর্দার ঠিক ওপরে তারটিকে শক্ত করে চেপে ধরতে হয়, অথচ আঙ্গুলটা সহজেই যাতে অপর পর্দায় সরান যায় এরকম সুযোগ রাখতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল (৫ম অঙ্গুলি বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ) সব সময় দানডির পেছনে আলগা ঠেকনোর মত ধরে রাখতে হয়। আঙ্গুল চালাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন সময়েই তর্জনী (১ম আঃ) তার ছেড়ে না ওঠে।

তর্জনী গড়িয়ে (slip) চলে আসবে আর (মধ্যমা) তার থেকে তুলে অন্য পর্দায় বা স্বস্থিত পর্দায় উঠবে আর পড়বে, এটি সাধারণ নিয়ম। কোন কোন বাদক কৃন্তন বা স্পর্শকৃন্তনের সময় অনামিকা (৩য় আঃ) ব্যবহার করে থাকেন। এ সম্বন্ধে নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মেনে চলাই শ্রেয়।

বোলপ্রকরণঃ—সেতারের তারের উপর মিজরাবের আঘাতকে কয়েকটি কাল্পনিক নামে ডাকা হয়, সেই নামগুলিকে সেতারের **বোল** বা **বাণী** বলা হয়। সেতারের প্রধান বাণী দুটির বা বোলের নাম **ডা** ও **রা** মিজরাব দিয়ে তারের ওপর কোলের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বলা হয় "ডা" ও বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বলা হয় "রা"। ডা, ডে, ডি, প্রভৃতি বোল কোলের দিকের ডা আঘাত থেকেই বার করা হয়, এবং রা, রে, রি প্রভৃতি বোলগুলি রা আঘাত থেকেই প্রকাশিত হয়। ডা ও রা-এর মিশ্রণে দ্রে, দ্রার, দ্রেদার অথবা **ড্রে, ড্রার, ড্রেডার** প্রভৃতি বোল বাজান হয়। মিজরাবের উল্টা ঘা দিয়ে আরম্ভ করে **রাডা** প্রভৃতি বোল বার করা হয়। লয়ভেদে একই বাণীকে ভিন্ননামেও ডাকা হয়। যেমন ডারা বাণীটি ডেরে হয়ে যায় ইত্যাদি। ঝালা বাজাবার সময় চিকারীর তারে যে আঘাত করা হয় তাকে **'রা'** বা **'র'** বলা হয়। অনেক সময় চিকারীর তারেও ডেরে প্রভৃতি বাণী বাজান হয়।

সেতার ঘরাণাঃ সেণী ঘরাণা বা গোয়ালীয়র ঘরাণা : পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য (অমৃত সেনের ছাত্র) লিখিত সঙ্গীত সুদর্শন নামক গ্রন্থে গোয়ালিয়রের রহিম সেন ও তস্য পুত্র অমৃত সেনকেই সেতারের প্রথম পুরুষ বলা হয়েছে। সুদর্শনাচার্য যাই বলুন আমরা জানি মসিদখানি বাজের স্রষ্টা মসিদখাঁই সেতারের প্রথম পুরুষ। রহিম সেন ও অমৃত সেনই প্রথমে সেতারে বীণের অঙ্গ, ধ্রুপদের অঙ্গ ও খ্যালের অঙ্গ জুড়ে সেতারের বাজে এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। উস্তাদ দুলহে খাঁই সেতারে তাঁদের এই ভাবে তালিম দেন। পরবর্তীকালে এঁদের সেতারের ধারা বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন কায়দায় চলতে থাকে। এই ঘরে সেতারের প্রথম খলিফা আমীর খাঁর নাম পাওয়া যায়। সেতারের ঘরাণাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম বীণকার ঘরাণায় আমরা গুলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, সেতারী ইমদাদ খাঁ, রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তি প্রমুখ গুণীগণের নাম পাই। গুলাম মহম্মদের শিষ্য মহম্মদ খাঁর ঘরে পাই বামাচরণ বাবু, জীতেন ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে। গোয়ালীয়রের

সেতার ঘরাণার প্রথম খলিফা আমীর খাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে পাই বরকতউল্লা, আসাক আলি, ও মুস্তাক আলি খাঁকে। রবাবী প্যার খাঁর ঘরে পাই বেনারসের বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ, পান্নালাল বাজপেয়ী, (জাফর খাঁর শিষ্য যিনি দুই আঙুলে মিজরাব পরে বাজাতেন) ও নবীবক্‌স ডেরেডার প্রভৃতি গুণীদের। প্যার খাঁর শিষ্যদের মধ্যে কুতুব আলির (কুতুবদ্দৌলা) নামও পাওয়া যায়।

জয়পুর ঘরাণা ঃ এই ঘরাণায় অমৃত সেনের পুত্র নিহাল সেনের নাম করা হয়। এই ঘরে সেতারী খলিফা হাফিজ খাঁর নাম পাওয়া যায়। অমৃত সেন, নিহাল সেন প্রভৃতি দীর্ঘদিন জয়পুরে বাস করার কারণে গোয়ালীয়র বা সেণী ঘরাণার হলেও এঁদের অনেকে জয়পুর ঘরাণার সেতারী বলতেন। জয়পুর ঘরে সর্বশেষ আমরা হাইদার হুসেনের নাম পাই। এঁর বাজে জয়পুর ঘরাণার বিশিষ্ট ছাপ ছিল।

লক্ষ্ণৌ ঘরাণা ঃ গুলাম রজা থেকে আরম্ভ (রেজাখানি বাজ)। হুসেন বকস, নবাবালি নক্কী খাঁ প্রভৃতি আরও অনেকের নাম এই ঘরে পাওয়া যায়।

বেনারস ঘরাণা ঃ এক দিকে প্রসীদ্দুজীর ঘর, অপর দিকে প্যার খাঁর ঘরের শিষ্য ঈশ্বরী প্রসাদ, নবীবক্‌স প্রভৃতিদের ঘর। বড়ে মহম্মদ খাঁর কাছে তালিম নিয়ে নেপাল দরবারের পশুপতি সেবক মিশ্র ও শিব সেবক মিশ্র এই দুই ভাই আর এক বেনারস ঘরাণা গড়ে তোলেন। এই ঘরাণায় সেতারী বিজয়দাস পাকড়ের নাম পাই। এই ঘরাণা লয়ের বৈশিষ্টের দাবী রাখে। প্রায় অশিতিপর বৃদ্ধ বিজয় বাবুর বাজনা শুনলে এখনও আমরা সেই লয়দারীর পরিচয় পাই। ইনিই এই ঘরাণার একমাত্র ধারক ও বাহক।

বিষ্ণুপুর ঘরাণা ঃ সেণী-বীণকার ঘরাণার নীলমাধব চক্রবর্তি থেকে শুরু। রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এঁর কাছে তালিম পান। রামপ্রসন্ন বাবু এই ঘরের বিশেষ গুণী ছিলেন। এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। এই ঘরে আমরা নাম পাই স্বর্গীয় সুরবাহারি ও সেতারী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বর্তমানে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এই ঘরাণার বাজ অক্ষুন্ন রেখেছেন। এই ঘরে রয়েছেন গোকুল নাগ (রামপ্রসন্ন বাবুর ছাত্র) ও তাঁর পুত্র মণিলাল নাগ। শ্রীমান মণি নাগ খুবই ভাল বাজান ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, তবে তাঁর বাজে অন্য ছাপ আসায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার style কিছু ক্ষুণ্ণ।

দারভাঙ্গা ঘরাণা বা **পাঠক ঘরাণা ঃ** এঁদের তালিম বেনারস ঘরাণা থেকেই এসেছে শোনা যায়। রামেশ্বর পাঠক থেকে শুরু। বর্তমানে এই ঘরাণার

সেতারী রয়েছেন বলরাম পাঠক। তাঁর বাজে ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাপ পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ঘরাণা: বীণকার বন্দে আলি থেকে চলে আসছে। এই ঘরে মুরাদ আলি খাঁর নাম পাওয়া যায়। এই ঘরাণায় কৃষ্ণরাও (কোলাপুর) ও বাবু খাঁর নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ঘরে রয়েছেন আবদুল হালিম জাফর খাঁ। এঁর বাজেও ঘরাণার বৈশিষ্ট্য আছে।

ঢাকা ঘরাণা: এই ঘরাণার নাম বর্তমানে শোনা যায় না। ভগবান দাস সেতারী ছিলেন এই ঘরাণার বিশিষ্ট গুণী। তাঁর নামেই প্রায় এই ঘরাণার শেষ।

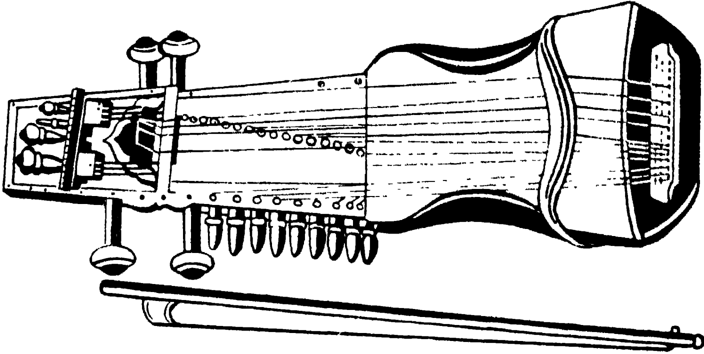
বর্তমানে সেতারে যে দুটি ঘরাণা অগ্রগামী:

প্রথম ইমদাদখানী ঘরাণা: ইমদাদ খাঁ থেকে আরম্ভ। এ ঘরে ছিলেন স্বনাম ধন্য সেতারী এনায়েৎ খাঁ। বর্তমানে তাঁর পুত্র খ্যাতনামা বিলায়েৎ খাঁ ও তস্য ভ্রাতা ইমরাৎ খাঁ।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন খাঁর ঘরাণা: রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁর কাছ থেকে তন্ত্রকারের তালিম পান ক্রিয়াসিদ্ধিক গুণী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। এঁর তালিমে গড়ে ওঠেন এই ঘরাণার মধ্যমণি পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই ঘরাণায় রয়েছেন গুণী সেতারী নিখিল ব্যানার্জী প্রভৃতি আরও অনেকে এই দুই ঘরাণায় ও অন্যান্য ঘরাণায় যেসব গুণী সেতারীরা আছেন তাঁদের সকলের নাম দিতে না পারায় আমরা একান্ত দুঃখিত। পরে সকলের বিষয় বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

সারেঙ্গী বা সারঙ্গ বীণা: এসরাজের বিষয় লেখার সময় ছড়ের যন্ত্রের অর্থাৎ ধনুস্তত যন্ত্রগোষ্ঠির প্রাচীনত্বের বিষয় লেখা হয়েছে। এখন ছড়ের যন্ত্রের আদি উৎপত্তির কথায় Groves Dictionery of Music & Musicians edited by N C Colles. M. A. (Oxon) 3rd edition 4th Volume 1952-তে পারস্যের আদি ধনুযন্ত্র কেমানজের প্রসঙ্গে লিখেছেন ......"It is undoubtedly one of the earliest of all bowed instruments, Claiming identity with or descent from the somewhat Mythical Ravanastram of India, from which the Urhun (ERSHIEN) of the chinese is also supposed to have sprung." আমরা এসরাজের বিষয় লেখার সময় বলেছি যে (৫০০০) পাঁচ হাজার বছর আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ রাবণাস্ত্রম বা রাভাণা যন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং এসরাজ

বা সারেঙ্গী প্রভৃতি ধনুর্যন্ত্র সেই রাবণাস্ত্রম থেকেই গড়ে উঠেছে এবং তারও আদিতে রয়েছে পিণাকীবীণা ও একতন্ত্রীবীণাদিযন্ত্র যা থেকে রাভাণা বা রাবণাস্ত্রম প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে। পিনাকী পিণাকপাণি মহাদেবের হাতে শোভা পেত এবং এটি তাঁরই সৃষ্ট। এই পিণাকী যে ধনুর্যন্ত্রের সবপেক্ষা আদি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। আমরা অমৃত্তি যন্ত্রটির বিষয় লেখার সময় বলেছি যে ভারতের অমৃত্তি নামক ধনুর্যন্ত্র থেকে কেমানজে যন্ত্রটি রূপ পেয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। ভারতের অতিপ্রাচীন এই অমৃত্তি যন্ত্রটির সঙ্গে আমরা



সারেঙ্গী

কেমানজের সাদৃশ্যও দেখতে পাই। আমাদের ধারণা এই অমৃত্তি জন্ম নিয়েছে পিনাকী থেকে। কাজেই পিনাকীকে আমরা সমস্ত ধনুর্যন্ত্রের আদি বলতে পারি।

সারেঙ্গী যন্ত্রটি কত প্রাচীন তার সঠিক সময়কাল নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নি তবে অনুমান করা যায় রাভানা বা রাবণাস্ত্রমের অনেক পরে এটি এসেছে। পারস্যের কেমানজে, চীনের আরহিন, জাপানের কোপীন, ইউরোপের ভায়োলিন প্রভৃতির আদিপুরুষ আমাদের রাভানা। সারেঙ্গী বর্তমানে তত গোষ্ঠির সভ্যযন্ত্রের বিভাগে অনুগত সিদ্ধ যন্ত্ররূপে পরিচিত। কদাচিৎ স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে সঙ্গীতাসরে এককভাবেও বাজতে শোনা যায়।

বর্তমানে বাজারে দুই ধরণের সারেঙ্গী দেখা যায়। প্রথমটি **টোটা সারেঙ্গী**। এগুলিতে একপ্রস্থ তরফ দেওয়া হয়। অনেকে একে **একহাড়া সারেঙ্গা** বলেন। দ্বিতীয়টি **দেড়পোষী সারেঙ্গী**। এগুলিতে দুই প্রস্থ তরফ থাকে এবং আকারে টোটা সারেঙ্গীর থেকে বড়। কিছুদিন আগে সমবেত বাদ্যমণ্ডলীতে বাজাবার জন্যে এক প্রকার বৃহদাকার সারেঙ্গী

ব্যবহার করা হত। এগুলি দাঁড়িয়ে বাজান হত। বর্তমানে এ ধরণের সারেঙ্গী দেখা যায় না। খ্যাতনামা নৃত্যবিদ শ্রীউদয়শঙ্করের বৃন্দবাদ্যের মাঝে এরূপ বৃহদাকার সারেঙ্গী দেখা যায়। রাজস্থানে আরও কয়েক প্রকারের সারেঙ্গী ব্যবহৃত হয় যেগুলিকে **ধানি-সারেঙ্গী** বা **দেড়পোষলি সারেঙ্গী** বলে। এগুলির আকার প্রচলিত সারেঙ্গী থেকে ভিন্ন ধরণের। রাজস্থানে **গুজরাতন সারেঙ্গী** নামে একপ্রকার সারেঙ্গীর ব্যবহার দেখা যায়, গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতেই এদের ব্যবহার। **সিন্ধিসারেঙ্গী** নামে আর একপ্রকার সারেঙ্গীও রাজস্থানে প্রচলিত আছে।

সারেঙ্গী একখানা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়, এর দানডি ও খোল কাঠের, গর্ভটি ফাঁপা এবং খোলটি শরোদ প্রভৃতির মত চামড়ায় ঢাকা থাকে। পটরির তলাটিও ফাঁপা থাকে। খোলের শেষপ্রান্তের মধ্যভাগে পন্থী থাকে, সমস্ত তারের গোড়া এতে বাঁধা হয়, চামড়ার উপর খাড়া ভাবে একটি সওয়ারী রাখা থাকে। সওয়ারীর ওপর দিয়ে প্রধান তার গুলির আগা দানডির মুক্ত প্রান্তের কানগুলির সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। তরফের তারগুলি সওয়ারীর মাঝের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে দানডির দক্ষিণ পাশে রাখা তরফের কাণের সঙ্গে বাঁধা থাকে। চারটি প্রধান কাণে চারটি প্রধান প্রধান তার (তাঁতের তার) লাগান থাকে। পটরীর শেষপ্রান্তে দুটি তন্ত্রাসন অথে দুটি সমতল সওয়ারী রাখা হয়, তার উপর দিয়ে দু পাশে মোট ১১টি জোয়ারী-তরফের তার রাখা হয়। এই জোয়ারী-তরফের দুই ভাগের প্রতিটি সওয়ারীর প্রথম তারটি পিতলের এবং বাকিগুলি ষ্টিলের এ ছাড়া পটরীর ডানপাশে রাখা ছিদ্রের উপর ছোট ছোট বোতামের মাঝ দিয়ে ২৭টি ষ্টিলের তরফের তার। এগুলি পর পর কোমল, কড়ি মিলিয়ে বারটি স্বরে মেলান হয়। সারেঙ্গী বাদক, গায়কের স্বরের সহিত মিলিয়ে এগুলি বাঁধেন এবং একক বাদনে নিজের ইচ্ছামত স্বর বেঁধে নেন।

সারেঙ্গীর স্বর অতীব মধুর। মেয়েদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে যায় তাই কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গতে আর কোন যন্ত্রই এর সমকক্ষ নয়। বেহালা একাজে ব্যবহৃত হলেও কণ্ঠস্বরের তুলনায় কিছু রুক্ষ। যদিও দক্ষিণ ভারতে গানের সঙ্গতে বেহালার প্রচলনই বেশী। সারেঙ্গীর প্রথম তার (নায়কী বা প্রধান তার) মধ্যমে মেলান হয়, দ্বিতীয় ষড়জে, তৃতীয় পঞ্চমে, চতুর্থ (তারটি যাঁরা সারেঙ্গীতে ব্যবহার করেন) তার খাদ পঞ্চমে বা

উদারার ষড়জে। সারেঙ্গী, মেহগ্নী, বার্মাসেগুণ, গাম্ভার অথবা তুঁত কাঠে ভাল হয়। কাঁঠাল বা আম কাঠেও তৈরী হয়, তবে সেগুলি খুব ভাল হয় না। তরফের তারগুলি বাজিয়েরা নিজেদের খুশী মত বেঁধে থাকেন।

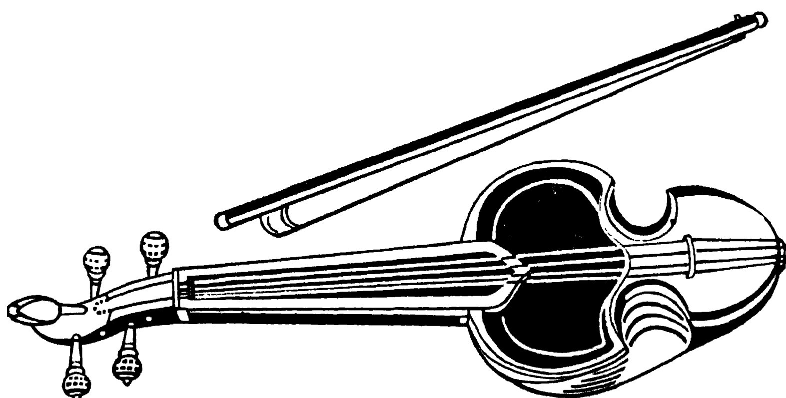
প্রথমে নাম পাই ছংগে খাঁর ঘরাণাদার হাইদার বকস্ যিনি সারেঙ্গী বাদক হয়েও দরবারে বীণকারের মত সম্মান পেতেন। ইনি বাদশাহের কাছে "খলিফা" উপাধি পেয়েছিলেন। দরবারে যাবার জন্য এর নিজস্ব তামজাম অর্থাৎ খাস সবারী নিযুক্ত ছিল। এই হাইদার খাঁর ভায়ের ছেলে ছিলেন কলিকাতার খ্যাতনামা উস্তাদ বাদল খাঁ। বুনিয়াৎ হুসেন ও পুত্র মেহেদী হুসেন হাইদার খাঁর ঘরাণার রামপুরের প্রতিনিধি। এই বদল খাঁর গায়ক শিষ্যদের নামের মধ্যে পাই জমীরুদ্দীন খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তি, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ভীষ্মদেব চাটার্জী, শচিনদাস, মোতীলাল, শৈলেশদত্ত গুপ্ত প্রভৃতিকে।

সারেঙ্গীর আর এক ঘরের নাম পাওয়া যায় ভারত বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক সেতারী ইমদাদ খাঁর ঘরাণার মম্মন খাঁর জামাতা বুন্দু খাঁকে, যাঁর নাম সারেঙ্গী জগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। বুন্দু খাঁর ঘরাণায় পাওয়া যায় ছোটে খাঁকে বর্তমানে এই ঘরাণায় আছেন সাগীরুদ্দীন। এ ছাড়া **কিরানা ঘরানায়** রহমন বক্সের এবং **বনারস ঘরাণায়** নাম পাওয়া যায় নবীবক্সের। বনারসের উস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্রের নামও স্মরণীয়। দিল্লীর গুলাম সবীরের নামও আমরা পাই।

পুরাতন দিনের সারেঙ্গীওয়ালার ক্ষেত্রে আমরা দিল্লীর আলিবকস্, লক্ষ্ণৌর হুসেন বকস্, গোয়ালীয়রের সাবিতালি খাঁ, বীকানীর বালে আমীর খাঁর শিষ্য খুরজার খাজা বকস্ প্রভৃতির নাম পাই।

সারিন্দা ঃ প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থে **সারঙ্গা** নামে এক ধরণের ছড়ের যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সারিন্দা সেই সারঙ্গারই অনুসরণ বা পরিবর্তিত সংস্করণ। বর্তমানের সারিন্দা বা সারঙ্গা একই যন্ত্র এরূপ কথাও অনেকে বলে থাকেন। এই ধনুর্যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, এমন কি বর্তমানে প্রচলিত সারেঙ্গী যন্ত্রটি থেকেও—এমন কথাও শোনা যায়। এই যন্ত্রকে অনেকে **সারিঙ্গী** বলে থাকেন। যন্ত্রটি ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়। অনেকের ধারণা, এই যন্ত্রের অনুসরণে ও রূপ পরিবর্তনের মাঝেই সারেঙ্গী জন্ম নিয়েছে। সারেঙ্গীর মত এটিও অনুগতসিদ্ধরূপে গানের সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়, এককভাবে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপেও একে বাজাতে শোনা যায়। যদিও এটি গ্রাম্য যন্ত্র তবুও বর্তমানে এটি সভা যন্ত্ররূপেই খাতির পেয়ে থাকে। যন্ত্রটি একটি কাঠ থেকে তৈরী করা হয়।

বাজের কায়দা সারেঙ্গীর মতই। বর্তমানে এর প্রধান তারটি ষ্টীলের ও বাকি তিনটি তার পিতলের। বেহালার মত এই যন্ত্রে কেবলমাত্র চারটি তারই ব্যবহার করা হয়। নায়কি অর্থে প্রধান তারটি মধ্যমে ও বাকি তিনটি তার যথাক্রমে ষড়জ, পঞ্চম ও খরজে বাঁধা হয়ে থাকে। অনেকে প্রধান অর্থে মধ্যমের তারটিতে তাঁতের তার ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে সারেঙ্গীর মত চারটি তারই তাঁতের তার রাখেন। প্রাচীনকালে এতে তাঁতের তারই ব্যবহার করা হত। এই

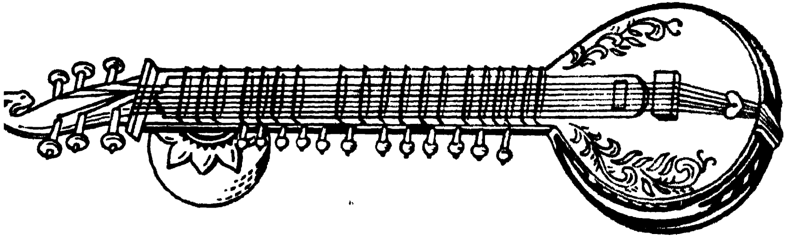


সারিন্দা

যন্ত্রের দানডিটা সারেঙ্গীর মত বাক্স আকারের না হয়ে বেহালার ধরণের সরু হয়ে থাকে। রাজস্থান পূর্ববঙ্গ, মণিপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সারিন্দার আকৃতির ও 'তার' সন্নিবেশের প্রভেদ দেখা যায়। ধ্বনিকোষের তল দেশটির মধ্যেই বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্যে আসে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সারিন্দার হাঁড়ির সওয়ারী বসানো কাঠের অংশটির মধ্যেই তফাৎ থাকে।

সুরচয়ন বা সুরচৈন ঃ আলাপচারীর একটি সভ্য যন্ত্র। যন্ত্রটি তরফ ছাড়া বড় সুর বাহারের আকারের। পর্দা ও সওয়ারী দেওয়া স্বরোদের মত ভিন্নাকৃতির সুরচয়ণও দেখা যায়। এই যন্ত্র জওয়া ও মিজরাব উভয়ের সাহায্যেই বাজান হত। ইং ১৮০০ সালের শেষভাগে এই যন্ত্র উদ্ভাবিত। ময়মনসিং গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্র কিশোরের ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের "তৌর্য্যত্রিক" মাসিক পত্রিকার "সুর চয়নের কাহিনী" নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে স্বরোদী হোসেন খাঁর সৃষ্টি। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে যন্ত্রটি স্বরোদের আকারের। আগাগোড়া চর্ম আবরণহীন ফাঁপা কাঠে তৈরী হত, এবং এতে পর্দা ও সওয়ারী

থাকতো। হুসেন খাঁ জওয়ার সাহায্যে এটি বাজাতেন। এই যন্ত্র স্বরোদের মত কোলে নিয়ে অথবা সুরবাহারের মত বাজান হত। উস্তাদ আবদাল্লা খাঁ এটি মিজরাব দিয়ে বাজাতেন। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত।



সুরবাহার

সুরবাহার ঃ সুরবাহার যন্ত্রটির জন্মকাল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে। লক্ষ্ণৌ নবাবের সভা-বীণকার পীয়ার খাঁ সাহেবের ছাত্র (তানসেনের পুত্র-বংশীয়) প্রখ্যাত বীণকার গোলাম মহম্মদ খাঁ সাহেবই এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। গোলাম মহম্মদ খাঁ তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয় বীণকার ওমরাও খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাই অনেকে মনে করেন যে ওমরাও খাঁ সাহেব এর স্রষ্টা কিন্তু আসলে গোলাম মহম্মদই এই যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন। সুরবাহারকে কেচুয়া সেতারের বৃহৎ সংস্করণ বলা চলে কারণ যন্ত্রটি অবিকল কেচুয়া সেতারের মত দেখতে, তবে সেতারের থেকে আকারে অনেক বড়। সেতারের থেকে এর আওয়াজ গম্ভীর, দীর্ঘস্থায়ী, মধুর ও সুশ্রাব্য।

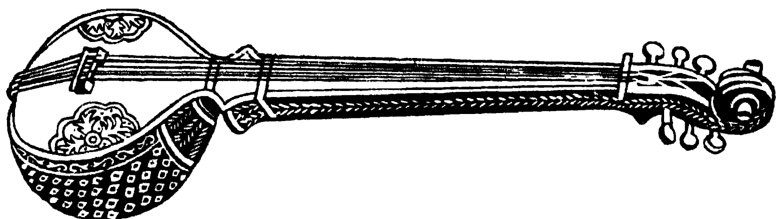
সুরবাহারের বৈশিষ্ট্য তার খাদের কাজ, বিলম্বিত মীড়, দীর্ঘস্থায়ী স্বরধ্বনির স্থিতি ও (ছয় সাত পর্দা পর্য্যন্ত) লম্বা মীড় টানার সুবিধা। সেতারের থেকে এতে আলাপ ভালভাবে করা যায়। এটিকে আলাপচারির যন্ত্র বলাই ভাল ; গতকারী এতে করা হয় না। সুর বাহারেই প্রথমে তরফের তার ব্যবহার করা হয়, এবং বীণের মত তারপরণের কাজ চালু করা হয়। সুরবাহারের সৃষ্টির পর থেকেই সেতারে খাদের তারে আলাপ করা ও চিকারীতে ঝালা বাজান আরম্ভ হয়, আমরা সেতারের কথায় একথা বলেছি। ৬।৭ পর্দা পর্য্যন্ত লম্বা মীড় ছাড়া আজকাল সেতারে সুরবাহারের প্রায় সব রকম কাজই (আদায়) করা হয়। সেই কারণে সুরবাহারের প্রচলন কমে গেছে। তা ছাড়া এই যন্ত্র প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সুরচয়ন যন্ত্রের সঙ্গে সুরবাহারের সাদৃশ্য দেখা যায়।

অতীতের নাম-করা গুণীদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের গোলাম মহম্মদের নাম করতে হয়। তার পরেই সাজ্জাদ মহম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা সেতারী এমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ সুর বাহার ভালই বাজাতেন। সেতারী মাত্রেই চেষ্টা করলে সুরবাহার বাজাতে পারবেন, তবে সুরবাহারের নিজস্ব বাজ বজায় রেখে দক্ষতার সহিত এর তারপরণের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে এটি বাজান কঠিন। তাই এই যন্ত্রের বাদকসংখ্যা কম।

সুরবাহারের তারসংখ্যা, পর্দাসন্নিবেশ, তরফের তার, সওয়ারী, যন্ত্রধারণ ও বাদনপ্রণালী ইত্যাদি সবই সেতারের মত।

নায়কী বা প্রধান তার—ষ্টীলের—জুড়ীর তারের মধ্যমে বাঁধা হয়। জুড়ীর তার বা সুরের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের—ইচ্ছামত স্বরে বাঁধা হয়। খাদ পঞ্চমের তার উদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়। খরজের তার উদারার ষড়জে বাঁধা হয়। পঞ্চমের তার—ষ্টীলের—মুদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।

প্রধান তারের মাপ অনুযায়ীই অন্যান্য তারের মাপ ধরা হয়। আমাদের দেশের বাজিয়েরা তাদের ইচ্ছামত সাইজের তার লাগান। নায়কীতে কেউ ৬ নং ষ্টীল, কেউ ৫ নং, কেউ বা ৪ নং তার (বাজিয়ের বাজনার আকার, নিজের টিপ ও বাজাবার সুবিধানুযায়ী) লাগান। তাই তারের নির্দ্দিষ্ট স্থূলত্ব দেওয়া গেল না। আমাদের সকল যন্ত্রের বেলাতেই এই একই নিয়ম। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের মাপ, তারের সাইজ প্রভৃতি সমস্ত বাজিয়ের বেলাতেই এক রকম, এমনকি সুর মেলানও এক স্বরে। আমাদের এখানে বিশেষ বিশেষ ঘরাণার উস্তাদেরা নিজস্ব সুবিধামত তার ব্যবহার করেন।

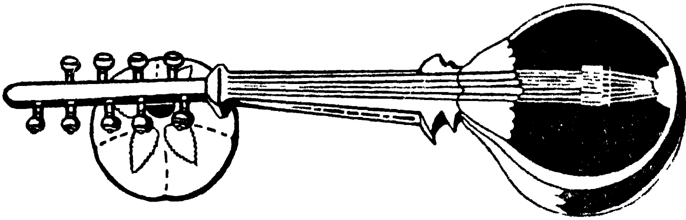


সুরবীণ

সুরবীণা বা সুরবীণ ঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরীতে সুরবীণ যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে এতে ৬টি তার থাকতো, কিন্তু কোন পর্দা থাকতো না। সাহিন্দাজীর লেখা

"Indian Music" গ্রন্থটিতেও সুরবীণের উল্লেখ আছে। এই পুস্তকে বলা হয়েছে : দিল্লীর ওমরাহ কালে সাহেব কর্তৃক যন্ত্রটি আবিষ্কৃত, কিন্তু এখানে আবিষ্কারের সাল তারিখ ইত্যাদি কিছুই লেখা নাই।*

যন্ত্রটি বহুলাংশে সেতারের মতই, তবে দানডির পটরী অর্থাৎ সারিকা স্থানটি পাতলা ষ্টীলের পাত দিয়ে মোড়া থাকে। যন্ত্রটি জওয়ার সাহায্যে বাজান হয়। ছয়টি তারের আগা দানডির মুক্তপ্রান্তে রাখা ছয়টি কানের সঙ্গে এবং হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সওয়ারীর উপর দিয়ে এই ছয়টি তারের গোড়া হাঁড়ির শেষ প্রান্তে রাখা লেজাডির সঙ্গে বাঁধা থাকে। সুরবীনে পর্দা থাকে একথা অনেকে বলেন, আমাদের ধারণা এই যন্ত্রে পর্দা থাকে না। পর্দা থাকলে পটরীতে প্লেট বসানোর কোন যুক্তি নেই। যন্ত্রটি জওয়ার সাহায্যে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত, তবে কলিকাতার যাদুঘরে একটি সুরবীণ রাখা আছে।



সুরশৃঙ্গার

সুরশৃঙ্গার ॥ সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটিকে অনেকে স্বরশৃঙ্গারও বলে থাকেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় ছজু খাঁর পুত্র **জাফর খাঁ** উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এই যন্ত্র সৃষ্টি করেন। এই ব্যাপারে একটি গল্প শোনা যায়। বেণারসের (কাশীর) রাজ-দরবারে এক সঙ্গীত সম্মেলনে খ্যাতনামা বীণকার নির্মলশাহ বীণা ও রবাবী জাফর খাঁর রবাব বাজনা হয়। বর্ষাকালের ভিজে হাওয়ায় চামড়া দেবে রবাবের আওয়াজ ঢ্যাবঢ্যেবে হ'য়ে যায় তাই বীণের পর রবাব বাজনা জমে না, তখন জাফর খাঁ বাজনা বন্ধ করে দিয়ে একমাস পরে বাজনা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি বেণারসের কোন কারিগর দিয়ে সুরশৃঙ্গার যন্ত্র তৈরী করান ও একমাস পরে বেণারসের রাজ-দরবারেই এই যন্ত্রে বীণ ও রবাবের

* Surbeen was invented by Kaale Saheb, Prince of Delhi. It is like the Sitar in shape with the bars. The Surface is covered with a thin plate of steel—Indian Music—By Sahinda—London. page 66.

কায়দায় আলাপ বাজিয়ে সকলকে চমক লাগিয়ে দেন। সেদিন বীণকার নির্মল শা তাঁর পুত্রপ্রতিম জাফর খাঁর বাজনার তারিফ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকের মতে রামপুরের নবাব সৈয়দ কালবে আলি খান বাহাদুর এই যন্ত্রের স্রষ্টা।[১] চলতি কথায় যন্ত্রটি সুরশিঙ্গার নামে পরিচিত। করম ইমাম সাহেব তাঁর মাদেনুল মৌসিকী গ্রন্থে **প্যাঁর খাঁকে** এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলেছেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই রবাবের জায়গায় বাহাদুরহুসেন খাঁকে সুরশিঙ্গার শেখানোয় কোন আপত্তি ওঠেনি।

রবাবের খোল (হাঁড়ি) যেমন কাঠে তৈরী হয় এই যন্ত্রে তেমন লাউয়ের খোলায় হাঁড়ি তৈরী করা হয়। খোলের (হাঁড়ির) ওপর চামড়ার বদলে কাঠের তবলি দেওয়া হয় সুরবাহারের মত। পটারির ওপর শরোদের মত লোহার অল্প-সমতল পাত লাগান হয়। সুরশৃঙ্গার রবাব থেকে আকারে বড়, রবাব বা শরোদের মত এটিও পর্দাবিহীন যন্ত্র। এর খোলটি আকারে কেচুয়া সেতারের মত (লাউয়ের আধখানা)। এর তবলির ওপর হাতির দাঁতের, হরিণের শিং-এর বা হাড়ের সওয়ারী থাকে। এতে ছয়গাছা তার খাটান থাকে (তিনটে লোহার আর তিনটে পেতলের)। হাঁড়ির শেষপ্রান্তের মধ্যস্থলে রাখা পর্নখিতে তারের গোড়া বেঁধে তবলীর ওপর রাখা সওয়ারীর ওপর দিয়ে নিয়ে এগুলি দানাডর মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রবাবের মত এটিও কোনস্ বা জওয়া দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে ভারতে সুরশৃঙ্গার বাদক নাই বললেই চলে।

রবাবের বিষয় লেখার সময় আমরা যেসব গুণীদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের প্রায় সকলেই সুরশৃঙ্গার বাদনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সুরশৃঙ্গারে আমরা ৫।৬টি প্রধান তার ও দুটি চিকারীর তার দেখতে পাই।

১। নায়কী তার—ষ্টীলের জুড় স্বরের মধ্যমে বাঁধা হয়।

২। জুড়ির তার (সুরের তার)—পেতল, ষ্টীল অথবা ব্রোঞ্জের হয় এবং মুদারার ষড়জে বাঁধা হয় (ইচ্ছামত সুরে)।

৩। পঞ্চমের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের তার—মুদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।

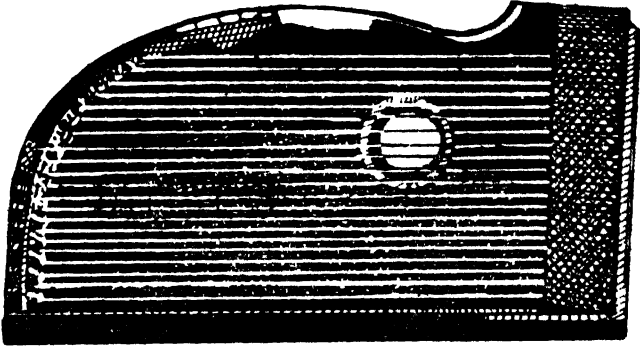
৪। খরজের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের তার—উদারার ষড়জে বাঁধা হয়।

৫। খাদ পঞ্চমের তার—পেতল বা ব্রোঞ্জের—উদারার পঞ্চমে বাঁধা হয়।

৬, ৭। চিকারীর তার—ষ্টীলের তার—তারাগ্রামের স এ বাঁধা হয়।

১ The Music of India by Rev. H. A. Popley—page no 116.

সংযোগী॥ সারেঙ্গীর অনুরূপ এই তত যন্ত্রটি সারেঙ্গীর মত ছড় দিয়ে বাজান হ'ত। এটি প্রায় একশো বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটিতে সারেঙ্গীর থেকে অনেক কম সংখ্যক তরফের তার রাখা হ'ত। আকারেও সারেঙ্গীর থেকে অনেক ছোট ছিল, বর্তমানে লুপ্ত। (S. N. on H. M. Ins. By S. M. Tagore).



স্বরমণ্ডল

স্বরমণ্ডল ঃ সঙ্গীতরত্নাকরের কল্লিনাথের টীকায় স্বরমণ্ডল যন্ত্রটির নাম পাওয়া যায়। এটিকে **সুরমণ্ডল**ও বলা হয়। এর আর এক নাম **স্বরমঞ্জরী**। স্বরমণ্ডলকে কানন যন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। একটা কাঠের বোর্ডের ফ্রেমের ওপর ২১টি তার ছোট ছোট কাণ দিয়ে বাঁধা থাকে। তারগুলি বাদক তার নিজের ইচ্ছামত তিনসপ্তকের স্বরবিভাগে রাগানুযায়ী স্বরে বেঁধে কোলের ওপর আড়ভাবে ধরে আঙুলের ঘা দিয়ে বাজান। আজকাল অধিকাংশ গায়কেরা তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গতে সুরের জমাটি ভাব বজায় রাখার জন্য নিজেই স্বরমণ্ডল বাজিয়ে থাকেন। ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রটি কখনও কখনও কাননের কায়দায় কোলের সামনে রেখে কাঠি দিয়েও বাজান হয়। সেক্ষেত্রে একে সন্তুরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বর্তমানে প্রচলিত বিদেশী পিয়ানো[১] এই প্রাচীন যন্ত্রের অনুকরণেই জন্মগ্রহণ করেছে। "তন্ত্রীনামেকবিংশত্যা কীর্ত্তিতা মত্তকোকিলা"।[২] আমাদের ধারণা প্রাচীন মত্তকোকিলা বীণাই বর্তমানের স্বরমণ্ডল।

১. This instrument is forefather of modern Piano which is nothing more than an enlarged Swaramandal".

—The Music of India by H. A. Popley Page 117.

২। সংগীত রত্নাকর-ব্যাখ্যায় শ্লোক নং ১১২।

যন্ত্রে ব্যবহার্য্য তারের মাপ অর্থে স্থূলতা

এই Chart-টি M/s. C. A. Wallgate & Co.-র Player Piano Accessories-এর Catalogue থেকে উদ্ধৃত। তত-যন্ত্রে আমরা যে সব তার ব্যবহার করি সেগুলির প্রকৃত মাপ কিরূপ হওয়া উচিত সেটি নীচে দেখান হয়েছে।

যন্ত্রে ব্যবহার্য্য তারের বাজার চলতি নাম	ইঞ্চির হিসাবে	মিলিমিটার হিসাবে	ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়্যার-গেজ হিসাবে
000নং ট্রিবল জিরো	0·0076	0·193	36
00নং ডবল জিরো	0·0084	0·213	35
0নং ওয়ান জিরো	0 0092	0·234	34
১নং	0·010	0·254	33
২নং	0 011	0·279	32
৩নং	0·012	0·305	31
৪নং	0·013	0·330	30
৫নং	0·014	0·356	29
৬নং	0 015	0 381	28
৭নং	0·017	0·432	27
৮নং	0·0195	0·495	25
৯নং	0·022	0·559	24
১০নং	0·025	0·635	23

উপরোক্ত ফার্মের মিউজিক Wire gauge পাকা মাপের। বাজারে নানা রকমের Wire guage ব্যবহৃত হয়, সেই সব Wire guage-র মাপ ঠিক মত মেলে না।

আনদ্ধজাতীয় যন্ত্র

বাদ্যযন্ত্রের বিভাগ লেখার সময় আমরা তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন এই চার রকম বাদ্য যন্ত্রের কথা লিখেছি। চর্মাচ্ছাদিত সকল প্রকার আঘাত যন্ত্রকেই আনদ্ধ বা বিতত যন্ত্র বলা হয়।

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মত আনদ্ধ যন্ত্রগুলিও প্রধানতঃ পাচ ভাগে বিভক্ত।

প্রথম : মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি **সভ্য** ;

দ্বিতীয় : ঢাক, ঢোল প্রভৃতি **বাহির্দ্বারিক** ;

তৃতীয় : মহানাগরা, জয়ঢাক, জগঝম্প প্রভৃতি **সামরিক** ;

চতুর্থ : মাদল, ডুগডুগি, ডমরু প্রভৃতি **গ্রাম্য** ;

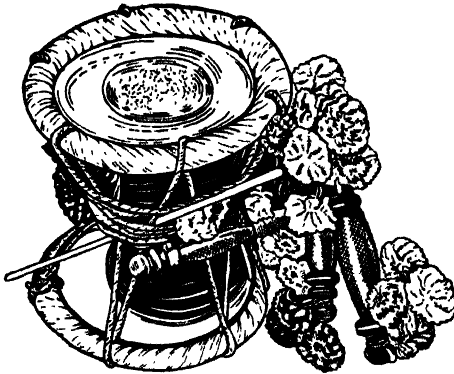
পঞ্চম : খোল, নাকাড়া, টিকারা, দামামা প্রভৃতি **মাঙ্গল্য** ;

প্রায় সমস্ত তালবাদ্যই অঙ্গগতসিদ্ধ। ক্বচিৎ তবলা, ঢোল প্রভৃতি কয়েকটিতে (স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে) লহরা বাজাতে শোনা যায়।

* * * *

অগাধপাল : এক প্রকার প্রাচীন চর্মাচ্ছাদিত আনদ্ধ যন্ত্র, বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত। আকারের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আঘাট বা আঘাটি : ঋকবেদবর্ণিত একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত তালযন্ত্র। নৃত্যের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। বিদেশী তাম্বুরীন যন্ত্রের মত। আকারের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না।



ইডাক্কা

ইডাক্কা : ইডাক্কা যন্ত্রটিকে দক্ষিণে অনেকে উডুক্কাইও বলে থাকেন। দক্ষিণভারতের অভিনব তালবাদ্য। দেখতে ডমরুর মত হলেও এটি বাজাবার

কায়দা ভিন্ন রকমের। বাঁ হাতে বাজনার মাঝখানের টানা গুলিকে ধরে ডান হাতে সরু কাঠি দিয়ে অথবা খালি হাতে বাজান হয়। বাঁ হাতে ধরা ছোটের টানাগুলির ওপর হাতের মুঠার চাপের কমবেশীতে আওয়াজের তারতম্য ঘটান হয়। এই বাজনার দুই মুখ ছোট বাছুরের (গো-বৎসের) চামড়ায় ছাঁওয়া হয়। ছাউনির দুটি পাগড়ি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে মুঠার চাপের কমবেশীতে পাগড়িতে টানের কম বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাউনির টানের তারতম্য ঘটে। এই তারতম্যের ফলে ধ্বনিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়।

উরুমি : দক্ষিণভারতের এক প্রকার বাহির্দ্বারিক আনদ্ধ যন্ত্র। ছেন্দা যন্ত্রটির কথা লেখার সময় আমরা ছেন্দা-মেলম শব্দটি ব্যবহার করেছি। দক্ষিণে যখন একটি বাদ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে অপর কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র বৃন্দ-বাদনের মত একসঙ্গে বাজান হয়, তখন মুখ্য বাদ্যযন্ত্রটির প্রাধান্যের কারণে সেই যন্ত্রটির নামের সঙ্গে 'মেলম' শব্দটি যুক্ত করা হয়। এই যন্ত্রের সঙ্গে ছোট আকারের পম্বাই ও ছোট আকারের নাগেশ্বরম বাজতে দেখা যায়। তিনটি বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত বাদ্যবৈঠককে এক কথায় **"উরুমি-মেলম"** বলা হয়। উরুমি যন্ত্রটি অনেকটা বড় আকারের ডমরুর মত, মাঝখানটা কিছু সরু, দু মাথা চওড়া, ভেতরটি ফাঁপা, কাঠের তৈরী। দু দিকের খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা। শবানুগমনেই উরুমি-মেলমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অন্য কোনও ক্ষেত্রে একে বাজাতে দেখা যায় না। পম্বাই ও নাগেশ্বরম প্রায় সর্বত্রই আলাদা আলাদা বাজে।

কাঠি : পশ্চিমবঙ্গে ব্রতচারী নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে দেখা যায়। দুটি ছোট ছোট কাঠের কাঠি দু হাতে ধরে নাচের তালে তালে মণ্ডল নৃত্যের এক সঙ্গী অপর সঙ্গীর কাঠিতে ঠুকে বা নিজের দু হাতে ধরা দুটি কাঠির পরস্পরের আঘাতে অথবা মাটিতে ঠুকে তাল দিতে থাকেন। বিহার ও উড়িষ্যার কাঠি-নৃত্যেও এই ধরণের কাঠির ব্যবহার দেখা যায়। বিহারে এই কাঠির ডগায় ঘুঙুর বেঁধেও বাজান হয় এবং এই কাঠি-বাদ্যকে তারা **ডাণ্ডা** বলে থাকেন। (Folk dances of Bengal by Guru Saday Dutta—Page 119.)

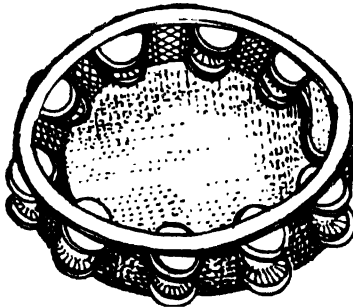
কাড়া : বাদ্যযন্ত্রটি আনদ্ধ জাতির বাহির্দ্বারিক শ্রেণীভুক্ত। আগে যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পূজাপার্বণের শোভাযাত্রায় একে জগঝম্প

ও নাকারা যন্ত্রের সঙ্গে বাজাতে দেখা যেত। এর দুদিকের মুখ নাকারার থেকে প্রশস্ত, নীচের মুখ ওপরের মুখ থেকে অপ্রশস্ত, গোলাকার ও উন্মুক্ত।



কাড়া

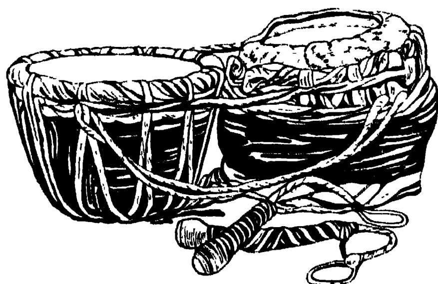
বড় মাপের কাড়াও দেখা যায় নাকারা থেকে কাড়ার আওয়াজ মোটা ও গম্ভীর। দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে সামনে পেটের ওপর রেখে, দু হাতে দুটি কাঠি ধরে বাজান হয়।



কাঞ্জিরা

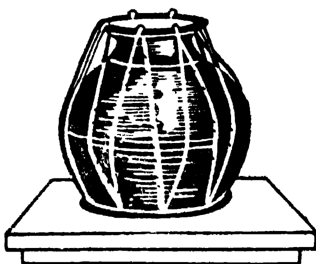
কাঞ্জিরা: ৮ইঃ থেকে ৯ইঃ গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ সম্পূর্ণ ভাবে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুর তৈরী ছোট ছোট চাকার মত ঝিনঝিনি থাকে, বাজাবার সময় ঝিনঝিনিগুলি থেকেও মধুর ধ্বনি বেরোয়। এই কাঞ্জিরা কখনও কখনও ৯।১০ ইঃ থেকে ১৫ ইঃ ডায়ামেটারের হয়ে থাকে। বিদেশী তাম্বুরীন (Tambourine) যন্ত্রের মত। যন্ত্রটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে বাজান হয়।

কিরিকিট্টি বাদ্যম : কাঁঠাল কাঠে তৈরী এক জোড়া দক্ষিণী বাদ্যযন্ত্র। খোলের মাঝখান ফাঁপা ও উপরি ভাগের মুখগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই



কিরিকিট্টি

আচ্ছাদন ছোট দিয়ে টানা থাকে। কিরিকিট্টি বাদ্যম নাগেশ্বরম যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রযুগল দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। দুটি যন্ত্রের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ ডাহিনাটি চড়া স্বরে ও বাঁয়া (বামকটি) খাদ স্বরে বাজে।

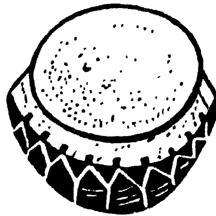


কুদামুঝা

কুদামুঝা : চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য যন্ত্র, আকার পিতলের কলসির মত। কলসির খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। মুখের ঢাকা একটি লোহার বালা দিয়ে কলসির গলায় আটকান থাকে। লোহার বালাটি সুত্‌লি দড়ি দিয়ে কলসির গায়ে টানা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এই যন্ত্রটি দক্ষিণী বাদ্যযন্ত্র এবং দক্ষিণের পঞ্চমুখ বাদ্যমের সঙ্গে বাজান হয়।

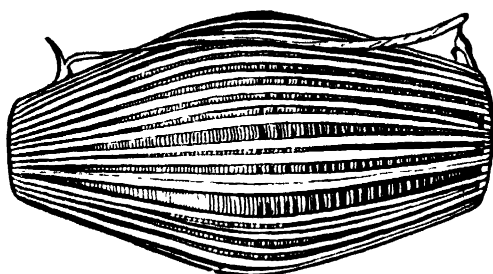
হুড়ুক্কা ঃ হুড়ুক্কার মত এক রকমের দক্ষিণী যন্ত্র। দু পাশের মুখ চামড়া দিয়ে ছাওয়া। দু দিকের মুখের মাপ সাত আঙ্গুল। কাঠের তৈরী এক হাত লম্বা, আটাশ আঙ্গুল মোটা শরীর, ভেতরটি ফাঁপা। মুখে চামড়ার ছাউনি ও চামড়ার বেড়। বেড়ে ছটি ফুটো এবং ফুটোর মাঝ দিয়ে দড়ির ছোট। বত্রিশ গাছা সুত্‌লি দড়ি ছোটের সঙ্গে বাঁধা থাকে। সেই দড়ি কাঁধের ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যন্ত্রটির বাঁ দিকের মুখ বাঁ হাতের কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ ডান হাতে বাজান হয়।

খঞ্জরী ঃ এটিও তালবাদ্য ও গ্রাম্যযন্ত্র। খঞ্জরী উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, গুজরাট, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত। দশ ইঞ্চির মত একটা কাঠের গোল ফ্রেমের এক পাশ চামড়া দিয়ে ঢাকা এবং অপর পাশটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে। খঞ্জরী বাঁ হাতে ধরে চামড়া দিয়ে ঢাকা মুখটি ডান হাতের আঙ্গুল সোজা রেখে, ডান হাতের চেটো ও আঙ্গুল দিয়ে বাজান হয়। এতে কোন ধাতুর তৈরী ঝিনঝিনি থাকে না (কাঞ্জিরার সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ)। মাঝে মাঝে বাঁ-হাতে ধরা আঙ্গুল দিয়ে চামড়ার ওপর চাপ দিয়ে আওয়াজের তারতম্য ঘটান হয়। সব দেশেই গ্রাম্য-গীতে ও ভজনে এর ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে ক্বচিৎ একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতেও দেখা যায়।



খোরদক (ডাহিনা)

খোরদক ঃ রৌশন চৌকির সঙ্গে সঙ্গতে এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এই যন্ত্রের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। বাঁয়া ও ডাহিনা দুটি যন্ত্রই একসঙ্গে জোড়ায় বাজে। এর ডাহিনাটি ছোট ও বাঁয়াটি বড়। যন্ত্রযুগল চড়াস্বরে বাঁধা থাকে। বাঁয়ার স্বর অপেক্ষাকৃত নীচু ও গম্ভীর। ছোট ও বড় আকারের হয়।



খোল বা শ্রীখোল

খোল বা শ্রীখোল ঃ খোল আনদ্ধজাতীয় অন্তর্গতসিদ্ধ যন্ত্র। ভারতের পূর্বাঞ্চলেই এর জন্ম ও প্রচলন। এর আকারের সঙ্গে মৃদঙ্গের আকারের মিল দেখা যায়। মৃদঙ্গ শব্দের ধাতুগত অর্থে আমরা খোল, মাদল, পখাবজ প্রভৃতি যন্ত্রের যে কোন একটিকেই মনে করতে পারি। সংস্কৃত খ্+ল থেকে খোল শব্দটির জন্ম, খোল মানে আধার, তুম্ব, আবরণ বা গহ্বর। খোল যন্ত্রটিকে অনেকে মৃদঙ্গ বলে থাকেন। "মৃন্ময়ং অঙ্গং যস্য" অর্থে মাটিই যার অঙ্গ সেই হিসাবে খোল মৃদঙ্গ নাম পাওয়ার উপযুক্ত হলেও আমরা মৃদঙ্গ বললে পখাবজকেই বুঝি। মৃদঙ্গের সঙ্গে আকারগত মিল থাকলেও দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সঙ্গীত রত্নাকরে মৃদঙ্গের বর্ণনায় যে তিন রকম আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে যবাকৃতির ঊর্ধ্বককে দেখা যায়। ঊর্ধ্বকের দুমুখ খোলের থেকেও সরু হত এবং মাটির তৈরী হত। খোল মাটির তৈরী বাদ্যযন্ত্র থেকেই জন্ম নিয়েছে, এবং ঊর্ধ্বক জাতীয় যন্ত্রই এর আবিষ্কারের মূলে রয়েছে। খোলের উৎপত্তি ও নামকরণের সঠিক বিবরণ জানা যায় না।

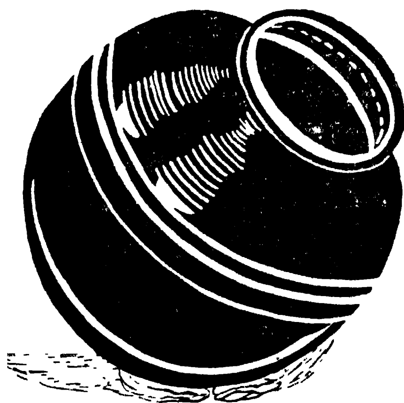
খোলের আর এক নাম মর্দল, এই মর্দলও মাটির তৈরী হত। সঙ্গীত রত্নাকরে " সঙ্গীত দামোদরে এইরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেবলমাত্র ১৭শত খৃষ্টাব্দের ভক্তিরত্নাকারে মর্দলকে কাঠের তৈরী বলা হয়েছে। মাদলকেও মর্দল বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের শুদ্ধমদ্দলম যন্ত্রটি কাঠের তৈরী এবং আকারে প্রাচীন মৃদঙ্গের মত। আমাদের ধারণা প্রাচীন মর্দলই দক্ষিণ ভারতের শুদ্ধমদ্দলম। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাস্কর্যের মাঝে বর্তমান আকারের খোল যন্ত্রটি দেখা যায় না। নরহরিকৃত পঞ্চমসার সংহিতায় দশকোশী ডাঁশপাহিড়া প্রভৃতি যে সব তালের নাম পাওয়া যায় তা থেকে আন্দাজ

করা যায়, খোলের জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এটি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল। তাই অনেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকেই খোলের আবিষ্কারক বলে থাকেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আগেও খোলের জন্ম হয়ে থাকতে পারে, আমরা তাঁকে আবিষ্কারক বলতে পারি না, তবে তিনি প্রধান প্রচারক ও প্রবর্তক ছিলেন একথা বলা যায়। মণিপুরে কাঠের খোলকে পুঙ্গ বা পুং (Pung) বলা হয়।

খোল প্রধানতঃ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হলেও মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতেও ব্যবহৃত হয়। তবলা, মাদল প্রভৃতির বোলের সঙ্গে খোলের বোলের মিল নাই। খোলের বোল তার স্বকীয়তা বজায় রাখে। খোলের আওয়াজ ঝুন্-যুক্ত হয়। খোল শ্রীহরি কীর্তনের প্রধান অঙ্গ বলে বৈষ্ণবেরা খোলকে **শ্রীখোল** বলে থাকেন। বাঙ্গলা বাজের সঙ্গে মণিপুরের খোলের বাজের স্টাইল ও বাণীর পার্থক্য আছে।

খোল বা শ্রীখোলের (হাঁড়—Body) অঙ্গটি পোড়া মাটির তৈরী। এই অঙ্গ খুব কড়া পোড়া মাটির এবং ওজনে একটু ভারী না হলে ঠিকমত খন্‌খনে আওয়াজ পাওয়া যায় না। গম্ভীর আওয়াজ পেতে হলে খোলের (পেট) মাঝখানটি মোটা হওয়া দরকার। মৃদঙ্গের মত এর আওয়াজ গম্ভীর নয় তাই সহজেই এর আওয়াজের বৈশিষ্ট্য কানে ধরা পড়ে। প্রমাণ আকারের খোলের দৈর্ঘ্য (১॥০) দেড়হাত থেকে (১৸০) পোনে দুহাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডাহিনার মুখের ব্যাস (৫॥০) সাড়ে পাঁচ আঙ্গুল থেকে ছয় আঙ্গুল ও বাঁয়ার মুখ (১০) দশ থেকে (১১) এগার আঙ্গুল হয়। ডাহিনা ও বাঁয়ার মাপ উপরোক্ত মাপ থেকে ছোট বড় হলে খোলের আওয়াজ ভাল হয় না। খোলের ডাহিনা খুব চড়া থাকে তাই কাঁসির মত মিষ্টি টুং টুং আওয়াজ পাওয়া যায়। বাঁয়ার তালা নরম রাখা হয়, যাতে বাঁয়ার আওয়াজ গম্ভীর শোনায়। ডাহিনা ও বাঁয়া উভয়ের আওয়াজই জোয়ারিদার অর্থে ঝুন্‌যুক্ত হওয়া দরকার। বাঁয়ার সুর এমন ভাবে নীচু রাখা হয় যাতে ডাহিনার চড়াসুরে আঘাতের সময় উভয়ের মিলিত সুর একভাবের হয়। খোলের ডাহিনা ও বাঁয়ার উভয় মুখেই 'খিরণ' (গাব) লাগান হয়। বাঁ মুখের গাব ডান মুখ থেকে অনেক হালকা অর্থে পাতলা রাখা হয়। খোলের দুদিকের মুখ অর্থাৎ তালা বড় ছোট দিয়ে টান রাখা হয়। তালিতে ষোলটি ঘাট থাকে তবে ছোটে বিশেষ টান দেওয়ার জন্য কোন আঁটা বা গুলি রাখা হয় না। খোলের বাজের মধ্যে তিন চার ধরণের বাজের নাম শোনা

যায়। (১) সাধারণত খোলা বাজ (২) নামমালা বাজ (৩) গুপা বাজ—(ক) খোলা গুপা (খ) চাপা গুপা (৪) টুকী বাজ গুপা বাজেরই ভিন্ন নাম।



ঘটবাদ্য

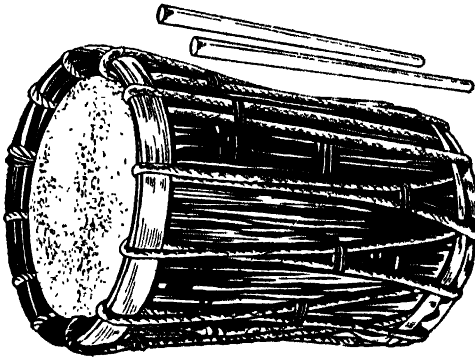
ঘটবাদ্য ঃ ঘনঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থপক্কশ্চ স্তোক বক্ত্রো মহোদরঃ
পাণিভ্যাং বাদ্যতে তজজ্ঞৈ-শ্চর্মনো-দ্বান নো ঘটঃ
কথিতা পাটবর্ণা যে মর্দলে তে ঘটা মতাঃ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর (আড়েয়ার সংস্করণ ৪৭২ পৃঃ শ্লোক নং ১০৮৫)

ভারতের এই প্রাচীন তাল-বাদ্যটি ঘটের আকৃতি। মাটির কলসীর বা হাঁড়ির মত। পেটটি মোটা ও মুখটি ছোট, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা বা খোলা থাকে। হাঁড়ি বাজনা বর্তমানে দাক্ষিণভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। লেখক মাদ্রাজে থাকার সময় বহুবার ঘট বাজানো দেখবার ও শোনবার সুযোগ পেয়েছেন। হাঁড়ি বাজানোর সময়ে হাঁড়ির মুখটি পেটের ওপর চেপে ধরে বা অনেক সময় মাটিতে উপুড় করে রেখে ও হাঁড়ির ঘাড়ের কাছে ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে বাজান হয়। সভ্যযন্ত্ররূপেই এটি সঙ্গীতাসরে মান পেয়ে থাকে। তবলা ও বাঁয়ার মত এটি সাথ সঙ্গতে ও জবাবে অদ্বিতীয়। বাজনাটির ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মধুর, তবলার মতই শুনতে লাগে, এবং দু'হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের এই ঘটবাদ্য আকারভেদে কাশ্মীরে **ঘরুহা** ও মধ্যপ্রদেশে **মাটকি** বলে প্রচলিত আছে।

ঘড়স ঃ হুডুক্কার অনুরূপ বা তার রূপান্তরবিশেষ বলা চলে। বাঁদিকের মুখের বেড দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাঝের আঙ্গুল ও কড়ে আঙ্গুলের ডগায় মোম লাগিয়ে, সেই ডগা দিয়ে বাজান হয়। ডান হাতে ঘষে ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের ঘা দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ত।

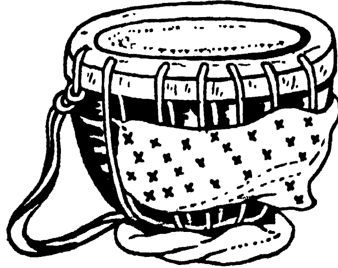
চর্চরী ঃ এই চর্মাচ্ছাদিত বাহির্দ্বারিক যন্ত্রটি আগে পূজাপার্বনে বাজতে দেখা যেত। যন্ত্রটি ছোট আকারের নাকারার মত ছিল ও কাঠি দিয়ে বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত।



ছেন্দা

ছেন্দা ঃ কথাকলি নৃত্যসঙ্গীতে এই ঘাতযন্ত্রটিকে বাজতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের এই বাদ্যযন্ত্রটি আমাদের ঢোলের আকারের। যক্ষাগ্ন নামক অতিপ্রিয় কর্ণাটকীয় নৃত্য-নাট্যে এই তালযন্ত্রটির বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। ছেন্দা যন্ত্রের প্রাধান্যে কেলিকট্টু নামক বাজ দিয়ে কথাকলি নৃত্য আরম্ভ করা হয়। কেলিকট্টু বাজে আমাদের পখাবাজের মত একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয় যার নাম মদ্দলম, তাছাড়া ভারী কাঁসর প্রভৃতি আরও দু-একটি তালযন্ত্র এই ঐক্যতালিতে ব্যবহার করা হয়। এই বাদ্যবৃন্দকে এক কথায় দক্ষিণী ভাষায় ছেন্দা-মেলম বলা হয়। যন্ত্রটি ঢোলের মত ঝুলিয়ে সামনে পেটের কাছে রেখে দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। আমাদের ঢোল সামনে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠের পাশ দিয়ে অথবা ঘাড়ের মাঝ দিয়ে এমন ভাবে ঝোলান থাকে যে বাজনাটি শোয়ান অবস্থায় দুই খোলা মুখ দুপাশে দুটি হাতের দিকে থাকে এবং তাকে দুহাতে দুটি মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়। ছেন্দা কিন্তু লম্বা ভাবে

ঝোলান কোমরের মাঝ দিয়ে দড়ি বেঁধে (Vertically) ঝোলান থাকে এবং তার বাঁ মুখটি ওপর দিকে রেখে একদিকের মুখেই তুহাতে তুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়।



জগঝম্প

জগঝম্প ঃ আনদ্ধ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সামরিক ও বাহির্দ্বারিক। • যন্ত্রটি মাটির তৈরী, বাজাবার সমতল গোলামুখ চামড়ায় ঢাকা থাকে ও বাঁয়ার মত চামড়ার ডুরি দিয়ে টানা থাকে। গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটি গোলাকার, নীচের দিকের গোল মুখটি ওপর দিকের মুখ থেকে আকারে কিছু অপ্রশস্ত ও উন্মুক্ত। জগঝম্প তুরকমের দেখা যায়। (তাসা দেখুন)



টিকারা

টিকারা ঃ এটিও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, মাটির তৈরী, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা ও চামড়ার ডুরিবাঁধা থাকে। টিকারা তুই রকম—একটি মহানাগারার মত বড় ও

অপরটি ছোট আকারের। আগের দিনে বিবাহাদির শোভাযাত্রায় হাতি বা উটের পিঠে রেখে বড় টিকারা বাজান হত। নৌবতের সঙ্গেও একে মাটিতে রেখে বাজাতে দেখা যেত। দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। ছোট আকারের টিকারা কচিৎ বাজতে দেখা যায়। (নাকারা দেখুন)



ডমারম

ডমারম : বাঁয়ার আকারের যুগল বাদ্যযন্ত্র। কাঠের তৈরী পাত্রযুগলের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ার ওপর কাঠি দিয়ে বাজান হয়। যন্ত্রযুগল দক্ষিণভারতের বাহির্দ্বারিক আনদ্ধযন্ত্র। একটি ষাঁড়ের পিঠে রেখে বাদক কাঠি দিয়ে বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রার আগে আগে চলেন। যন্ত্রদুটি কত প্রাচীন তা জানা যায় না, অনেকে এই যন্ত্রযুগলকে বাঁয়া-তবলার আদি-উৎস বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ডমরু : এই যন্ত্রটিকে শুদ্ধ ভাষায় ডম্বরু বা ডম্বুরু বলা হয়। যন্ত্রটি অতি প্রাচীন। দেবাদিদেব মহাদেবের নটরাজ মূর্তির হাতে এই যন্ত্র দেখা যায়। সেই কারণে মহাদেবের আর এক নাম ডম্বুরপাণি। এই যন্ত্রটি আমাদের কাছে **ডুগডুগী** বলেই পরিচিত। বর্তমানে বাঁদরনাচিয়েদের হাতে একে দেখা যায়। চীনের Tang Dynasty-র সময় (618-907 A D.) অবিকল আমাদের ডমরুর আকারের একটি যন্ত্র Tang-huang গিরিগুহায় অঙ্কিত দেখা যায়। ভারতে এই যন্ত্র আরও বহু আগে থেকে প্রচলিত। (ডমরুর ছবি পরে দেয়া হয়েছে)

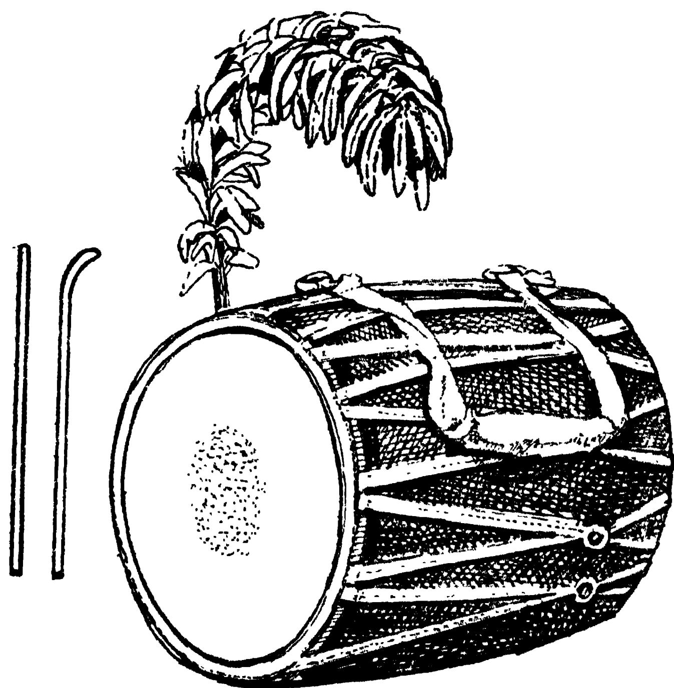
ডম্ফ : আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভজন ও অন্যান্য ভগবদবিষয়ক গানের সঙ্গে সঙ্গতে এই তালবাদ্যটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় লুপ্ত।

ডাফ : চামড়ায় ঢাকা ছোট আকারের সাধারণ গ্রাম্য আনদ্ধযন্ত্র। গ্রাম্য নৃত্য ও গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ভারতে গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। কাঠ বা ধাতুর গোল ফ্রেমের একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। হাত দিয়ে বাজান হয়। বাজাবার কায়দায় ও আকারে খঞ্জরীর মত। ডাফ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে।

ডোলকি : মৃদঙ্গের অনুরূপ ছোট আকারের যন্ত্র। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত।

ঢাউস বা ঢবস : এক হাত লম্বা উনচল্লিশ আঙ্গুল মোটা, ঘেরের মাঝখান ফাঁপা, এক ধরণের প্রাচীন চর্মবাদ্য। দুপাশে দুটি বারো আঙ্গুল ঘেরের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো। চামড়ায় সাতটি ফুটো রাখা হত, দুপাশে লতার বলয় থাকতো এবং বলয় দুটি চামড়া দিয়ে বেড় দেওয়া হত। সাতটি ফুটোর মাঝ দিয়ে দড়ি এসে চামড়ার বেড় দেয়া বলয় দুটিকে টেনে রাখতো। হুড়ুক্কার মতো এই বাদ্যযন্ত্রটিও কাঁধ থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁ হাতে ও ডান হাতে দুটি কাঠি ধরে বাজানো হত। বর্তমানে লুপ্ত।

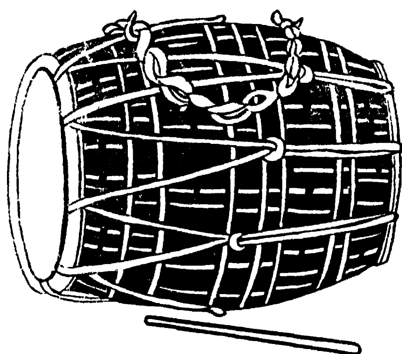
ঢাক ও জয়ঢাক : আনদ্ধযন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে ঢাক ও জয়ঢাক বাহির্দ্বারিক যন্ত্র বলেই গণ্য। পুরাকালে যুদ্ধযাত্রায় ব্যবহৃত হত বলে অনেকে একে সামরিক যন্ত্র বলে থাকেন। বর্তমানে পূজাপার্বণে বাজতে দেখা যায়। শুদ্ধ ভাষায় ঢাককে **ঢক্কা** বলা হয়। অতি বৃহদাকারের ঢাককে **'জয়ঢাক'** বলা হয়। সাধারণ ঢাক থেকে জয়ঢাকের আওয়াজ গম্ভীর ও জোরদার। ঢাকের ডানমুখটাই ঊর্ধ্বমুখ। ঢাক মাটিতে বসিয়ে রেখে ঊর্ধ্বমুখে দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। দুদিকের খোলা মুখই মোটা চামড়ায় ঢাকা থাকে। দুদিকের চামড়ায় ছোটের টান দেওয়া থাকে। ঢাকের ওপর দিকে বাঁখারি বা বেতের ছড়ে নানা রং-এর পাখির পালক থোকা থোকা করে বাহারের জন্য সাজান থাকে। অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটি ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর পূজায়, নানা পার্বণে ও চড়কে গাজনের সময় ঢাক দেখা যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মিশরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ঢাকের অনুরূপ একটি



ঢাক ও জয়ঢাক

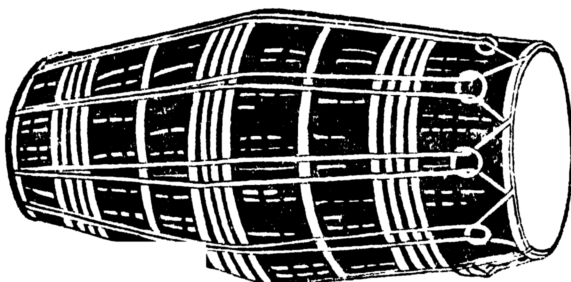
যন্ত্র পাওয়া যায়। কেবলমাত্র এই কারণে এটিকে মিশর দেশের যন্ত্র বলে আমরা স্বীকার করতে অক্ষম। আমরা এটিকে একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই মনে করি।

ঢোল: এটিকে গ্রাম্য ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র বলা হয়। অতি প্রাচীন এই আনদ্ধযন্ত্রটি অনেকটা ঢোলকের মত। ঢোলকের থেকে লম্বায় ছোট হলেও অন্যভাবে আকারে বড় ও পেটটি মোটা। দুদিকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। আগে বাঁদিকের মুখের ছাউনির মাঝে 'গাব' অর্থে খরলি বা খিরণ দেওয়া হত, বর্তমানে কোন গাব দেওয়া হয় না। এটি কাঁধে ঝুলিয়ে সামনে পেটের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে বাজান হয়। ডান হাতে কাঠি দিয়ে ডান দিকের মুখ, এবং খালি হাতে বাঁদিকের মুখ বাজান হয়। ঢোলে সুর বাঁধার কোন ব্যবস্থা নাই একই সুরে এটি বাঁধা থাকে ও সেই সুরেই বাজে। এর সঙ্গে সঙ্গতে (মাত্রা ও লয় রাখার জন্য) একটি কাঁসি বাজে। পূজাপার্বণে ও



ঢোল

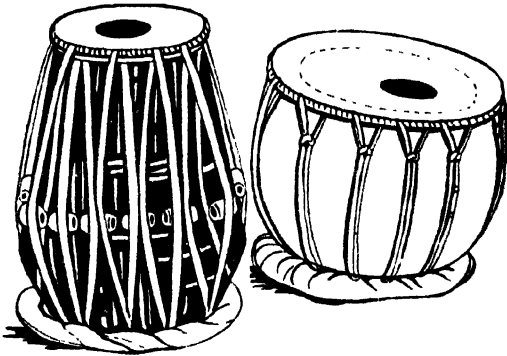
তরজা ও কবি গানের আসরে একে বাজতে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে ঢোলং নাগেশ্বরমের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সামান্য আকারভেদে ঢোল প্রচলিত। বাজাবার কায়দা সর্বত্রই প্রায় সমান।



ঢোলক

ঢোলক ঃ ঢোলক শব্দটি প্রাকৃত শব্দ। এই নামই এর প্রাচীনত্বের বড় প্রমাণ। আনদ্ধ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সভ্যযন্ত্রের তালিকাভুক্ত। বহুকাল পূর্বে লিডিয়া ও অন্যান্য এসিরীয় দেশে অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হত। তবুও এটি একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই পরিচিত। পাঁচালি ও কবিগান প্রভৃতির সঙ্গেই বেশী বাজে। দোলের শোভাযাত্রায় ও অন্যান্য উৎসবে সমবেতসঙ্গীতের সঙ্গে এবং যাত্রা ও পালাগানে এর ব্যবহার নজরে আসে। ঢোলক একখণ্ড মোটা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। এর মাঝখানটা কুঁদে ফাঁপা করা হয়। ঢোলের মতই দুদিক ফাঁকা (খোলা) মুখদুটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এই

চামড়াগুলিতে টান রাখার জন্য ছাউনির দুমুখের পাগড়ি সুতলী দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা হয়। প্রয়োজন মত সুর বাঁধার জন্য জোড়া জোড়া দড়ির মাঝে লোহা, পেতল, তামা বা রূপার আংটা (কড়া) গলান থাকে, সেগুলি সরিয়ে সুর বাঁধার জন্য দড়ির ছোটে ইচ্ছামত টান করা হয়। ঢোলক বিভিন্ন আকারের (size) হয়। পখাবজের মত একেও কোলের উপর শুইয়ে খালি হাতেই দুমুখ বাজান হয়। দাক্ষিণাত্যে ছোট আকারের যে ঢোলক ব্যবহৃত হয় তাকে **ঢোলকি** বলে। দক্ষিণভারতে কিছুদিন আগে কাঁচের ঢোলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এর (Body) হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষটি ফাঁপা কাঁচের তৈরী। এগুলি "Glass Dhole" নামে পরিচিত। আমরা **শীশ-ঢোলক** বলাই পছন্দ করি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঢোলক স্বল্পবিস্তর আকারভেদে ঢোলক নামেই প্রচলিত আছে।



তবলা ও বাঁয়া

তবলা ও বাঁয়াঃ তবলাকে শুদ্ধ ভাষায় তল-মৃদঙ্গ বলা হয় ও বাঁয়াকে বলা হয় বামক অথবা বাম-মৃদঙ্গ। এটি অনুগত সিদ্ধ ও সভ্য যন্ত্ররূপেই পরিচিত। তবলা ডান হাতে বাজান হয় বলে এর অপর নাম ডাহিনা বা ডাইনে (ডাঁয়া)। আমরা বৈদিক, পৌরাণিক ও হিন্দুযুগের নানা গ্রন্থে বহু প্রকারের চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যের উল্লেখ দেখতে পাই। প্রাচীন গুহাতে মর্মরমূর্ত্তির মাঝে, শিলালিপিতে, মন্দিরগাত্রে খোদাই করা চিত্রপটে নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি দেখতে পাই; কিন্তু হিন্দুযুগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা উপরিউক্ত চিত্রাদির মাঝে তবলা বাঁয়ার আকৃতির কোন প্রতিকৃতি আমাদের নজরে আসে

না। অবশ্য দক্ষিণভারতের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে যুগল বাদ্যযন্ত্রের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। অভিধানে "তবল" এই ফার্সী শব্দের অর্থ দুন্দুভী বা নক্কারা জাতীয় যন্ত্র বলা হয়েছে এবং তবলী নামে আরবী শব্দের অর্থ "ঢোল কি তরহ বাজতা হৈ" এরূপ বলা হয়েছে। শব্দটিকে বিজাতীয় বলেই জানা যায়। কিন্তু তবুও আমাদের ধারণা যে হিন্দুযুগে এজাতীয় যন্ত্র ভারতে প্রচলিত ছিল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ৩০৭ পৃঃ লিখেছেন "প্রাচীন ভারতে তবলা ও বাঁয়ার মত গানে দুটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়"……….. "তবলা ও বাঁয়ার গঠন, বাদনপদ্ধতি মুসলমান যুগে নূতন রূপ গ্রহণ করতে পারে" অতএব বোঝা যায় যে অতীতে হয়ত তবলা বাঁয়ার মত কোন যন্ত্র ছিল। ডাঃ অমিয় সান্যাল মহাশয় ভারতীয় দর্দুর যন্ত্রকে তবলা বাঁয়ার আদি উৎস বলে মান্য দিয়েছেন। ডাঃ বিমল রায় এই মতগুলি স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। তাঁর বক্তব্য—ভরতের গ্রন্থে দর্দুর দুটি ছিল এমন কথা কোথাও লেখা নাই। দর্দুর পনব ছাড়া অন্য কোন যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় নি, বা ঊর্ধ্বকের স্থানও সে কখন গ্রহণ করে নি। দর্দুর ছিল ঘট বা ছোট কলসের মত দেখতে। তিনি ভরতের উক্তি দিয়ে নানা ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তবলা ভারতীয় কোন বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে জন্মগ্রহণ করে নি। এটি এরেবিয়া থেকেই এসেছে। তাঁর লেখার সমগ্র অংশটি বা এসম্বন্ধে অন্যান্য গুণীরা যা লিখেছেন, বা যেগুলি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে, সে সমস্ত বিষয় এখানে লেখা সম্ভব হয় নি। শ্রীযুত রবীন্দ্রকুমার বসু মহাশয় তাঁর "তবলা বিজ্ঞান ও বাণী" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে "গৌতমবুদ্ধ পাথর কুঁদিয়ে তা থেকে একরকম বাজনা তৈরী করলেন। তার নাম দিলেন 'তবল জাং'। পঞ্জাব প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে সেটাকে বলে 'ধামা' বা 'ডুক্কড়'। এর পর আরব দেশের লোকেরা এর অনেক পরিবর্তন করেন। চন্দ্রপাল এবং আনন্দপালের সময় যখন তারা ব্যবসাবাণিজ্য করবার জন্য কম্বোজে এলেন, তখন তাঁরা তবল-জাংকে কাঠের রূপ দিয়ে তবলা নাম দিলেন। তখন বাঁয়ার রেওয়াজ হয় নি। তাঁরাই বাঁয়ার প্রচলন করেন। আমীর খসরু তবলার সাজ গাব ইত্যাদির রেওয়াজ করেন।"

এঁর লেখায় দেখা যায় ভারতে বৌদ্ধযুগেই প্রথমে তবলার জন্ম হয় কিন্তু আমাদের ধারণা তবলা তার আগেই জন্ম নিয়েছিল, ভিন্ন নামে ও রূপে।

মুসলমান আমলে সেটি সামান্য রূপবদলে তবলা নামে আমাদের কাছে পরিচিতি পায়।

বাদ্যবিশারদ শ্রীযুত সুবোধ নন্দী মহাশয় লিখিত "তবলার কথা" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সম্বন্ধে বক্তব্যে লেখা আছে—"বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় গদাধর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় মুরলীধর চক্রবর্তী দিল্লীতে যান এবং প্রথমেই তিনি অচপলের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন। ইনি যখন বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন তখন আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে সদারঙ্গ কর্তৃক যখন খেয়াল গানের প্রচলন হয়, তখন ইহার সঙ্গে পাখোয়াজই সঙ্গত হইত, কিন্তু সদারঙ্গ যখন এই গানের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত অনুপযোগী বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন তাঁর শিষ্য দ্বিতীয় আমীর খসরু এই প্রকার গানের সঙ্গে সঙ্গতের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত তবলা যন্ত্রটি তিনিই সৃষ্টি করেন।" "মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় মহম্মদ শা'র সময়ে ১৭৩৮ খৃঃ রহমন খাঁ নামক বিখ্যাত পাখোয়াজীর পুত্র দ্বিতীয় আমীর খসরু সাহেব, সদারঙ্গের কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন এবং এই খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করিবার জন্য তিনি বর্তমান তবলা যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন।"

উপরোক্ত লেখা থেকে বোঝা যায় যে যন্ত্রটি আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের আমীর খসরু দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্র নয়, এটি দ্বিতীয় আমীর খসরু (১৭৩৮ খৃঃ) দ্বারা সৃষ্ট। অথচ (১৩৮০ খৃঃ) প্রথম আমীর খসরুর জীবিত কালে আমরা সুধাকলশ রচিত "সঙ্গীতোপনিষৎ সারোদ্ধার" গ্রন্থটিতে "তথৈব ম্লেচ্ছবাদ্যানি ঢোল তবল মুখানিতু" শ্লোকে ম্লেচ্ছ বাদ্যের মধ্যে তবলা নামটি পাচ্ছি। অতএব তবলা তখন ছিল এটি ধারণা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না। আমরা বলি তবলা তখন ছিল কেবল দিল্লী, পাঞ্জাবেই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তার দেখা পাওয়া যেত এবং তবলা নামেই সে পরিচিত ছিল। অতএব দ্বিতীয় আমীর খুসরো বা সদারঙ্গের আগে তবলা ছিল না একথা মানা যায় না। এই বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীর নৃত্যরত গণপতিদেবের মূর্তিতে একক তবলার মত একপ্রকার যন্ত্র দেখা যায় কিন্তু দশম শতাব্দীর আগে বা পরে কোন মূর্তিতেই এ ধরণের কোন বাদ্যযন্ত্রের নমুনা আমাদের নজরে পড়ে নি। এখানেও বাঁয়া ও তবলাকে জোড়ায় দেখা যায় না। খেয়াল গানের সময় থেকে তবলার প্রসার ও প্রচার হয়েছে একথা স্বীকার করা যায়। তখনকার দিনে

ধ্রুপদ প্রবন্ধাদিতে পখাবজে সঙ্গত চলতো, খ্যাল প্রভৃতি গানের মান নীচু থাকায় তবলা তার নাম প্রচারের অবকাশ পায় নি।

Salvadar Daniel লিখিত Arab Music Instruments গ্রন্থে আমরা (A-Tabal) এ-তবল নামে একজোড়া যন্ত্রের নাম পাই, দুটিই বাঁয়ার মত দেখতে, ডাহিনাটি বাঁয়ার থেকে বড়। এই এ-তবলের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের ডমারমের মিল দেখা যায়। তবে ডমারম কতদিনের প্রাচীন সেটি জানা না থাকায় আমরা সঠিকভাবে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। এ-তবল নামটির মাঝে তবল শব্দটি রয়েছে। পারস্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই যন্ত্রযুগল পারসিয়া থেকে স্পেনে তথা সারা ইউরোপে চড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে আরব দেশেও চালু হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতই উচ্চমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিভূমি ছিল, একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। তাই এই যন্ত্রযুগল অতীতে ভিন্ন আকারে ভারত থেকে পারস্যে গেছলো, একথা ভাবা খুব অসঙ্গত নয়। ল্যাটিন তবুলা (Tabula) শব্দের সঙ্গে তবলা শব্দটির মিল পাওয়া যায় এবং এই ড্রামটি পূর্বদেশজাত তাও জানা যায়। ইটালির তিমপ্যানি, ফরাসির তির্ব্যালে ও আরবীয় এতবল শব্দ প্রভৃতির সঙ্গে তবল শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় এই সব বাদ্যযন্ত্রগুলি আরবীয় এ-তবল যন্ত্রের পরের সংস্করণ। প্রাচীনকালে প্রচলিত 'সম্বল' নামক একজোড়া বাজনা থেকে তবলা এসেছে একথাও অনেকে বলে থাকেন। ঊর্ধ্বক নামে এক প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের চিত্র থেকে একক তবলার অনুরূপ আকৃতির সন্ধান মেলে। দুঃখের বিষয় কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ও এই সমস্ত যন্ত্রগুলির আবিষ্কারের সাল তারিখ আমাদের হাতে না থাকায় আমরা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়েরা ভারতের সিন্ধুদেশের কিয়দংশ অধিকার করে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। সেই সময় থেকেই ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে কিন্তু এখানেও বাদ্যযন্ত্রের বিশদ ইতিহাস বা তাদের আকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ না থাকায় সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা ভারতীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশদ ভাবে অনুসন্ধানের অনুরোধ জানাই।

ঐতিহাসিক কোন সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় তবলার প্রবর্তন সম্বন্ধে ঘরাণাদার তবলীয়াদের মুখের কথাই একমাত্র সম্বল এবং অতীতকে ত্যাগ করে

বর্তমানে প্রচলিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমরা চলতে বাধ্য হচ্ছি। এই কারণে উস্তাদ সুধার খাঁকেই তবলার আদি পুরুষ ও প্রচারকর্তা হিসাবে মান্য দিতে হবে। এখন তবলা ও বাঁয়ার অঙ্গের কথা বলেই তবলার কথা শেষ করছি। পরে আরও বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো।

তবলার অঙ্গ : (১) যেটি ডান হাতে বাজান হয় সেটিকে তবলা বা ডাহিনা বলা হয়, চলতি কথায় এটিকে ডাঁয়া বা ডাইনে বলে। অনেকে এটিকে তবল বলে থাকেন। হিন্দীতে একে তবলা বা তবলে ও চলতি হিন্দীতে "দাঁয়া" বলা হয়।

(ক) **খোল :** তবলার খোল বা খাদি, (অর্থাৎ মূল কাঠামোটি—Body, যাকে শুদ্ধ ভাষায় ধ্বনিকোষ বলা হয়), সেটি কাঠের তৈরী। হিন্দীতে খোলকে কাঠ বা লকড়ী বলা হয়। সাধারণতঃ কাঁঠাল কাঠ, শিরীষ কাঠ, আম কাঠ, খয়ের কাঠ, নিম কাঠ, বিজয়শাল ও শিশুকাঠ থেকে খোল তৈরী হয়। রক্তচন্দন কাঠে খুব ভাল খোল হয়। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বলে ক্বচিৎ চন্দনের খোলের দর্শন মেলে। খোলের ওজন, কাঠের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং খোলের মাঝখানের খালের কুঁদার (অর্থাৎ খোলের মাঝের খালের) ওপরই তবলার আওয়াজের ভালমন্দ নির্ভর করে।

(খ) **ছাঁউনি :** খোলের ওপর চামড়ার আচ্ছাদনকে ছাউনি বলে। ছাঁউনিকে শুদ্ধ ভাষায় ধ্বনি-পট্টক ও হিন্দীতে পুড়ী বলে। বাংলাতে একে **তালা** বা **তলি** বলা হয়। ছাগল বা বাছুরের চামড়ায় ছাঁউনি হয়। এই ছাঁউনিতে বাজাবার তিনটি জায়গার তিনটি পৃথক নাম। ১। **কাণি** বা **কিণার** (ছাঁউনির ধারের অংশ) এই স্থানটিকে **চাঁটি** বা **চাঁটও** বলা হয়। বাংলাতে এটিকে **পরতালা** বা **পরতলি** বলা হয়। কিণারে অর্থাৎ তালার প্রান্তে তালার উপর একটি সরু চামড়ার ঘের থাকে, সেটিই পরতালা। অনেকে একে **পটি** বলে থাকেন। ২। **স্যাহী** (সিয়াহী শব্দ থেকে এসেছে) বা **গাব**। ছাঁউনির মাঝে গোলাকার কালো যে পদার্থটি সাঁটা থাকে সেটিকেই গাব বলা হয়। সাধু ভাষায় এটিকে **খিরণ** বলা হয়। ৩। কাণি ও গাবের মাঝে যে সাদা সমতল অংশটি দেখা যায় সেটিকে **মৈদান** অথবা **লব** বলা হয়। মৈদান শব্দটিকে বাংলায় অনেকে **ময়দান** বলেন। এই অংশটিকে বাংলাতে **সুর** বলা হয়।

(গ) **পাগড়ী :** ছাঁউনির শেষে তবলার মুখের (কিণারে) ধারে তবলার

ছাউনিকে অর্থাৎ তালা ও পরতালাকে বেঁধে টেনে রাখার জন্য মোটা চামড়ার বিনটের বেড় দেওয়া হয়। তবলার ওপর মুখের ধারের এই চামড়ার বেড়টিকে পগড়ী বলা হয়। হিন্দীতে এটিকে 'গজরা' বলা হয়। 'পগড়ী' শব্দটিও হিন্দী শব্দ, বাংলায় এটি পাগড়ীতে পরিণত হয়েছে। এই পাগড়ীতে ষোলটা ছেদ রাখা হয় এবং তার মাঝ দিয়ে ছোট গলিয়ে ছাউনিকে প্রয়োজনমত টেনে বাঁধা হয়। এক ছেদ থেকে আর এক ছেদ পর্যন্ত স্থানকে তবলার **ঘাট** বলা হয়। প্রতিটি তবলায় ষোলটি ঘাট থাকে।

(ঘ) **ছোট্ঃ** শুদ্ধ ভাষায় এগুলিকে চর্মরজ্জু বলা হয়। এর হিন্দী নাম **বদ্ধি**। চলতি ভাষায় এগুলিকে ছোট্, ছড় বা ছোটা বলা হয়। তবলার ছাউনির থেকে তলবেড়ের সঙ্গে টেনে ছোট্ বাঁধা হয়। ছাউনিতে প্রয়োজন মাফিক টান রাখার কারণেই ছোটের ব্যবহার।

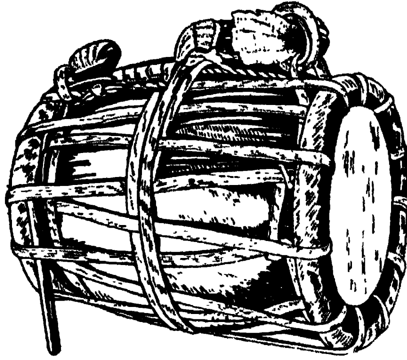
(ঙ) **গুলিঃ** খোলের ওপর চামড়ার পটির অথে ছোটের নিচে গোল গোল যে কাঠের ছোট ছোট টুকরো দেখা যায় তাদের গুলি বলা হয়। হিন্দীতে এদের **গট্টা** বলে। প্রতিটি তবলায় ৮টা গুলি থাকে।

(চ) **গুড়রীঃ** তবলার (খোলের নীচে) বসবার জায়গায় চামড়ার পটি দিয়ে তৈরী গোলাকার বিঁড়ের মতন বস্তুটিকে "গুড়রী" বলা হয়। পাগড়ীর মাঝ দিয়ে ছোট্ পরিয়ে গুড়রীর মাঝ দিয়ে গলিয়ে ছোটে টান রাখা হয়। আমরা বাংলায় গুড়রীর নাম **তলবেড়** রেখেছি।

বাঁয়ার অঙ্গঃ বাঁয়ার খোল অর্থে ধ্বনিকোষটি সাধারণতঃ মাটির তৈরী হয়। বাঁয়ার খোল—কাঠ অথবা তামা, স্টীল, রূপা প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হয়ে থাকে। বাঁয়ার খোলকে বাংলায় **হাঁড়ী** ও হিন্দীতে **'কুড়া'** বলা হয়। তবলার সঙ্গে বাঁয়ার সব অঙ্গই প্রায় সমান ও তাদের ডাক নামও একই। বাঁয়ার ছোট্গুলি অনেক সময়ে সুতলী দড়ির হয় বলে একে **'ডোরী'** বলা হয় এবং ডোরিতে টান রাখার জন্য গুলির বদলে পেতল বা লোহার আংটা পরান থাকে। বাঁয়ার গাব একপাশে রাখা হয়। তবলার মত মাঝখানে থাকে না, বাকী সব একই প্রকার। পখাবজের আওয়াজের সঙ্গে মিল থাকলেও তবলা ও বাঁয়ার ধ্বনি তার নিজস্বত্বের দাবী রাখে। দ্বিতীয় খণ্ডে তবলার বোল ও ঘরাণা প্রভৃতির বিষয় লেখার ইচ্ছা রইলো।

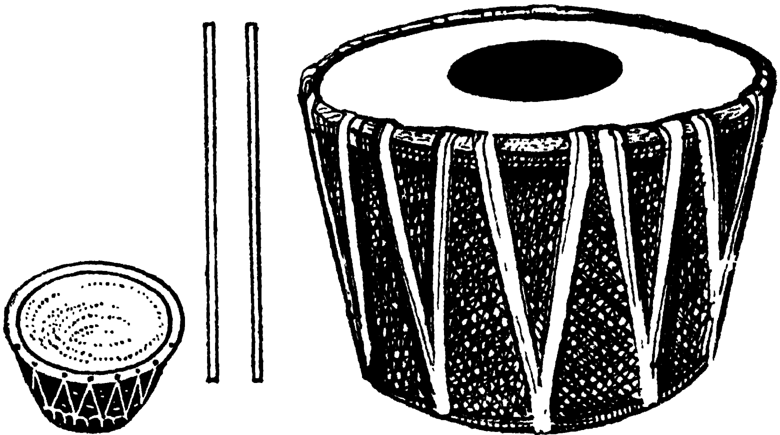
তাভিলঃ দক্ষিণের বাহির্দ্বারিক আনদ্ধযন্ত্র। নাগেশ্বরমের সঙ্গে বাজে। অনেকটা উত্তরভারতের ঢোলের মত। যন্ত্রটি প্রায় ১৬।১৭ ইঃ লম্বা ও ১৫।১৬ ইঃ

মোটা গোলাকার হয়। একখানা বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার করা হয়। দুপাশে বেতের বা বাঁখারির বেড়ের সঙ্গে চামড়া বাঁধা থাকে। চামড়ার ছোট দিয়ে



তাভিল

দুপাশের ছাউনিকে টেনে রাখা হয়। দুদিকের মুখের মাপ এক। ডান দিকের মুখ ডান হাতের চেটো, আঙ্গুল ও কব্জির ব্যবহারে বাজান হয় এবং বাঁ মুখটা মোটা শক্ত কাঠি দিয়ে বাজান হয়।



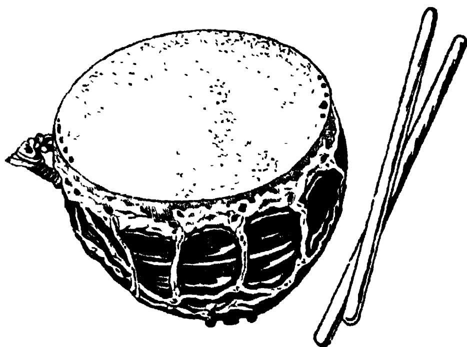
তাসা বড় তাসা বা ঝগঝম্প

তাসাঃ এটি সামরিক ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্রের কোঠায় পড়ে। এটি জগঝম্পের সঙ্গে জুড়িতে বাজান হয়। কাড়া ও তাসা দেখতে প্রায় একই রকম তবে তাসা আকারে ছোট। মাটির তৈরী, এর চামড়ার ছাউনি খুব মোটা

হয়। বিবাহে, বরানুগমন-শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার। বর্তমানে বড় ড্রামের সঙ্গে একে কোন কোন শোভাযাত্রায় বাজতে দেখা যায়। বাংলাদেশে শারদীয় পূজার সময়ে এটি ঢাক ঢোলের সঙ্গেও বাজে। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই তাসা সামান্য আকারভেদে প্রচলিত আছে। বৃহদাকার তাসাকে অনেকে জগঝম্প বলেন। অধিকাংশ তাসার তলদেশ ফাঁকা থাকে।

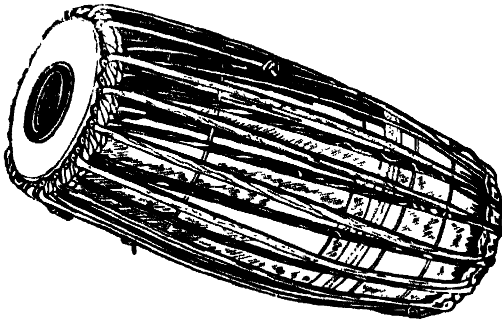
তিমিলা বা থিমিলা ঃ তিমিলা দক্ষিণ ভারতের আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ১।২॥০ ফুট লম্বা ডমরুর আকারের এক ধরণের যন্ত্র। সাধারণতঃ দক্ষিণের কেরালা অঞ্চলের মন্দিরে পূজাপার্বণের সময় বাজে। একটা বড় কাঠ ফাঁপা করে কুঁদে যন্ত্রটি তৈরী করা হয়। দুদিকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বাঁ কাঁধের ওপর থেকে একপেশে করে ঝুলিয়ে রেখে ওপরের মুখ দুহাত দিয়ে বাজান হয় অথবা কোমরে বেঁধে সামনে ঝুলিয়ে এক মুখ (ওপরের মুখ) দুহাত দিয়ে বাজান হয়।

তুম্বকনারি ঃ চর্মাচ্ছাদিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। গ্রাম্য সঙ্গীতেই এর ব্যবহার। লম্বা ঘাডওয়ালা কলসির মত এই যন্ত্রটির মুখে চামড়া ঢাকা দেওয়া থাকে। যন্ত্রটিকে বাঁদিকের কোলের ওপর রেখে অথবা বাঁদিকের বগলে চেপে ধরে বাজাতে দেখা যায়। ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলেই এটি বিশেষভাবে প্রচলিত।



দামামা, দগড়া বা ডঙ্কা

দগড়া ঃ দামামার আকারের চর্মাচ্ছাদিত আঘাতযন্ত্র। যন্ত্রটি কাঠ বা মাটি থেকে তৈরী হয়। মোটা কাঠ দিয়ে চামড়ার ঢাকার ওপর ঘা মেরে বাজান হয়। এর আওয়াজ জোরদার, যন্ত্রটি বহির্দ্বারিক। প্রদেশ বিশেষে এটিকে ডঙ্কাও বলা হয়।

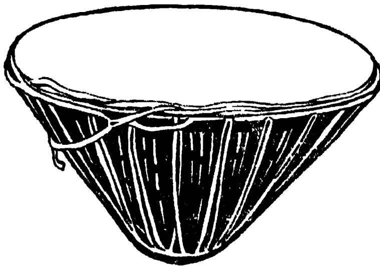


দক্ষিণী মৃদঙ্গ

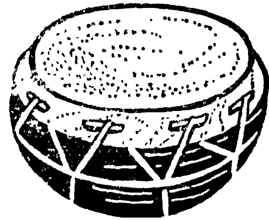
দক্ষিণী মৃদঙ্গ : দক্ষিণে যে তিনটি বাদ্যযন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (বাদ্যত্রয়ম্ : বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ) তার মধ্যে মৃদঙ্গ অন্যতম। এই মৃদঙ্গকে দক্ষিণীরা মদ্দলম বলে থাকেন। আমাদের মৃদঙ্গের মত দুই প্রান্তের খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা থাকে এবং ডানদিকের মুখে স্থায়ীভাবে গাব লাগান থাকে। বাজাবার সময় বাঁদিকের মুখে আটা বা সুজি মেখে তাল করে অস্থায়ীভাবে গাব লাগান হয়। এতে আওয়াজ গম্ভীর শোনায়। কাঁঠাল কাঠ (Jack Wood), রক্তচন্দন বা লাল কাঠ (Red Sandal Wood & Red Wood or Alomgium decapatum) বা নিম কাঠ (Margosa Wood), নারিকেল কাঠ ও তাল কাঠের মাঝ (Coconut tree core or Palm tree core) প্রভৃতি থেকে তৈরী করা হয়। দক্ষিণীদের ধারণা মন্দিরের আশেপাশের গাছের কাঠে যন্ত্র তৈরী করলে আওয়াজ ভাল হয়। কারণ মন্দিরের আরতি বা উৎসবাদিতে বাদিত বাদ্যধ্বনির তরঙ্গে ঐ গাছের কাঠগুলি শব্দসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ও তাদের আঁশের মাঝে ধ্বনিকোষ গড়ে ওঠা সম্ভব। তাই মন্দিরের সন্নিকটের গাছগুলির কাঠই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। দক্ষিণী মৃদঙ্গের ডানদিকের মুখ ৬$\frac{1}{2}$″ থেকে ৭″ ইঃ পর্যন্ত, বাঁদিক থেকে $\frac{1}{2}$″ ইঃ পরিমাণ ছোট হয়। বাঁদিকের মুখ ৬$\frac{3}{4}$″ থেকে ৭$\frac{1}{2}$″ পর্যন্ত। লম্বায় ২২″ ইঃ ২৪″ ইঃ পর্যন্ত হয়। চড়ার সুরের মৃদঙ্গ ২২″ ইঃ ও খাদের জন্য ২৪″ ইঃ সাইজের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উত্তর ভারতের মতই দুপাশের মুখের চা·ড়া ছোট্ দিয়ে টানা থাকে, তবে কোন গুলি থাকে না। কাণিতে ঘা মেরে সুর বাঁধা হয়। প্রাচীন কালে উত্তরের মৃদঙ্গেও কোন গুলি ব্যবহার করা হত না। দক্ষিণী মৃদঙ্গ

উত্তরের পখাবজ থেকে ছোট। বাদনপদ্ধতিরও প্রভেদ আছে। দক্ষিণের বাঁয়া আঙুল মুড়ে বাজান হয়; উত্তরে হাত খুলে সোজা রেখে বাজান হয়। বিস্তৃতির ভয়ে তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

দামামা ঃ দামামা দেখতে টিকারার মত, মুখটা আরও চওড়া ও চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। দামামার আর এক নাম দগ্‌ড়া। এর শরীরও মাটির তৈরী। আগে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। কিছুদিন আগেও নানা শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার নজরে পড়তো, এবং সঙ্গে জোড়ে কখনও কখনও টিকারাকেও বাজতে দেখা যেত। দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। আজ এর দর্শন মেলা ভার। (দগড়া দেখুন)



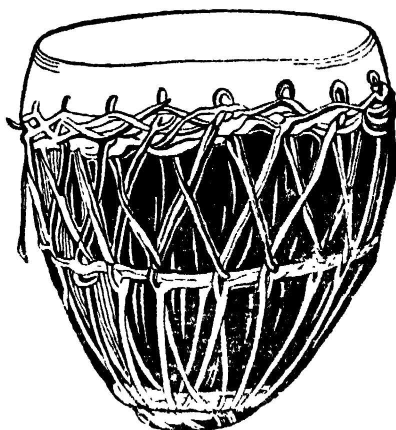
নাগারা বা নাকারা



নাকারা বা নাগারার প্রকারভেদ

নাকারা ও নাগারা ঃ নাকারাকে শুদ্ধ ভাষায় অনেকে দুন্দুভি বলে থাকেন। শাস্ত্রে আমরা আর এক প্রকারের দুন্দুভির কথা জানতে পারি, (দুন্দুভির ব্যাখ্যা দেখুন)। প্রাচীন কালের ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থেকেই এর জন্ম। নাকারা বহু প্রকারের দেখা যায়। শানায়ের সঙ্গে একে জোড়ায় (একটি বড় ও একটি ছোট আকারের) এখনও বাজতে দেখা যায়। বৃহদাকারের নাকারাকে মহানাগারা বলা হয়। মহানাগারার মত দেখতে—**"ধাউসি"** নামেও একজাতীয় যন্ত্র আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল। সেগুলি অশ্বারোহী সৈনিকেরা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য যে এটি অশ্বপৃষ্ঠেই বহন করা হত। দক্ষিণ ভারতেও আমরা নাকারা যন্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাই। ছোট নাকারা গলায় ঝুলিয়ে পেটের ওপর সামনে রেখে দুই হাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। মন্দিরের দ্বারে রাখা মহানাগারাগুলিকে পূজা ও আরতির সময় বাজতে দেখা যায়। দুশো বচ্ছর আগে নাকারাকে যুদ্ধের সময় বা রাজা মহারাজাদের শিকারে বেরোবার সময় অন্যান্য

যন্ত্রের সহযোগে বাজতে দেখা যেত, বর্তমানে এর ব্যবহার কম। নাকারা ও নাগারা এই দুটি যন্ত্রের পৃথক ছবি থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে নাকারা ও নাগারা এই দুটি অবয়বভেদে কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল, যদিও উভয়ের বাজের কায়দা

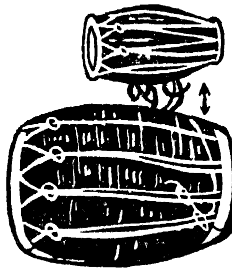


মহা নাগারা

একই রকম। একথাও ভাবা যায় যে দেশ ও কালভেদে যন্ত্রটি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। আকবর বাদশাহের নৌবতে বিশ জোড়া নাকারা রাখা হত বলে জানা যায়।

পটহঃ আগের দিনে পটহকে অড্ডাবজ বলা হত। মার্গ বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একে ধরা গেলেও প্রাচীন দেশী বাদ্যযন্ত্রের তালিকায়ও এর নাম পাওয়া যায়। বাজনাটি খয়ের কাঠের তৈরী হত। মার্গজাতীয় পটহ আড়াই হাত এবং দেশী আধ হাত লম্বা হত বলে জানা যায়। মার্গজাতীয়ের পরিধি ৬০ আঙ্গুল বলা হয়েছে কিন্তু দেশীর পরিধির কোন মাপ নাই। মার্গজাতীয়ের ডানদিকের মুখ সাড়ে এগারো আঙুল, বাঁ মুখ সাড়ে দশ আঙ্গুল হত। দেশীর ডান মুখ সাত আঙ্গুল ও বাঁ মুখ সাড়ে ছয় আঙ্গুল হত। পটহের উভয় মুখ লোমওলা (আলাতলি) চামড়ায় ছাঁওয়া হত। চামড়ায় সাতটি ফুটো থাকতো এবং ধাতুর তৈরী চার আঙ্গুল বড় সাতটি ধাতুর কলসের আকারের দোলনা ফুটার মাঝ দিয়ে ঝোলান থাকতো। ডান মুখের বেড়ে লোহার বলয় অর্থে ঘের ও বাঁ মুখে লতার বলয় থাকতো। বাঁ মুখের চার আঙুল নীচে তিন আঙ্গুল চওড়া আর একটি লোহার পাতের বেড় থাকতো। বাঁ দিকের মুখের দড়ির

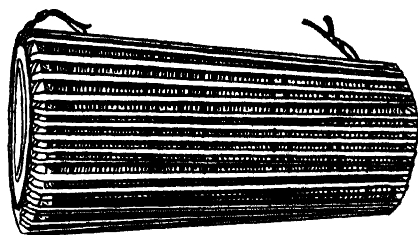
টানাগুলো লোহার পাতের মাঝ দিয়ে এসে ডান মুখের বলয়কে টেনে রাখতো। যন্ত্রটি আঠার আঙ্গুল লম্বা হত মাঝখান মোটা ও ডগা-বেঁকা কাঠি দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হত। কখনও কখনও কাঠির সঙ্গে বাজাবার জন্যে হাতকেও ব্যবহার করা হত। তখনকার দিনের নাটকে এই বাজনা ব্যবহৃত হত। এর ডান মুখে দেং ও বাঁ মুখে ঝেং ধ্বনি প্রকাশিত হত। অনেকটা ঘট বাজনার মতই বাজতো। বর্তমানে লুপ্ত।



পম্বাই বা জোড়ঘাই

পম্বাই ও জোড়ঘাই ঃ উত্তর ভারতের জোড়ঘাইকে ঢোল-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। জোড়ঘাই যন্ত্রটি আজ লুপ্ত। ছোট আকারের ঢোলের উপর তদপেক্ষা ছোট আকারের আর একটি ঢোল জোড়া থাকে। ছোটটি চড়া স্বরে ও বড়টি খাদে অর্থাৎ নীচু স্বরে বেঁধে বাজান হয়। বাজনাটি গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। দু মুখেই বাজে। কাঠের ফাঁপা বাজনাটির দুদিকের খোলামুখই চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বাঁ দিকের মুখ কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের পম্বাই যন্ত্রটিও একই প্রকার আকারের একজোড়া ঢোলকের মত। ১।১৷৷০ ফুট মাপের দুটি খোল, দুটি খোলেই দুদিকের খোলামুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা। একটির ওপরে একটি বাঁধা থাকে, ওপরের খোলটি পেতলের এবং নীচের খোলটি কাঠের তৈরী। বাঁ দিকের মুখ হাত দিয়ে ও ডান দিকের মুখ কাঠি দিয়ে বাজান হয়। চামড়ার ছাউনিগুলি সুতলী দিয়ে টানা থাকে। কোথাও কোথাও দুটি খোলই পেতলের তৈরী হয়। গ্রাম্য নাটকে ও প্রাকৃত দেবদেবীর পূজায় এদের বাজতে দেখা যায়। সাধারণতঃ একে কোমরের সঙ্গে বেঁধে বাজান হয়। **উত্তরের জোড়ঘাই ও দক্ষিণের পম্বাই** সদৃশ ও সমক্রিয় :

মর্দ্দল : একপ্রকার প্রাচীন চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য। বর্তমানে প্রচলিত মাদল-সদৃশ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই যন্ত্র মাটির তৈরী। গোলাকার ফাঁপা হাঁড়ির দুপাশের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো। বাম মুখ ১৩ আঙ্গুল, ও ডান মুখ ১২ আঙ্গুল থাকতো। বর্তমানে লুপ্ত। সঙ্গীত রত্নাকর মতে একপ্রকার মৃদঙ্গ।



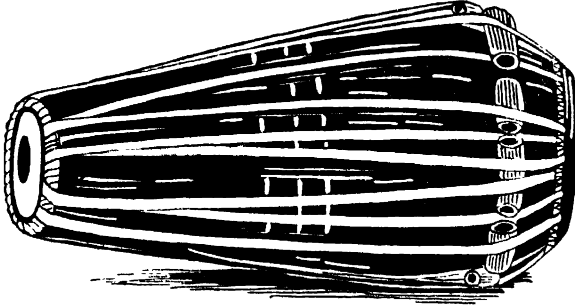
মাদল

মাদল : শ্রীখোলকে যেমন মুরজ, মর্দ্দল বা মৃদঙ্গ বলা হয়, শুদ্ধ ভাষায় মাদলকেও তেমনি মুরজ বা মর্দ্দল বলা হয়। মর্দ্দল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এটি অতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র। মাদল কাঠের তৈরী, এর দুদিকের উন্মুক্ত মুখের পরিধি প্রায় একরকমই, বাঁ মুখটি সামান্য কিছু বড় আকারের হয়। মাটির তৈরী মাদলও দেখা যায়। ঢোলক ও পখাবজ প্রভৃতির মত যেগুলি কাঠের তৈরী তাদের ভিতরটি কাঠ কুঁদে ফাঁপা রাখা হয়। দুদিকের উন্মুক্ত মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। বাঁ দিকে চর্মাচ্ছাদনীতে বোহন অর্থে খরলি (গাব) লাগাবার রীতি আছে, কিন্তু সব মাদলে গাব দেখা যায় না। সমস্ত খোলটি চামড়ার বেড় দেওয়া থাকে। দুপাশের চর্মাচ্ছাদনীই ছোট দিয়ে টান করে বাঁধা থাকে। সাধারণতঃ সাঁওতাল, কোল, ভীলজাতীয় লোকদের নৃত্যের ও গীতের সঙ্গে বেজে থাকে। বাংলা দেশের বিভিন্ন উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যে মাদল বাজতে দেখা যায়।

মুরজ : একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য। বাম মুখ আট আঙ্গুল ও ডান মুখ সাত আঙ্গুল ছিল বলে জানা যায়। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত। কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

মৃদঙ্গ বা পখাবজ : "মৃন্ময়ং অঙ্গং যস্য স মৃদঙ্গঃ"—মাটি যার অঙ্গ সেই মৃদঙ্গ—অর্থে যন্ত্রটি মাটির তৈরী। পৌরাণিক কাহিনীতে শোনা যায়, মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করার পর, ভগবান ব্রহ্মা সেই অসুরের রক্তেভেজা মাটিতে মৃদঙ্গের খোল (Body) তৈরী করেন, অসুরের (চর্ম) চামড়া দিয়ে

ত্বমুখের ছাউনি, শিরা থেকে ডুরি (অর্থে ছোট) এবং হাড় কেটে মৃদঙ্গের গুলি তৈরী করেন। পরে অসুরবিজয়ী মহাদেবের নৃত্যের সঙ্গে তাল রাখার জন্য তিনি গণেশকে মৃদঙ্গ শিক্ষা দেন ও তাঁকে দেবাদিদেবের নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে বলেন।



বর্তমান মৃদঙ্গ বা পখাবজ

অনেকের ধারণা যে মাটির মৃদঙ্গ দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে কাঠের তৈরী হতে থাকে। শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ের ১৩নং শ্লোকে আমরা "ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেয্যশ্চ পণবানক গোমুখাঃ" এই ছত্রে নানা বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখের মধ্যে পণব নামটি দেখতে পাচ্ছি। গীতার ব্যাখ্যাকারেরা পণব শব্দটির অর্থ মৃদঙ্গ বলেছেন। আমরা মহাভারতের বিরাটপর্বে "পণবাদিকাশ্চ তথৈব বাদ্যানি চ বংশশব্দাঃ" শ্লোকেও পণব নামক বাদ্যটিকে দেখতে পাচ্ছি ও বাদ্যটি রণবাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত সেটাও জানতে পাচ্ছি। পণবকে যদিও অনেকে মৃদঙ্গ মনে করেন, কিন্তু আসলে পণব যন্ত্রটি মৃদঙ্গের মত ছিল না। অনেকের ধারণা মৃদঙ্গ তখন পণব নামে প্রচলিত ছিল। আমাদের দৃঢ় ধারণা পণব এক ভিন্ন আকারের যন্ত্র ছিল। যদিও তখনকার দিনে এক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা পাণব ঋষির নামে প্রচলিত একটি গল্প শুনতে পাই। একদিন এক হ্রদে পাণব ঋষি স্নান করতে যান, এমন সময় বৃষ্টি আসে, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা হ্রদের জলে পড়তে থাকে, বৃষ্টির প্রবলতার তারতম্যে সরোবরে পড়া জলের শব্দের তারতম্য ঘটে। এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য তাঁকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এই শব্দকে রূপ দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে যান ও এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। ধ্যানে তিনি একপ্রকার যন্ত্রের রূপ দেখতে পান। তখন তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করেন এবং ধ্যানে পাওয়া যন্ত্রটির রূপ ও শব্দবৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি যন্ত্র নির্মাণ

করান। প্রণব ঋষির পরিকল্পনায় প্রস্তুত করা হয় বলে যন্ত্রটির নাম রাখা হয় প্রণব। এই কাহিনীটি মৃদঙ্গের আদি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।* অনেকে মনে করেন যে প্রণব যন্ত্রটি মৃদঙ্গের অনুরূপ ছিল তাই এই কাহিনী। এই ধরণের কিংবদন্তিতে যে ইতিহাস লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় সেগুলিকে অনেক সময় সত্য ঘটনা বলে মান্য দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোনটি যে প্রক্ষিপ্ত তা বোঝা কঠিন, তাই সেদিনের লোকশ্রুতিতে আমরা সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি না, যদিও অতীত দিনের অনেক ইতিহাসই গল্পচ্ছলে আমাদের মাঝে শ্রুতির মাধ্যমেই স্থান পেয়েছে।

অপর এক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা বাণাসুরের নাম পাই, যিনি শিবের বরে হাজার হাত পেয়েছিলেন। তিনি হাজার হাতে মৃদঙ্গ বাজাতেন। এক ভীষণ যুদ্ধে তাঁর সমস্ত হাতই কাটা যায়। শিবভক্ত বাণাসুর তখন পুনরায় উমারূপাণির সাধনায় মগ্ন হন। তাঁর সাধনায় শিবঠাকুর সন্তুষ্ট হলে তিনি মাত্র দুটি হাত ফিরে পাবার প্রার্থনা জানান এবং বলেন তিনি কেবলমাত্র মৃদঙ্গবাদন দ্বারা তার পূজা করার জন্যই এই হাত দুটি প্রার্থনা করছেন। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটি হাত ফিরে পাবার বর দেন। অসুররাজ দুহাতেই অপূর্ব মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন এবং এই বাজনার মাধ্যমেই তিনি শিবের আরাধনা করতেন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আমরা মৃদঙ্গের প্রচলন বেশী দেখতে পাই। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫শ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের সময়েও এর নাম পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের লেখায় দেখা যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি মৃদঙ্গের অনুকরণে পুষ্করাদি যন্ত্র সৃষ্টি করিয়েছিলেন এবং ভরতের জন্মের পূর্ব থেকেই যে যন্ত্রটি প্রচলিত ছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়। মৃদঙ্গে বোলন মুখে গাব লাগাবার পদ্ধতি তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং সম্ভবত কাঠের মৃদঙ্গ তার আবিষ্কৃত। মৃদঙ্গের তিন রকম রূপের কথা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং যন্ত্রটি মাটির তৈরী ছিল জানা যায়। সেখানে আঙ্কিককে হরীতকীর মত, ঊর্ধ্বককে যবের মত (অর্থাৎ দুমুখ বর্তমান খোলের থেকে সরু) এবং আলিঙ্গ্যকে গোপুচ্ছের মত বলা হয়েছে (একমুখ বেশী বড় ও অপর দিকের মুখ সরু)। সঙ্গীত রত্নাকরের ৬য় খণ্ডের বাদ্যাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব হরীতকীর আকারের

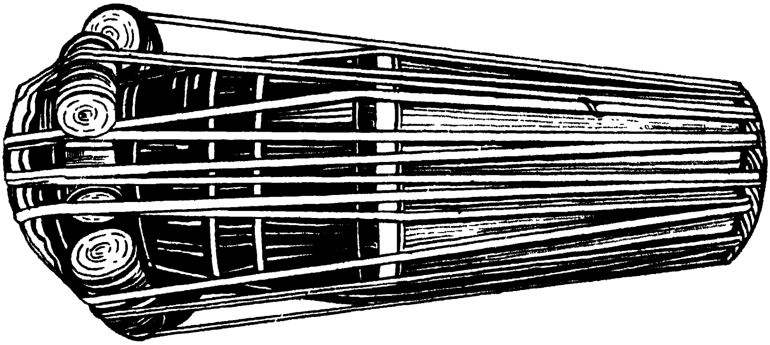
* কাহিনীটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে, কিন্তু সেখানে প্রণবের পরিবর্তে স্বাতির নাম দেখা যায়।

কথায় বলেছেন লম্বায় ২১ আঙ্গুল, বাঁদিকের মুখ ১৪ আঙ্গুল ও ডানদিকের ১৩ আঙ্গুল এবং যন্ত্রটি কাঠের তৈরী। রক্তচন্দনের মৃদঙ্গের কথায় লম্বা ৩০ আঙ্গুল, বাঁমুখ ১২ আঙ্গুল, ডান ১১½ আঙ্গুল ইত্যাদি। এখানে বর্তমান পখাবজের সঙ্গে এর মাপের কিছু মিল দেখা যায়। নাট্যকার ভরত মৃদঙ্গকে **ভাণ্ডবাদ্য** বলেছেন—গঠন ও নির্মাণ প্রণালার কথায় বলেছেন—আলিঙ্গ্য গোপুচ্ছের মত গঠনবিশিষ্ট, বাঁমুখ ১৩।১৪ আঙ্গুল, ডানমুখ তার কিছু কম (রত্নাকরের সঙ্গে মিল আছে) মধ্যদেশ পৃথুল (মোটা) ও চার দিকে চার আঙ্গুল পরিমিত গোলাকার গুল্মস্থলের সঙ্গে সংযুক্ত। এই আলিঙ্গ্যই মৃদঙ্গ ছিল অনেকে এরূপও বলে থাকেন।

পখাবজীদের ঘরে পঞ্চমুখী পখাবজের নাম শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে এই ধরণের পখাবজের বা মৃদঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় না। মোগল যুগে **"আওয়াজ"** নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি দেখতে পখাবজের মতই ছিল, তবে আকারে কিছু ছোট।

প্রাচীন মৃদঙ্গ থেকেই বর্তমান পখাবজ এসেছে, এটি এরেবিয়া বা পারস্য থেকে আমদানী করা হয় নি এবং আমীর খুশরো এর আবিষ্কারক নয়। ফার্সী ভাষায় পখাবজকে **তরঙ্গ** বলে। পক্ক অর্থে পাকা এবং আওয়াজ অর্থে ধ্বনি অথবা পাক অর্থে পবিত্র ও আওয়াজ অর্থে ধ্বনি এই ভাবে পবিত্র ধ্বনিকারক বলেই যন্ত্রটির নাম পাখোয়াজ হয়েছে এরূপও বলা হয়। ব্যাখ্যাগুলি যথাযথ না হলেও প্রায়শঃ এরূপ অর্থ শোনা যায়। আমাদের ধারণা, পখাবজ এই হিন্দী শব্দটি বাংলায় পাখোয়াজ শব্দে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে মৃদঙ্গ কবে, কোথা থেকে, কী ভাবে পখাবজ নামটি পেলো? আমরা পনেরশো শতাব্দীর আগে কোথাও পখাবজ শব্দটি পাচ্ছি না। তেরশো শতাব্দীতে পার্শ্বদেবের কালে জৈনদের স্থানাঙ্গ সূত্রে আনদ্ধ জাতীয় বাদ্য-সঙ্গীতের তালিকায় **পুখারগায়া** (Pukharagaya) নামে বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান পাই এবং এর পরবর্তী কালে ১৪০৬ খৃঃ সিতাম্বরদলীয় জৈন সঙ্গীতশাস্ত্রী সুধাকলশ রচিত "সঙ্গীতোপনিষৎ সারোদ্ধার" নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে পটহকে আউজ বলা হত। এই যুগেই আমরা প্রথমে "পখাউজ" শব্দটি পাই। তা ছাড়া, সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে দেখতে পাই যে প্রায় সমস্ত রকমের আনদ্ধ যন্ত্রকেই "আবজ" (অপভ্রংশে আউজ শব্দটি এসেছে) বলা হত। পুখারগায়া নামটি আমরা আগেই পেয়েছি, এখন পুখারগায়ার "পুখা" শব্দটির সহিত যদি "আবজ" কথাটি যুক্ত করা যায় তবে পুখা+আবজ পুখাবজ এবং তারই অপভ্রংশে হিন্দি শব্দ পখাবজ

জন্ম নিয়েছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। তাছাড়া পখাউজ থেকে পখাবজ শব্দটি এসেছে একথাও সহজেই ভাবা যায়। আমরা মুসলিম যুগের গ্রন্থেই পখাবজ শব্দটি প্রথমে দেখতে পাই। প্রাচীনকালে পখাবজে আটার গাব মাঝে মাঝে দেওয়া হত, দেখতে শ্রীখোলের মত ছিল, ছোটের টান রাখা হত, কিন্তু গুলি ছিল না। মুসলিম যুগে এতে গাব দেওয়ার রীতির পরিবর্তন ঘটলো, ও ছোটে টান রাখার জন্য আটটি কাঠের গুলি ব্যবহৃত হল। এই ভাবে প্রাচীন মৃদঙ্গ বর্তমানের পখাবজে পরিণত হল। পখাবজ ধ্রুপদাঙ্গীয় গানের সঙ্গে সঙ্গতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা ও



মহামৃদঙ্গ

আরতির সময় মৃদঙ্গ বাজান হয়। বৃহদাকারের পখাবজ বা মৃদঙ্গকে **মহামৃদঙ্গ** বলে। ঐকতান বাদনেও এর ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণভারতে প্রচলিত মৃদঙ্গের সঙ্গে আমাদের অধুনা-প্রচলিত পখাবজের কিছু প্রভেদ আছে। উত্তরের পখাবজ দক্ষিণের মৃদঙ্গের তুলনায় অনেক বড়। বাদন-পদ্ধতির প্রভেদও নজরে পড়ার মত। আমাদের পখাবজে বাঁদিকে ময়দার অস্থায়ী গাব লাগিয়ে হাত খুলে আঙুল সোজা রেখে বাজান হয় কিন্তু দক্ষিণের বাঁয়া, বাঁ হাতের আঙুল মুড়ে বাজান হয়। বিস্তৃতির ভয়ে তুলনামূলক বিচার থেকে বিরত থাকছি। (দক্ষিণী মৃদঙ্গ দেখুন।)

এখন মৃদঙ্গের বা পখাবজের অঙ্গের কথায় আসছি—মৃদঙ্গের পাঁচটি মুখ্য অঙ্গ :

প্রথম : **খোল**—এই খোলকে শুদ্ধ ভাষায় ধ্বনিকোষ বলে, হিন্দীতে লকড়ী ও ইংরাজিতে বডি (Body) বলে। এটি বর্তমানে কাঠের তৈরী। কাঁঠাল, নিম, গাম্ভার, খয়ের ও রক্তচন্দন কাঠে খোল তৈরী করা হয়। এই সব কাঠের খোল

খুব ভাল হয়, আওয়াজ মধুর ও গম্ভীর হয় ; এদের মধ্যে রক্তচন্দনের খোলই উৎকৃষ্ট, তবে ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় : **ছাঁউনি**—ছাউনিকে শুদ্ধ ভাষায় ধ্বনিপট্টক ও হিন্দীতে "পুড়ী" বলা হয়। খোলের দুমুখেই ছাঁউনি থাকে। ডানদিকে ছাউনির মাঝামাঝি গাব দেওয়া হয় এবং ডান হাতে বাজান হয়। বাঁদিকের ছাউনিতে স্থায়ীভাবে কোন গাব থাকে না, বাজাবার আগে ময়দা বা আটার মণ্ড করে অস্থায়ী বোহণ অর্থে গাব লাগান হয়।

তৃতীয় : **পাগড়ি**—ছাউনির বেড়, যার সঙ্গে ছাউনির চামড়া বিনট করে বাঁধা হয় ছাউনিকে কষে রাখার জন্য। একে শুদ্ধ ভাষায় চর্মবেষ্টনী ও হিন্দীতে "গজরা" বলে।

চতুর্থ : **ছোট**—একে শুদ্ধ ভাষায় চর্মসূত্র বা চর্মরজ্জু বলা হয়, হিন্দীতে বধী বা ডোরী বলে। (চামড়ার সরু পটি দিয়ে ছোট তৈরী হয়।)

দুদিকের ছাউনির চামড়ায় সমান ভাবে টান রাখার জন্যই ছোট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

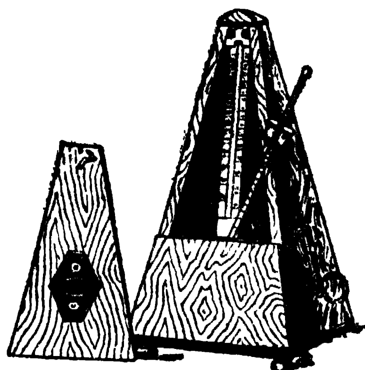
পঞ্চম : **গুলি**—শুদ্ধ ভাষায় এদের গুল্ম ও হিন্দীতে গটা বলে। ছাউনিতে প্রয়োজনমত টান দিয়ে তাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্বরে নিখুঁত ভাবে মিলিয়ে বাঁধার জন্যই গুলির ব্যবহার।

বর্তমান পখাবজের আওয়াজ গম্ভীর ও জোরদার। ধ্রুপদ ও ধামার জাতীয় গানের সঙ্গে পখাবজের সঙ্গত প্রায় সীমাবদ্ধ। বীণা, রবাব, সুরবাহার প্রভৃতি কতিপয় যন্ত্রের সঙ্গে আলাপের তারপরণে ও গৎ বাজাবার সময় একে বাজাতে দেখা যায়।

মৃদঙ্গের বিভিন্ন ঘরাণা ও বাদ্যের কথা, বোলের বিষয় পরে লেখার ইচ্ছা রইল

মাত্রামান যন্ত্র বা মেট্রোনোম (Metronome) : বৈজ্ঞানিক মাত্রা জ্ঞাপক যন্ত্রবিশেষ। ইং ১৮০০ সালে মেট্রোনোম প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। আমস্টারডামের (Amsterdam) মিঃ উইনকেলই ১৮১২ সালে এটি প্রথমে উদ্ভাবন করেন। তখন মিঃ মালজেল নামে এক ভদ্রলোকও তাঁর সঙ্গে এই উদ্ভাবনে যোগ দেন। পরে মিঃ মালজেল ইং ১৮১৬ সালে প্যারিস থেকে নিজের নামে যন্ত্রটি Patent Registration করিয়ে নেন। যন্ত্রটি মালজেলস্ মেট্রোনোম নামে চলতে থাকলেও আসলে মিঃ উইনকেলই এর উদ্ভাবন কর্তা (Grove's Dictionary of Music & Musicians. Vol K. to O. Page No. 448.)

মাত্রা ও লয়ের কাল নির্দেশক এই যন্ত্রটি লয় ও মাত্রা বোঝাবার পক্ষে অপূর্ব। কোন বিশেষ লয়ের গতি ও মাত্রার স্থায়িত্বকাল ধরে রাখবার সুযোগ এতে আছে। যন্ত্রটি নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাল ও মাত্রাবোধের বিশেষ সহায়ক। গান, গত্ ও তান অভ্যাস করার সময় এটির সঠিক ব্যবহার প্রয়োজনে আসে।



মেট্রোনোম

রেকর্ডিং করার সময় কোন একটি গানের গতি নির্দ্ধারণে হিসাব মত একই লয়ে প্রতিবার নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে গানটি গাওয়া ও সময়মত শেষ করার কাজে এটি অপরিহার্য।

যন্ত্রের গতি যদি (M. M. 80) এম এম ৮০-তে বেঁধে দেওয়া যায় তবে যন্ত্রের গতি-নির্দেশক কাঁটাটি মিনিটে ৮০ বার দুলবে (80 Oscillations per minute) অর্থাৎ এক একটি পূর্ণমাত্রার স্বর ধ্বনির স্থায়িত্বকাল হবে—

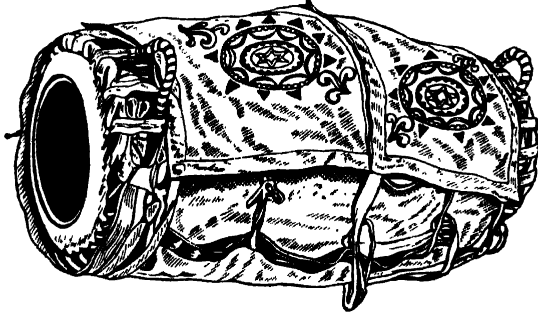
$$\frac{৬০}{৮০} = \frac{৩}{৪}$$ সেকেণ্ড।

বিভিন্ন তালের জন্য এতে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ মাত্রা পর পর বিশেষ ঘণ্টাধ্বনির ব্যবস্থা আছে। কাঁটাটির মাঝে একটি ভারি দোলক গলান থাকে সেইটির স্থানস্থিতি অনুপাতেই যন্ত্রের গতি নির্দ্ধারিত হয়।

রুঞ্জা: আঠারো আঙ্গুল লম্বা কাঠের তৈরী একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। সমাকৃতি-বিশিষ্ট, দুদিকের খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ছাওয়া হত। মুখ দুটি এগারো আঙ্গুল বড ও বেড়যুক্ত। বামমুখে ভিতর দিকেও থাকত দুটি বেড়, যাদের মাঝে মুখের সমান মাপের ও চার আঙ্গুল মাপের দুটি স্নায়ু-নলিকা রাখা হত। এই বামমুখে একটি ফুটো থাকতো। দুটি মুখের পাগড়িতে ৭টি

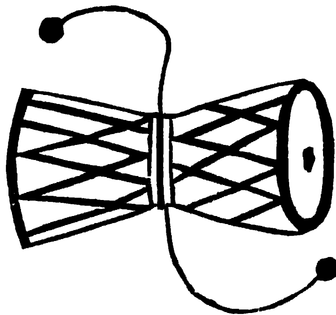
করে বিনোট থাকতো। কাঁধ থেকে ৩।৪ হাত লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে হাত দিয়ে দুদিকের মুখ বাজান হত। বোলে রুং ধ্বনির ব্যবহার শোনা যেত। বর্ত্তমানে লুপ্ত।

হুড়ুক্ক বা হুড়ুক্কা ঃ বৃহদাকারের ডমরু বিশেষ। কুড়ুক্কা দেখুন।



শুদ্ধমদ্দলম্

শুদ্ধমদ্দলম্ ঃ দক্ষিণ ভারতের এক প্রকার আনদ্ধযন্ত্র বিশেষ। এই ঘাত যন্ত্রটিকে বাহির্দ্বারিক যন্ত্রের বিভাগে ধরা হয়। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চবাদ্যম যন্ত্রের মধ্যে এটিকে একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। দক্ষিণী মৃদঙ্গের তুলনায় এটি আকারে কিছু বড় হয়। দক্ষিণ দিকে বোহন অর্থে মোটা গাব অনেকটা চওড়া করে দেওয়া হয়। আওয়াজও বেশ জোরদার। দক্ষিণের বহু মন্দিরেই পূজা ও উৎসবের সময় একে বাজাতে দেখা যায়।



ডমরু ২৭৩ পাতায় দেখুন

বিভিন্ন প্রদেশে ডমরু বিভিন্ন মাপের দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে আকারের সামান্য প্রভেদও পরিলক্ষিত হয়।

শুষির বা সুষির যন্ত্র

বর্ত্তুল বা অন্য আকারের ছিদ্রযুক্ত ফুৎকার-যন্ত্রমাত্রকেই (ফুটোওলা ফুঁ দিয়ে বাজান যন্ত্রদের) শুষির যন্ত্রের বিভাগে ধরা হয়। শুষির যন্ত্র দুরকমের দেখা যায়—একনল ও দ্বিনল। সঙ্গীতশাস্ত্রে শুষিরজাতীয় যন্ত্র চার ভাগে বিভক্ত :

(১) বংশী : বাঁশের তৈরী—সরলবাঁশী, লয়বাঁশী, মুরলী, বেণু প্রভৃতি। **(২) কাহল :** কলম, রোশনচৌকি, সানাই প্রভৃতি। কাহল সেই জাতীয় যন্ত্র যাদের শর বা তৃণধ্বজ অর্থাৎ রীড (Reed) দিয়ে বাজান হয়, (কাহল জাতীয় বাঁশীর এটিই বৈশিষ্ট্য)। **(৩) শৃঙ্গ :** শিঙ্গা, রণশিঙ্গা, তুরী ইত্যাদি। **(৪) শঙ্খ :** বিভিন্ন প্রকারের শঙ্খ ও গোমুখাদি।

প্রধান প্রধান এই চার ভাগে বিভাজিত যন্ত্রদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(ক) সভ্য : মুরলী, সরলবাঁশী প্রভৃতি সভ্য।

(খ) বাহির্দ্বারিক : রোশনচৌকি, সানাই, কলম প্রভৃতি।

(গ) সামরিক : তুরী, শিঙ্গা, রণশিঙ্গা প্রভৃতি।

(ঘ) গ্রাম্য : তুবড়ী, বেণু, প্রভৃতি।

(ঙ) মাঙ্গল্য : রামশিঙ্গা, শিঙ্গা, গোমুখশঙ্খ প্রভৃতি। শঙ্খাদি বাদ্যকে অনেকে মাঙ্গল্য বিভাগে ধরেন।

"বংশঃ পাবঃ পাবিকা চ মুরলী মধুকর্য্যপি।
কাহলাতুণ্ডকিন্যৌ চ চুক্কা শৃঙ্গমতঃ পরম্॥

সঙ্গীত রত্নাকর

বাঁশ থেকে তৈরী বলেই বাঁশী। এক বিশেষ ধরণের পর্বহীন বাঁশ থেকে বাঁশী তৈরী হয়। দক্ষিণভারতে বাঁশীকে **খুজল** বলা হয়। শঙ্খ, শৃঙ্গ প্রভৃতি ফুঁ দিয়ে বাজান যন্ত্র শুষির শ্রেণীর। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতি প্রসূত! বিশেষ কোন শিল্পপ্রসাদে গড়ে ওঠেনি। বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্তে আসার বহুপূর্ব থেকে এদের ব্যবহার চলে আসছে। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের গঠনে পরিবর্তন এসেছে। শৃঙ্গাদি যন্ত্র যেমন মৃত গো-মহিষাদির শিং থেকে উদ্ভূত, বাঁশীও তেমনি স্বাভাবিকতার

মাঝেই জন্ম নিয়েছিল। কোন গাছের ফোঁপরা ডালের ভিতর হাওয়া ঢুকলে একটি শব্দ বের হয় আবার সেই ডালেরই উৎপত্তিস্থলে যদি কোন আলাদা ফুটো থাকে তবে দুটি শব্দ শোনা যায়। আমাদের ধারণা আদিতে বাঁশীর উৎপত্তি এই সব বিভিন্ন ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছিল।

জীবজন্তুর ফাঁপা হাড় থেকে বাঁশীর উৎপত্তি, একথা বার্নি সাহেব তাঁর History of Music বই-এ ব্যক্ত করেছেন: "The Tibia was originally a flute made of the Shank or Shin bone of an animal and it seems as if the wind instruments of the ancient times have been long made of such material, as nature had hollowed, before the art of boaring flutes was discovered" Charles Burney's History of Music Vol. I, page 487.

প্যালিওলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রস্তর যুগের আগের দিকে হরিণের হাড়ে তৈরী বাঁশীর নমুনা দেখা যায়। নিওলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রস্তর যুগের শেষের দিকে বর্নহোলমে পাঁচটি ফুটোওয়ালা এক বাঁশীর কথা জানা যায়।[১] ক্যাপ্টেন উইলক ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাটির তৈরী দুটি ফুটোওয়ালা এক বাঁশী সংগ্রহ করে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন।[২]

বাঁশীর আদি-উৎপত্তির সালতারিখ বা আবিষ্কারকের নামের কোন সন্ধান আমরা পাইনি। যন্ত্রটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান আকারে আমাদের কাছে এসেছে। যন্ত্রসৃষ্টির ইতিহাসে কোন যন্ত্রটি যে আদিম সে কথা বলা কঠিন। অনেকের ধারণা পিনাক নামক ধনুযন্ত্র যখন মহাদেবের হাতে দেখা যায় তখন ধনুযন্ত্রই প্রথম এবং সেটিই আদিম। বিষ্ণুর হাতে যখন শঙ্খকে দেখা যায়, তখন মনে হয় শুষির যন্ত্রই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছে। বাদ্যযন্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাই সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। প্রাচীন শাস্ত্রে বংশ, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী নামে নানা প্রকারের বাঁশীর নাম পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত ইতিহাসে গ্রীসের মিনার্ভা দেবীকে বাঁশীর স্রষ্টা বলা হয়, বাঁশী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আরও শোনা যায় গ্রীসের খ্যাতনামা পণ্ডিত পিথাগোরাস খৃঃ জন্মের পাঁচশো বছর আগে বাঁশী আবিষ্কার

১। Musical Instruments through the Ages—By Iris Erwin (3rd Impression 1964.)

২। যন্ত্রকোষ—রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

করেছিলেন। শ্মশানে শুকনো মড়ার মাথার (খুলির) ভেতর দিয়ে বায়ু চলাচলের শব্দ থেকেই তিনি বাঁশী তৈরীর প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের বিষয়ে গ্রীসের অরফিউসের গল্প আমাদের মনে সন্দেহ জাগায়, কারণ অরফিউসের বাঁশীর গল্প পিথাগোরাসের অনেক আগের কথা। সুতরাং আমরা কি করে পিথাগোরাসের আবিষ্কারে বিশ্বাস রাখি?

বাঁশ ছাড়াও বাঁশী কাঠে এবং ধাতুতে তৈরী হয়। খয়ের, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠে, প্লাষ্টিক ও হাতির দাঁতে বাঁশী তৈরী হয়ে থাকে। বাঁশীর নির্মাণে সোনা, রূপা, পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও দেখা যায়।

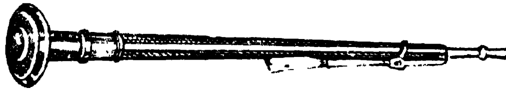
সঙ্গীত রত্নাকরে বাঁশীর ধ্বনি ও ফুৎকারের (ফুঁ-এর) দোষ-গুণের বিষয় লেখা আছে। বংশীবাদকদের প্রয়োজনে আসতে পারে ভেবে সে নিয়ে লেখা হল :

বার রকম গুণ

(১) স্নিগ্ধতা— স্নেহমাখা স্বর।
(২) ঘনতা—স্বরের গম্ভীরতা।
(৩) রক্তি—স্বরধ্বনির রঞ্জকতাগুণ।
(৪) ব্যক্তি—বিশেষ প্রকাশভঙ্গী।
(৫) প্রচুরতা—অনেক দম।
(৬) লালিত্য—স্বরের লাবণ্য বা উজ্জ্বলতা।
(৭) কোমলতা—কমনীয়তা।
(৮) অনুরণন—প্রতিশব্দ জ্ঞান।
(৯) ত্রিস্থানত্ব—তিন সপ্তকে সমান অধিকার।
(১০) শ্রাবকত্ব—শ্রোতাদের শ্রবণ-সুখকর গুণ।
(১১) মাধুর্য—মধুরতা (মিষ্টতা)।
(১২) সাবধানত্ব—স্বরের গুণ সম্বন্ধে অবহিত থাকা।

দশ রকম দোষ

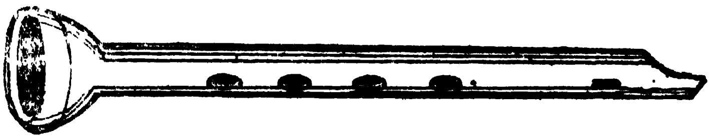
(১) যমল—এক ফুঁ-এর পর আর এক ফুঁ দেবার সময় প্রতিশব্দ।
(২) স্তোক—প্রয়োজন অনুসারে স্বরকে মোটা রাখতে না পারা।
(৩) কৃশ—স্বরের দুর্বলতা, উপযুক্ত ওজনে কোন স্বরে পৌঁছাতে না পারা।
(৪) স্খলিত—মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনে থেমে যাওয়া।
(৫) কম্পিত—স্বর কাঁপা।
(৬) তুম্বকী—ফাঁপা মোটা আওয়াজ।
(৭) কাকী – কাকের মত স্বরধ্বনি।
(৮) সন্দষ্ট—চেরা আওয়াজ।
(৯) অব্যবস্থিত—কখনো কম কখনো বেশী রুক্ষ স্বর।
(১০) স্ফুরিত—কফদোষগত জড়ানো স্বরধ্বনি।



অত্থু বা ওত্তু

অত্থু বা ওত্তু (Ottu): এই শুষির বাদ্যটি দক্ষিণ ভারতে শ্রুতি শানাই নামে পরিচিত। প্রধান নাগস্বরমের সঙ্গে অবিরাম স্বর রাখার জন্য এই শানাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটি প্রায় আড়াই ফুট মত লম্বা হয়। দেখতে অবিকল নাগস্বরমের মত। ফুঁ দেবার জায়গায় ধাতুর তৈরী গোল আংটা পরান থাকে এবং রীড দিয়ে বাজান হয়। শানায়ের বহির্মুখে অর্থাৎ ধ্বনিপ্রকাশ স্থানে, গোলাকার এক টুকরো কাঠ দিয়ে আংশিকভাবে বাদ্যযন্ত্রটিকে চেপে দেওয়া হয়। শানায়ের গায়ে যে চার-পাঁচটি ফুটো থাকে, তাদের দু-একটি বাদে বাকি সমস্ত ফুটোই মোম দিয়ে বন্ধ করা হয়, শব্দ-স্থায়িত্বের কারণেই এই ব্যবস্থা।

আইয়ারখুঝল: দক্ষিণভারতের পার্বত্য-অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার বাঁশের বাঁশী। পাহাড়ী রাখালেরাই এই বাঁশী বাজিয়ে থাকে। অতি প্রাচীন এই বাঁশীটিতে ছয়টি স্বরছিদ্র থাকে ও চার ফুট লম্বা হয়। এটি কাহল জাতীয় বাঁশী ও গ্রাম্য যন্ত্র। বাজাবার জায়গায় অর্থে বাঁশীর গোড়ায় ভেঁপুর মত তালপাতার জিভ দিয়ে বাজান হয়।



আলগোঝা

আলগোঝা: পঞ্জাবে ব্যবহৃত একজাতীয় বাঁশীকে আলগোঝা বলা হয়। এটি সভ্য যন্ত্র হয়েও বাহির্দ্বারিক। বাঁশীটি বাঁশের বা কাঠের তৈরী হয়। এতে চারটি মাত্র স্বরছিদ্র থাকে, অনেক আলগোঝায় সাতটি স্বরছিদ্রও থাকে; এছাড়া সমস্তই সরল বাঁশীর মত। পঞ্জাবী গ্রাম্যসঙ্গীতের সঙ্গে একে বাজতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই বাঁশী পারস্য থেকে আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখনও সঠিক সন্ধান পাইনি। পারস্যের (Nay) 'নে' বা 'নাই' বাঁশীটির মত এর আওয়াজ খুব মধুর। আলগোঝা নামটি পারস্য থেকে এসেছে বলে

অনেকে মনে করেন। অন্ধ্রপ্রদেশেও এই ধরণের বাঁশীর ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের ধারণা এটি আমাদের সরল বাঁশীর অনুকরণ। অনেক আলগোঝার বহির্মুখ ফানেলের আকারের।



কলম বাঁশী

কলম বাঁশী: এই বাঁশীর গোড়া বা মুখ (অর্থে যেখানে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়) লেখবার কলমের মত চ্যাপ্টা ধরণের বলেই একে কলম বাঁশী বলা হয়। পার্সিয়া, আফগানিস্থান, তাতার, টার্কি প্রভৃতি দেশেও এই বাঁশীকে কলম বাঁশী বলা হয়। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন যে গ্রীসের (Calamus) কলমস বাঁশীর অনুকরণেই এটি গড়ে উঠেছে। সরল বাঁশীর মত এর স্বরছিদ্র ও ধরার কায়দা একই রকম; কেবল বাজাবার জায়গায় দেশী সানায়ের মত একটা ছোট নল বসান থাকে, এবং বাজাবার আগে এই নলটিকে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। ক্ল্যারিওনেট ওবে প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাঁশিতে এবং আমাদের দেশী সানাই প্রভৃতিতে অনুরূপ জিভ ব্যবহার করা হয়। জিভ দেওয়া বাঁশীগুলিকে শাস্ত্রে কাহল জাতীয় বাঁশী বলা হয়েছে। কলম বাঁশী কাহল জাতীয়।

কার্ণা: দাক্ষিণভারতে এটি পূজাপার্বণের সময় মন্দিরে বেজে থাকে। সঙ্গীত গ্রন্থে আমরা দুই প্রকার কার্ণার সন্ধান পাই। প্রথমটি এক রীড (অর্থে জিভ) দেওয়া কাঠের বাঁশী। সম্মুখভাগে আটটি স্বররন্ধ্র অর্থে স্বরছিদ্র থাকে। দাক্ষিণ ভারতে সববাদ্যম বাজাবার সময় এই ধরণের কার্ণা সেই বাদ্যসম্মেলনে বেজে থাকে। পেতলের তৈরী, শৃঙ্গজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে **করণাল** নামে ট্রাম্পেট জাতীয় একটি যন্ত্রের নাম দেখা যায়, সেই যন্ত্রটিই বর্তমানে **কুর্ণা** বা **কার্ণা** নামে পরিচিত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

Dictionary of South India Music & Musicians নামক পুস্তকের (Volume II) ২য় খণ্ডে ৩০২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "A wind instrument used in temple rituals. It is also used in Uzhbekistan in the

U. S. S. R. The Karna is used in the performance of Sarva Vadyam in South Indian Temples."

অন্য প্রকার কার্ণার ব্যাখ্যায় আমরা পাই যে পিত্তল নির্মিত এক ধরণের ভারী বক্রতল নলাকার শুষিরযন্ত্র। খুব জোরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। বাজনাটির আওয়াজ জোরদার ও রুক্ষ (উচ্চনাদী ও শ্রুতি-কঠোর)। বেঢপ মাপের জন্যে হাতে ধরার অসুবিধা। Indian Music by Shahinda নামক পুস্তকটির ৮১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে: "It is a heavy curved pipe awkard to hold. It is blown hard and played in a band in times of important occasion (war, marriage & big festivals), made of brass, sound is harsh & loud."

এখানে দেখা যায় যন্ত্রটি বিবাহাদি উৎসবে বা যুদ্ধের সময় সমবেত বাহির্দ্বারিক যন্ত্রগুলিতে বাজতো। যন্ত্রটির কোন sketch আমাদের হাতে না থাকায় বর্তমান সংস্করণে সেটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। রাজস্থানে কার্ণা নামে সরল আকারের একপ্রকার শুষিরবাদ্য প্রচলিত আছে।

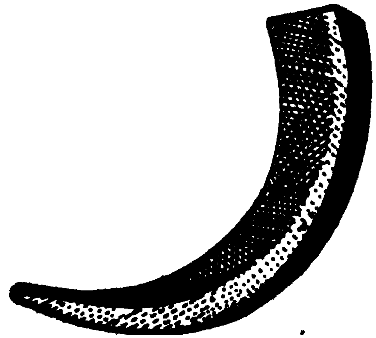


ক্ল্যারিনেট

ক্ল্যারিনেট: এটি পাশ্চাত্য দেশীয় শুষির যন্ত্র। যন্ত্রটিকে **ক্ল্যারিওনেট**-ও বলা হয়। এটি কাহল জাতীয় যন্ত্র। শানাই প্রভৃতি ভারতীয় যন্ত্রের মত এতে রীড পরিয়ে বাজান হয়। জার্মানীর ন্যুরেমবার্গ শহরের মিঃ জে. সি. ডেনার (J. C. Denner) নামে এক ভদ্রলোক ইউরোপীয় চ্যালুমোঁ (Chalumeau) যন্ত্রের অনুসরণে এবং তাতে speaker key-র স্থাপনায় ক্ল্যারিনেট যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন (ইং ১৬৯০-১৭০০)। ইং ১৭২০ সালে ডেনার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ডেনার অনেক নূতন চাবি যোগ করে এই যন্ত্রের আরও উন্নতি করেন। শিল্পীরা নূতন চাবিযুক্ত যন্ত্রটিতে বাজাবার অনেক সুবিধা পান। ১৮১০ সালে আইওয়ান মুলার (Iwan Muller) এই যন্ত্রের সবিশেষ উন্নতিসাধন করেন। ১৮৪২ সালে মিঃ ক্লোসে (Klose) এই বাঁশীতে বোহেম সিস্টেম (Boehm System) প্রবর্তন করেন।

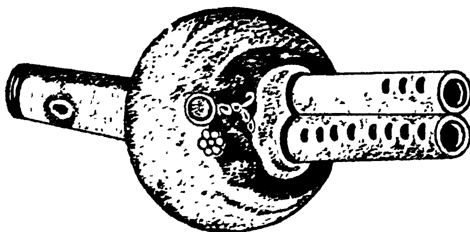
যন্ত্রটিকে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমে ফুংকার রন্ধ্রের দিক বা যেদিকে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়, সেটিকে বলা হয় মাউথ-পিস (Mouth piece), এই রন্ধ্রের পিছন দিকে জার্মান-সিলভারের তৈরী বা নিকেল করা অন্য ধাতুর তৈরী লিগেচার (Ligature) দিয়ে বাজাবার রীডটি মাউথ-পীসের সঙ্গে আটকানো থাকে। দ্বিতীয় অংশটি সকেট (Socket)। সকেটের পর তৃতীয়াংশে মেন বডি (Main Body), মেন বডি ও সমগ্র যন্ত্রটি আব্লুসকাঠ বা ইবোনাইটে তৈরী হয়। মেন বডিতে স্বরছিদ্র থাকে, এবং এই ছিদ্রগুলিকে কনট্রোল করে বাজাবার জন্যে নিকেলের বা সিলভারের স্প্রীং-যুক্ত চাবী ও তার সরঞ্জাম রাখা থাকে। সবশেষ মুক্ত প্রান্তে (নীচের দিকে) থাকে হর্ণ (Horn) বা চোঙ্গা। এই বাঁশীর ওপর দিকের (ফুংকার রন্ধ্রের দিকে) মাউথ-পীসটি ও রীড যাতে সহজে আঘাত না পায়, তাই মাউথ-পীসটি মাউথ-ক্যাপ (Mouth-cap) দিয়ে ঢাকা থাকে। ক্ল্যারিনেটের সমস্ত অংশগুলি আলাদা করে বাক্সে রাখা যায় এবং বাজাবার সময় প্রত্যেক অংশটিকে যুক্ত করে একক যন্ত্রে পরিণত করে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে একটি রীড এবং ১৩ থেকে ২৪টি পর্যন্ত চাবী থাকে।

ক্ল্যারিনেট সাধারণতঃ 'এ' ও 'বি' স্কেলের দেখা যায়। তা ছাড়া 'সি' স্কেল, হাই 'ডি-ফ্ল্যাট', হাই 'ইফ্ল্যাট,' 'এফ' প্রভৃতি স্কেলের পাওয়া যায়। 'বি-ফ্ল্যাটে'র ক্ল্যারিনেটকে 'ব্যাস ক্ল্যারিনেট' (Bass Clarinet) বলে, এর (হর্ণ) চোঙ্গাটির মুখ ওপর দিকে বাঁকান থাকে। গীতানুসরণে ও বাদ্যমণ্ডলীতে বাজাবার সুবিধার জন্যেই ক্ল্যারিনেটে বিভিন্ন স্কেলের ব্যবহার। যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধরূপে মণ্ডলবাদ্যে ও কণ্ঠানুসরণে সমান উপযোগী। যন্ত্রটির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থাকলেও বিস্তৃতির আশঙ্কায় বিরত থাকছি।


গোশৃঙ্গ বা গোশিঙা

গোশৃঙ্গ বা গোশিঙা : গরুর শিং থেকে যেসব ছোট আকারের শিঙা তৈরী হয় তাদের গোশিঙা বলে। আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে গোশৃঙ্গের নাম পাই পুরাকালে যুদ্ধের সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহৃত হত।

চুঙ্কা ঃ চারহাত লম্বা একজাতীয় প্রাচীন তিত্তিরীবাঁশী, বর্তমানে লুপ্ত।



তুবড়ী-বাঁশী

তুবড়ী-বাঁশী ঃ আমাদের দেশে সাপুড়েরাই এই বাঁশী বাজিয়ে থাকেন। শুদ্ধ ভাষায় তুবড়ী **ভুজঙ্গস্বরম্** ও **তিত্তিরী** নামে পরিচিত। গ্রাম্য ভাষাতে একে তুবড়ী বা **পূংগী** অথবা **পুন্‌গী** বলা হয়। এই যন্ত্রের খোল (ধ্বনিকোষ) বা বায়ুকোষটি তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী। শুষিরজাতীয় এই গ্রাম্য যন্ত্রটিকে **তিক্তিরী** বা **তিত্তি** নামে ডাকা হয়। তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী বলেই একে তিক্তিরী বলা হয়। একে নাক দিয়ে বাজান হত বলে এর আর এক নাম ছিল **নাসাবংশী,** সাপ খেলা বা ধরার সময় এই বাঁশী ব্যবহৃত হয় বলে এর অপর নাম **নাগিন-বীণ,** দক্ষিণভারতে এটি **মাগুধী।** এর অপর এক শুদ্ধ নাম **তুম্বকী** (Tumbaki)।[১] এটি বিদেশে **তুমেরা, জিন্‌গুর** (Jingur) **জিনাগোভী** (Jinagovi) নামেও পরিচিত।[২]

প্রাচীনকালে ক্বচিৎ এতে হরিণের চামড়ার তৈরী খোল ব্যবহৃত হ'ত, বর্তমানে চামড়ার খোলের প্রচলন নাই। এর খোলের তলদেশে দুটি নলের আকারের সমমাপের বাঁশী খোলের সঙ্গে মোম দিয়ে জোড়া থাকে। এই বাঁশী (সিঙ্গাপুরী) পবহীন বাঁশ থেকে তৈরী হয়। দুটি বাঁশীর (নলের) একটিতে পাঁচটি ও অপরটিতে নয়টি ছিদ্র রাখা হয়। পাঁচটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশীটির দুই ও চার নম্বর ছিদ্র ব্যতিরেকে বাকি তিনটি মোম দিয়ে বন্ধ থাকে। এই

১। The eight Principal Rasas of the Hindus by Raja Sir Sourendra Mohon Tagore. Page No. 19.

২। "Pungi also called Tumeri, Tubri, jingur or Jinagovi. Indian snake-charmer's reed pipe. The body and mouthpiece are of Gourd, two cane pipes are inserted, one a tonic drone, the other with finger holes for melody"—The International Cyclopedia of Music & Musicians. 9th edition, 1964, Page 1708,

বাঁশীটি অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বাঁশীটির মুক্তপ্রান্তে অর্থে আগার দিকে সাতটি স্বরছিদ্র থাকে। এই স্বরছিদ্রের ওপর অঙ্গুলি চালনাতেই স্বর প্রকাশিত হয়। এই নলটির প্রথম ছিদ্রটি (খোলের দিকের) নলের পশ্চাৎদিক পর্যন্ত (আরপার ভাবে) ছেদ্র করা থাকে। সাধারণ বাঁশীতে যেভাবে ফুঁ দিয়ে বাজান হয় এতে ঠিক সেভাবে ফুঁ দেওয়া হয় না। ফুঁ দেবার আগে গাল ফুলো করে একমুখ বাতাস নিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন মাফিক ফুঁ দিয়ে বাজান হয়ে থাকে।[৬]

সম্ভবত একনলা বাঁশীর পরেই দুনলা আবিষ্কৃত। ভারতে শানাই, নাগস্বরম্ প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তুবড়ী বাঁশীরই অনুকরণ। পাশ্চাত্য দেশের ব্যাগপাইপ প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও তুবড়ীর অনুকরণেই গড়ে উঠেছে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ প্রাচীন তুবড়ী বাঁশীর খোল মৃগচর্মে তৈরী হত বলে জানা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এই ধরণের আদিম বাঁশীগুলির মধ্যে যথেষ্ট আকৃতিগত মিল থাকায় কোন দেশের বাঁশী প্রথমে আবিষ্কৃত তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কেবলমাত্র সভ্যতার বিকাশের উপর নির্ভর করেই আমরা বলতে পারি যে আমাদের ভারতই এদের আদিম উৎপত্তিস্থল। মিশরের নাবিকেরা **জুমারা** বা **জুক্কোয়ারা** নামে যে দ্বিনল বাঁশী ব্যবহার করেন বা তাঁদের বর্তমান **আর্গুল** বাঁশী অবিকল আমাদের তুবড়ীর মত। আর্গুলের একটি নল অপরটি থেকে কিছু বড় হয়। মিশরের লাউচীন সমাকৃতি দ্বিনল বাঁশীকে **থাম** বলা হয়। এই যন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমানে বিরত থাকছি।



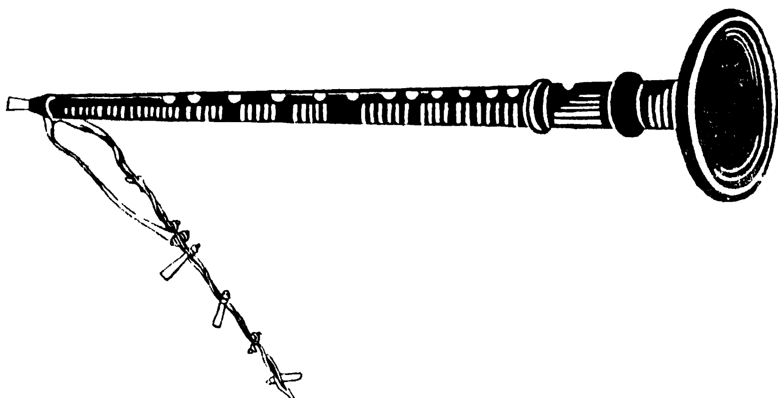
তুরী

তুরীঃ আমরা আগে বলেছি যে শিঙাগুলি অনেকটা ইংরাজি বর্ণমালার 'S' এস্ অক্ষরের মত। তুরী একপ্রকারের শিঙা হলেও এর আকৃতি সরল।

৬। ভারতীয় সঙ্গীত কোষ—শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, পৃঃ ৯২ "এই বাঁশী ক্রয় করিতে গেলে সাপুড়িয়াগণ ফুৎকার ছিদ্রটি অত্যধিক বড় করিয়া কাটিয়া বিক্রয় করেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের ব্যবহার্য বংশীর ছিদ্রটি অত্যন্ত ছোট এবং বাদনকালে, যখন তাঁহারা শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন ফুৎকার ছিদ্রটি জিহ্বাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখেন, তাহাতে লাউয়ের সঞ্চিত বায়ু ধীরে ধীরে বংশীকে ধ্বনিত করিতে থাকে"

তুরী পিতল বা তামার তৈরী। সঙ্গীত রত্নাকরে তুরীর উল্লেখ আছে। সেখানে তুরী **তুরুতুরু, তুরতুরী** বা **তিত্তিরী** নামে পরিচিত। ভারতের নানা প্রদেশে তুরীকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন মাপে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে তুরী, **তুতুরী** নামে পরিচিত। ট্রাম্পেট যন্ত্রটি তুরীর অনুরূপ। প্রাচীনকালে তুরী যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে এর প্রচলন নাই।

তুণ্ডকিনী ঃ কাহল জাতীয় দুহাত লম্বা রীড দেওয়া বাঁশী। এর অপর নাম **তুরুতুরু, তিত্তিরী** বা **যমল**। তুণ্ডকিনীতে রীড থাকে। তুণ্ডকিনী তুরীর নামান্তর হলেও রীড থাকে বলে একে তুরী বলা যায় না।



নাগশ্বরম

নাগশ্বরম ঃ আমাদের শানায়ের মত দেখতে। দক্ষিণে দুই প্রকারের নাগশ্বরম্ প্রচলিত। প্রথমটি **তিমিরি,** দক্ষ বাদকেরা এই তিমিরি নামের বড় আকারের শানাইটি বাজিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়টি **বারি,** এটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। আমাদের শানায়ের মত নাগশ্বরমের সঙ্গে শ্রুতি নামে আর একটি বাঁশী অবিশ্রান্ত সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। (অত্থু বা ওত্তু দেখুন) আমাদের তুবড়ী বাঁশীর এক নাম ভুজঙ্গস্বরম, নাগশ্বরম নামটি ভুজঙ্গস্বরম থেকেই জন্ম নিয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

নেড়ুনকুঝল ঃ অভিনব এই বাঁশী দক্ষিণভারতে বেজে থাকে। আবিষ্কারকের নাম ও জন্ম তারিখ জানা যায়নি। দক্ষিণভারতের রাখালদের বাঁশী। বাঁশীটি বাঁশের তৈরী। বর্তুল এই বাঁশীটি লম্বায় ৩ ফুট ২ বা ৪ ইঞ্চির মত হয়। আকারের তুলনায় আওয়াজ কম জোর, দূর থেকে শোনা যায় না।

বাঁশীটির বৈশিষ্ট্য, এর ফুঁ দেবার ফুটো, প্রায় মাঝখানে থাকে এবং ফুঁ দেবার জন্যে একটি মুখ লাগান থাকে। এইভাবে মাঝখানে ফুঁ দেবার জায়গা থাকায় বাঁশীটি



নেহুন কুঝল

দুভাগ বলে মনে হয়, ফুঁ দেবার জায়গাটি মুখের সামনে রেখে বাঁশীটি সোজা ক'রে ধ'রে বাজান হ'য়ে থাকে, সময় বিশেষে আড় বাঁশীর মত ধরেও বাজান হয়। একই বাঁশীকে দুটি জোড়াবাঁশী বলে মনে হয়, ফুৎকার রন্ধ্র থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত এক অংশ এবং রন্ধ্রের নিচের থেকে হাঁটুর দিক পর্যন্ত অপর অংশ। নীচের অংশটিতে আটটি স্বরছিদ্র থাকে এবং মূল স্বর এখানেই বাজে। উপরের সাতটি ছিদ্রবিশিষ্ট অংশ শ্রুতিসানায়ের মত একস্বর প্রকাশ করে।

বাঁশীর ফুৎকারছিদ্র ও দুদিকের স্বরছিদ্রের মাঝে টিনের ঢাকনা থাকে যেটি বায়ুঘরের (wind chamber-এর) কাজ করে। বায়ু-ঘরের পাশের ছিদ্র দিয়েই বাতাস বাঁশীটির নলের দুদিকের অংশে চলে যায়।

ন্যাসতরঙ্গ ঃ অঙ্গৈক দেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্যস্য জায়তো,
উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

পৃথিবীর নানাদেশে বংশীজাতীয় নানাধরণের ফুৎকারযন্ত্র দেখা যায়। কোনটি কত দিনের প্রাচীন, কোনটি কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ অথবা কোনটি কোন দেশ থেকে এসেছে এসব নিয়ে নানা তর্ক। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে কোনটিই সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। আমাদের পরাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে অন্যান্য অনেক জাতিই আমাদের নিজস্ব সম্পদকেও তাদের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঐতিহাসিকেরা ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আমাদের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট অভাব ছিল। সেই কারণে প্রকৃত তথ্যের অভাবেও আমাদের অনবধানতার অবকাশে অন্যান্য দেশের সঙ্গীতৈতিহাসিকেরা অবাধে আমাদের ভারতীয় যন্ত্রকেও তাঁদের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশের প্রাচীন বা আধুনিকসঙ্গীত ইতিহাসে ন্যাসতরঙ্গের নাম শোনা যায় না। এমন কি বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশেও এই যন্ত্রটির নাম বা বাদকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে ন্যাসতরঙ্গকে উপাঙ্গ বলা হ'ত। যন্ত্রটি এক জোড়া ছোট্ট শানাই-এর আকারের অর্থাৎ তার ক্ষুদ্র সংস্করণও বলা যায়। যন্ত্রতুটি ধাতুর তৈরী তুটি



ন্যাসতরঙ্গবাদক

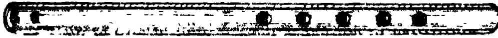
আলাদা নলের মত, লম্বায় প্রায় এক ফুট। গোড়ার দিকটি সরু ও আগার দিকটি মোটা হয়। দেখতে শানাই-এর মত হলেও গোড়ার দিকের মুখ ছাড়া আগাগোড়া নিশ্ছিদ্র। এই সরু মুখের দিকে নলের মধ্যে ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। এই ঝিল্লিময় অংশটিতেই স্বর-পরিবর্তন ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় ফুৎকার যন্ত্রের বিভাগে একে ধরা হ'লেও বাঁশী তুটি ফুঁ দিয়ে বাজান হয় না। ন্যাসতরঙ্গের ন্যাস শব্দটির অর্থের মধ্যে প্রাণায়ামের ন্যাসের আভাস পাওয়া যায়। বাদন পদ্ধতিতে ফুৎকারের বদলে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় আশ্চর্য ধরণের শ্বাসকৌশলের চাপের তারতম্যের ফলে ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গের আন্দোলনে বংশীযুগলে বিভিন্ন স্বর ও স্বরগ্রাম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রতুটি গলার

দুপাশে রেখে কণ্ঠতন্ত্রীতে নিশ্বাসের চাপ দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের বাজের কায়দা অতি দুরূহ, কষ্টসাধ্য এবং বিশেষধরণের কুম্ভকসাধনার অন্তর্গত বলেই আজ এ যন্ত্রের কোনও বাদক নাই এবং যন্ত্রযুগলও সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে। অতীতে কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই এই যন্ত্রবাদনে সিদ্ধ কয়েকজন বাঙ্গালী গুণী সঙ্গীতজ্ঞের নাম শোনা যায়। প্রথমেই কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে গোপল সিংহ রায়, নীলমাধব চক্রবর্তী ও আলাউদ্দীন-ভ্রাতা আফতাবুদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই যন্ত্রে রাগবাদনের ও স্বরের সূক্ষ্মকাজের যাদুকর ছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারতের এই বিস্ময়কর যন্ত্র পরিবেশন করতে পারেন এমন একজন বাদকও বর্তমানে বাংলায় বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই নাই।



পাব

পাব ঃ প্রাচীনকালের এক ধরণের বাঁশের বাঁশী। বাঁশীটির শরীর বাঁশপাতা দিয়ে জড়ানো থাকতো। বাঁশীটি ফুঁ দেবার জায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত চোদ্দ আঙ্গুল লম্বা হত। মুখের ছিদ্র থেকে ন' আঙ্গুল দূরে আরম্ভ হ'ত স্বরছিদ্র। আধ আঙ্গুল পরপর আটটি ফুটো থাকতো, শেষের ফুটোটি হাওয়া বেরোবার জন্যেই নির্দিষ্ট থাকতো। বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।



পাবিকা

পাবিকা ঃ প্রাচীনকালের একপ্রকারের বাঁশীর নাম। বাঁশের তৈরী, চোদ্দ আঙ্গুল লম্বা, বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা শরীর। ফুটোগুলি কড়ে আঙ্গুলের মাপের। দু'মুখই খোলা, ৫টি স্বরছিদ্র থাকতো। রত্নাকরে এর নাম ও সামান্য পরিচয় আছে।

বর্ত্তক ॥ বৃহদাকারের কড়ি জাতীয় শঙ্খ বিশেষ। এই জাতীয় শঙ্খ বর্ত্তমানে দেখা যায় না।

বিজয় ॥ এক প্রকার বাঁশী, বর্ত্তমানে লুপ্ত। বিজয় নামে একপ্রকার শঙ্খেরও নাম পাওয়া যায়।

বেণু ॥ বাঁশ থেকে তৈরী। পুরাকালে রাখালরা গোচারণের সময় এই বাঁশী বাজাতো। বেণু গ্রাম্য যন্ত্র বলে পরিচিত। "আয়রে কানু বাজারে বেণু"



বেণু

পদ্যে কাণু অর্থে কৃষ্ণকেই ধরা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ গোচারণের সময় বেণু বাজাতেন অথবা আড় বাঁশী বাজাতেন তা বলা শক্ত। বেণু আগে ধর্ম্মীয় গানে বা নৃত্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হত জানা যায়। মিশরের "জিকার" নামে ধর্ম্মীয় নৃত্যের সঙ্গে সেখানকার ফকিরেরা এই ধরণের বাঁশীর সঙ্গত করতেন। ভারতে প্রাচীন জক্করী নৃত্যের সঙ্গেও ব্যবহৃত হত। এই জক্করী নৃত্যই মিশরে জিকার বলে প্রচলিত। ইংরাজীতে একে দার্বি ফ্লুট (Dervi flute) বলে। যন্ত্রটি সরলভাবে ঈষৎ বেঁকিয়ে ধরে অল্প-অল্প ফুঁ দিয়ে বাজান হয়। ফুঁ-এর বলের (কম বেশী ওজনের) ওপরই এর নানা স্বরধ্বনির প্রকাশ। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ব্যতীত এই বাঁশী বাজান সম্ভব হয় না। বাজান কঠিন বলেই এর বাদক সংখ্যা কম। বেণু বাজিয়ে খুব কম দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বর্ত্তমানের "টিপারা বাঁশী"ই বেণু। প্রাচীন বেণুই বর্ত্তমানে টিপারা বা ত্রিপুরা ফ্লুট বলে প্রচলিত। এই বাঁশী প্রায় ৩' ফুট লম্বা হয়।



ভেঁপু

ভেঁপু ॥ কাহল জাতীয় এক ধরণের তাল পাতার বাঁশী, বাংলায়, ওড়িষ্যাতে এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে বাজতে দেখা যায়। এই বাঁশীর ফুঁ দেবার জায়গায় তালপাতার জীভ (reed) ব্যবহার করা হয়। এটি গ্রাম্য যন্ত্র। ছেলেমেয়েরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা ও স্নান যাত্রার সময় (অথবা বর্ষাকালে) বাজিয়ে থাকে। ভেঁপু একস্বর প্রকাশক বাঁশী।

আমের আঁটি বা কষি থেকেও ভেঁপুর মত এক স্বর প্রকাশক একপ্রকার বাঁশী বর্ষাকালে ছেলেরা বাজিয়ে থাকে। আমাদের ধারণা ভারতের ছেলেদের হাতের এই **আম-কষির-বাঁশী** থেকেই সমস্ত কাহল জাতীয় বাঁশীর জন্ম হয়েছে; কাজেই এগুলি কত প্রাচীন তা বলা কঠিন।

ভেরী ॥ ভেরী বাদ্যযন্ত্রটির বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে এটিকে শুষির যন্ত্রের বিভাগে ধরেছেন। অন্যেরা একে আনদ্ধ যন্ত্রের বিভাগে রেখেছেন। প্রথমে আমরা আনদ্ধ জাতীয়ের কথাই বলছি।

ভেরী সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে (আনেন্দ্রাম, সং ; শ্লোক নং ১১৪৮-১১৫০)

"বিতস্তিত্রয় দৈর্ঘ্যা স্যাদ্ ভেরী তাম্রেণ নির্মিতা
চতুর্বিংশত্যঙ্গুলে চ বদনে বলয়াম্বিতে
তস্যাঃ সবলয়ে চর্ম্মচ্ছন্নে ছিদ্রসমন্বিতে
রজ্জ্বা নিয়ন্ত্রিতে গাঢ়ং মধ্যে সূত্রেণ বন্ধনম্"

এই থেকে জানা যায় যে ভেরী চর্ম্মাচ্ছাদিত আনদ্ধ যন্ত্র বিশেষ এবং এই চর্ম্মবাদ্যটি তামার তৈরী ও চামড়ার ঢাকাটি ছোট দিয়ে টানা থাকতো। এর গোলাকার মুখ প্রায় ১॥/১ ফুট মত বড়। যন্ত্রটি আবার দু রকমের হয়। (ক) রণভেরী—যেটি যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হত ও (খ) জয়ভেরী—যেটি যুদ্ধ জয়ের পর বাজান হত। রামায়ণে আমরা যুদ্ধ বাদ্যের মধ্যে ভেরীর উল্লেখ দেখতে পাই। বর্ত্তমানে ভেরী যন্ত্রটি লুপ্ত বলা চলে।

দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ শুষির জাতীয় ভেরীর কথায় আমরা রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর "যন্ত্রকোষ" নামক পুস্তকে ভেরীর বিষয়ে লিখেছেন— "ইহাকে সচরাচর ভড়ঙ্গ বলে। ইহা দূরবীক্ষণের ন্যায় ও তাহারই মত একটি নলের ভিতর আর একটি এইভাবে স্তবকে স্তবকে রাখা থাকে, বাজাইবার সময় এক একটি করিয়া বাহির করা হয়। ইহা পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে নৌবতে ইহার ব্যবহার।"

আমাদের ধারণা ভড়ঙ্গ যন্ত্রটির ব্যাখ্যা তিনি যা লিখেছেন সেটি সম্ভবত ভুরুঙ্গ বা ভড়ঙ্গকে ভেরী ধারণা করার কারণেই হয়েছে। সম্ভবত প্রাচীনকালে **ভুরুঙ্গ** নামে এক জাতীয় ভেরী প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে **ভুরী** নামে এক প্রকার শৃঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে, (covered brass horns used in temples)। এটি শুষির যন্ত্রের বিভাগে পড়ে। এই ভূরীই উত্তর ভারতে ভেরী নামে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়।

আমরা Mr. Sahinda-র লেখা Indian music নামক পুস্তকটিতে **ভীর** (Bheer) নামে একটি যন্ত্রের নাম পাই। তিনি লিখেছেন "Bheer—Is one of the most ancient flutes of mythological interest. It

was played in the marriage of Mahadeo and Parbati. It is made entirely of copper and has a shrill sound".

রাজা সাহেব এই ভেরীর বিষয়ই তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে দুই প্রকারের ভেরী প্রচলিত ছিল। একটি দামামা জাতীয় ও অপরটি তুরী জাতীয়। দামামা জাতীয় ভেরীকে যদি আমরা ভেরী বলি ও তুরী জাতীয়টিকে যদি ভড়ঙ্গ বলি তবে নামভেদে আকারভেদ সহজতর হয়। আমাদের কাছে দুই প্রকার ভেরীর কোন স্কেচ না থাকায় পাঠকদের কাছে এই যন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি পরিবেশনে অক্ষম।



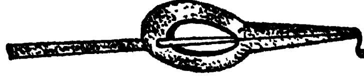
মুরলী

মুরলী ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে যে বাঁশী দেখা যায় সেই আড় বাঁশীই মুরলী নামে পরিচিত। মুরলীকে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় **"তাজী-নাই"** বলা হয়। এই বাঁশীর মাঝখান ফাঁপা। বাঁশীর বাঁশে কোন পাব অর্থে গাঁট থাকে না। মুরলী ছোট বড় নানা আকারের দেখা যায়। মুরলী ভারতের অতি প্রাচীন শুষির যন্ত্র। বাঁশীর গোড়ার ফাঁকা ছিদ্রটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। গোড়ার (শিরোভাগের) তিন চার আঙ্গুল বাদে ফুঁ দেবার জন্য ফুৎকার-রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রে ফুঁ দিয়ে বাঁশীটি বাজান হয়। এই ছিদ্রের কম বেশী চার আঙ্গুল বাদে পর পর ছ' সাতটি ছিদ্র থাকে, এই সমস্ত ছিদ্রগুলিকে স্বরছিদ্র বলা হয়। এই ছয়টি ছিদ্র থেকেই ফুঁএর বলের (বায়ুর চাপের) কমবেশীতে ও আঙ্গুলের চাপের তারতম্যে স্বরধ্বনির বিচিত্রতার বিকাশ ঘটে।

মুরলী দু হাত দিয়ে তীর্য্যগ্‌ভাবে ধরে বাঁ হাতের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে গোড়ার দিকের তিনটি স্বরছিদ্র এবং ডান হাতেও অনুরূপভাবে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে আগার দিকের তিনটি স্বরছিদ্র ইচ্ছামত চাপা দিয়ে বাজান হয়। বাঁশীর পিছনে বুড়ো আঙ্গুলের ঠেক্‌নো রাখা হয়। বাঁশীতে ফুঁ দেবার কায়দা গুরুর কাছে শিখে নিতে হয়, এসব বিষয় লিখে বোঝান সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত মুরলীর সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত মুরলীর কিছু তফাৎ দেখা যায়। রত্নাকরে দুরকমের মুরলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমটি দু হাত লম্বা। শিরোভাগে একটি ফুঁ দেবার এবং মুক্তপ্রান্তে চারটি স্বরপ্রকাশের ফুটো থাকে।

দ্বিতীয়টির বর্ণনায় দেখা যায় সাড়ে বাহান্ন আঙ্গুল ও ১ যব লম্বা। মাথা থেকে ৩½ আঙ্গুল পরে ফুঁ দেবার ফুটো, এই ফুটোটির ব্যাস ১½ আঙ্গুল বড়। আটটি ফুটো স্বরপ্রকাশের জন্য থাকে ও ফুটোগুলির ব্যাস ৫½ যব হয়। স্বর প্রকাশের ফুটোগুলি ২½ আঙ্গুল পর পর থাকে।*



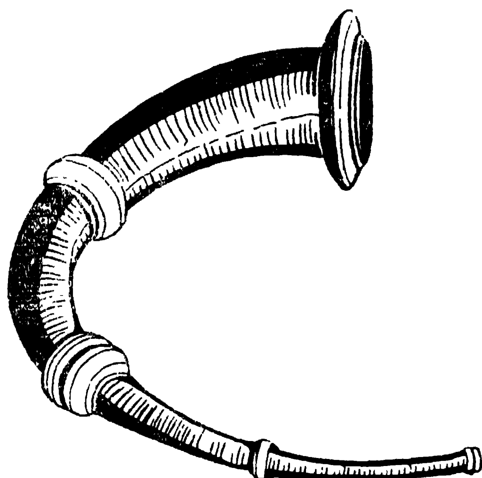
মোচঙ্গ

মোচঙ্গ॥ যন্ত্রটি ত্রিশূলের আগার মত দেখতে। Jews' Harp-এর সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। বিশুদ্ধ লোহা থেকে তৈরী হয়। লোহার একটি সরু পাত যন্ত্রটির মাঝখানে লাগান থাকে। যন্ত্রের মোটা দিকটা বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুলে চেপে ধরে এবং সরু দিকটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে ডান হাতের প্রথম আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে রাখা লোহার পাতে ঘা দিয়ে বাজান হয়। একতারার মত একটি স্বরই যন্ত্রটি প্রকাশ করে। আঘাতের সঙ্গে প্রশ্বাসের বল ও দীর্ঘতার উপর স্বরের হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং ডান হাতের আঘাতের কায়দার ও প্রশ্বাসের বিশিষ্ট ব্যবহারের উপর এর বাদন কুশলতা নির্ভর করে। যন্ত্রটির ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে সমবেত বাদ্যমণ্ডলিতে এর অংশগ্রহণে। বাদ্য মণ্ডলিতেই এর ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ তবে তবলা ও পাখোয়াজের সাথে কদাচিত একে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্ররূপে অংশ গ্রহণে দেখা যায়। কুশলী বাদকেরা এই যন্ত্রে পখাবজের সঙ্গতে নানা প্রকার ছন্দ বৈচিত্র্য দেখান। যন্ত্রটির মাঝের লোহার পাতটিতে মোম অথবা ময়দার মণ্ড দিয়ে সুর বাঁধা হয়। হায়দ্রাবাদের পার্বত্যাঞ্চলে চেঞ্চু জাতিরা বংশনির্মিত মোচঙ্গাকৃতির একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁদের বাঁশের তৈরী এই মোচঙ্গের নাম **টোণ্ডারম্মা**। এই যন্ত্রে যাঁরা বেশী রিয়াজ করেন, তাঁরা প্রায়শই দাঁতের রোগে বা হাঁপানিতে ভুগে থাকেন। এই কারণেই অধুনা উত্তর ভারতে এর বাদকসংখ্যা অতি নগণ্য। দক্ষিণ ভারতে এখনো কিছু সংখ্যক বাদককে এই যন্ত্র বাজাতে শোনা যায়। নঙ্গীপুরের সীতারাম আইয়ার এই যন্ত্রের একজন দক্ষ বাদক।

রণশৃঙ্গ॥ চলতি ভাষায় এটিকে **রণশিঙা** বলে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। এই শিঙা তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতু থেকে বড়

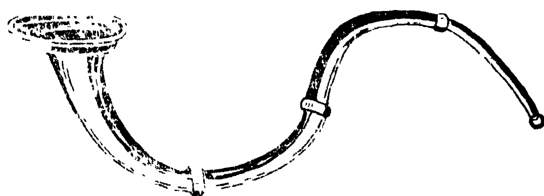
* সঙ্গীত রত্নাকর, বাদ্যাধ্যায়—শ্লোক ৬০১—৬০৬।

আকারে তৈরী করা হত। সৈন্যদের আহ্বান করা ও উৎসাহ দেওয়ার কাজে এই শিঙা ব্যবহার করা হত। এই শিঙা আকারে অনেকটা ইংরাজি 'S' এস্



রণশিঙ্গা

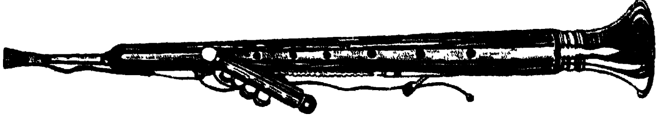
অক্ষরের মত। এর পরিবর্তে বর্ত্তমানে বিউগল্ (Bugle) ব্যবহৃত হয়। ফুঁ এর কম বেশীর ওপরই স্বরধ্বনির তারতম্য নির্ভর করে। (শৃঙ্গ দেখুন)



রামশিঙা

রামশৃঙ্গ বা রামশিঙা॥ **রামশিঙা** সাধারণত ধর্ম্মীয় শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নগর সংকীর্ত্তনে এর ব্যবহার ক্বচিৎ নজরে পড়ে। রণশিঙা থেকে এগুলির ব্যাসের আকার বড়, আওয়াজও মোটা। উভয় শিঙার বাজাবার কায়দা একই। এগুলি আকারে বড় তামা বা পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরী। দক্ষিণে ও উত্তরে প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পূজা ও উৎসবের সময় রামশিঙাকে বাজাতে দেখা যায়। রামশিঙ্গাকে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলা হয়।

রৌশনচৌকী ॥ একত্র সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের সমবেত বৈঠকের নাম রৌশন-চৌকী। "রৌশন"[১] শব্দটি ফারসী শব্দ অর্থ প্রকট বা জাহির করা অথবা চমকপ্রদ এবং চৌকী শব্দের অর্থ বৈঠক বা আগড়া। রৌশনচৌকী এই দুটি শব্দের মিলিত অর্থ এক সম্মিলিত বাদ্য বৈঠকের মাধ্যমে চমকদার স্বর প্রকাশ করা। এই বাদ্য



রৌশনচৌকী

বৈঠকের কায়দা পারস্য থেকে আমদানি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। রৌশনচৌকীর বৈঠকে নয়টি বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলনে স্বর প্রকাশ করা হত এবং এই বাদনরীতি সম্রাট আলেকজাণ্ডার কর্তৃক আনীত বলা হয়। পুরু রাজার রাজত্বকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত। The story of Indian Music and its instruments by Ethel Rosenthal page 84-এ লেখা হয়েছে—"The Naubat implying a combination of nine instruments is supposed to have been invented by Alexander the Great······ A special apartment known as Naubat or Naqqara khana is usually reserved foı Musicians about the Gate ways lead into the palaces and shrines" গ্রীক সম্রাটের পক্ষে নৌবত শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিপূর্ণ নয় বলে পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন ও তাঁরা এটি আলেকজাণ্ডারের আবিষ্কৃত বলিয়া মান্য দেন না।

শানায়ের মত পূজা পার্ব্বনে ও বিশেষ উৎসবে এর ব্যবহার এখনও দেখা যায়। বর্তমানে নয়টি বাদ্যের মিলিত বৈঠক আর বসে না। এখনও অনেক নবাব বা আমীর উমরাহের বাড়ীর ফটকে নৌবতখানা দেখা যায়। আগের দিনে এই নৌবতেই রৌশনচৌকীর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে বিবাহাদি উৎসবে সেই অনুকরণে অনেকে তাঁদের বাড়ীর সদর দরজায় বা তার পাশে সাময়িক ভাবে বাঁশের মাচায় নৌবতখানা তৈরী করেন ও তার ওপর শানাইবাদকদের বৈঠক বসান। এই বৈঠককেও নৌবত বলা হয়। চলতি ভাষায় এই মাচা নবৎখানা নামে পরিচিত। "Naubat—Instruments of Music, sounding

১ উর্দূ হিন্দি শব্দকোষ—মুহম্মদ মুস্তাফা খাঁ মদ্দাহ

at the Gate of a great man at certain intervals"—Students Practical Dictionary (Urdu-English Dictionary) by Ram Narain Lal 1947, 11th edition.

অনেকে বলেন নববাদ কথাটি থেকে নৌবত শব্দটি এসেছে। যদিও আসলে নৌবত শব্দটি আরবী শব্দ তবু এঁরা বলেন—নব অর্থে নয় ও বাদ অর্থে বাদ্য এইভাবে নয়টি বাদ্যের সম্মিলন ঘটে বলেই এর নাম নববাদ। আমাদের ধারণা নৌবত শব্দটি প্রচলিত হবার পর নববাদ কথাটি এই বাদ্য বৈঠকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

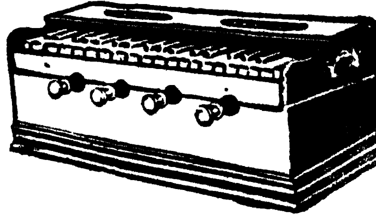
আকবর বাদশাহের নৌবতে নয়টি শানাই বাজান হত বলে শোনা যায়। আবুল ফজলকৃত আইন-ই-আকবরিতে বলা হয়েছে যে সম্রাট আকবরের নৌবতে ১৮ জোড়া কুর্গ, ২০ জোড়া নাকারা, ৪টি ঢোল, নয়টি শানাই, ২টি নাফেরী, ৬টি কার্ণা, ২টি শিঙ্গা ও ৩ জোড়া ঝাঁঝ ব্যবহৃত হত।

অন্যত্র দেখা যায় নৌবতে সাধারণত নয়জন বাজিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা যথাক্রমে—দুই জন শানাই বাদক, দুজন নাকারা, একজন ঝাঁঝ, একজন জামেদার (অর্থে পরিচালক), একজন তালিবাদক ও একজন সহকারী শানাই বাদক অর্থে শ্রুতিশানাই বাদক। এই নয়জনে নৌবত। জানা যায় এই রৌশন চৌকীতে যে সব শানাই বাজান হত তাদের আকার ছোট ছিল ও তীব্র স্বর প্রকাশ করতো। পাশ্চাত্ত্য ওবো (oboe) যন্ত্রের সঙ্গে এই ধরণের শানায়ের মিল আছে বলা হয়।

নয়বাঁশী ॥ রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে এই বাঁশীর নাম পাওয়া যায়। বিশেষ ধরণের বাঁশ থেকেই এই বাঁশী তৈরী হয়। সকল বাঁশীর মত এর মুখ চ্যাপ্টা হয় না। হাওয়া বেরোবার কোন পৃথক ছিদ্রও এতে থাকে না। গোড়া ও আগার মুখ সম্পূর্ণ খোলা থাকে। গোড়ার দিকের খোলা মুখ কাত করে ধরে ফুঁ দিতে হয়। বাঁশীটি একটু বেঁকা করে ধরা নিয়ম। অনেকটা টিপারা বাঁশীর কায়দায় বাজান হলেও টিপারা ফ্লুট থেকে এগুলি আকারে অনেক ছোট। বাজাবার কায়দার কিছু পার্থক্য আছে। এই ধরণের বাঁশী আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত। অনেকের ধারণা এই ধরণের বাঁশীর মুখ চ্যাপ্টা থাকতো ও আকারে অনেক ছোট হত।

হারমোনিয়ম ঃ হারমোনিয়ম একটি পাশ্চাত্য স্বর-যন্ত্র। যন্ত্রটি বায়ু-চালিত একে Aerophones বিভাগে ধরা হলেও পাশ্চাত্যে এটিকে Reed Organ

family, Reed wind family, বা Free Aerophone হিসাবে ধরা হয়েছে। এটি ফুঁ-এর সাহায্যে না বাজলেও আমরা একে বায়ু-চালিত যন্ত্র বলে শুষির যন্ত্রের বিভাগে রাখতে বাধ্য হয়েছি। বর্তমানে ভারতে যে বক্স-হারমোনিয়ম প্রচলিত সেটি ইউরোপীয় টেবিল হারমোনিয়মের অনুকরণে নির্মিত সহজতর একটি সহযোগী যন্ত্র। যন্ত্রটি সভ্য যন্ত্রের বিভাগে পড়ে।



হারমোনিয়ম

হারমোনিয়মের প্রথম আবিষ্কারকদেব ক্ষেত্রে আমরা কোপেনহেগেন শহরের শব্দ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ডাঃ ক্রাটজেনষ্টেন (Dr. Kratzenstein) ও জি, জে, গ্রেনী (G. J. Grenie) এই দুজনের নাম পাই। এঁরা চীন দেশের চ্যাং যন্ত্রের অনুকরণে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝে (ইং ১৭৫৬—১৮৩৭) এই যন্ত্রটির উদ্ভাবনে অগ্রণী ছিলেন।[১] গ্রেনীর আবিষ্কার বলে এই যন্ত্রটি তখন Orgue Expressif নামে প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সের বহু স্থানে হারমোনিয়ম আজও Orgue Expressif নামেই চলছে। হারমনি প্রসারক হয়েও যন্ত্রটি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত হারমোনিয়ম নাম পায় নি। এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে Jacob Estay, Jacob Alexandre, Victor Mustel প্রভৃতি বহুজনের নাম পাওয়া যায়। যন্ত্রটি হারমোনিয়ম নাম পাবার আগে Adelophone, Melodica, Harmonine, Harmonica প্রভৃতি বহু নামে চলতে থাকে।[২]

ইঃ ১৮৪০ সালে প্যারিসের (A. Debain) এ ডিবেঁ নামে এক ভদ্রলোক এই যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের Wind Channel প্রবর্তন করেন। এই চ্যানেলের মাঝ দিয়ে stopper-এর সাহায্যে হারমোনিয়মের রীডগুলির বিভিন্ন দলে পৃথক পৃথক ভাবে হাওয়ার ধাক্কা পৌঁছাত। এই বৈশিষ্টের বলে সুকৌশলে তিনি যন্ত্রটির

১। Harvard Dictionary of Music 2nd Ed. 1970, Page 371.

২। The Oxford Companion to Music by Percy A. Scholes. 9th Ed. Page 870.

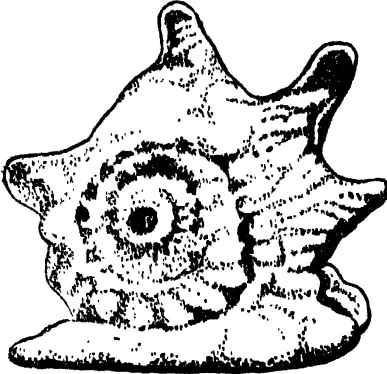
উদ্ভাবক বলে নিজের নামে Patent Registration করিয়ে নেন ও যন্ত্রটির **হারমোনিয়ম** নাম রাখেন।[৩] সরকারি সনদ ও কৃতিত্বের বলে তাঁর নামটিই এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলে পরিচিতি পায়। যদিও আসলে হারমোনিয়ম কোন একজনের কৃতিত্বে গড়ে ওঠে নি। নানা জনের নানা দানেই এটি গড়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে এই যন্ত্রটি টেবিল হারমোনিয়ম রূপে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে আসে, এর শেষের দিকে ডোয়ার্কিন কোং-র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিকল্পনায় এটি বক্স হারমোনিয়মে পরিণত হয়। (ভিন্নমতে মোহিনী ফ্লুট কোং'র মোহিনীবাবু।) প্রথমে এর (Bellow) হাফরটি বাক্সের ওপরে রাখা হত। টেবল-হারমোনিয়মে হাফরটি (Bellow) পায়ে করে চালান হত। বর্তমানে এটি হারমোনিয়ম-বক্সের পিছন দিকে রাখা হয়। সে সময়ে এক একটি প্লেটে দুটি করে একস্বরে বাঁধা রীড রাখা হত। বর্তমানে স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়মের প্রবর্তনে Dass Bros.-এর সিদ্ধেশ্বর দাস, জি. এন দাস, ধীরেন দাস প্রভৃতির নাম দেখা যায়।

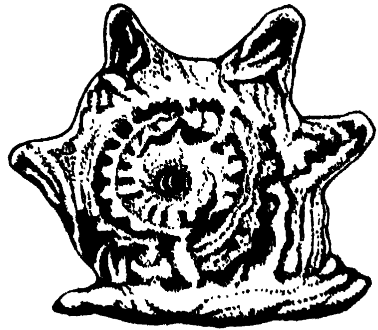
আমাদের দেশে যন্ত্রটির জনপ্রিয়তার কারণ: (১) অন্যান্য যন্ত্রের দামের তুলনায় সাধারণ হারমোনিয়মের দাম খুব বেশী নয়। (২) অপরাপর তার যন্ত্রের মত স্বর বাঁধার জন্য দীর্ঘ সময় লাগে না। বরং যন্ত্রটি নিজেই অন্য যন্ত্রে স্বর মেলাতে সাহায্য করে। (৩) রীডের ওপর আঙ্গুল টিপলে সহজেই স্বর প্রকাশ পায়। (৪) অল্প সময়ে বাজাতে শেখা যায়। বলা বাহুল্য কুশলী বাদক হতে যথেষ্ট শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন হয়। (৫) স্বর-সহযোগীতায়, একক বাদনে, বৃন্দবাদনে, লহরার বাজে, নৃত্যাদির সহযোগীতায়, কৃতানুসরণ প্রভৃতিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। (৬) সব সময় নির্দ্দিষ্ট স্বরটিকে এক ভাবে পাওয়া যায়, স্বর-বিচ্যুতির ভয় থাকে না। (৭) নবীন সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে ও সাধারণভাবে কণ্ঠসাধনার সহযোগীতায় বিশেষ কাযকরী।

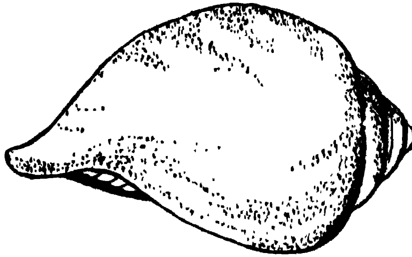
এই যন্ত্রের প্রতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণীদের উদাসীনতার কারণ: (১) ভারতীয় নির্দিষ্ট স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ইকোয়ালী টেম্পার্ড স্কেলের (সমান স্বরান্তরযুক্ত ঠাটের স্বরগুলি) স্বরসমষ্টির সঠিক মিল নাই। (২) স্বরের দোলন, মীড়, গমক প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার প্রকাশ করা যায় না। (৩) রাগানুযায়ী বিশেষ শ্রুতিযুক্ত স্বর প্রকাশ করা যায় না। (৪) সহযোগীতার সময় অনেক ক্ষেত্রে গায়কের স্বর বেসুরো মনে হয়, (যদিও তানপুরার সঙ্গে ঠিক মিল পাওয়া যায়)। রাগের সঠিক শ্রুতি হারমোনিয়মে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে Clements সাহেব ২২ শ্রুতি

৩। Encyclopeadia Britannica Vol. II 1974, Page 109.

প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন রীড দেওয়া হারমোনিয়ম তৈরী করে ভারতীয় কণ্ঠ-সঙ্গীতবিদ্‌দের সঙ্গে বাজাবার ব্যবস্থা করেও কণ্ঠে প্রকাশিত রাগোচিত শ্রুতিকে সঙ্গতের সময়ে (বিশেষ শ্রুতিযুক্ত রীডের ব্যবহারেও) সঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। (৪) এইসব কারণে ভারতীয় পণ্ডিতেরা যন্ত্রটিকে বেসুরো বলে থাকেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও একথা মানেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানেই ছেদ টানছি।

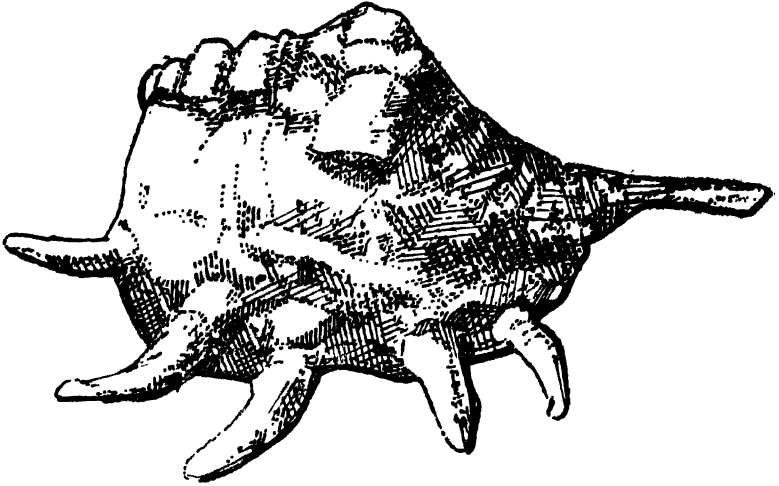

গোমুখশঙ্খ


গৌরীশঙ্খ

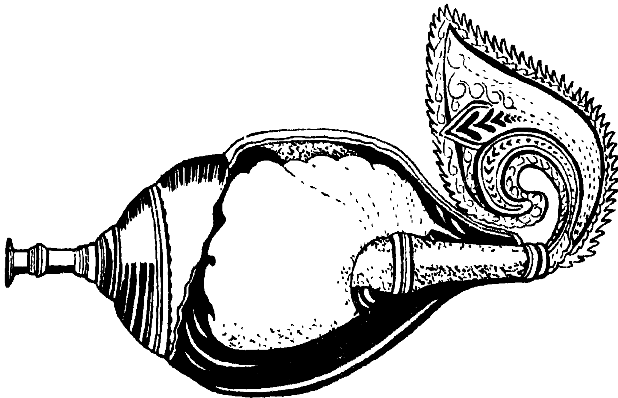

সাধারণ শঙ্খ

শঙ্খ ঃ আমরা ভগবান বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ দেখতে পাই। এর আবিষ্কর্তার নাম অথবা সাল তারিখ পাওয়া সম্ভব নয়। এই শুষির জাতীয় বাদ্য অতি প্রাচীন, যন্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল বা ধাতুর ব্যবহার যখন মানুষের অজানা ছিল, এই প্রকৃতি-প্রসূত যন্ত্রটি মানব সভ্যতার সেই আদিম অবস্থাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুদ্ধ ভাষায় একে **কম্বু** বলা হয় (যদিও দক্ষিণ ভারতে সকল রকম শিঙ্গার সাধারণ নাম কম্বু)। পূজা পার্বনে, সকল প্রকার শুভ কাজে ও উৎসবে এর ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুদের দেব মন্দিরে, গৃহস্থের ঘরে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজাবার রীতি

প্রচলিত। শঙ্খকে চলতি ভাষায় শাঁখ বলা হয়। প্রাচীনকালে শঙ্খ যুদ্ধের সময় ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং অন্যান্য নামী রথী মহারথীরা প্রত্যেকেই এক একটি বিভিন্ন নামের শঙ্খে ধ্বনি তুলেছিলেন।



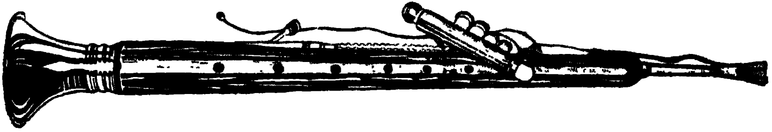
বৃহৎ পঞ্চমুখীশঙ্খ



অলংকরণশঙ্খ

শঙ্খ কয়েক প্রকারের দেখা যায়। তন্মধ্যে গোমুখশঙ্খ, গৌরীশঙ্খ, পঞ্চমুখীশঙ্খ, ধবলশঙ্খ, পানিশঙ্খ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। গোমুখ আকৃতিতে

গরুর শিংযুক্ত মুখের আকারের হয়। প্রায় একই প্রকার আকারের ছোটগুলিকে **গৌরীশঙ্খ** বলা হয়। এই শঙ্খ বাজাবার বিশেষ কৌশল আছে; শাঁখারীদের কাছে শিখে নিতে হয়। গোমুখ ও গৌরীশঙ্খকে হিন্দুরা পবিত্রভাবে ব্যবহার করেন। **দক্ষিণাবর্ত্তগোমুখ** কচিৎ দেখা যায়, এই শঙ্খকে দেবদেবীর মত আসনে রেখে পূজা করা হয়। সাধারণ শঙ্খও কচিৎ দক্ষিণাবর্ত হ'য়ে থাকে। দক্ষিণাবর্ত্ত শাঁখের পেটটি ডানদিকে ঘোরান থাকে। পঞ্চমুখীশঙ্খের ডানদিকে পাঁচটি আঙ্গুলের মত বন্ধ রন্ধ্র মুখ থাকে। কোন কোন পঞ্চমুখীতে একটি লেজও থাকে। অনেকে লেজযুক্ত পঞ্চমুখীকে **ষট্পদী** বলে থাকেন। দক্ষিণভারতে একপ্রকার অলঙ্কৃতশঙ্খ দেখা যায়, এর ফুৎকার রন্ধ্রে পিতল, তামা বা রূপার মুখ লাগান হয়। দক্ষিণের এই শঙ্খ **ধবলশঙ্খ** বা **অলংকরণশঙ্খ** নামে পরিচিত। ধবল শঙ্খের গায়ে নানা প্রকার নক্সার কাজ দেখা যায়। **পানিশঙ্খ** দেবদেবীর আরতির সময় মাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি বাজান হয় না। বাঙ্গালায় কয়েকটি নাট্যশালায় ও সঙ্গীতাসরে **শঙ্খতরঙ্গ** বাজান হয়েছিল। এই তরঙ্গে সাত স্বরের অথবা বার স্বরের বারটি শাঁখে কোন এক প্রকার রাগ বাজান হয়।



সানাই

শানাই বা সানাই : খৃষ্টজন্মের ৩০০০ তিন হাজার বছর পূর্বের ইজিপসিয়ান কবরের স্মৃতিস্তম্ভের চূড়ায় (Nay)* নাই জাতীয় বাঁশীর ছবি দেখা যায়। অনেকের ধারণা এই নাই থেকেই শানাই আবিষ্কৃত। নাই যন্ত্রটি সম্বন্ধে Indian Music নামক পুস্তকে লেখা হয়েছে "Nai has been the theme of all poets and love deities It is the invention of Omar Aiyyar to ensnare maidens with its magic sounds. It is exactly like the barrels of a gun and has seven openings" Page 99. এই পুস্তকে শানাই যন্ত্রের আবিস্কারকের নামও লেখা হয়েছে।

* "The Arabic Mizmar and Parsian word 'Nay' stands for any instrument of the wood wind family in case of Reed pipe also." Studies in Oriental Musical Instruments by Henry George Farmer, Ph. D. (IIs Series) 1931 page 58.

Senai is the remarkable invention of **Hakim Bu Ali** Senaichi. Senai is more or less similar to Uns in appearance. Both tube and cup are made of black-wood. The metal needle, ivory disk and blade of grass are adjusted on top as in Uns, only they vary in sizes. Senai is played in the temples and in a band called Naubat. Page no. ৮3. এখানে আমরা হাকিম বু আলি সানাইচির নাম দেখতে পাই। কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দিহান। অনেকের ধারণা, 'নাই' থেকেই শানাই এসেছে। এটি বাদশাহদের প্রিয় ছিল এবং সেই থেকে শাহ শব্দের 'শা' অক্ষরের সঙ্গে 'নাই' যুক্ত হয়ে শানাই হয়েছে। অন্যেরা বলেন, 'সিয়াহি' অর্থে কাল, ও 'নাই' অর্থে বিশেষ বাঁশী। কালো রং-এর বিশেষ বাঁশী বলে এর নাম (সিয়াহি+নাই=সিয়াহিনাই এবং সেই থেকে) **"সানাই"** রাখা হয়েছে। পারস্যের এই 'নাই' যন্ত্রটি রীড দেওয়া বাঁশী এবং সানাই যন্ত্রটিও রীড দেওয়া। অনেকের ধারণা যে শানাই যন্ত্রটি নাই থেকেই এসেছে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা কঠিন।

নামটি এভাবে জন্ম নিলেও আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মনে করেন, আমাদের প্রাচীন **মধুকরী** নামক বাঁশীটিই নাম ভেদে ও আকার পরিবর্তনে সানাই নামে প্রচলিত হয়েছে।

ভারতে মধুকরী যন্ত্রটিই শানায়ের মত বাজানো হ'ত। শানাই আকারে ধুঁতরো ফুলের মত, যন্ত্রটির স্বরধ্বনি সকলকেই মোহিত করে। এই সুন্দর ধ্বনির কারণে এর আর এক নাম **সুনাদী**। উৎসবে ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ, তবে আজকাল সঙ্গীতাসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশণে একে অংশ নিতে দেখা যায়। যন্ত্রটি বাহিদ্বারিক হলেও বর্তমানে কয়েকজন কুশলী বাদক রাগ পরিবেশণে এই যন্ত্রটিকে সভ্য যন্ত্রের সম্মানে উন্নীত করেছেন। যন্ত্রটি এককভাবে বাজে না, সুরের জমজমাটি বজায় রাখার কারণে মূল গ্রামিক স্বরটিকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে আর একটি শানায়ে বাজান হয়। এই একস্বর পরিবেশক সঙ্গী শানাইটিকে **শ্রুতিশানাই** বলে। বাদনকালে মূল শানাইবাদকের পশ্চাতে আর একজন পরিবেশক এই শ্রুতিশানাই বাজিয়ে থাকেন। শানাই-এর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য বাঁয়ার আকারের দুটি তালবাদ্য বেজে থাকে। এর একটি অপরটি থেকে ছোট। এগুলিকে নাকাড়া বা নাগারা বলা হয়। নাকারার বড়টিকে **জিল** ও ছোটটিকে **খুমা** বলা হয়।

শানাই লম্বায় সাধারণত ১॥ ফুট থেকে ২ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর মুক্ত প্রান্তের ওপর দিকে ৮।৯টি সরু ছিদ্র থাকে, এর মধ্যে ৭ (সাতটি) ছিদ্র প্রয়োজনে লাগে এবং বাকি ১।২টিকে মোম দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। এর ফুংকার স্থানে রীড (স্বর-জিহ্বা) অর্থে জিভ পরান হয়, এই জিভ বিশেষ এক প্রকারের **পালাঘাস** থেকে তৈরী হয়। বাজাবার আগে ফুংকার রন্ধ্রের কাছে হাতির দাঁতের সরু মুখের ভিতর এই জিভ পরান হয়। সাতটি ছিদ্র থাকলেও ২॥ সপ্তকের কড়িকোমল প্রভৃতি সমস্ত স্বরই এতে প্রকাশিত হয়। ফুঁ'এর কম বেশীর ওপর এবং স্বর-রন্ধ্রে আঙ্গুলের চাপের কম বেশীর ওপরই এতে বিভিন্ন স্বর প্রকাশ পায়।

আকবরের সময় প্রসিদ্ধ শানাই বা সুরনাই বাদক হিসাবে উস্তা মহম্মদের নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বারানসীর (Benares) বিলাতুস ভ্রাতাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

শৃঙ্গ বা শিঙা ঃ সংস্কৃত শৃঙ্গ শব্দ থেকেই শিঙা কথাটি এসেছে। শিংওয়ালা জন্তুদের শিং থেকে তৈরী হ'ত বলেই এর নাম শিঙা। দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে আমরা শিঙা যন্ত্রটি দেখতে পাই। যন্ত্রটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন আমাদের ধাতুর ব্যবহার জানা ছিল না তখন নানা প্রকারের জীবজন্তুর হাড়, শিং, চামড়া প্রভৃতি থেকেই বাদ্যাদি নির্মিত হ'ত। বর্তমানে শিঙা পিতল, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। অতীতে শিঙা, সংকেত জ্ঞাপনে, দূরাহ্বানে, জনসমাবেশ একত্রীকরণে ও যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে পূজায়, উৎসবে ও ব্যসনে এদের ব্যবহার দেখা যায়। ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে শিঙার ব্যবহার দেখা যায়। পারস্যের **কারণে,** হিব্রুর **কেরেণ,** গ্রীসের **কেরাণ,** রোমের **কর্ণু,** ফ্রান্সের **কর,** জার্মানি ও ইংলণ্ডের **হর্ণ,** ওয়েলসের **কর্ণ,** হাঙ্গেরীর **কারুৎ** (Kurt) প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও আমাদের শিঙার মত দেখতে। বর্তমানে শিঙার বদলে অনেক স্থানে বিউগল ও ট্রাম্পেট (Bugle & Trumpet) ব্যবহৃত হয়। সাধারণ শিঙা ছাড়া অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিঙার কথা অন্যত্র লেখা হয়েছে।



সরল বাঁশী

সরল বাঁশী ঃ আমাদের সরল বাঁশী পারস্যে আলগোঝা নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন এটি পারস্য থেকে আমদানি করা হয়েছে। অনেকে

বলেন এটি প্রাচীন ভারতীয় বাঁশী, পারস্য থেকে আমদানি করা হয় নি। পাশ্চাত্য দেশের ফ্ল্যাজিওলেট (Flageolet) রেকর্ডার অথবা (Fipple Flute) বাঁশী আমাদের সরল বাঁশীর অনুরূপ, মুরলীর মত এটিতেও ছ সাতটি ফুটো থাকে। এই ফুটোগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় স্বর-রন্ধ্র বলা হয়। মুরলী বাঁশীর যে ফুটোতে ফুঁ দিয়ে বাজান হয় অর্থাৎ মুরলী বাঁশীর ফুংকার রন্ধ্রের স্থানে এই বাঁশীর বায়ুরন্ধ্র (অর্থাৎ হাওয়া বেরোবার ফুটো) থাকে। সেই কারণে বায়ুরন্ধ্রে ফুঁ না দিয়ে এই বাঁশীর মুখে অর্থাৎ একেবারে গোড়ার দিকে হুইশেলের মত চ্যাপ্টা জায়গাটিতেই ফুঁ দিতে হয় এবং হাওয়া-ফুটোটি (বায়ুরন্ধ্রটি) খোলা রাখতে হয়। বাঁশীটি সোজাভাবে অর্থে সরল ভাবে ধরে বাজান হয় এবং সেই কারণেই এর নাম সরল-বাঁশী। হাওয়া-ফুটো ছাড়া এই বাঁশীতে আরও ছ' সাতটি ফুটো (স্বরছিদ্র) থাকে। ডানহাতের চারটি আঙ্গুল গোড়ার দিকের চারটি ফুটোয় ও বাঁহাতের তিনটি আঙ্গুল আগার দিকের তিনটি ফুটোর ওপর রাখা হয়। বাকি সব কায়দাই মুরলীর মত।

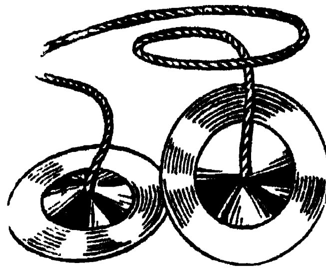
স্বর-বংশী : ইংরাজীতে একে Pitch Pipe বা Tuning Whistle বলে। সাধারণত: A, G, D, E, এই চারটি Note (স্বর) এতে পাওয়া যায়। এই চার বা ছয় স্বরের মধ্যে যে স্বরটিতে আপনার যন্ত্র বেঁধে নিতে চান সেই নির্দিষ্ট ফুৎকার ছিদ্রে ফুঁ দিলেই বাঁশীর সেই অংশ থেকে সেই স্বর ধ্বনি পাওয়া যায়। আর এক প্রকারের স্বর-বংশী দেখা যায় যেগুলিকে (Chromatic Pitch Pipe) **ক্রমিক-স্বর-বংশী** বলে। ১৯ শতকে এই পীচ-পাইপটি Eardsley's Patent Chromatic Pitch Pipe নামে প্রচলিত হয়। এই বাঁশীর সাহায্যে আপনার ইচ্ছামত যে কোন স্বরের (note-এর) সঙ্গে আপনি আপনার বাদ্য যন্ত্র মিলিয়ে নিতে পারেন। বাঁশীর মুক্তপ্রান্তে একটি স্বর-নির্দেশক কাঁটা এবং একটি চলমান স্বরনামাঙ্কিত ছোট অর্দ্ধচন্দ্রাকার (Dis) প্লেট থাকে। এই স্বরাঙ্কিত চার্টে খুব ছোট ছোট হরফে স্বরের নাম ও তার মাঝের অর্দ্ধস্বরগুলি চিহ্নিত থাকে। স্বরাঙ্কিত নির্দিষ্ট চাকতিটি সরিয়ে কাঁটাটি নির্দিষ্ট স্বরের উপর নিয়ে এসে বাঁশীতে ফুঁ দিলে আপনার প্রয়োজনীয় স্বরটি পেয়ে যাবেন। যে কোন বাদ্য যন্ত্রে সুর মেলানোর কাজে এই বাঁশী বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ঘনজাতীয় যন্ত্র

বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ধাতুর ব্যবহার জানার পরই ধাতব বাদ্যযন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়। ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহারই প্রথম। 'ঘন' শব্দের অর্থ লৌহ, তাই লোহার তৈরী যন্ত্রদের ঘনজাতীয় যন্ত্র বলা হয়। অন্যান্য ধাতুর আবিষ্কারের পর এই জাতীয় অধিকাংশ যন্ত্র বিভিন্ন ধাতুতে ব্যবহৃত হতে থাকলেও, ঘনজাতীয় যন্ত্র নামেই এরা প্রচলিত থেকে যায়। কাঁচ ও বাঁশের বা কাঠের যন্ত্রও পরবর্তী কালে ঘনজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের তালিকায় অংশ গ্রহণ করে। মুগুর, কাঠি বা অন্য কোন বস্তুর আঘাতে অথবা পরস্পরের আঘাতে এদের বাজান হয়। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মত ঘনজাতীয় যন্ত্রও তিনভাগে বিভক্ত।

১। **স্বতঃসিদ্ধ**	২। **অনুগতসিদ্ধ**	৩। **মাঙ্গল্য**
সপ্তসরাব	কাঁসি	ঘণ্টা
বাঁশতরঙ্গ	মন্দিরা প্রভৃতি	কাঁসর প্রভৃতি
মুকুরতরঙ্গ প্রভৃতি		

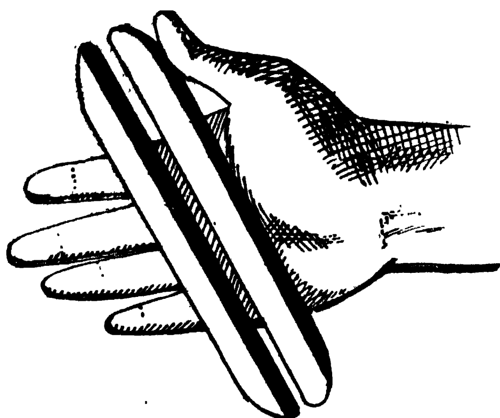
বর্তমানে ঘনজাতীয় সমস্ত যন্ত্রের বিষয় লেখা সম্ভব না হলেও প্রচলিত ও কিছু লুপ্ত যন্ত্রের বিবরণ লেখা হয়েছে।



করতাল

করতাল : অনেকটা ঝাঁঝেরই মত। কাঁসা বা পিতল দিয়ে তৈরী দুটি ছোট গোলাকার কিনারহীন থালার আকারের। করতালকে অনেকে খঞ্জনী বলে থাকেন। মন্দিরাকেও খঞ্জনী বলা হয়। করতালকে কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নামগানে ও খোলের সঙ্গে সঙ্গতে এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরার মাঝখানটি গভীর কিন্তু করতাল অনেকটা

সমতল তবে মাঝখানটি সামান্য অবতল। করতালকে **খরতালী** বা **খর্তাল** অথবা **খত্তালও** বলা হয়।



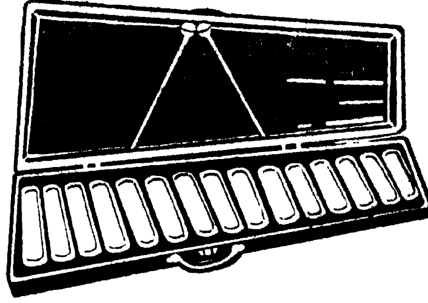
করতালি

করতালি ঃ দুটি অর্ধগোলাকার বিশুদ্ধ লোহার তৈরী যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রযুগলের মাঝের অংশ মোটা ও দুদিকের মুখ সরু হয়। যন্ত্র দুটি করতলের মাঝে রেখে হাত কাঁপিয়ে পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়ে থাকে। যাত্রায় জুড়ির গানে অথবা শোভাযাত্রার গানে একে বাজাতে দেখা যায়। অনেকে একে **কর্তাল** বা **খরতাল** বলে থাকেন।

কম্রা ঃ খয়ের কাঠ বা বেণুর তৈরী হত। বারো আঙ্গুল লম্বা ও দু আঙ্গুল চওড়া চারটি কাঠের টুকরো, মাঝখানটা মোটা ও শেষ দিকটা কিছু সরু। প্রতি হাতে দুটো করে কাঠি, (একটি মাঝের আঙ্গুলের গোড়ার দিকে ও অপরটি ডগার দিকে) ধরে কব্জি কাঁপিয়ে বাজান হত। প্রায় করতালির মতই, বর্তমানে লুপ্ত। কাঠে তৈরী হলেও একে ঘনজাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে।

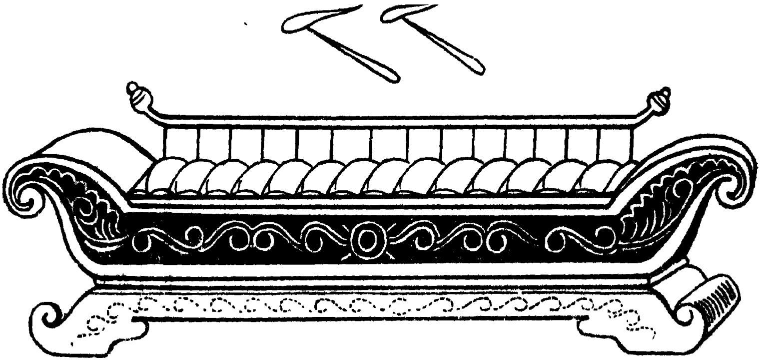
কাঁচতরঙ্গ ঃ বাঁশতরঙ্গ ও কাঠতরঙ্গের পর এই কাঁচতরঙ্গের আবির্ভাব। বাঁশতরঙ্গে বা কাঠতরঙ্গে স্বরের পর্দা (Reed) কাঠের বা বাঁশের টুকরো থেকে তৈরী হয়। কিন্তু কাঁচতরঙ্গে এগুলি মোটা কাঁচের ছোট বড় আকারের টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়। এই যন্ত্র প্রধানত উত্তর ভারতেই প্রচলিত। ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এর প্রচলন দেখা যায়। শুদ্ধ ভাষায় কাঁচতরঙ্গ **"মুকুর-তরঙ্গ"** নামে পরিচিত। জলতরঙ্গের থেকে অপেক্ষাকৃত

ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হলেও পরিষ্কার ও মধুর স্বরধ্বনি। আড়াই সপ্তক পর্যন্ত এতে বাজান যায়। ১৫ থেকে ১৯ খানি পদা সাজান থাকে। দুটি কাঠি দুহাতে



কাঁচতরঙ্গ

ধরে কাঁচের পর্দার ওপর ঘা দিয়ে বাজান হয়। স্বরধ্বনির অনুপাতে পর্দাগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়। বাজাবার কাঠির মাথাগুলি মখমল দিয়ে মোড়া থাকে।

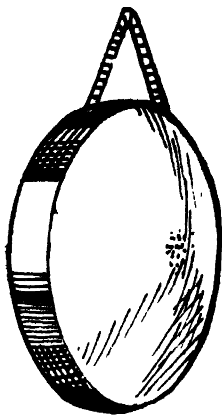


কাষ্ঠতরঙ্গ

কাষ্ঠতরঙ্গ: চলতি ভাষায় এটি কাঠতরং নামে প্রচলিত। সাধারণতঃ সম্মিলিত বাদ্যমণ্ডলিতেই এর স্থান। স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপেও একে কচিৎ তবলার সঙ্গতে বাজতে দেখা যায়। তবলার সঙ্গে অতি দ্রুত গতিতে এটি বাজে। মধুর পরিষ্কার স্বরধ্বনি এ থেকে পাওয়া যায় না বলেই সমবেত বাদ্যমণ্ডলিতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অনেকে এটিকে বাঁশতরঙ্গের নকল বলে থাকেন। প্রায় ২২ অথবা ২৪ খানি মোটা চওড়া কাঠের পর্দা (স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে)

একটি অর্ধবৃত্তাকার কাষ্ঠাসনের ওপর রাখা থাকে ও ছুটি হাতে ছুটি কাঠের মাথা-মোটা ছোট মুগুর দিয়ে বাজান হয়।

কাঁসর: কাংস্যময় ধাতু অর্থে কাঁসা থেকে তৈরী বলে এই ঘনজাতীয় বাদ্যটিকে কাঁসর বলা হয়। ঝাঁঝর থেকেই কাঁসরের জন্ম। কাঁসর গোলাকার হয় এবং ধার (কিনার) তোলা ও মোড়া থাকে। এরসর্বত্র সমতল, পৃষ্ঠটি ঈষৎ উত্তল। এর পিঠে ঝাঁঝরের মত কোন কুঁজ থাকে না। এটি মাঙ্গল্য বাদ্য। হিন্দুদের পূজার সময় অঙ্গণে ও প্রাঙ্গণে একে বাজতে দেখা যায়। সংবাদ জ্ঞাপনের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। কাঁসর বাঁহাতে ধরে ডানহাতে মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কাঁসরের ঊর্ধ্বমুখে ছুটি ছিদ্র থাকে সেখানে দড়ি বেঁধে এটিকে ঝোলান অবস্থায় দড়ি ধরে বাজিয়ের সামনে রেখে বাজান হয়।


কাঁসর

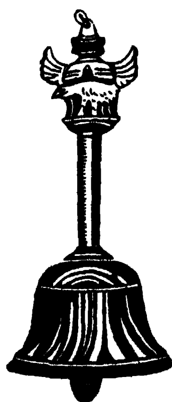
কাঁসি: কাঁসরের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কেবল ঢোলের সঙ্গে সঙ্গতেই একে দেখা যায়। কাঁসরের মতই একে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁহাতে ধরে ডানহাতে কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কাঁসির আওয়াজ কিছু তীব্র। ঢোলের সঙ্গে তাল দেওয়াই এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। একঘেয়ে তাল ও মাত্রা দেওয়া ছাড়া এর বোলের কোন বিচিত্রতা নাই। ঢোলের নানা কাঠির বিচিত্র লয়দার বোলের সঙ্গে কাঁসিতে একভাবে মাত্রা রেখে যাওয়া কঠিন। বিশেষ অভ্যাস ব্যতিরেকে কাঁসিতে সঙ্গতের সময় একভাবে লয় রক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।


কাঁসি

কাংস অথবা কাংস্যতাল: পদ্মপাতার আকারের ছুটি গোলাকার কাঁসার থালা ১৩ আঙ্গুল ব্যাসের। তলদেশের মাঝখানে দু আঙ্গুল মুখ, তার মাঝে এক আঙ্গুল নিচু জায়গায় ফুটো এবং সেই ফুটোর মাঝখান দিয়ে দড়ি পরিয়ে দুহাতে তালি দেওয়ার মত বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত। (অনেকটা দক্ষিণ ভারতের জালরার মত)।

খঞ্জনী ঃ (মন্দিরা দেখুন)।

খুজিতালম্ ঃ এটিও জালরার মত। অনেকটা আমাদের খর্তালের মত বলা চলে। মাঝখানটা অবতল (concave)। এটি দক্ষিণ ভারতের একপ্রকার ঘনবাদ্য, গানে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



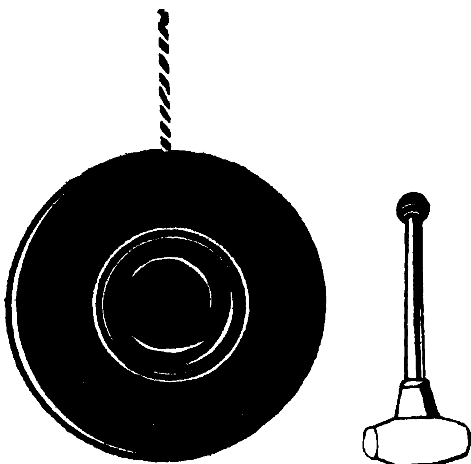
হাতঘণ্টা



ঝুলন-ঘণ্টা

ঘণ্টা ঃ প্রাচীন কালে ঘণ্টা সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহৃত হত, বর্তমানেও একে কচিৎ সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন বিজ্ঞাপনের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ঘণ্টা দুরকমের— প্রথম **হাতঘণ্টা** এবং দ্বিতীয় **ঝুলান-ঘণ্টা**। দুরকমের ঘণ্টাই কাঁসা, পিতল, রূপা, ব্রোঞ্জ, ভরণ, লোহা প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হয়। হাতঘণ্টার ওপরে একটি দাণ্ডি থাকে। দাণ্ডিটি হাতে ধরে হাতঘণ্টা বাজান হয়। হাতঘণ্টা সচরাচর দেবমন্দিরে পূজা ও আরতির সময় বাঁহাতে ধরে বাজান হয় তাই এটিকেও মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয়। বড় বড় ঘণ্টা গীর্জা ও মন্দিরের

মাঝে লোহার শিকল বা মোটা দড়ি দিয়ে ঝোলান থাকে এবং পূজা ও পার্বণে বাজান হয়। এই ঝুলান ঘণ্টা বৃহৎ এবং অতিবৃহৎ আকারের হয়। রাশিয়ার যাদুঘরে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঝুলান ঘণ্টা রাখা আছে।

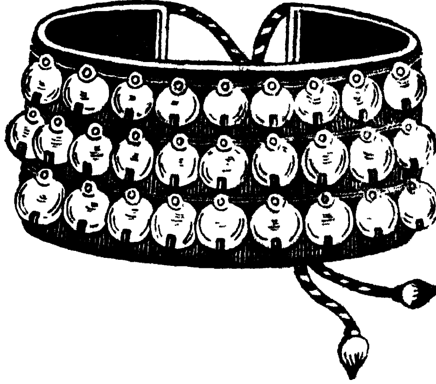


ঘড়ি

ঘড়িঃ ধাতুর তৈরী একপ্রকার ঘনযন্ত্র। গোলাকার, কিনারহীন থালার মত সমতল। প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা কাঁসার চাদর থেকে গোলাকার ভারী এই যন্ত্রটি তৈরী হয়। আকারে প্রায় ৮" থেকে ১৮" ইঞ্চি ব্যাসের দেখা যায়। ঘটিকা শব্দ থেকেই ঘড়ি কথাটি এসেছে। হিন্দুদের দেবদেবীর পূজার সময় এর ব্যবহারের কারণে এটিকে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলা হয়। সংবাদ প্রচারে বা সময় নিরূপণের কাজেও একে স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যখন যান্ত্রিক ঘড়ি ছিল না তখন সময় জ্ঞাপনের কাজে এর বিশেষ ব্যবহার ছিল, এবং সেই কারণেই এর নাম ঘড়ি রাখা হয়েছিল। ঘড়ির মাথায় একটি ছেঁদার মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে কাঠের মুগুর দিয়ে একে বাজান হয় অথবা কাঠের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রেখে মুগুরের ঘা দিয়ে বাজান হয়। এর ধ্বনি মধুর ও সুদূরপ্রসারী।

ঘুঙুরঃ শুদ্ধ ভাষায় ঘুঙুরকে **ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা** বলা হয়। পেতল, ব্রোঞ্জ বা কাঁসার তৈরী ছোট ছোট অনেকগুলি ঘুন্টি সুতা দিয়ে বেঁধে নাচের সময় পায়ে পরা হয়। এই ছোট ছোট ঘুন্টির গুচ্ছকে **তোড়া** বলা হয়। নাচের সময় দুটি তোড়া

দুপায়ে পরে তাল দেওয়া হয়। নানা ধরণের পা ফেলার কায়দায় তোড়া ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চলে। বিভিন্ন লয়ে দ্রুত পা ফেলার কায়দাকে তোড়ার



তোড়া

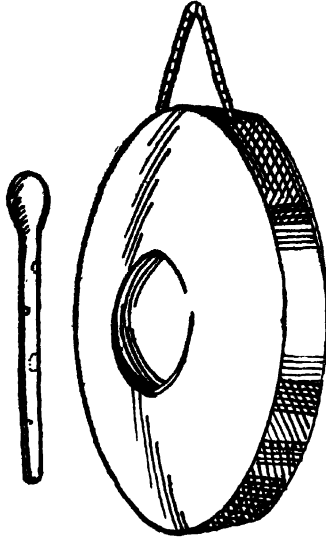
কাজ বলা হয়। গ্রাম্য গীতে যথা মনসার গান, শীতলার গান, তরজাগান প্রভৃতির সময়ে গায়করা অনেকে ঘুঙুরের তোড়া ব্যবহার করেন। ঘুঙুর প্রাচীন যন্ত্র। আজকাল চামড়ার বেল্টের উপর ঘুন্টি দিয়ে তোড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জয়ঘণ্টা: পুরাকালে যুদ্ধে জয়লাভের পর এই ঘণ্টা ব্যবহৃত হত বলে এর নাম জয়ঘণ্টা রাখা হয়েছিল। বর্তমানে এই বৃহদাকারের ঘণ্টাগুলি গীর্জার চূড়াঘরে বা হিন্দুর দেব-মন্দিরে ঝুলান থাকে।

জালরা: পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরা একজোড়া ঘন যন্ত্র বিশেষ। হরিকথায় ও ভজন গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। দুহাতে দুটিকে ধরে একটির ওপরে আর একটির আঘাত দিয়ে গানে তাল রাখা হয়। দক্ষিণ-ভারতের জালরাকে উত্তর-ভারতে করতাল ও খঞ্জনী বলা হয়।

ঝাঁঝ: ঝঞ্ঝা শব্দ থেকে ঝাঁঝ শব্দটি এসেছে। চলতি ঘন বাদ্যের মধ্যে ঝাঁঝ নামে যেটি প্রচলিত সেটি ঝাঁঝর বা কাঁসর নয়। এই ঝাঁঝ গোলাকার দুটি প্লেট অর্থে কিনারহীন দুটি বড় থালার মত। ঐ থালা দুটির মাঝখানটা উচ্চ থাকে এবং সেই অবতল স্থানের মাঝে ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুহাতে দুটি থাল বাজান হয়। এগুলি ভক্তিমূলক গানের সঙ্গতে বেজে থাকে। ঝাঁঝ দুরকম আকারের দেখা যায়। বড় ও মাঝারি ঝাঁঝ ব্যাণ্ড পার্টি বা সমবেত বাদ্যমণ্ডলীতে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের কাংস্যের আকারের সঙ্গে এর কিছু মিল দেখা যায় ছোট ঝাঁঝরকে করতাল বলা চলে এবং বড় ঝাঁঝকে ইংরাজীতে cymbals বলে।



ঝাঁঝর

ঝাঁঝর ঃ সমস্ত ঘন জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁঝর অতি প্রাচীন। প্রাচীনকালে ঝাঁঝর লোহা থেকে তৈরী করা হত। লোহার তৈরী বলে ঝনঝনে আওয়াজের কারণেই এর নাম ঝাঁঝর রাখা হয়েছিল। এর অপর নাম ঝঞ্ঝা। বর্তমানে ঝাঁঝর কাঁসায় তৈরী হয়। ঝাঁঝর গোলাকার ও বড় মাপের হয়। এর ধার (কিনার) তোলা ও ঈষৎ মোড়া থাকে। এর পিঠ সামান্য উত্তল থাকে এবং পিঠের মাঝখানের একটু গোল অংশ কুঁজের মত (হ্যাজ) ওঠা থাকে। গোলাকার ঝাঁঝরের মাথায় দুটি ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্রের মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বাঁ হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়ে থাকে। এটিও মাঙ্গল্য বাদ্য, পূজাপার্বণে একে বাজাতে দেখা যায়। বৃহদাকারের ঝাঁঝর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গং (Gong) নামে পরিচিত। এর অপর একটি নাম **টম্‌টম্‌**। ভারতের আসাম মণিপুরে গং **সেঙ্গু** নামে প্রচলিত। বড় গং স্ট্যাণ্ডের মাঝে ঝোলান থাকে এবং কাঠের মুগুর দিয়ে আঘাত করা হয়। ঝাঁঝর বা বড় গং পুরাকালে সংবাদের কাজে, সময়নির্দেশে

ও দূরাহ্বানে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একে দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট স্বরে এটি বাঁধা থাকে না।

তাল : আগুনে শোধন করা দুটি ক্ষুদ্র গোলাকার কাঁসার থাল। মুখের মাপ সওয়া ২ আঙ্গুল। তার মাঝখানটা এক আঙ্গুল নীচু এবং সেই নীচু জায়গার মাঝে ফুটো। মাঝখানের ঘের দেড় আঙ্গুল উঁচু। ফুটোর মাঝ দিয়ে সুতা বেঁধে দুহাতে দুটি ধরে পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। ডান হাতের থালাটির মুখ অল্প বেঁকা থাকে। বর্তমানে লুপ্ত।

তোড়া : ঘুঙুর দেখুন :



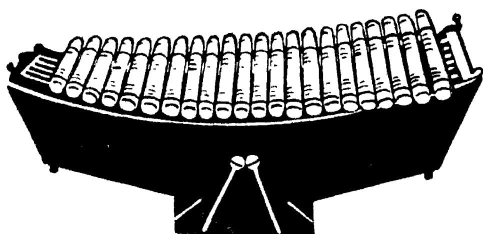
নূপুর

নূপুর : পায়ের গোছে পরার ধাতুর তৈরী অলংকার বিশেষ। এই অলংকার অনেকটা কড়াই শুটির মত, এর ভিতরে কড়াই শুটির মত গোলাকার গুলি থাকে এবং চলার সময় পায়ের তালে তালে এ থেকে মৃদু ধ্বনি প্রকাশ পায়। অনেকে নাচের সময় পায়ে পরে তালঝঙ্কার সৃষ্টি করেন। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে আমরা **নূপুরের** প্রচলন দেখতে পাই। অতি প্রাচীন এই **নূপুর** ভারতের নিজস্ব এক ঘন জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। এর জন্মের সাল তারিখ বা আবিষ্কার কর্তার নাম জানা নাই। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির চরণে দেখা যায় বলে দ্বাপর যুগে সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়।

পট্ট : শ্রীপর্নী (গাবগাছের কাঠ) কাঠের তৈরী। ত্রিশ থেকে বত্রিশ আঙ্গুল লম্বা চারকোণা যন্ত্র। একহাত চওড়া, উপরে ও নীচে দুটি লোহার পর্দা। দুটি দড়ি লাগান থাকে। এই দুটি দড়ির সঙ্গে দুটি ছোট ছোট লোহার গোলাকার বালা যুক্ত থাকে। যন্ত্রটি বুকের সামনে উরুর মাঝে রেখে গাছের রস বা রালা অথবা কোন আঠায় আঙ্গুল ডুবিয়ে যন্ত্রের ওপর সেই আঙ্গুল ঘষে বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত। বিবরণ সুসম্পূর্ণ না থাকায় সঠিক আকার ও বাদনপ্রণালী লেখা সম্ভব হল না।

বাঁশতরঙ্গ : ব্রহ্ম ও চীন দেশে এই যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। আমাদের দেশে সম্মিলিত বাদ্যমণ্ডলীতে কখনও কখনও একে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের জাইলোফোনের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। অনেকের



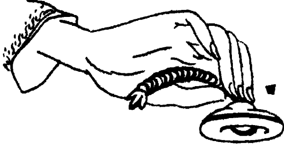
বাঁশতরঙ্গ

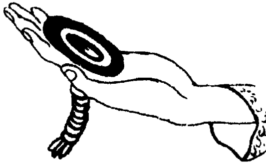
ধারণা এই যন্ত্রের অনুকরণেই জাইলোফোন জাতীয় যন্ত্রের সৃষ্টি। ব্রহ্ম ও চীন দেশে বাঁশতরঙ্গ = বস্তরণ (Basataran) নামে প্রচলিত। ২১ থেকে ২৪ খানি পর্যন্ত পর্দা থাকে। বাঁশের তৈরী মোটা মোটা মাপ করা টুকরো (বড় থেকে ক্রমশ ছোট আকারের পর্দা) নৌকার আকারের কাঠের ফ্রেমের ওপর সাজান থাকে। এই পর্দাগুলি সপ্তকের স্বরধ্বনির সঙ্গে মেলান থাকে। এটি ব্রহ্মদেশ জাত যন্ত্র বলে জানা যায়। গোল মোটা মাথার দুটি কাঠি দুহাতে ধরে পর্দার ওপর ঘা দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হয়ে থাকে। সমবেত বাদ্যমণ্ডলীতে এর ব্যবহার দেখা যায়। ক্বচিৎ এককভাবে তবলার সঙ্গে বাজতে শোনা যায়। কাঠির কাজেই এর বাজের বৈশিষ্ট্য।

ব্রহ্মতালম্ঃ দক্ষিণভারতের একপ্রকার ঘন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। একজোড়া ছোট গোলাকার ডিমের মত, মাঝখানটা কুঁজের মত উঁচু। কুঁজের মাঝের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সুতলী দড়ি পরিয়ে সেই সুতা দিয়ে দুটি থালা দুহাতে ধরে পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। পূজায় আরতির সময় নাম কীর্তনে এবং ভজন গানে এই যন্ত্রে গানের সঙ্গে তাল দেওয়া হয়। বৃন্দ-বাদনেও এই তাল যন্ত্রটিতে বাজতে দেখা যায়। উত্তরভারতের খঞ্জনীর মত।

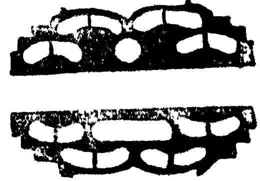
মন্দিরাঃ মন্দিরাকে অনেকে খঞ্জনী বলে থাকেন। কাঁসার তৈরী ছোট ছোট দুটি গভীর বাটি। বাটি দুটির তলদেশের মধ্যস্থান ন্যুব্জ এবং সেই গভীর স্থানে বড় আকারের ফুটো থাকে। এই ফুটোর মাঝ দিয়ে সুতলী দড়ি গলিয়ে মাঝের আঙুলের সঙ্গে খুব ঢিলা ভাবে বাঁধা থাকে। দু-হাতে দুটি বাটি ধরে

পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। কালীকীর্তনে, যাত্রার জুড়ী গানে, মাঙ্গলিক পালাগানে ও সমবেত ভক্তিমূলক গানে এর ব্যবহার দেখা যায়।





মন্দিরা

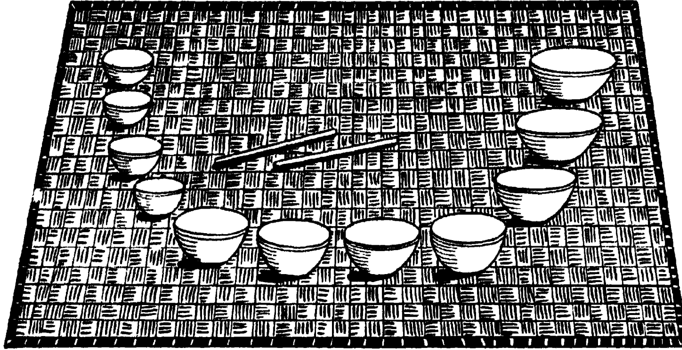


রাম-খরতাল

রাম-খরতাল ঃ ধর্মীয় সমবেত সঙ্গীতে বা একক ভজনগানে এই যন্ত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। এগুলি ছোট থেকে অনেক বড় বড় আকারের হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। কাঠের খাঁজের মাঝে মাঝে পিতলের দু'টি চাকতি রাখা থাকে। হাতে ধরে বাজাবার সময় এগুলি থেকে মধুর ঝিনাঝিনি আওয়াজ হতে থাকে।

সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ ঃ শরাব অর্থে জলপূর্ণ বাটি। সাতটি জলভরা বাটির নাম সপ্তশরাব। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের তালিকায় এই সপ্তশরাবের নাম পাওয়া যায়। এর ডাকনাম **জলতরঙ্গ**। ফার্সী ভাষায় একে **"চিনী-নাওয়াজ"** বলা হয়। আগের দিনে জলতরঙ্গ কেবলমাত্র সাতটি জলভরা বাটি সাতটি মূল স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজান হত। আজকাল জলতরঙ্গে মূল সাতস্বরের সাতটি বাটির অতিরিক্ত সাত, আট বা দশটিরও বেশী বাটি রাখা হয়। কখনও কখনও কুড়িটি পর্যন্ত বাটি দেখা যায়। এগুলি উদারার মধ্যম থেকে তারা গ্রামের গান্ধার মধ্যম পর্যন্ত রাগ অনুযায়ী প্রয়োজন মাফিক কড়ি কোমল স্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধা হয়। বাটিগুলি সাধারণতঃ চিনামাটির তৈরী হয়ে থাকে। বাজাবার সময় জলপূর্ণ বাটিগুলি দুই তিন ইঞ্চি উঁচু কাঠের গোল পিঁড়িতে কম্বলের আসনের উপর বসান হয়। স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা অনুযায়ী বাটিগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়ে থাকে।

স্বর বাঁধার সময় স্বর অনুযায়ী বাটিগুলিতে জল কম বেশী করা হয়। বাটিগুলি খুরাওলা বাটি, এবং বাটির খুরাগুলি পিঁড়ির সঙ্গে কাঁটা পেরেকের খাঁজে আটকান থাকে। জলতরঙ্গ অধিকাংশ সময়ে সমবেত বাদ্যমণ্ডলীতে বেজে



জলতরঙ্গ

থাকে। স্বতঃসিদ্ধ সভ্য যন্ত্ররূপে সঙ্গীতসভায় এককভাবে তবলার সঙ্গতেও একে বাজতে দেখা যায়। জলতরঙ্গের স্বরধ্বনি মধুর, তবে ক্ষণস্থায়ী। দক্ষিণভারতের বেহালা ও মৃদঙ্গের সঙ্গে একে বাজতে দেখা যায়। দুই হাতে দুইটি বেতের পাতলা কাঠি ধরে বাটির উপর ঘা দিয়ে জলতরঙ্গ বাজান হয়। কাঠির ঘা-এর বিচিত্রতা এবং একমাত্রার মধ্যে ৮ থেকে ১৬টি কাঠির ঘা রেখে বাজানতে এর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। খুব অল্প সংখ্যক বাজিয়েই এই যন্ত্রে বোল কাঠির ঘা ও তার বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন।

স্বর শলাকা ঃ এই শলাকাটি ইংরাজীতে Tuning-Fork বা Pitch-Fork নামে প্রচলিত। ইংরাজী ১৭১১ সালে খ্যাতনামা Trumpet বাজিয়ে জন শোর (John Shore) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (Vide Encyclopeadia Americana —Vol—27, Page 021 Ed. 1967) শলাকাটি ইংরাজী বড় U হরফের আকারের। একটি শলাকা কেবলমাত্র একটি স্বরই প্রকাশে সক্ষম। হারমোনিয়মের রীড ও পিয়ানো জাতীয় যন্ত্রের তার এই স্বর-কাঁটার সাহায্যে মেলান হয়। এই কাঁটার ডগায় ঘা দিয়ে কানের কাছে রাখলে বহুক্ষণ যাবৎ একটি স্বরের অনুরণন শোনা যায়।

শব্দ-সূচী

অ

ভ

গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দ

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Bibliography

Arab Music & Musical Instrument — S. Danialls
Asiatic Research Journal — Asiatic Society
Bibliography of Musical Instruments and Archaeology — K, Schlesinger
Evolution of the Classic Guitar — Wilfrid.
Folk Dances of Bengal — Gurusaday Dutt.
India in Greece — Mr. Pokak.
Indian Music — Sahinda.
Introduction to the Study of Bharatiya Sangit Sastra — H. Krishnamacharyya
Indian Folk Musical Instruments — Kothari. S. N. Ac. N. Delhi
Introduction to the Study of Musical scales — Alain Danielou
History of Music — Charles Burney
History of Indian Music — Sambomoorthy

History of Indian Musical Instruments	Curt Sachs
History of Arab Music	Farmer
Journal of Music Acadamy	Madras
Music of India	N. Augustus Willard
Music of India	Rev. Popley.
Music of Hindusthan	Fox Strangway
Music through the Ages	Elizabeth E. Rogers
Music Instruments of India	S. Krishnaswamy.
Music Instruments through the Ages	Iris Urwin (Translator) by Anthoney Baines
Music Instruments and their History	Karl Geringer
Musical Instruments	A. J. Hipkins
Laya Vadyas	P. Sambomoorthy
New Oxford History of Music	Egon Wells.
Oxford Companion of Music	Percy A. Scholes
Ragas & Raginees	O C. Ganguly.
Short Notices on Hindu Musical Instruments	Raja Sir Sourindra Mohan Tagore
Studies in Oriental Musical Instruments	Henry George Farmer
Sruti Vadyas	P. Sambomoorthy
The Story of Indian Music & its Instruments	Ethel Rosenthal
The Story of Musical Instruments	H. W. Schwartz.
The story of Indian Music	O. Gaswami
The eight principal Ragas of the Hindus	Rajs Sir Sourindra Mohan Tagore
The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan	By Capt. C. R. Day (Oxford shire Light Infantory
To whom dhrupad owes its origin.	Dagar S. S. Mandir.

Universal History of Music	Tagore
Dictionary of Music & Musicians	Grove's
Dictionary of South Indian Music & Musicians	P. Sambomoorthy
Directory of the World Music and the Musicians Guide	1968.
Encyclopeadia Britannica	1973. Edition.
Encyclopeadia Americana	1966 Int. Edition.
Encyclopeadia of the Violin	Bachmann.
Harvard Dictionary of Music	1970. 2nd Edition.
International Cyclopeadia of Music & Musicians	9th Edition

গ্রন্থ-পঞ্জী

আশুরঞ্জনীতত্ত্ব	শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
এসরার মুকুল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এসরার তরঙ্গ	শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কীর্তন (বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
কীর্তন গীতি প্রবেশিকা	„ „
গীতসূত্রসার	সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
তবলার কথা	শ্রীসুবোধ নন্দী
তবলাবিজ্ঞান ও বাণী	শ্রীরবিন্দ্রকুমার বসু
দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর	শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিন্তা	ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল
বাংলা ছন্দমালা	পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি
বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড)	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ঐক্যতান স্বরলিপি	শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
বিষ্ণুপুর ঘরাণা	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
ভক্তি রত্নাকর	ঠাকুর নরহরি দাস
ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ	ডাঃ বিমল রায়
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা	শ্রীদিলীপকুমার রায়
মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
যন্ত্রকোষ	রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	„ „ „ „
রাগরূপায়ণ	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
হিন্দুসঙ্গীত	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ
সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা	রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীতসার	শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
তত্ত্ববোধিনী	সম্পাদক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দী

সঙ্গীতজ্ঞকে সুস্মরণ	বিলায়েৎ হুসেন
সঙ্গীতসুদর্শন	পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য
হামারে সঙ্গীতরত্ন	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি	পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে
হিন্দী-বাংলা অভিধান	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী
*হিন্দী শব্দ-সাগর (অভিধান)	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

উর্দু

হিন্দী-উর্দ্দু-শব্দকোষ	মহম্মদ মুস্তাফা খান
আইন-ই-আকবরী	আবুল ফজল
তুহাফতুল-হিন্দ্	মীর্জা খাঁ
নগমাতে আসরফী	মহম্মদ রজা
মাদেনুল মুসীকি	করম ইমাম
কিতাব-অল-কাফী ফিল-মিউজিক (আরবী)	হুসেন ইবন জাইলা

সংস্কৃত

চতুর্দণ্ডী প্রবেশিকা	ভেঙ্কটামখী
নারদীয় শিক্ষা	নারদ মুনি
পঞ্চমসার সংহিতা	নারদ মুনি
পাণিনীয় শিক্ষা	পাণিনি মুনি
বৃহদ্দেশী	মতঙ্গ মুনি
নাট্যশাস্ত্র	ভরত মুনি
মানসোল্লাস	সোমেশ্বর
যাজ্ঞবল্ক্যীয় শিক্ষা	যাজ্ঞবল্ক্য মুনি
রাগতরঙ্গিনী	লোচন কবি
রাগবিবোধ	সোমনাথ
রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসার	মহারাজা প্রতাপ সিংহ
সঙ্গীত সময়সার	পার্শ্বদেব
সঙ্গীতরাজ	মহারাণা কুম্ভ

---

*হিন্দী মাসিক পত্রিকা—"সঙ্গীত"-হাথরাস শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ

সঙ্গীতচূড়ামণি		কবিচক্রবর্তী জগদেকমল্ল
সঙ্গীত দামোদর		পণ্ডিত শুভঙ্কর
সঙ্গীত পারিজাত		পণ্ডিত অহোবল
সঙ্গীত মকরন্দ		নারদ
সঙ্গীত রত্নাকর		শার্ঙ্গদেব (এ্যাডেয়ার সংস্করণ)
সঙ্গীতোপনিষদ্ সারোদ্ধার		সুধাকলশ
হৃদয়-কৌতুক		হৃদয়নারায়ণ
হৃদয়-প্রকাশ		„
ভরত-ভাষ্যম্		নান্যদেব
স্বরমেল কলানিধি		রামামাত্য
পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (English Translation)		পণ্ডিত কালাণ্ডে
বীণা-প্রপাঠক		পরমেশ্বর
শৃঙ্গার-সাবিত্রী		পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক
তৌর্য্যত্রিক	সম্পাদক	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
বালক	„	শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী
ভারতী	„	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুর ও সঙ্গীত (প্রবন্ধ)	„	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঙ্গীত-চিন্তা (প্রবন্ধ)	„	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরছন্দা (বাংলা)	„	শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত-কোষ	„	শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

বহু সঙ্গীতগ্রন্থ পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহে থাকলেও এবং বহু সঙ্গীত গ্রন্থের পরিচয় জানা থাকলেও সকল গ্রন্থের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কেবলমাত্র এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থ সংকলনের সময় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের নামই এই গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পেয়েছে ।